বর্ধমান সমগ্র

তৃতীয় খন্ড

ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব সমাজ নদনদী কৃষি
শিল্প রাজনীতি আন্দোলন সমবায়
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ

সম্পাদনা
ড. গোপীকান্ত কোঙার

পরিবেশক
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০৭৩

BARDHAMAN SAMAGRA VOL III
Ed. by Dr. Gopikanta Konar

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪০৮ জুলাই ২০০০
প্রকাশিকা : সুলেখা কোঙার নতুনপল্লী বর্ধমান
পরিবেশক : দে বুক স্টোর ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
মুদ্রক : অর্চনা অফসেট ১৬৮ নতুনপল্লী বর্ধমান
প্রচ্ছদ : শ্যামলবরণ সাহা ৩৭ কালনা রোড বর্ধমান
অক্ষর বিন্যাস : মৃণালকান্তি ঘোষ
অক্ষর সংশোধন : মাধব চক্রবর্তী

উৎসর্গ

আগামীদিনের গবেষক
ও বিদ্বজ্জনের উদ্দেশে

উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বঙ্গের জেলাগুলির গেজেটিয়ার রচিত হতে থাকে। সেই থেকে বাংলা ভাষায় জেলার বা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা রীতিসম্মত হয়। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যাঁরা এ ধরনের গবেষণা করেছিলেন তাঁরা সকলে পেশাদার ঐতিহাসিক ছিলেন না। পেশাদার ঐতিহাসিকগণ আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব সর্বদা অনুভব করেন নি। ফলত অনেক ক্ষেত্রেই জেলার বিবরণ বা অঞ্চলের বিবরণ গেজেটিয়ার-এর অনুকরণে রচিত হয়। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের জেলার বা অঞ্চলের বিবরণে স্থানীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে তথ্যের অভাব দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে।

বর্ধমান একটা গুরুত্বসম্পন্ন বড় জেলা। এখানে অনেক বিশিষ্ট বাঙালি জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসে বর্ধমান উপেক্ষিত হয়ে রইল। বর্ধমান আছে। বর্ধমান থাকবে। এই ছিল ধারণা। বর্ধমানকে ধরে নেওয়া হয়েছে। পেশাদার ঐতিহাসিকগণ এ জেলার ইতিহাস লেখার জন্য এগিয়ে আসেননি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বর্ধমান সহ রাঢ় বঙ্গের ইতিহাস লেখার জন্যপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। অদ্যাবধি বর্ধমান সম্বন্ধে যা গবেষণা হয়েছে বা অধ্যয়ন হয়েছে, তার জন্য প্রধানত সে সকল বুদ্ধিজীবীরাই প্রশংসনীয়, যাঁদের পেশাদার ঐতিহাসিক বলা যায় না।

অথচ বর্ধমান জেলায় ঐতিহাসিক উপকরণের প্রাচুর্য দেখা যায়। এ জেলায় কোথাও কোথাও প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্টি বিকশিত হয়েছিল। জৈন শ্রমণেরা এখানে এসেছিলেন। বর্ধমান শব্দটির মধ্যেই জৈন

ধর্মের ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। বর্ধমান সুপ্রাচীন নগর। এ সব তথ্যই এখন জানা আছে। প্রাচীন জীবনযাত্রার বিবরণ ও কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাদের একটি বড় চমৎকার। সম্ভবত কাটোয়ার কাছে ছিল প্রাচীন সিদ্ধলগ্রাম। এই গ্রামের অতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ভট্ট ভবদেব, বিক্রমপুরের দেব বংশের রাজা জাতবর্মণের বা তাঁর পুত্র হরিবর্মণের মন্ত্রী ছিলেন। তা ছাড়াও তিনি ছিলেন বিরাট পন্ডিত এবং খ্যাতনামা সন্দর্ভ রচয়িতা। ভবদেব নিজের গ্রামে অথবা কাছাকাছি কোন জায়গায় একটি জলাশয় খনন করিয়েছিলেন। তার শিল্পিত বিবরণ এইরূপ

রাঢায়ামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী
সীমাসু শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎ প্রাণাশয়প্রীণন ঃ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরস্রাতাভিজাতাঙ্গনা
বক্তাব্জপ্রতিবিম্বমু গ্ধমধুপীশূন্যাব্জিনী কানন ॥

জলহীন রাঢ়ে জঙ্গলপথের ধারে গ্রামের উপকণ্ঠে জলাশয় খনন করিয়েছিলেন। তাতে শ্রান্ত পথিকদের প্রাণ জুড়াত । জলাশয়ে পদ্ম ফুটে থাকত। পদ্মমধু পান করত মৌমাছিরা। কিন্তু যখন অভিজাত ঘরের অঙ্গনাগণ স্নান করতেন, তখন জলে প্রতিবিম্বিত তাঁদের পদ্মমুখের দিকেই পদ্মবন ছেড়ে উড়ে আসত মুগ্ধ মৌমাছিরা। এর সঙ্গে ভারতচন্দ্র-বর্ণিত বর্ধমানের সায়রের কিছুটা মিল আছে। বৈষ্ণব কবি এবং চৈতন্যের জীবনীকার জয়ানন্দ-প্রদত্ত কাটোয়া শহরের বিবরণও সুন্দর। সেখানে থাকেন শত শত দ্বিজ। সেখানে নদী সপ্তধারা। সেখানে আছে বহু কূপ ও দীঘি, আম কাঠালের বাগান, ফুলের বাগান। বাড়ির দুয়ারে শোভা পায় 'তোরণ' কলস, এবং বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা। আছে বিশাল এক ফুলের বাজার। 'কাটোয়া নগরী, যেন সুরপুরী, সর্বসুখপ্রমোদে'। কাঞ্চীর রাজপুত্র সুন্দর যে বর্ধমান পুরী দেখে চারদিকে তাকিয়েছিলেন, রাজবাড়ির আসে পাশে তার নানান স্মৃতিচিহ্ন দর্শকের মনে রোমাঞ্চ জাগায়।

বর্ধমান জেলায় গ্রামে গ্রামে যে দেবদেবীগণ মানুষের আত্মীয়, তাঁরাও প্রাচীন কৃষ্টির প্রাণবন্ত নির্দর্শন। বিশেষভাবে প্রাগাধুনিক কালে বর্ধমান জেলার সাংস্কৃতিক পারম্যতা লক্ষণীয়। কোনও সন্দেহ নেই যে, নবদ্বীপ শান্তিপুরের পাশেই বর্ধমান জেলা ছিল চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। শ্রীখন্ড, কাটোয়া, যাজীগ্রাম, কালনা, ঝামটপুর, কাঁদরা, কুলীনগ্রাম, নবগ্রাম, বাঘনাপাড়া, দৈধে বৈরাগীতলা, শ্রীপাট সর এ সব বিখ্যাত স্থানেই চৈতন্যের ভক্তি - আন্দোলন অর্থবহ হয়ে উঠেছে। মনোহরশাহী কীর্তন-শৈলীর একটা বড় আশ্রয় ছিল বর্ধমান জেলা। আবার বহু গ্রামেই ছিল উদারহৃদয় পীর সাহেবদের আস্তানা। একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, 'বর্ধমান-জ্বর'-এর প্রাদুর্ভাবের আগে বর্ধমান জেলা ছিল একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানকার মুক্ত আবহাওয়া, সুনির্মল জল, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, এবং সরলস্বভাব মানুষজন আকর্ষণীয় ছিল। উনিশ শতকের শুরুতেও ধান্যোৎপাদনে সমগ্র ভারতে বর্ধমান জেলা অগ্রগণ্য ছিল। বর্গীর হাঙ্গামা, রাজা তিলকচাঁদের শোচনীয় পরাজয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, মহারাজার ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা এবং অধীনতা, এ সব বর্ধমান জেলার পরিশ্রমী কৃষকদের প্রাণশক্তি নষ্ট করতে পারেনি। তাঁদের জমিজমা

গ্রাস করার জন্য হাজার হাজার মামলা করা হয়েছিল। লালবিহারী দে-সৃষ্ট অবিস্মরণীয় চরিত্র গোবিন্দ সামন্তের মতো অনেক কৃষকই সর্বহারা হয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেও এই জেলার অর্থনীতি ভেঙে পড়েনি।

সমগ্র বঙ্গে বর্ধমান একমাত্র জেলা যেখানে ধরিত্রীর গর্ভে আছে অশেষ সম্পদ। বর্ধমানে মধ্যযুগেও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য উন্নত ছিল। তাই হিন্দুস্থান থেকে বর্ধমানে এসেছিলেন মোগল, পাঠান, রাজপুত, পাঞ্জাবি, মাড়োয়ারি, ওড়িয়া, ইংরাজ। বর্ধমান জেলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ যে প্রাচীন কালেও পূর্ববঙ্গে গিয়ে কাজ করেছিলেন, তার প্রমাণ ভট্ট ভবদেব।

বর্ধমান জেলার বহু সাংবাদিক, লেখক, এবং গবেষক জন্মভূমিকে ভালবেসে এই জেলার ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। বহু গবেষকের মূল্যবান রচনা দুষ্প্রাপ্য। গবেষকদের রচনাসমূহ বহুবিধ সূত্র থেকে আহরণ করে এ গ্রন্থের সুযোগ্য সম্পাদক অধ্যক্ষ ড. গোপীকান্ত কোঙার যে ভাবে সে সব সাজিয়ে দিয়েছেন, তার কোন প্রশংসা পর্যাপ্ত হবে না। এ জন্য তাঁকে যে কী দুঃসহ পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা কিছুটা অনুমান করা যায়। এই গ্রন্থে মানুষের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বর্ধমানের জনগণের অসামান্য সংস্কৃতি, সংগ্রাম, মনন, এবং জীবন। এখানেই গ্রন্থটির অনন্যতা।

ভূমিকা রচনার রীতিবিরুদ্ধ হলেও এখন একটু নিজের কথা লিখি। আমার পৈত্রিক নিবাস ছিল ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের গ্রামে। দেশ ভাগের পরে সব কিছু হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলাম। নতুন পরিস্থিতি এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। অবশেষে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে যখন এলাম গোলাপবাগে তারাবাগে, তখন মনে হয়েছিল যে বহুদিন ধরে বহু পথ হেঁটে আবার আমার নিজের দেশেই ফিরে এসেছি। এখানে পদ্মা মেঘনা নেই। সুপ্রাচীন দামোদর নদ বিশীর্ণ। কিন্তু আছে অজস্র ফুল, পাখি, গাছ, মাছ আর দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রসারিত সবুজ ধানের ক্ষেত, আর পলাশ ফুলের রক্তিম আহ্বান। এ জেলার সীমা ছাড়ালেই গ্রাম-বাংলার মায়াভরা রূপ উত্তর ভারতের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে মিলিয়ে যেতে থাকে। বর্ধমানের কোনও মানুষকে অপরিচিত মনে হয়নি।

শেষে শুধু একথাই লিখি যে, বর্ধমান সম্বন্ধে গবেষণা করতে হলে এই গ্রন্থ হাতের কাছে না থাকলে চলবে না। অধ্যক্ষ ড. গোপীকান্ত কোঙার আমাদের মতো নগণ্য ইতিহাসের ছাত্রদের চিরঋণী করে রাখলেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল তথা বর্ধমান জেলার ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব নদনদী সমাজ কৃষি অর্থনীতি রাজনীতি আন্দোলন সমবায় প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরার মানসে **বর্ধমান সমগ্র ১ম খণ্ড** প্রায় দুবছর আগে প্রকাশিত হয়েছে। বহু মানুষের চিন্তা চেতনার ফসলগুলি তুলে এনে এক জায়গায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। তাতে একদিকে যেমন নামী-অনামী লেখকের লেখা এখানে রাখা সম্ভব হয়েছে, তেমনি - খ্যাত-অখ্যাত স্থানের বিষয়গুলি গোচরে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। এ ধরণের সংকলন না হলে হয়তো অনেক তথ্য অজানা থেকে যেত। এমন অনেক পত্র-পত্রিকা রয়েছে যেগুলির বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রায় অসম্ভব অথবা সে ধরণের প্রচার না থাকায় অনেকেরই অজানা থেকে যায়। এগুলিতে রয়েছে স্থানীয়ভাবে তুলে আনা বহু তথ্য।

খুঁজে বের করা ও প্রবন্ধগুলি বাছাই করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তথ্য, বিশেষত আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর। স্বীকার করতে হয় বেশ কয়েকটি লেখা গবেষণাধর্মী হলেও অনেক প্রবন্ধ কেবলমাত্র তথ্যের কারণে সংকলিত হয়েছে। আবার বিভিন্ন দিক বা বিষয়কে সন্নিবেশিত করার জন্য বেশ কয়েকটি অতি সাধারণ লেখাও নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে। কারণ স্থানীয় বা আঞ্চলিক কোন বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের সংগ্রহ বা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। তুলনামূলক বা সামগ্রিক পর্যালোচনার স্বার্থে এভাবে রাখা হয়েছে। আরও একটি দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হল কোন স্থান বা বিষয় সম্পর্কে সময়ের ব্যবধানে যে পর্যবেক্ষণ

তাকেও তুলে আনার চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য স্বীকার করতে হয় কিছু লেখার মধ্যে তত্ত্বের অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে লেখক তথ্য দিলেও তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করতে পারেন নি। কিন্তু এটা আশা করা বোধ হয় ভুল হবে না যে এ ধরণের উপাদান বা উপকরণগুলি সাহায্য করবে একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নিয়ত পরিবর্তনশীল মূল্যবান রসদকে ধরে রাখতে। আগামীদিনে এগুলির আরও বিশ্লেষণ, চর্চা ও গবেষণার কাজে সাহায্য করবে। একথা তো অস্বীকার করা যাবে না যে কোন একটি অঞ্চলের ইতিহাস বা অণু-ইতিহাস থেকেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব বৃহত্তর জনগণের ইতিহাস। সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস কোন স্থাণু বিষয় নয়, এর যেমন আছে ধারাবাহিকতা, তেমনি আছে এর ব্যাপ্তির দিক। তাই যুগের ঐতিহ্য, ধারাবাহিকতা এবং ব্যাপকতার বিচারেই সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যদিও জেলা-ভিত্তিক বেশ কয়েকটি ইতিহাস লেখা হয়েছে, কিন্তু **বর্ধমান সমগ্র** প্রকাশিত হওয়ার আগে কোন জেলা সম্পর্কে এ ধরনের সংকলন গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত হয়নি। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে একাজ করা খুবই কঠিন। হয়তো অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল থেকে গেছে। বর্তমান গ্রন্থে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ যথাসাধ্য গ্রহণ করার। **বর্ধমান সমগ্র ১ম খন্ড** প্রকাশিত হওয়ার পর আনন্দবাজার পত্রিকায় মাননীয় ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী মহাশয় এবং **বর্ধমান সমগ্র ২য় খন্ড** প্রকাশিত হওয়ার পর গণশক্তি পত্রিকায় মাননীয় সৌমিত্র লাহিড়ী মহাশয় গ্রন্থগুলি সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সঠিক পরামর্শও দিয়েছেন। তাছাড়া বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি গ্রন্থগুলি সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত মতামত জানিয়েছেন। এ ধরণের গ্রন্থ সম্পাদনায় এগুলি খুবই মূল্যবান এবং তাঁদের পরামর্শ এ কাজে আমার সাহস কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, উৎসাহ যুগিয়েছে।

তাঁদের মূল্যবান আলোচনায় যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তার সমস্ত দাবী হয়তো বর্তমান গ্রন্থে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বহু মূল্যবান পরামর্শ আমার খুব কাজে এসেছে। মুদ্রণের ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থে যথাসাধ্য সতর্কতা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সংগৃহীত লেখায় অস্পষ্টতা বা অনিচ্ছাকৃত কোন প্রমাদ থাকলে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বহু প্রবন্ধের মধ্যে সূত্র উল্লেখ করা নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে সম্পাদকের যেহেতু সরাসরি যোগাযোগ প্রায় ঘটছে না এবং লেখক কেবলমাত্র সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লিখেছেন, অনেকক্ষেত্রে কোন অলোচনায় যাননি তা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। খুব সংগত কারণেই দাবী আমাদের থাকতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গবেষণাধর্মী লেখা না হলেও গ্রন্থে স্থান দিতে হয়েছে। বেশ কয়েকটি বিষয়ে একাধিক লেখা থাকায় পুনরাবৃত্তি হয়েছে, কিন্তু কোন বিষয়কে একটি লেখার মধ্যে সামগ্রিকভাবে খুঁজে পাওয়া নাও যেতে পারে। তাই একাধিক প্রবন্ধের অবতারণা। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মূলত **প্রথম খন্ডের** বিষয়গুলির উপর আরও নতুন নতুন লেখা সংযোজন করার চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য অঞ্চলভিত্তিক অনেক নতুন লেখা এই খন্ডে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। লেখকদের সম্পর্কে একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে বর্ধমান জেলা সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ এবং দুটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এগুলি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা না করে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করবো।

ডা. **সুবোধ মুখোপাধ্যায়** মহাশয় প্রখ্যাত চিকিৎসক। কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। সাহিত্যচর্চা, কবিতা ও নাটক লেখা, নাটকে অভিনয় করা এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজে আজও তাঁর নাম অনেকেই স্মরণ করেন। বর্ধমান রাজপরিবার নিয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। **বর্ধমান** কবিতার মধ্যে তিনি জেলার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে শুরু করে ধর্ম-চিন্তা, কবি-সাহিত্যিক, মহাপুরুষ, স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রমুখেরা যে অবদান রেখে গেছেন তা বর্ণনা করেছেন। আবার বন্যা, দুঃখ ও শোকের কথাও বাদ দেননি।

জেলা পরিচিতি -বর্ধমান একটি প্রতিবেদন হলেও একটি ছোট লেখার মধ্যে বর্ধমানের ভূগোল, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, শিক্ষা, সমাজ, খাদ্যদ্রব্য, শিল্পকর্ম, দেবদেবী, উৎসব, মেলা, শিল্প কারখানা স্মরণীয় মানুষ ইত্যাদির হিসাব এক ভরাট বুনোনের মধ্যে রাখা হয়েছে। তথ্যগতভাবে খুবই উচ্চমানের। কিন্তু এগুলির সঙ্গে আরও নতুন তথ্য সংযোজিত হতে পারে একথা অস্বীকার করা যাবে না।

অধ্যাপক **অবন্তীকুমার সান্যাল** মহাশয় বিদগ্ধ মানুষ। দীর্ঘদিন বর্ধমান রাজ কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমানের সাহিত্য চর্চায় নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছেন। **১৮২৯ সালের বর্ধমান** প্রবন্ধটির অবতারণা একটি কারণে খুবই যুক্তিযুক্ত। কারণ প্রবন্ধের মধ্যে ফরাসী প্রকৃতি বিজ্ঞানী ভিক্টর জাকমঁকে দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন একশত সত্তর বৎসর পূর্বে গ্রাম বর্ধমানের মানুষ, বিদেশী ইংরেজদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক, রাস্তাঘাট প্রভৃতি। এ লেখা পড়লে মনে হবে যেন জেলার পুরাতন সমাজকে সামনে থেকে দেখেছি।

ড. **সুকুমার সেন** সাহিত্য জগতে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি বর্ধমানের মানুষ। আমাদের বর্ধমানের গৌরব। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। **বর্ধমানের পুরানো কথা** প্রবন্ধে জেলার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ, ধর্মকর্ম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন এবং উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তার গবেষণাধর্মী আলোচনা জেলাকে জানার ও চেনার কাজে অনবদ্য তথ্য বলা যায়।

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান জেলার নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কাজে লিপ্ত আছেন। বর্ধমানের ইতিহাস সংস্কৃতি সম্পর্কে বই লিখেছেন। তাঁর সংগৃহীত তথ্যও গবেষণা-লব্ধ বিষয়কে সমন্বিত করে **বর্ধমানের প্রত্ন নিদর্শন** প্রবন্ধটি লিখেছেন। প্রবন্ধে তিনি জেলার ভূস্তরের অভ্যান্তরভাগ থেকে আবিষ্কৃত পুরাবস্তুগুলির একটি নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন।

সুধীর চন্দ্র দাঁ দীর্ঘদিন শিক্ষকতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী রয়েছেন। বর্ধমান সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থও রচনা করেছেন। প্রবন্ধ লিখেছেন বহু। নগর **বর্ধমানের অস্তিত্ব সন্ধানে** প্রবন্ধের মধ্যে বর্ধমান তথা নগরের ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব সমাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। অনুসন্ধানের কাজে একদিকে

যেমন তথ্য নিয়েছেন ক্ষেত্র থেকে, তেমনি বিভিন্ন গ্রন্থ এবং প্রাচীন তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণে রত হয়েছেন। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা দিয়ে, নদী সভ্যতার কথা উল্লেখ করে এবং অন্যান্য আরও তথ্য দিয়ে বর্ধমানের প্রাচীনত্ব বা ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। গবেষণাধর্মী এই লেখাটি আগামী প্রজন্মের কাছে অনেকাংশে দলিল হতে পারবে।

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চা ভালই করেন। তিনি বর্ধমানের কবিকুলেরও একজন। **খন্ডিত অনুতে পাই সমগ্রের সচল মহিমা** ছোট প্রবন্ধটিতে অল্প কথায় জেলার অবস্থান থেকে শুরু করে সমাজ, ইতিহাস, শিল্প - সাহিত্য - সংস্কৃতি প্রভৃতি আংশিকভাবে হলেও কিছুই প্রায় উল্লেখ করতে ছাড়েননি।

অধ্যাপিকা **কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত** একজন অভিজ্ঞ গবেষিকা। **কাঞ্চননগরের অবক্ষয় ও বর্ধমান শহর** প্রবন্ধের প্রথমে উল্লেখ করেছেন যে পুরনো বর্ধমানের ইতিহাস নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই এবং তিনি এর ইতিহাস অনুসন্ধানে খুব সঠিকভাবেই দিক নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। মূলত শহর বর্ধমান কাঞ্চননগরে কেন গড়ে উঠল, বর্ধমান রাজাদের আমলে তার বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে তা ধ্বংস হয়ে নতুন শহর কিভাবে গড়ে উঠল তার একটি সঠিক মূল্যায়ন প্রবন্ধের মধ্যে করেছেন।

তথাকথিত সাহিত্য - সংস্কৃতির জগতের মানুষ না হলেও **মদনমোহন সাধু** মহাশয় তার **বর্ধমানের দর্শনীয় স্থান** প্রবন্ধে শহরের প্রাচীন এবং বর্তমান কালের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলিকে এক জায়গায় সংকলিত করেছেন। এ ধরণের সংকলনের গুরুত্ব শহরকে জানা ও চেনার কাজে অপরিসীম। এর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যও কম নয়।

শিক্ষক **রতনলাল দত্ত** যাঁর ছদ্মনাম **চারু দত্ত 'ছড়ায় মোড়া বর্ধমান'** এর মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র বর্ধমানের দ্রষ্টব্য বিষয়ের উল্লেখই করেনি, আংশিকভাবে এখানকার ইতিহাস, সমাজকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়া বিষয়গুলি ছড়ার মধ্য দিয়ে রাখার জন্য একটি পৃথক মাত্রা পেয়েছে বৈকি।

সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে অনেকদিন ধরেই বিচরণ করছেন **ভব রায়** মহাশয়। অর্থনীতির বিষয় নিয়েও লেখালেখি করেছেন। অভিজ্ঞ মানুষ। **'শহর বর্ধমানের বাণিজ্য ঐতিহ্যের একটি অনুসন্ধানী দৃষ্টিপাত'** প্রবন্ধে বর্ধমান শহরের প্রায় চারশো বছরের পুরাতন বাণিজ্যিক ঐতিহ্যকে আলোচনার শুরুতে এনেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে বর্ধমান রাজ পরিবারের প্রভাব, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের বাণিজ্য স্বার্থমুখী প্রভাব, নগরায়নের প্রভাব, দেশ ভাগজনিত প্রভাব প্রভৃতি আলোচনার মধ্যে এনেছেন। এক কথায় কৃষি নির্ভর বর্ধমান শহরের আর্থ-বাণিজ্যিক পরিমন্ডলে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হলেও এর বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষনীয়ভাবে তুলে ধরেছেন।

সমীরণ চৌধুরী ও নিরুপম চৌধুরী ভাতৃদ্বয় **বর্ধমানে অবাঙালী ব্যবসায়ী পরিবার বর্ধমানের মাড়োয়ারী সমাজ** প্রবন্ধের মধ্যে বর্ধমান শহরে একটি প্রধান অবাঙালী ব্যবসায়ী সমাজের যতদূর সম্ভব শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা

করেছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে সংগঠক হিসাবে সমীরণ চৌধুরী একটি অগ্রগণ্য নাম। নিরুপম চৌধুরীও সাংবাদিক হিসাবে বর্ধমানকে চেনা ও জানার চেষ্টা করছেন। বর্ধমানে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের আগমন থেকে শুরু করে তাদের শিক্ষা দীক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য, খাদ্যাভাস, সামাজিক মিশ্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলি সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাত, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ থেকে আগত ব্যবসায়ী, এমনকি চিনা ব্যবসায়ীরা বর্ধমান শহর এবং পাশাপাশি অঞ্চলে একই সমাজের মানুষ হিসাবে কিভাবে স্থান করে নিয়েছেন তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একজন বিদগ্ধ মানুষ ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। **স্থান পরিচয়-কাটোয়া** প্রবন্ধটিতে প্রায় একশো বছর পূর্বে লেখক কাটোয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে সরজমিনে কয়েকবার ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। একদিকে তিনি কাটোয়া এবং তৎসংলগ্ন দাঁইহাট, বিল্বেশ্বর ও কুলাই, কেতুগ্রামের বহুলাপুর, মরাঘাট, অট্টহাস, অগ্রদ্বীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি যেমন দেখেছেন এবং তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে সংগৃহীত তথ্যগুলির গবেষণীধর্মী বিশ্লেষণও করেছেন। এ ধরণের প্রবন্ধ জেলার সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাসকে জানার দলিল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** ও তাঁর সহযোগী **হরিনাথ পালিত**ও **মনীন্দ্রনাথ বসুর উজানি ও মঙ্গলকোট** প্রবন্ধটি পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না কোন অঞ্চলের ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি অনুসন্ধানের পদ্ধতি কি হওয়া উচিত। লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিকবার সরজমিনে পরিভ্রমণ করেছেন। ভাগীরথী তীরবর্তী উজানিনগর, ও অজয় তীরবর্তী মঙ্গলকোট এর লুপ্ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার ও প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান করেছেন আজ থেকে প্রায় একশ বৎসর পূর্বে। নদনদী, বৈষ্ণব পাট, দেব-দেবীর মূর্তি, স্থাননাম, সমাধিস্থান, মসজিদ, হাট, পুকুর, দীঘি, বাগান, বাড়ী, পীরের স্থান, লিপি প্রভৃতি প্রায় কোন কিছুই তিনি একাজে বাদ দেননি। প্রতিটি ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান পথনির্দেশ বলা চলে। তাছাড়া এই প্রবন্ধ আমাদের অবশ্যই সাহায্য করছে উত্তর রাঢ় তথা উত্তর বর্ধমান জেলার ইতিহাসকে জানতে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার আধিকারিক **রঙ্গনকান্তি জানা** একজন অনুসন্ধানী মানুষ। তাঁর অনুসন্ধানী মন নিয়ে তিনি **প্রত্নক্ষেত্র মঙ্গলকোট** প্রবন্ধটি লিখেছেন। বর্ধমান জেলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি খুঁজতে গিয়ে তিনি সঠিকভাবে উত্তর রাঢ়ে অজয় নদের তীরবর্তী অঞ্চল মঙ্গলকোটকে বেছে নিয়েছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি প্রত্নসমৃদ্ধ জেলা বর্ধমানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, উৎখনন কতখানি সম্ভব হয়েছে, সম্ভাবনা কতটা আছে, সমস্যা কোথায় প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সঠিকভাবে বলা যায় এ ধরণের প্রবন্ধই দিতে পারে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের নিশানা।

অধ্যাপক ড. **কালীচরণ দাস** মহাশয় তার চাকুরীর অবসর জীবন প্রায় পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত করেছেন আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায়। **অজয় সভ্যতা** প্রবন্ধের মধ্য

দিয়ে তিনি বর্ধমান জেলার পশ্চিম-উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত অজয় নদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পান্ডুরাজার ঢিবি, গোস্বামী ডাঙ্গা, রাজার ডাঙ্গা, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম গাঙ্গুলীডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানগুলি পুরা-সমৃদ্ধ স্থল বলে উল্লেখ করেছেন। এখানেই শেষ করেননি। অজয় তীরবর্তী প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের আলোচনাকে সংযুক্ত করে বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখানকার প্রাচীন জনপদের সঙ্গে তথাকথিত সর্বজয়ী আর্যজাতির সংঘর্ষ ও মিশ্রণের কথা উল্লেখ করেছেন। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার সঙ্গে তুলনা যেমন করেছেন, তেমনি এখানকার হিন্দু-মুসলমান রাজাদের যে ইতিহাস-কীর্তি তাও ক্রমান্বয়ে আলোচনার মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করে বক্তব্যের প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আবার বর্গী-আক্রমণের বর্বর ইতিহাসের কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। এককথায় পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে কোন একটি অঞ্চলের সভ্যতা সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এই প্রবন্ধটিকে অনন্যতা দিয়েছে।

অধ্যাপক ড. **কালীচরণ দাসের** আরও একটি প্রবন্ধ **ইন্দ্রানীর বিলুপ্ত মন্দির** বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত করার কারণ আছে বলে মনে করি। অধ্যাপক দাস অনুসন্ধানী মন নিয়ে ভাগীরথী তীরবর্তী দাঁইহাটের কাছে 'বেরা' গ্রামটিতে খুঁজে পেয়েছেন এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। তিনি এ সম্পর্কে একদিকে যেমন সরজমিনে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তেমনি অপরদিকে ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ দিয়ে বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। আঞ্চলিক ইতিহাস থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব জনজাতির বৃহত্তর ইতিহাসকে, তা খোঁজার জন্য এর থেকে বড় উদ্যোগ আর কি হতে পারে!

পেশায় শিক্ষক এবং দীর্ঘদিন সংবাদপত্র প্রকাশনা করছেন **তারকেশ্বর চট্টোরাজ** মহাশয়। **শাহী মসজিদ-কাটোয়া** প্রবন্ধটির অবতারণা কাটোয়ার একটি ঐতিহাসিক নিদর্শনকে তুলে ধরার তাগিদে। এখানে তিনি মসজিদের নির্মাণ-শৈলী থেকে শুরু করে এর শিলালিপি এবং ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

পেশায় শিক্ষক **শিবশঙ্কর ঘোষ** মহাশয় এর নেশা ক্ষেত্র সমীক্ষা। তিনি জেলার বহু স্থান নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছেন। তারই একটিকে **গোপভূমের বিশিষ্ট গ্রাম সুয়াতা** প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জেলার প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক গোপভূম পরগণার এই গ্রামটিকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। সমীক্ষিত তথ্যগুলি নিয়ে হাতের কাছে যা সাহায্য পেয়েছেন তা দিয়ে বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ ধরণের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আঞ্চলিক গবেষণা কর্মের সহায়ক।

ড. **সুজিত বিশ্বাস** মহাশয় তার **ইছাই ঘোষের দেউল ও শ্যামারূপার মন্দির** প্রবন্ধে অজয় নদের তীরবর্তী গোপভূম অঞ্চলের এরকমই একটি প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। রেখ দেউলটির গঠনশৈলী, এর ইতিহাস নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ, এমনকি কিংবদন্তী নিয়ে বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। ইতিপূর্বে বিনয় ঘোষ এবং অন্যান্য চিন্তাবিদদের দ্বারা বিষয়টি আলোচিত হলেও উক্ত প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

বিশ্বেশ্বর ঘোষাল মহাশয় তার **মন্তেশ্বর কাহিনী** প্রবন্ধটিতে প্রত্নসমৃদ্ধ এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান মন্তেশ্বরের একটি ঐতিহাসিক কাহিনীকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের দ্বান্দ্বিক রাজনৈতিক ইতিহাসে ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের সুর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে তিনি তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। হয়তো আরও কিছু তথ্য-প্রমাণ-থাকলে প্রবন্ধটির গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেত।

জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী তার দীর্ঘ প্রবন্ধ **দক্ষিণ দামোদর - গত শতাব্দীর অগ্রগতি, এই শতাব্দীর সম্ভাবনা**এর মধ্যে সঠিক ভাবে উক্ত অঞ্চলের ভৌগলিক পরিচিতি জানিয়ে দিয়ে তার জলবায়ু নদনদী থেকে শুরু করে গাছপালা, চাষ-আবাদ, জনবসতি, শিক্ষা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত দিকগুলি উল্লেখ করেছেন। আবার কেবলমাত্র বিবরণ বা তথ্য দিয়েই তিনি কাজ শেষ করেননি, বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর অর্থাৎ রায়না খন্ডঘোষ অঞ্চলের মানুষের জীবনের দীর্ঘদিনের সামগ্রিক সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন উক্ত অঞ্চলের জনজীবনের সমস্যার কথা। এক্ষেত্রে কৃষি, সেচ, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমস্যা এবং তার সমাধান ও সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন। আঞ্চলিক ভাবে সমস্যা নিয়ে ভাবতে এবং সমাধানের সূত্র খুঁজতে একটি সঠিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় প্রবন্ধটির গবেষণা মূল্য যথেষ্ট আছে বলা যেতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক, **বর্ধমান জেলার নিম্ন দক্ষিণ - দামোদর অঞ্চলের ইতিহাসচর্চা ও পুরাবৃত্ত প্রসঙ্গে** প্রবন্ধটি একটি বিশেষ কারণে সংযোজন করেছেন। বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চল এর ইতিহাস খুব প্রাচীন হলেও ব্রিটিশ আমলে এবং স্বাধীনোত্তর কালে ও দুর্গম থাকার কারণে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিকভাবে অবহেলিত ছিল দীর্ঘদিন। কিন্তু এ অঞ্চলের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির শিকড় যে অনেক গভীরে তা বুঝতে আজ আর অসুবিধা হয় না। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জনগোষ্ঠীর সংঘর্ষ, মিলন-মিশ্রণে ঐতিহ্য-গতভাবে এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রায়না, বোড়ো, গোতান, কাইতি, শ্রীরামপুর, কোটশিমুল, নাড়ুগ্রাম প্রভৃতি মুন্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লিখিত স্থানগুলির প্রত্যেকটি কোন না কোন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন অথবা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে যা আলোচিত হয়েছে তা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এগুলির ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

প্রকাশ দাস মহাশয় একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে নিজেকে দীর্ঘদিন যুক্ত করে রেখেছেন। জেলার বেশ কয়েকটি বিষয়ে নিজে প্রবন্ধ লিখেছেন। **পানাগড়ে বৈদিক প্রাচীনত্বের নিদর্শন** প্রবন্ধটিতে আঞ্চলিকভাবে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করেছেন। কয়েকটি তথ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থানটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'গড়'-এর সম্পূর্ণ ইতিহাসকে জানতে গেলে যা করা উচিত তা করতে না পেরে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। হয়তো এই প্রশ্ন আগামীদিনের গবেষণা কাজে দিশারী হতে পারবে।

দামোদর নদের তীরবর্তী দুষ্প্রবেশ্য যে অরণ্য এবং অজয় নদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে দুর্গাপুর নগরের যে পরিকল্পনা ও রূপায়ন - সে সম্পর্কে **প্রফুল্ল গুপ্ত** মহাশয় **দুর্গাপুর নগর পরিকল্পনা** প্রবন্ধে এক সুন্দর অবতারণা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োর প্রাচীন উদাহরণ যেমন দিয়েছেন, তেমনি বিভিন্ন গ্রন্থ ও কাব্যের কথা, দক্ষিণ ভারতের মাদুরা ও কাঞ্চীপুরের কথা, এমনকি চন্ডীগড় বা ভুবনেশ্বরের কথাও তুলনামূলকভাবে উল্লেখ করেছেন। শিল্প কারখানা সৃষ্টির সঙ্গে যে নগর এবং তার কলোনী গড়ে উঠেছে তার স্থাপত্যরীতির কথা যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি সমাজবিন্যাসের সনাতন রক্ষণশীল ধারণার অপরিবর্তনীয়তার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। জেলার অন্যতম শিল্প শহর দুর্গাপুরের নগরায়ন প্রক্রিয়ার এটি একটি অনবদ্য মূল্যায়ন বলা যেতে পারে।

অশোক দাস মহাশয় শিক্ষকতার সঙ্গে সমাজসচেতন মানুষ হিসাবে সমাজ তথা জনজীবনের সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করছেন দীর্ঘদিন। লোক-সংস্কৃতির নানা উপাদান নিয়ে এবং জনজীবনের নানা বিষয় নিয়ে তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর এ ধরণের চিন্তা-চেতনা থেকে বেরিয়ে এসেছে **দুর্গাপুর- প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক্ শিল্পায়নের যুগ** -এর মত একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধের মধ্যে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বর্ধমান তথা রাঢ় বঙ্গের গৌরব দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার ইতিহাস। তার প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা। এসব কথা বলতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, প্রাচীন দেব-দেবী এবং সেখানকার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন, জনজীবনের শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা বলেছেন। শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে যে পরিবর্তন সেটি যেমন তার চোখে ধরা পড়েছে, তেমনি বর্তমান সংকটও তাঁকে ভাবিয়েছে। সামগ্রিকভাবে একটি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং তার আনুষঙ্গিক পরিবর্তনকে তিনি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন যা আগামী দিনে নথি হয়ে থাকবে।

প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় **শিল্পে-বাণিজ্যে দুর্গাপুরের সেদিন এদিন** প্রবন্ধটির মধ্যে শিল্প শহর দুর্গাপুর গড়ে ওঠার পর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি শিল্প কারখানাগুলির বর্তমান রুগ্ন অবস্থার কথাও বলেছেন। আবার বর্তমান সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের আধিক্য এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তনের দিকটিও তুলে ধরেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত মানুষজনের সুবিধার্থে জনবহুল বাজার, হাসপাতাল, শিক্ষায়তন প্রভৃতি তৈরী হয়েছিল, কিন্তু আজ কারখানার সম্পূর্ণ উৎপাদনকে ধরতে রাখতে না পারায় সামাজিকভাবে সমস্যা দেখা দিয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আর্থ-সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত দুর্গাপুরের মানুষ আজ হিমসিম খাচ্ছে। কিন্তু লেখক তার লেখায় সমাধান সূত্র হিসাবে কেবলমাত্র অর্থনীতি ও শিল্পনীতির পরিবর্তন চাননি, চেয়েছেন নৈতিক চেতনার জাগরণ।

প্রবীন অধ্যাপক **রামদুলাল বসু** মহাশয় সাহিত্য-সংস্কৃতি -সমাজ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন দীর্ঘদিন। **রানীগঞ্জ সমাজের দর্পনে** প্রবন্ধটিতে প্রায় জনবসতি বিরল ছোট গ্রাম রানীগঞ্জে জনপদ গড়ে ওঠার ইতিহাস থেকে শুরু করে রানীগঞ্জে কয়লা শিল্পের সূচনা, জনপদ ও জনজীবনের উপর সামাজিকভাবে পরিবর্তন, বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য-

সংস্কৃতি চর্চা, স্বাধীনতা আন্দোলন, ধর্ম-কর্ম-উৎসব, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটি ঐতিহাসিক এবং তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণ দিয়েছেন। বিষয়ের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে বর্ধমান জেলার কয়লাশিল্পের কেন্দ্রভূমি রানীগঞ্জ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের অধিকারী। আবার উল্লেখ করতে ভোলেননি যে ইতিহাস কখনও থেমে থাকে না বলেই রানীগঞ্জ শহর বিপজ্জনক বলে ঘোষিত হওয়ার পরও সে তার নিজের গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতিহাসের এই চলাকে খুঁজে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে এটি একটি মূল্যবান লেখা।

একইভাবে **তাপস মজুমদার** মহাশয় তার **কালের বিবর্তনে রানীগঞ্জ** প্রবন্ধে রানীগঞ্জে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে তুলে ধরতে গিয়ে অতীতের কিছু স্মৃতিচারণ করেছেন। এখানকার রাস্তাঘাট, রেললাইন, বাজার-হাট, উৎসব মেলা, পুকুর ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। সিয়ারশোলের রাজাদের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আর্থ সামাজিক কারণে ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন এই রানীগঞ্জ শহরকে তিনি মুমূর্ষ নগরী আখ্যা দিয়েছেন।

অজয় নদের তীরবর্তী গ্রাম চুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম একথা আজ কারও অজানা নয়। কিন্তু **ঋদ্বিশ পাল** মহাশয় তার **কবিতীর্থ চুরুলিয়ার প্রাচীন ইতিহাস** নামে ছোট্ট প্রবন্ধের মধ্যে তুলে ধরতে চেয়েছেন এই গ্রামটির প্রাচীনতা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য। তথ্য হিসাবে তিনি এখানকার দুর্গ বা গড়, মন্দির, মসজিদ, মাজার প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। আবার চুরুলিয়া আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল হলেও সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামটির যে ঐতিহ্য তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নিশীথ কুমার ঘোষ মহাশয়ের **আসানসোল ইতিহাসের আয়নায় সেকাল, একাল ও ভাবীকাল** প্রবন্ধটি আসানসোল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাসের আলোচনা বলা যেতে পারে। বর্তমানে আসানসোল খনি ও শিল্পাঞ্চল হিসাবে পরিচিত হলেও অনার্য অধ্যুষিত জঙ্গলাকীর্ণ দামোদর ও অজয় বিধৌত এই অঞ্চলের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ইংরেজরা কিভাবে এখানে কয়লার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সেখান থেকে শুরু করে কয়লার অনুসন্ধান, উত্তোলন, নদীপথ ও রেলপথের ব্যবহার, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে অন্যান্য কোম্পানি বা সংস্থার কয়লা শিল্পে আগমন, কয়লা শিল্পকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে উঠা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ইতিহাস থেকে তুলে এনে বর্তমান সময়ের অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। জনবসতির প্রসার এবং কয়লা শিল্পের বর্তমান সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন। একদিকে কয়লাখনিগুলি বিপজ্জনক অবস্থায় ধুঁকছে, অপরদিকে বহু কল-কারখানা বন্ধ হয়েছে বা রুগ্ন অবস্থায় টিকে আছে তারও উল্লেখ করেছেন। আসানসোল অঞ্চলের অর্থনীতি, জনজীবন, সভ্যতা, সংস্কৃতি আজ এক বিপদ সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে রয়েছে। জেলার উল্লেখযোগ্য স্থান আসানসোল অঞ্চলের এ এক মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যায়ন বলা যেতে পারে।

অজিত সরকার মহাশয় সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই যুক্ত আছেন। তিনি তার **আসানসোলের আশেপাশে** ছোট্ট প্রবন্ধটিতে আসানসোল এর অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করে পাশ্ববর্তী উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি কোন বিষয়ের আলোচনায় না গেলেও স্থানগুলিকে চিনিয়ে দেওয়ার গুরুত্ব স্বীকার করতেই হয়।

আবদুল লতিফ একজন বিদগ্ধ ঐতিহাসিক। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে তার লিখিত **খাজা আনোয়ার গোরস্থান** ছোট্ট প্রবন্ধটি একটি ঐতিহাসিক দলিল বলা যেতে পারে। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে একটি ফরাসী কবিতার চরণকে সম্বল করে খাজা আনোয়ার এর মৃত্যু কাহিনী ও তাঁর মৃত্যুকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। সমাধিস্থলের একটি আনুপূর্বিক বর্ণনাও দিয়েছেন। স্থানটি আজ ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

আবদুল গণিখান বর্ধমানের মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন কবিও সাহিত্যিক। বর্ধমান রাজবাড়ীর ইতিহাস সহ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। **বর্ধমানের কুলবধু নূরজাহান** প্রবন্ধটিতে তিনি প্রায় অজানা একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। মেহেরুন্নিসা বর্ধমানের কুলবধু থেকে যে ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহান হয়েছিলেন তার জন্ম বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে গুণপনার কথা নিপুণভাবে বিবৃত করেছেন। আর একাজ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। এ ধরণের লেখা ইতিহাসের উপাদান হয়ে থাকবে।

ডা. **সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের** পরিচয় আগেই দিয়েছি। তিনি **রাজা রামমোহন রায় ও বর্ধমান রাজবংশ** প্রবন্ধটিতে রামমোহন রায় এর পূর্বপুরুষের সময়কাল থেকে শুরু করে রামমোহনের পুত্রের সময় পর্যন্ত বর্ধমান রাজ পরিবারের যে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা সময়কালের উল্লেখ করে বিভিন্ন ঘটনার নিরিখে বিবৃত করেছেন। বর্ধমান রাজ পরিবারের ইতিহাস আলোচনায় এটিকে একটি মৌলিক তথ্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় **নীলকণ্ঠ দামোদর** প্রবন্ধটি শুরু করেছেন খুব হাল্কাভাবে তার ছোট মেয়ে শবরীর আব্দার এর কথা উল্লেখ করে। কিন্তু প্রবন্ধে প্রবেশ করলে বোঝা যাবে দামোদর নদকে ঘিরে যে সমস্ত তথ্য তিনি তুলে ধরেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। দামোদরের জলকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের জন্য এবং ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহা কমিটির সুপারিশ উল্লেখ করে দামোদরের ব্যবহার নিয়ে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। আবার দামোদরের বিপুল জলসম্পদকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাগত ত্রুটি এবং কারখানা ও প্রশাসনের উদাসীনতাও তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। শিল্প-কারখানার দূষিত জল দামোদরের জলকে দূষিত করছে, নানা রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটাচ্ছে ইত্যাদি সমস্যার কথাও তুলে ধরেছেন। পরিকল্পনার পূর্ণ রূপায়ন না হওয়া, সুদূরপ্রসারী চিন্তার অনুপস্থিতি, সরকারী নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা, সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশজনিত সমস্যা প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন। এক কথায় প্রবন্ধটিতে বর্ধমান জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের গর্ব দামোদর নদের দূষণ সম্পর্কে একটি নিটোল আলোচনা রয়েছে বলা যেতে পারে।

শ্যামাপ্রসাদ কুন্ডু পেশায় শিক্ষক এবং সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে চিন্তা-চর্চা তার দীর্ঘদিনের নিত্যসঙ্গী। বর্ধমান শহরের বুক চিরে যে বাঁকা নদীটি রয়েছে, যার তীরে গড়ে উঠেছিল মহন্ত অস্থল, নির্মল ঝিল, দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দির, শিশুদের পার্ক, সমাধি ক্ষেত্র, বর্ধমান

শহরের মানুষের জনবসতি, যোগান দিত পানীয় জল, যার উপরে এক শতাব্দী আগেও নৌকা ভাসতো ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে, আজ সেটির মলিনতা পেয়েছে মানুষেরই ব্যবহারে। এ ধরণের বিষয়কে লেখক তার প্রবন্ধ **বাঁকা নামে নদীটি** এর মধ্যে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে নদীর নাম এবং গতিপথ নিয়েও আলোচনা করেছেন। জেলার এই নদীটিকে চেনা ও জানার জন্য প্রবন্ধটি সহায়ক হবে বৈকি।

মহম্মদ আয়ুব হোসেন দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য-সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চর্চা করছেন। ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজে তিনি ঘুরেছেন অনেক। **বিলুপ্ত নদী সিঙ্গটিয়া** প্রবন্ধে তিনি একটি হারিয়ে যাওয়া নদীর ইতির্হাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধের মধ্যে তিনি উক্ত নদীটির গতিপথেব গ্রামগুলির নাম (বীরভূমের নানুর থানা থেকে শুরু করে বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানায় যেখানে নদীটি অজয় নদে মিশেছে) উল্লেখ করেছেন। আবার এই পুরাতন নদী তীরবর্তী শ্রীপাট কুলাই, পান্ডুগ্রাম ও খাটুন্দী, অট্টহাস (কেতুগ্রাম), অম্বল গ্রাম, বালুটিয়া প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানগুলি পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি অনুমান করছেন এই সমস্ত স্থানে সভ্যতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আলোচ্য নদীটির অবদান ছিল এবং তিনি এ ব্যাপারে গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সজল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় **রানীগঞ্জ নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর** প্রবন্ধে বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রানীগঞ্জের সীমান্তবর্তী দামোদর, নুনিয়া এবং সিঙ্গারণ এই তিনটি নদীর উৎসস্থল, ঐ অঞ্চলের সভ্যতায় নদীগুলির প্রভাব, পরবর্তীকালে পলিজনিত সমস্যা, জি. টি. রোড ও রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি কারণে নদীগুলির খাত-পরিবর্তন বা শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ ও ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে। প্রবন্ধটি আঞ্চলিকভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সন্ধান ও চর্চার একটি সার্থক প্রচেষ্টা বলা যোতে পারে।

ড. **পঞ্চানন মন্ডল** বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগের অধ্যক্ষ পদে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টি, গ্রন্থ রচনা, গ্রন্থ সম্পাদনা, গবেষণা প্রভৃতি কর্মের মধ্যে সারাজীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। প্রবন্ধও লিখেছেন বহু। তাঁর **কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের মুড়াই নদী ও পাঁইটা গ্রাম** প্রবন্ধটিতে তিনি দক্ষিণ বর্ধমানের নদী মুন্ডেশ্বরী বা 'মুড়াই' কে কেন্দ্র করে যে আদিম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার সূত্র হিসাবে একদিকে যেমন নদীর গতিপথের কথা উল্লেখ করেছেন, তেমনি নদীতীরে গড়ে ওঠা সভ্যতার মানুষের ধর্ম-কর্ম, উৎসব পালন, স্থান নাম, পদবী ইতিহাসের কিছু তথ্য প্রভৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধান সম্পর্কে একটি ধারণা এখানে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক **অজিত হালদার** মহাশয় একজন অভিজ্ঞ মানুষ, নানা বিষয়ে তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। **বর্ধমানের কৃষি ব্যবস্থা (মোগল আমলে)** এবং **বর্ধমানের ভূমি ব্যবস্থা (ইংরেজ আমলে)** তাঁর দুটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। গবেষণাধর্মী এই লেখা দুটির মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগে মোগল আমল থেকে শুরু করে ইংরেজ আমলে বর্ধমান চাকলায়

ভূমি ব্যবস্থার রূপ, অধিকার বা মালিকানা, রাজস্বআদায়, সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়কে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সময়ের আইন বা বন্দোবস্তগুলিকে উল্লেখ করে তার ফলাফল নিয়েও আলোচনা করেছেন। আবার জমির উৎপাদন, জমির উপর জনসাধারণের চাপ, শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার প্রভাব, নদী ও জলসেচের প্রভাব, কৃষি উৎপাদনের বাজার মূল্যের তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি কোন বিষয়কেই প্রায় আলোচনার বাইরে রাখেননি। আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক হালদার বহু তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে প্রবন্ধগুলির গুণগত মান সুউচ্চে স্থাপন করেছেন। কৃষিনির্ভর জেলা বর্ধমানের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসকে জানার জন্য এগুলি একটি অনবদ্য বিশ্লেষণ।

দীর্ঘদিনের সংগ্রামী সমাজসচেতন মানুষ হিসাবে, জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকার সুবাদে এবং বর্ধমানের মানুষ হিসাবে **বাংলার জমিদার সম্প্রদায় ও তৎকালীন সমাজ** প্রবন্ধটি **সৈয়দ শাহেদুল্লাহ** এর বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত একটি দলিল বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে জমিদারের অত্যাচারের ঘটনাই কেবলমাত্র উল্লেখ করেননি, জনজীবনের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য পরিসংখ্যান এমনকি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-এর প্রামাণ্য গ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটি আয়তনে ছোট হলেও গবেষণামূল্য অনস্বীকার্য।

সুনীল বসুরায় মহাশয় **কয়লাখনি অঞ্চলে জনজীবনের সমস্যা** প্রবন্ধটিতে রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের বিস্তৃতির কথা উল্লেখ করে এ অঞ্চলে কয়লা তোলার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। প্রবন্ধের মূল বিষয়ের অবতারণায় আলোচ্য অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ জনিত সমস্যা, কয়লা উত্তলন ও খনি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ম নীতি না মানার সমস্যা, পরিবেশগত সমস্যা, খনিতে ধস আগুনের সমস্যা, জমি পুনরুদ্ধারের সমস্যা, জনস্বাস্থ্যের সমস্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি উপস্থাপন করেছেন। আলোচনা সূত্রে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ বা ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বিপদ কাটেনি, আশঙ্কা নিয়ে লেখক তার প্রবন্ধের ইতি টেনেছেন। এককথায় প্রবন্ধটিতে জেলার খনি-শিল্প এলাকায় জনজীবনের সামগ্রিক সমস্যা নিয়ে আলেচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে যে সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে তারই একটি বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান ও তথ্যের ভিত্তিতে **নিশীথ কুমার ঘোষ** মহাশয় তার প্রবন্ধ **আগুন, গ্যাস, ধস চিতায় শুয়ে মৃত্যুর প্রহর** গোনার অবতারণা করেছেন। প্রায় ২২৮ বছরের কয়লা উৎপাদনের ইতিহাসে বহু নিয়ম-বিধি রচিত হয়েছে, বহু কমিটি গঠিত হয়েছে, কিন্তু খনি কর্তৃপক্ষের বিরামহীন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস প্রতি মুহুর্তে ব্যাপক মানুষের ফুসফুস ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, খনি গর্ভের আগুন দিন দিন আর ও ছড়িয়ে পড়ছে। পাতালের আগুন প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার বাড়ছে। এমনই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির কারণ ও ঘটনা বিবৃত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

কয়লা খনির প্রসারে আদিম অধিবাসীদের অনেককেই ভূমিহীন হতে হয়েছে। খনি মালিকরা অনেক সময় স্বল্প দামে জমি ক্রয় করে অথবা দখল করে বহু মানুষকে ভূমিহারা

করেছেন। এর বিরুদ্ধে মানুষের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে যে বহু লড়াই হয়েছে তারই একটি ঘটনাকে তুলে এনে **বিকাশ চৌধুরী** মহাশয় তাঁর প্রবন্ধ **কালোহীরার মাটিতে মাটিহারাদের লড়াই** এর অবতারণা করেছেন। এক্ষেত্রে গ্রামের মানুষ কিভাবে সংগঠিত হয়েছেন, লড়াইয়ে নেমেছেন, পুলিশ ও খনি মালিকের ভূমিকা, জমির বদলে চাকুরীর দাবিকে প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতির বিবরণ তথ্য প্রমাণ সহযোগে দিয়েছেন। সমাজ অর্থনীতির পরিবর্তনে এ ধরণের লেখা মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করার পথ দেখায়।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ বর্ধমানের একজন সমাজ সচেতন মানুষ। তিনি সারা জীবন ব্যয় করেছেন জনসেবায়। আপোষহীন লড়াই করেছেন। রাজনৈতিক ও গণসংগঠনে সফলভাবে উচ্চমানের নেতৃত্ব দিয়ে ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। **সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বর্ধমানের মানুষ** প্রবন্ধটিতে তিনি প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের (১৯৪২ সালে) একটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যা তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রাখতে বর্ধমান জেলার মানুষের উদ্যোগের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়েই তিনি উল্লেখ করেছেন বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে চাইলেও সাধারণ হিন্দু মুসলমান মেহনতি মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়।

বলাই দেবশর্মা মহাশয় সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক জীবনে একজন বিদগ্ধ ও গুণী মানুষ ছিলেন। সংবাদপত্র সম্পাদনা, ইতিহাস চর্চা, প্রবন্ধ রচনা, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি একজন অগ্রণী মানুষ ছিলেন। নিজে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে **স্বাধীনতা সাধনায় বর্ধমান** প্রবন্ধে তিনি বর্ধমান শহর এবং বর্ধমান জেলার কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে যে স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কেবলমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন নয়, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও যে বর্ধমানের মানুষ সামিল হয়েছিল তা তিনি উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে বর্ধমানের সংবাদপত্রগুলি কি ভূমিকা নিয়েছিল, মহিলাদের অংশগ্রহণ কিরূপ ছিল প্রভৃতি বিষয়গুলিও আলোচিত হয়েছে। লেখক যদিও উল্লেখ করেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনে কে বা কারা যোগ দিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তিনি তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে সফলভাবে বিষয়টি সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

পূর্ণেন্দু সিংহ মহাশয় **স্বাধীনতা আন্দোলনে রানীগঞ্জের বীর সংগ্রামীরা** এই ছোট্ট প্রবন্ধটির মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন রানীগঞ্জ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি প্রাণকেন্দ্র। বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে তিনি একদিকে যেমন বেশ কিছু মানুষের নাম উল্লেখ করেছেন, তেমনি এটিও উল্লেখ করতে ভোলেননি যে বহু অজ্ঞাত ও প্রচার বিমুখ তরুণ উক্ত কাজে নিবেদিত হয়েছিলেন। এককথায় জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সামগ্রিক কোন চিত্র পাওয়া সম্ভব না হলেও আঞ্চলিকভাবে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য যে সমস্ত ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল তন্মধ্যে রানীগঞ্জ যে অন্যতম একটি ছিল, তা এই প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বর্ধমান জেলার মানুষ হিসাবে **বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী** কারও অচেনা নয়। সারাজীবন যিনি সমাজসেবা, গণসংগঠন, গণআন্দোলনের কাজে যুক্ত ছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে

শরিক হয়েছেন, রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে **বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির প্রথম ২৫ বছর** প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন। ইংরাজ শাসন ও ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় কৃষকের যে অসহনীয় অবস্থা এবং তার মধ্যে থেকে কৃষকশ্রেণীকে সংগঠিত করে সংগ্রাম আন্দোলন পরিচালনার মত ঘটনার বিবরণ তিনি এই প্রবন্ধে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর কাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে তার একটি দলিল বলা যেতে পারে এই প্রবন্ধটি। ক্যানেল আন্দোলন থেকে শুরু করে উৎপাদিত ফসলের উপর লেভি, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয় লেখার মধ্যে উঠে এসেছে। আবার বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সমিতি যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল তার ও উল্লেখ রয়েছে। এককথায় বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা এই প্রবন্ধটি আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে এক অনবদ্য তথ্য হিসাবে আগামী প্রজন্মের কাজে লাগবে।

দীর্ঘদিন গণ আন্দোলনের শরিক এবং প্রশাসনের সঙ্গেও যুক্ত থাকা মানুষ হিসাবে **রথীন রায়** মহাশয় **দুর্গাপুরে কৃষক আন্দোলন শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী একটি অভিজ্ঞতা** প্রবন্ধটি সত্যিই তার বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ এক প্রতিবেদন। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল সেখানকার শ্রমিকরা একটা বড় অংশ ছিলেন দুর্গাপুর সংলগ্ন গ্রাম থেকে আসা এবং জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অপর একটি অংশ ছিল ভারতের বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা মানুষ। ষাটের দশকের গোড়া পর্যন্ত দুর্গাপুর অঞ্চলে বুর্জোয়া-জমিদার বা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে সে ধরণের কোন আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে (১৯৬৬) দুর্গাপুরে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়। পাশপাশি অন্ডাল, কাঁকসা, দুর্গাপুর (উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্বৃত্ত জমিতে ভূমিহীন কৃষকদের চাষ করাকে কেন্দ্র করে) প্রভৃতি স্থানে কৃষক আন্দোলনও সংগঠিত হতে থাকে। এই সমস্ত আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা বিবৃত হয়েছে শ্রী রায়ের প্রবন্ধে। নেতৃত্ব এবং সময়ের উল্লেখ করে ঘটনার যে বিবরণ তা আগামী দিনে দলিল হয়ে থাকবে।

অরিন্দম কোঙার শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকদের গণ সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত। আবার একজন সমাজ সচেতন মানুষ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান মঞ্চ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন বিষয়ে তার তাত্ত্বিক জ্ঞান বা পড়াশুনা প্রচুর। লেখালেখিও আছে অনেক। বিভিন্ন গণ-সংগঠনে নেতৃত্ব দেওয়ার সুবাদে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে **বর্ধমান জেলায় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি** প্রবন্ধটি যথোচিত বলেই মনে হয়। এখানে তিনি জেলা সম্পর্কে দু-একটি কথা ব্যয় করে শুরু করেছেন জেলার নারী সমাজের ঐতিহাসিক কিছু তথ্য দিয়ে। শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়টি উল্লেখ করে জেলার নারী সমাজ স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কয়লাখনি শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংগঠিত উদ্যোগ নিয়েছে তার একটি বিবরণ - ঐতিহাসিক তথ্য সহযোগে প্রবন্ধের মধ্যে রেখেছেন। সন্ত্রাস ও আক্রমণের বিরুদ্ধে মহিলারা সমিতিগতভাবে কিভাবে এগিয়ে এসেছেন, আক্রমণ প্রতিহত করেছেন

তার নিখুঁত বিবরণ প্রবন্ধে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বহু আগে থেকেই জেলার মহিলা নেতৃ ও কর্মীগণ যে ভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। যদিও লেখক শ্রী কোঙার তার লেখার শেষ দিকে যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে এটি জেলার মহিলা সমিতির অসম্পূর্ণ ইতিহাস। কিন্তু বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটি দলিল, হতে পারবে। আর লেখকের কথায় বলি এমন অসম্পূর্ণ ইতিহাসের সমষ্টিই তো এনে দিতে পারে সম্পূর্ণ ইতিহাস।

অরুণোদয় সরকার মহাশয়ের লেখা **বর্ধমানে সমবায় আন্দোলনের ধারা** প্রবন্ধটি আমাদের জানতে সাহায্য করে সর্বভারতীয় স্তরে যে সমবায় আন্দোলন তার প্রথম সারিতে বর্ধমানের স্থান রয়েছে। এ জেলার সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসও বেশ পুরানো এবং এই সমবায়মূলক কর্মকান্ড জেলার কৃষি উন্নয়ন ছাড়াও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ক্রেতা সমবায়, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিজীবীদের নানা প্রয়োজনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিবাহ প্রভৃতি নানা কারণে সমবায় ভিত্তিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। লেখাটি অনেক আগের হলেও ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে জেলার সমবায় আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস বলা যেতে পারে।

রামশংকর চৌধুরী মহাশয় একজন বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন। সাহিত্য সংস্কৃতি, বিশেষত লোকসংস্কৃতির জগতে তিনি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ। বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। প্রবন্ধ লিখেছেন বহু। সমাজসচেতন মানুষ হিসাবে গণ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিজ্ঞতা ও তথ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে **আসানসোল পৌর প্রতিষ্ঠানের অতীত ইতিহাস (১৮৯৬-১৯২৮)** প্রবন্ধটি সত্যিই ইতিহাস হয়ে থাকবে। আসানসোলকে অল্প কথায় চিনিয়ে দেওয়ার পরই তিনি আসানসোল শহর প্রতিষ্ঠা এবং তার পৌর প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ধারাবাহিকভাবে বহু দুষ্প্রাপ্য নথি-পত্রের উল্লেখ করে দেখাতে চেয়েছেন আসানসোল পৌর প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার শুরু থেকে কিভাবে তার কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পৌর প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাড়ী ঘর, শহরের রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, পয়প্রণালী, বাজার, আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি কিছুই প্রায় বাদ পড়েনি। পৌর প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এটি একটি দলিল হয়ে থাকবে।

নীরদবরণ সরকার মহাশয় তার চাকুরীর অবসর জীবন প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করছেন পড়াশুনা আর লেখালেখির কাজে। একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, প্রবন্ধও লিখেছেন বেশ কয়েকটি। তার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে **সুপ্রাচীন বর্ধমান হাসপাতালের ইতিকথা বর্ধমান ফ্রেজার হসপিটাল** প্রবন্ধটি লিখেছেন। তিনি তার প্রবন্ধে বর্তমান বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, স্বাধীনোত্তর কালে যার নাম হয় 'বিজয়চাঁদ হাসপাতাল' তারই ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে শ্রী সরকারের লেখায়। হসপিটালটির জন্মের প্রেক্ষাপট এবং সময়কাল উল্লেখ করে প্রথম দিকের কিছু তথ্য এখানে দিয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না হলেও লেখাটির আংশিকভাবে ঐতিহাসিক মূল্য অবস্যই রয়েছে।

কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. **রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী** মহাশয়ের কথা যিনি তার অমূল্য সময় ব্যয় করে সাগ্রহে আমার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। আমি তাকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। এছাড়া আমার এই গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য পেয়েছি বহু পত্র-পত্রিকা সম্পাদকের সাহায্য-সহযোগিতা এবং অন্যান্য মানুষ যারা আমাকে বিভিন্ন পত্রিকা দিয়ে বা লেখাগুলি দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই সেই সমস্ত মানুষকে যাদের অনেকের সঙ্গে আমার সরাসরি যোগাযোগ না ঘটলেও তাদের লেখাগুলি আমার সম্পাদিত গ্রন্থে স্থান দিতে পেরেছি। তাদের কাছে আমি ঋণী। তাদের লেখাগুলি আরও বৃহত্তর জনসমক্ষে তুলে দিতে পেরে আমি ধন্য। আরও যে সমস্ত মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে **বর্ধমান সমগ্র ৩য় খন্ড** প্রকাশিত হতে চলেছে তাদের নামের তালিকা দিয়ে আমি কলেবর বৃদ্ধি ঘটালাম না।

উল্লেখ করতেই হয় আমার সহধর্মিনী সুলেখা কোঙারের কথা। সাংসারিক দায় থেকে প্রায় মুক্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার এ কাজে, উৎসাহ যুগিয়েছেন। পুত্র প্রিয়দর্শন বাইরে থেকেও বারবার তাগাদা দিয়েছে বর্ধমান সমগ্র এর পরবর্তী খন্ডগুলি প্রকাশ করার জন্য। তাই গ্রীষ্মবকাশের শুরুতে ওর ওখানে গিয়ে সাতদিন না থাকলে হয়তো সম্পাদকের কথাগুলো লেখা এবং গ্রন্থটির আনুষঙ্গিক কাজগুলো এখনও হয়তো হয়ে উঠতো না। অর্চনা অফসেটের কর্মীবৃন্দ যারা আমার সন্তান তুল্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারছি না। কিন্তু মৃনাল, ছোট্টু, মনোজ, বিশু এরা সবাই আপনজনের মত আমার কাজগুলি করে দিয়েছে। এদের সকলের ভালবাসা উৎসাহ আমার একাজে প্রেরণা যুগিয়েছে।

একটা কথা বলে শেষ করছি। আমার এই প্রচেষ্টা যার মধ্যে যুগ যুগ ধরে ফেলে আসা, হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে সেটির সার্থকতা বিচার করুক ভাবীকাল। প্রবন্ধগুলি নির্বাচন ও লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভুল থাকলে দায় অবশ্যই আমার। আশা রাখি বর্ধমানকে যারা জানতে ও চিনতে চান তাদের কাছে এটি একটি দলিল হিসাবে কাজ করবে। আগামীদিনের গবেষকদের কাছে এই লেখাগুলি পাথেয় হতে পারলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে, আমি ধন্য হব।

গোপীকান্ত কোঙার

সূচীপত্র

এক নজরে বর্ধমান জেলা

অবস্থান	৮৬°৪৮ - ৮৮°২৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও ২২°৫৬ - ২৩°৫৩ উত্তর অক্ষাংশ।
আয়তন	৭০২৪ বর্গ কিলোমিটার।
জনসংখ্যা	৬,৯১৯,৬৯৮জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৩,৬০২,৬৭৫ জন, মহিলা - ৬১.৯৩ শতাংশ।
ধর্মীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত মানুষ	হিন্দু - ৭৯.৬৯ শতাংশ, মুসলমান - ১৯.৫৫ শতাংশ, অন্যান্য - ০.৭৬ শতাংশ।
জীবিকা	কৃষি, চাকুরি ও ব্যবসা।
কৃষি ভূমি	৪,৯৬,০৫৩ হেক্টর।
প্রধান শস্য	ধান, আলু, গম, তৈলবীজ।
বনভূমি	২৩৫৭৭.৬৬ হেক্টর।
খনিজ সম্পদ	কয়লা (আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার)।
খনিসংখ্যা	১৯৪টি।
শিল্প	লৌহ-ইস্পাত, রেল-ইঞ্জিন, টেলিফোনের তার, রাসায়নিক দ্রব্য, অ্যালুমিনিয়াম, সাইকেল,পাইপ নির্মান, সিমেণ্ট, সার, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রভৃতি, কৃষির সহযোগী শিল্প- হিমঘর ৬৯টি, চালকল ২০৩টি, ধানকল ৯৭৯টি।
মহকুমা	৬ টি।
থানা	৩২ টি।
ব্লক	৩১টি।
পঞ্চায়েত সমিতি	৩১ টি।
গ্রাম পঞ্চায়েত	২৭৮ টি।

মৌজার সংখ্যা	২৫৮৮ টি।
স্থায়ী বসতিযুক্ত গ্রামের সংখ্যা	২৪৮৮ টি।
শহর	৫১ টি।
কর্পোরেশন	২ টি।
পৌরসভা	৯ টি।
লোকসভা কেন্দ্র	৪ টি।
বিধানসভা কেন্দ্র	২৬ টি।
স্বাস্থ্য	মেডিকেল কলেজ ১টি, মহকুমা হাসপাতাল ৫, গ্রামীণ হাসপাতাল ৬, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (ব্লক) ৩০, নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৯০, এক ডবলিউ উপকেন্দ্র ৭২৮।
ব্যাঙ্ক	রাষ্ট্রীয় ২৯২, ব্যাঙ্ক শামা ৭১, সমবায় ব্যাঙ্ক ৩০, সমবায় সংস্থা ২৬২৮।
রাস্তাঘাট	রেলপথ ৬১২কি. মি., পি. ডব্লিউ. ডি. জাতীয় সড়ক ১৫৯ কি. মি., এর রক্ষণাবেক্ষণে রাজ্য সড়ক রয়েছে - ৩১৫ কি. মি., জেলা সড়ক (শহরের রাস্তা)৭২৪কি. মি., গ্রাম সড়ক ৭৩৭ কি. মি., মোট সড়ক ১৯৩৯ কি. মি., (পাকা রাস্তা ১৯৩৩ কি. মি. এবং কাঁচা রাস্তা - ৬ কি. মি.) স্থানীয় প্রশাসনের রক্ষণাবেক্ষণে - রয়েছে পাকা রাস্তা ৩০৬ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ১৩০৮ কি. মি., মোট রাস্তা ১৬১৪ কি. মি., পৌরসভার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে - পাকা রাস্তা ৮২২ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ৬২৬ কি. মি., মোট রাস্তা ১৪৪৮ কি. মি.।
যোগাযোগ	ডাকঘর ৭৫৯ টি, ডাক ও তারঘর ৯৫টি।
শিক্ষা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০.১২.২০০০ (তারিখের তথ্য অনুযায়ী), অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮৮৫, উচ্চতম মাধ্যমিক ১৭৮, মাধ্যমিক ৪৮১, জুনিয়ার হাই ৯২, সিনিয়র মাদ্রাসা ৩, হাইমাদ্রাসা ১৩, জুনিয়র হাই মাদ্রাসা ১৮, উচ্চ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ১ টি (যার অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা মোট ১০২টি; তন্মধ্যে মেডিকেল কলেজ দুটি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ - ৬টি, মিউজিক কলেজ - ১টি, বি. এড. কলেজ - ৬টি, পি. এড. কলেজ - ১টি, হোমিও ডিগ্রি কলেজ - ৮২টি), মহাবিদ্যালয় ৩০টি, কারিগরী ও ইঞ্জিনিয়ারিং ৪০টি, শিক্ষক - শিক্ষণ ৫টি, মেডিকেল কলেজ ১টি।

বর্ধমান

সুবোধ মুখোপাধ্যায়

শাল্মলী তরু রাঙামাটি বুকে উদরে হীরক খনি,
রহিয়াছে যার পশ্চিমে ঘেরি, পূরবেতে সুরধনী।
চির দুর্জয় দামোদর নদে চরণ করে যে দান,
শিরে জটাভার অজয় যাহার সেইতো বর্ধমান।
কোথাকার বীর সিংহের শিশু বিজয় পতাকা করে,
আপন শৌর্যে গড়িল রাজ্য মহাসাগরের 'পরে।
দ্বাদশ বর্ষ যেথায় কাটালো জৈন বর্ধমান,
সিদ্ধি লভিয়া ধন্য হইল সে রাঢ় বর্ধমান।
রূপেতে যাহার বাদশাজাদার নিদ গেল চির টুটে,
জগতের সেই সেরা সুন্দরী বধূ হয়ে যেথা ফুটে।
প্রেম অবতার হৃদয়ে যেথায় জাগিল প্রেমের বান,
গুরু বলি যেথা বরিল কেশবে সেইতো বর্ধমান।
মৃত পতি সনে সদাগর বধূ যেথাকার নদী বহে,
শিশুর কথায় কমলে-কামিনী যেথা জাগে কালিদহে,
ব্যাধ কালকেতু তরেতে যেথায় বাড়িল দেবীর মান,
কবিকঙ্কণ নিক্কণ পূত সেইতো বর্ধমান।
যেথা শ্রীধর্মমঙ্গল গাথা বিরচিল ঘনরাম,
করচা লিখিয়া গোবিন্দ দাস অমর করিল নাম,
মালাধরে যেথা গুণরাজ বলি মাল্য করিল দান,
অনন্তপুরী জনমে যেথায়, সেইতো বর্ধমান।
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচিয়া কৃষ্ণদাস,
লোচনানন্দ নবাই ময়রা যেথায় করিল বাস।
মাতৃভাষায় যেথায় ধ্বনিল মহাকাব্যের গান,
সারা বাংলায় অমৃতের ধারা বহাল বর্ধমান।
শ্যামাসঙ্গীতে সিদ্ধি লভিল যেথায় কমলাকান্ত,
গালি দিয়া যেথা মহাকালিকায় ভক্ত হইল শান্ত।
পাঁচালি রচিয়া দশের সমাজে রথী যেথা পেল মান,
রাজসভা যেথা ধীরাজে বরিল সেইতো বর্ধমান।
রঘুনাথ যেথা না রচি গীতিকা করেনি জল স্পর্শ,
নীলকণ্ঠের অমিয় কণ্ঠে ধ্বনিত যেথায় হর্ষ,
রঙ্গলালের রসের সাগরে উঠিল যেথায় বান,

মতিলাল রায় চিরঞ্জীবেরে দানিল বর্ধমান।
যেথাকার রায় দেবতাগণেরে টানিয়া আনিল মর্তে,
জীবন দানিল যেথাকার মাটি সুধী অক্ষয় দত্তে।
রাজসভা যার মুখরিত করি ধ্বনিল রমার গান,
ললিতমোহন দুর্গাদাসেরে দানিল বর্ধমান।
সমাজ চাবুক পঞ্চানন্দে গড়িল যেথার মাটি,
গঙ্গার বুকে জনমি যে জন মানুষ হইল খাঁটি।
যেথাকার ছেলে বরি নিল জেলে রচি বিদ্রোহী গান,
বুলবুল কাজী নজরুল সুত জননী বর্ধমান।
পরধর্মেও বিশ্বাসী হয়ে স্বদেশের চাষী তরে,
লালবিহারীর গল্প যেথায় ছড়াল ভারত 'পরে।
যেথাকার ছেলে বাঁধন টুটিতে ছুটিল দূর জাপান,
আইনের বীর রাসবিহারীর জননী বর্ধমান।
অতুল বিভব বাসনা ত্যজিয়া মোহ্ আশা করি জয়,
শিব সঙ্গীতে পূজিল ভারতী যেথায় রাজা বিজয়।
যেথাকার কবি বাংলায় পেল শেখরের সম্মান,
সুনাট্যকার যেথা ভোলানাথ সেইতো বর্ধমান।
যোগেন্দ্র দিল বঙ্গবাসীরে মধুর বঙ্গবাসী,
কনক ভূষণ চারণ যাহার অঙ্গে ফুটাল হাসি।
কুমুদ হাস্যে অজয়ের বুকে বহিল যেথা উজান,
কাদের নওয়াজ আওয়াজে মুখর সেইতো বর্ধমান।
বাংলা ভাষার আদিম জননী রাঢ়ের রঙীন মাটি,
কাব্যে ও গানে ভবিষ্যতের হল সাহিত্য খাঁটি।
আদি যুগ হতে এই রাঢ়ভূমি বাণীর পীঠস্থান,
মোদের গর্ব সকল আশার আলোক বর্ধমান।
স্ফীত উদরে, কম্প বিকারে, অনাহারে, শোকানলে,
লাখো লাখো প্রাণ কত গেছে ভেসে হেথা বন্যার জলে।
মরিয়া অমর শত বিপদেও হেথাকার সন্তান,
সকলের প্রিয় বরণীয় সেই মোদের বর্ধমান।
এই রাঙামাটি সকলের খাঁটি প্রাণ হতে প্রিয়তর,
আজও হেথাকার অনেক মণীষা সারা ভারতেতে বড়।
যুগে যুগে যেন রাখিবারে পারি জন্মভূমির মান,
মরিলে আবার তোমারই বুকেতে জনমি বর্ধমান।

□ শারদীয় 'কলকল্লোল', ১৪০৫ □

জেলা পরিচিতি বর্ধমান

প্রাচীন রাঢ়ভূমির অন্তর্গত কৃষি ও শিল্পপ্রধান বর্ধমান জেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের বহু ঘটনা। বর্ধমান অঞ্চল একসময়ে পরিচিত ছিল সুহ্ম নামে। এই সুহ্মদেশেরই এক অংশই হল রাঢ়। অরণ্যভূমি রাঢ়াঞ্চলে জৈন ধর্মগুরু মহাবীর এসেছিলেন ধর্মপ্রচারে। রাঢ় এলাকার একটি অংশকে বলা হত বর্ধমানভুক্তি। ভুক্তি অর্থাৎ প্রদেশ। সমগ্র পশ্চিম বাংলা একসময় পরিচিত ছিল বর্ধমানভুক্তি নামে।

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের পূর্বাশ্রম নাম থেকেই হয়েছে বর্ধমান নামকরণ -- এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন কেউ কেউ। তাদের মতে মহাবীর প্রথম ধর্মপ্রচার করেন বর্ধমানে। আবার টলেমির বিবরণ যে 'ব্রডমন' নগরীর উল্লেখ আছে, তাকেই বর্ধমান বলে মেনে নিয়েছেন অনেকেই।

বর্ধমান জেলা সৃষ্টি হয় ১৮৮৫ সালে। ২২´-৫৬´-২৩´, -৫৩´ অক্ষরেখা এবং ৮৬´-৪৮´-৮৮´, -২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত এই জেলার ভিতর দিয়ে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা। জেলার আয়তন ৭০০৭-৪৫৯ বর্গ কিলোমিটার।

আদমসুমারী অনুসারে (১৯৮১) জেলার জনসংখ্যা ৪৮,৩৫,৩৮৮ জন। পুরুষ ২৫,৮৪,৬০৩ জন এবং নারী ২২,৮৬,৭৮৫ জন। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই জেলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই হল তপশিলী হিন্দু ও উপজাতি গোষ্ঠী। পশ্চিম বাংলার একমাত্র বর্ধমানে বাস করে আগুরি সম্প্রদায়ের মানুষ। মূলত বাঙালীপ্রধান জেলা হলেও, শিল্পাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের বসতি রয়েছে।

জেলার ৫টি মহকুমা ঃ বর্ধমান (সদর), কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর ও আসানসোল। মোট ব্লক সংখ্যা ৩৩। তার মধ্যে জেলা সদর-এ আছে ১১টি ব্লক। তাছাড়া কালনায় ৫টি, কাটোয়ায় ৫টি, দুর্গাপুরে ৪টি ও আসানসোলে ৮টি ব্লক আছে। জেলায় পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা ৩১, গ্রাম পঞ্চায়েত ২৯৪। মোট গ্রাম সংখ্যা ২৭২৮। থানা ৩৫টি।

কোম্পানি আমল থেকেই বর্ধমানে শিক্ষার প্রসার শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে মিশনারী পরিচালিত দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। ১৮৫০ সালে প্রথম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সূত্রপাত ঘটে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালের ১৫ জুন। বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে কলেজ সংখ্যা ৬১। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ৩০৫ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৪৫৫টি। জেলায় সিনেমা হলের সংখ্যা ৬১। তার মধ্যে ৬টি আছে বর্ধমান শহরে।

কালনা ও কাটোয়ায় মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৫ সালে। ১৮৬৯ সালে মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় আসানসোলে।

খনিজপ্রধান বর্ধমান জেলার উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ; পূর্বদিকে ভাগীরথী নদী ও নদীয়া জেলা; দক্ষিণে হুগলী, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার অংশ বিশেষ এবং পশ্চিমে মানভূম বা বিহার রাজ্য।

কাঁকর আর লাল বালি মেশান দেশ রাঢ়ভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত এই জেলাটির পশ্চিমদিকের সবটা এবং পূর্বদিকের কিছু অংশ উঁচু জমি। উঁচু পশ্চিমভাগ মিশেছে ছোটনাগপুরের মালভূমির সঙ্গে। বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চলে আছে মহুয়া, পলাশ, শাল, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান গাছপালা।

জেলার প্রধান নদনদী ভাগীরথী, অজয় ও দামোদর। দামোদরের দুটি শাখা নুনিয়া এবং সিঙ্গারান। তাছাড়া আছে পাহাড়ী নদী ব্রাহ্মণী, তামলা, বাবলা, কানা ও ধলকিশোর। ইডেন খাল কেটে প্রথমদিকে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্তমানে দামোদরের ওপর সাতটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ। তাছাড়া সরবরাহ হচ্ছে সেচের জল।

একসময় বর্ধমান পরিচিত ছিল 'বাঙলার শস্যগোলা' নামে। পূর্বভাগের পলিমাটিতে পলিমিশ্রিত মাটিতে ধান, আলু, তেলবীজ, আখ, পাট জন্মায় প্রচুর। ধান প্রধান কৃষিদ্রব্য। রবি ও খরিফ মরশুমে আউশ, আমন ও বোরো ধান উৎপন্ন হয়। বেশ কিছু চাল কল আছে। জেলার বাইরে চাল রপ্তানি হয়। গমও উৎপন্ন হয় এই জেলায়। কৃষিপ্রধান এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজে জড়িত।

জমিদারী প্রথা লোপের সময় বর্ধমানের জমিদার ছিলেন রাজা উদয়চাঁদ মহতাব। বর্ধমান কোম্পানির হাতে চলে যায় ১৭৬০ সালে। কিন্তু কোম্পানি শাসকদের সঙ্গে বর্ধমান রাজ পরিবারের সদ্ভাব ছিল না। মহারাজা তেজচন্দ্রের সময় শত্রুতা প্রকট হয়ে ওঠে। মহারাজা বিজয়চাঁদের সময় আবার বন্ধুত্বের সূত্রপাত ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহাতাবচাঁদ বাহাদুর ইংরেজদের অন্যতম সহায়ক হয়ে বাঙলায় সিপাহীদের শক্তি ও সাহস ভেঙে দিয়েছিলেন।

কোম্পানির অধিকার বিস্তারের সময় পরিচিত ছিল চাকলা বর্ধমান নামে। বর্তমান বর্ধমান জেলা, পরগণা বিষ্ণুপুর, বীরভূম ও হুগলী জেলার বিস্তৃত অঞ্চল ছিল চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত। ১৮০৫ সালে জঙ্গল মহল জেলা গঠিত হওয়ার সময় চাকলা বর্ধমানের বিরাট অংশ জুড়ে দেওয়া হয় তার সঙ্গে। আবার ঐ অংশ জেলা বর্ধমানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ১৮৩৩ সালে। অবশ্য বর্ধমানের কিছু অংশ ১৮২০ সালে হুগলী জেলা গঠনের সময় নতুন জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৫-৩৬ সালে পশ্চিম বর্ধমান নতুন জেলা গঠিত হয়। জেলা সদর হয় বাঁকুড়া। জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় বিষ্ণুপুর পরগণা, ইন্দাস ও কোতলপুর। ১৮৭২ সালে কয়েকটি অঞ্চল পশ্চিম বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, ১৮৭৯ সালে পশ্চিম বর্ধমান বা বাঁকুড়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই সময় আরামবাগ মহকুমা চলে যায় হুগলীতে। অবশ্য, এর পর জেলা বর্ধমানের আকারগত পরিবর্তন আর ঘটে নি।

বর্তমান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন মহারাজার প্রাসাদ। গোলাপবাগ, দিলখোসবাগ, ও কৃষ্ণসায়র দীঘি, সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির বর্ধমানের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। নবাবহাটে রাজবংশ একশত আটটি শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরগুলির কাছে তালিতগড় দুর্গে বর্গী হাঙ্গামার সময় বর্ধমান রাজ পরিবার আশ্রয় নিতেন। গড়টি ছিল দুই মাইল জুড়ে। চারদিকে ছিল পরিখা।

বর্ধমান একসময় ছিল স্বাস্থ্যকর স্থান। সীতাভোগ মিহিদানা বিখ্যাত মিষ্টান্ন। সমৃদ্ধ কৃষি সম্পদের জন্য 'বাংলার বাগিচা' নামে পরিচয় ছিল বর্ধমানের। নানা শিল্পদ্রব্যের জন্যও জেলার খ্যাতি ছিল।

বর্ধমান জেলার হস্তশিল্পও বিখ্যাত। বিশেষ করে দরিয়াপুরের ডোকরা শিল্প। তাছাড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তৈরি হয় পিতলের মূর্তি, সেরপাই, তাঁতবস্ত্র, মাদুর, বাঁশের মোড়া, ঝুড়ি, কাঠের আসবাবপত্র, কাঠের পুতুল, পাথর ও কাঠে খোদাই কাজ (দাঁইহাট), মাটির হাঁড়ি, বাসন কোসন, মাটির মূর্তি, খেলনা, পোড়া মাটির পুতুল, শোলার পুতুল ও দেবী প্রতিমার সাজ।

হিন্দুদের দেবী ও মুসলমানদের পীর গাজীদের পারস্পরিক অবস্থান এই জেলার বৈশিষ্ট্য। শাক্ত সাধনার প্রভাবই এই জেলায় বেশি। তাছাড়া সারা জেলা জুড়ে চলে মনসা পূজা। ধর্মঠাকুরও এখানে প্রভাবশালী। ভাঁজো অন্যতম লোকদেবতা। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত।

এই জেলার কয়েকটি বিখ্যাত মেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ নবাবহাটের শিবরাত্রির মেলা, সদর ঘাটের পৌষ সংক্রান্তির মেলা, কুড়মুনের চড়কের গাজন, বোহারের পীরগদাই সাহেবের মেলা, কেজার ও ছোট খণ্ডের মনসার ঝাঁপান, জৌগ্রামের শিবরাত্রির মেলা, দামুন্যার কল্পতরু মেলা, জামালপুরের বুড়োরাজের গাজন ও শিবরাত্রির মেলা। আরও বহু মেলা আছে।

জেলা বর্ধমানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মন্দির মসজিদ। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের এক বিস্ময়কর সম্মিলন ঘটেছে। জেলার মন্দিরগুলি নিয়ে কিংবদন্তীর শেষ নেই।

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর মন্দির সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কিংবদন্তী হল রাবণপুত্র মহীরাবণ পাতালে বসবাসকালে দেবী ভদ্রকালীর পূজা করতেন। মহীরাবণ রাম লক্ষণকে অপহরণ করে পাতালে নিয়ে যান। হনুমান মহীরাবণকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। হনুমান উদ্ধার কাজ সমাপ্ত করে ফেরার সময় দেবী ভদ্রকালীর বিগ্রহও নিয়ে আসেন এবং ক্ষীরগ্রামে রেখে যান। এই দেবীই পরে যোগাদ্যা নামে পরিচিত হন।

আসানসোল মহকুমার পাণ্ডবেশ্বর গ্রামে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন পাণ্ডবরা। গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত অজয় নদী। পাণ্ডবরা এখানে পাঁচটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরগুলি এখনও বর্তমান।

বর্ধমানে স্টেশনের পশ্চিম দিকে ১০৯টি শিব মন্দির আছে। অবশ্য সকলেই বলেন ১০৮টি মন্দির। মহারাণী বিষণকুমারী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অম্বিকা কালনায় যে ১০৮টি মন্দির আছে, সেটিও বর্ধমানরাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানের কয়েকটি উপাসনা কেন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য হল সাড়বার রাঢ়েশ্বর বা কালেশ্বর শিবমন্দির, কল্যাণেশ্বরী মন্দির, গৌরাঙ্গপুরের রেখদেউল, পাণ্ডবেশ্বরে পাণ্ডবেশ্বর শিবমন্দির।

পীঠস্থান কোগ্রামে উজানীর দেবী মঙ্গলচণ্ডী, পীঠস্থান কেতুগ্রামের দেবী বহুলা, পীঠস্থান অট্টহাস বা ফুল্লরার ফুল্লরা দেবীর মন্দির এবং বিল্বেশ্বর গ্রামের বিল্বেশ্বর শিবমন্দির বিখ্যাত।

বর্ধমান শহরের মাঝামাঝি জায়গায় প্রায় দুই একর জমির ওপর বর্ধমানে অধিষ্ঠাত্রী সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির, নাটমন্দির, অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির অবস্থিত। বর্ধমানরাজ এই মন্দির নির্মাণ করেন।

বর্ধমান জেলায় কয়েকটি পুরাতাত্ত্বিক নির্দশনও রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাণ্ডু রাজার ঢিবি। অণ্ডাল স্টেশন থেকে ১০ মাইল দূরে রামনগর ও গোঁসাইখণ্ডর কাছে পাণ্ডবেশ্বরে পাওয়া গেছে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন। বিশাল ঢিবি ছাড়াও এখানে রয়েছে ৬টি শিবমন্দির।

মশাগ্রামে সমুদ্রগুপ্তের পিতা চন্দ্রগুপ্তের দুষ্প্রাপ্য রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। আদি বরাহ বিষ্ণু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে মন্তেশ্বর থানার রাইগ্রামে। কাটোয়ার কাছে নৈহাটিতে পাওয়া গেছে সংস্কৃতে রচিত বল্লাল সেনের একটি তাম্র শাসন। শিলালিপির প্রথমটি থেকে জানা যায়, এখানকার বেগুনিয়া মন্দিরটি রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী হরিপ্রিয়া নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় লিপিতে আছে নন্দ ও তার স্ত্রী এই মন্দির সংস্কার করেন। কাটোয়ার কাছে নৈহাটিতে বল্লাল সেন আমলের তাম্রলিপি (১২ শতক) পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই তাম্রলিপি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বাঁকা নদীর দক্ষিণে আলামগঞ্জের ভিখিরিবাগানে ৩৪৫ মণ ওজনের একটি শিবলিঙ্গ এবং ১৮ ফুটের গৌরীপট পাওয়া গেছে। অনেকের মতে এই শিবলিঙ্গটি কালাপাহাড়ের সময় বিনষ্ট হয়েছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন পাওয়া গেছে সিদ্ধল গ্রাম, বর্ধমান, ঢেকুর, মশাগ্রাম, জাননগর, ক্ষীরগ্রাম, পাতুন, শ্রীখণ্ড, মঙ্গলকোট, মল্লসারুল, বীরভানপুর, মশাগ্রাম, বৈদ্যপুর, কুচুট, কাঁটারিয়া, কুরুম্বা এবং কোড়ুই প্রভৃতি গ্রামে।

দুর্গাপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বার্ণপুর, কুলটি, বরাকর, কাঞ্চননগর নিয়ে বর্ধমানের বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল। শিল্পায়নে আধুনিক পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটেছে দুর্গাপুরে। একসময় ছিল অরণ্যাঞ্চল। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় ১৯৫৫ সালে পরিণত হয় শিল্পাঞ্চলে। ১৬ বর্গমাইল এলাকায় ইস্পাত কারখানা তৈরি হয় ১৯৫৯ সালে। কোকচুল্লি স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট দুর্গাপুরের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

আসানসোল ও রাণীগঞ্জ কয়লাখনির জন্য বিখ্যাত। মহকুমা শহর আসানসোলে ভারতের প্রায় সব রাজ্যের মানুষ বাস করে। রোমান ক্যাথলিকদের উদ্যোগে উপাসনা কেন্দ্র, স্কুল, কুষ্ঠাশ্রম, অনাথ আশ্রম গড়ে ওঠে ১৮৭২ সালে। এই বৃহৎ শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত কুলটি-হীরাপুর-বার্ণপুর। সেনর‍্যালে সাইকেল কারখানা, অ্যাসুমিনিয়াম কারখানা, বার্ণপুর আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কস, কুলটি আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কস প্রভৃতি সংস্থা গড়ে উঠেছে। রাণীগঞ্জ কয়লাখনির জন্য বিখ্যাত হলেও এখানে আছে বেঙ্গল পেপার মিলস্। ভারতের সেরা কয়লা পাওয়া যায় রাণীগঞ্জ কয়লাখনিতে। ৩০০ কয়লাখনিতে কাজ করে

প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক। আঠার শতকের শেষে ছোটনাগপুরের কালেক্টর হার্ডলি প্রথম কয়লার সন্ধান পেলেও, খনি সন্ধান করা হয় নি। কিন্তু অনেক পরে সেই কয়লা খুঁজে পান রূপার্ট জোন্স ১৮১৪ সালে। তারপর কয়লা তোলা আরম্ভ হয়।

বাঙলা বিহার সীমান্তে রেলইঞ্জিন কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস স্থাপিত হয়েছে। শহরটির পত্তন হয় ১৯৪৮ সালে এবং প্রথম রেলইঞ্জিন তৈরি হয় ১৯৫০-৫১ সালে। মিহিজামের অনেকটা অংশ জুড়ে প্রায় সাত মাইল এলাকায় গড়ে উঠেছে এই শিল্পনগরী।

বর্ধমান শহরের কাছেই কাঞ্চননগরের ইস্পাত শিল্পের খ্যাতি ছিল দুনিয়া জুড়ে। এখানকার ছুরি, কাঁচি ছিল বিখ্যাত। কাঞ্চননগরের 'অগ্নিফুলি' কাপড় নাম করেছিল সেকালে। তাছাড়া ভাস্কর্যের জন্য সুনাম ছিল। তার নিদর্শন পাথরের তৈরি দেবী ভগবতীর কঙ্কালী প্রতিমা যা আজও জীবন্ত হয়ে আছে।

জেলা বর্ধমানে বহু কৃতী মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের। কাটোয়ার কাছে সিঙ্গি গ্রামে তাঁর জন্ম। গুসকরা গ্রামের কাছে সিদ্ধল গ্রামে বাস করতেন বিখ্যাত বোদ্ধা ও স্মৃতিশাস্ত্রকার পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট। বেদ ও বিভিন্ন শাস্ত্রে ছিল তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গ্রন্থকার কবি মালাধর বসুর বাস ছিল কুলীন গ্রামে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন।

ষোড়শ শতকে রায়না থানার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। অম্বিকা কালনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন অন্যতম শাক্ত পদকর্তা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। কাটোয়ার কাছে বাঁধমুড়া গ্রামে দাশরথি রায়ের জন্ম। কালনার কাছে বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বর্ধমানের কয়েকজন স্মরণীয় মানুষ হলেন - শ্রীখণ্ডের মহাকবি দামোদর, দেনুড়ের কেশব ভারতী ও বৃন্দাবন দাস, কাঞ্চননগরের গোবিন্দ দাস, সোতাই গ্রামের হটী বিদ্যালঙ্কার, কলাইঝুড়ি গ্রামের রূপমঞ্জুরী, ঝামটপুরের কৃষ্ণদাস কবিরাজ, পাটুলির বংশীবদন গোস্বামী, বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর, কাঁদরার জ্ঞানদাস, জৌগ্রামের কনাদ ভট্টাচার্য, খেড়ুয়ের নবাই ময়রা, বড়বেলুনের ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৈয়ড়ের ঘনরাম চক্রবর্তী, কুমার গ্রামের গোবিন্দ কবিরাজ, ধোয়াবুনির নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাটিকুরির ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চক বামনগড়িয়ার দুর্গাদাস লাহিড়ী, আমাদপুরের রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কড়ুই-এর কালিদাস রায় এবং কোগ্রামের কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

□ 'বাংলার বাতায়ন' ক্যালকাটা কেমিক্যাল ৭০ বর্ষ ও যুগান্তর ৫০ বর্ষ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৬ □

১৮২৯ সালের বর্ধমান

অবন্তীকুমার সান্যাল

তরুণ ফরাসী প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ভিক্টর জাকমঁ ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন ১৮২৮ সালের ২৬ আগস্ট, পণ্ডিচেরি হয়ে (সেখানে ছিলেন মাত্র দু সপ্তাহ) কলকাতা পৌঁছেছিলেন ১৮২৯ সালের ৬মে। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ।

জাকমঁ এসেছিলেন ফ্রান্সের ম্যুজেঅ্যম্ দিস্তোয়ার ন্যাত্যুরেল-এর পক্ষ থেকে তদানীন্তন উদ্ভিদ-তত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব অনুশীলন করার ভার নিয়ে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের অনুশীলন সম্পর্কেও তাঁর স্বাধীনতা ছিল। এই কাজের জন্যে তিনি কলকাতা থেকে শুরু করে উত্তর ভারত, হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল (চীন সীমানা পর্যন্ত), পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মালব, রাজপুতানা ও দক্ষিণ ভারতের একাংশে একটানা ঘুরে তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন। এই সময়ে তিনি পেয়েছিলেন সর্বত্র ইংরেজ সরকারের সাহায্য, বিশেষ করে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক এবং পাঞ্জাবের স্বাধীন রাজা রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য। একটানা ঘোরাঘুরির কাজ শেষ করে ফ্রান্সে ফিরে যাবার উদ্যোগের আগেই ১৮৩২ সালের ৭ ডিসেম্বর বোম্বাইতে তাঁর মৃত্যু হয়।

জাকমঁ কলকাতা থেকে যাত্রা করেছিলেন ২০ নভেম্বর। সঙ্গে দুটো গরুর গাড়িতে তাঁর জিনিসপত্র এবং আটজন লোক। নিজে ঘোড়ার পিঠে। প্রথম রাত কর্কস্ বাংলোয় কাটিয়ে পরদিন পৌঁছোন বারাকপুরে। সেখান থেকে পলতা ঘাট পেরিয়ে চন্দননগর, হুগলি হয়ে কুন্তী নদী পেরিয়ে ২৩ নভেম্বর পৌঁছোন পাণ্ডুয়ায়। কুন্তী নদীর উপরে বর্ধমান মহারাজার তৈরি ঝোলানো সেতুটি তখন সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু জাকমঁ ফেরিতেই পার হয়েছিলেন।

জাকমঁ পাণ্ডুয়ার নাম লিখেছেন প্যলুয়া (Poeuloua), একথাও লিখেছেন, ম্যাপে আছে Purruah। সেখানে ডাক ছিল কিন্তু কোনো বাংলো ছিল না। সেখানে একটা বড়ো দিঘির পাড়ে এক আম গাছের নীচে তাঁবুতে রাত কাটিয়ে তিনি পরদিন ২৪ নভেম্বর এসে পৌঁছোন পাঁচক্রোশ দূরে এখনকার বর্ধমান জেলার চোটখণ্ডে। বর্ধমানের বৃত্তান্ত এখান থেকেই শুরু হল।

চোটখণ্ড বা জৌগ্রাম

বর্ধমান জেলায় পা দিয়েই জাকমঁর চোখে পড়েছে দিঘির আধিক্য। হুগলির তুলনায় এখানকার জমি কম বানের জলে ভাসে। কুয়ো তাঁর চোখেই পড়েনি। মাঠে আখের খেতই বেশি, কিন্তু আখ খুবই ছোট জাতের। এখানেই তিনি প্রথম দেখলেন সরষের চাষ।

কিছু কিছু দিঘি ইউরোপের মতোই অসমান, নিচু জায়গায় আড়াআড়ি বাঁধ দেওয়া। বেশির ভাগই মানুষের তৈরি, সাত থেকে দশ মিটার গভীর, খোঁড়া মাটির পাড়, ঢালুতে তাল আর তেঁতুল গাছ, মুখোমুখি দুই পাড়ে জলে নামার ধাপ। দিঘিতে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই স্নান করে, এরই জল তারা খায়। সব দিঘিই প্রায় এক রকম। তালগাছের মধ্যে মধ্যে খেজুর গাছ। তালের পাতায় হাত পাখা হয়, আর রসে হয় নিম্নশ্রেণীর নেশার তাড়ি। খেজুর গাছ থেকেও তাড়ি হয়। পণ্ডিচেরি এলাকায় খেজুর গাছ নেই।

চোটখণ্ড একটা ছোট গ্রাম। ইংরেজি ম্যাপে নাম লেখা আছে জৌগ্রাম। গ্রামের লোক নানাভাবে নামদুটি উচ্চারণ করে। জাকমঁ জন কুড়ি লোককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কেউ বলেছে, 'জো', কেউ বলেছে 'চো', কেউ 'খণ্ড' বা 'খন্', কেউ কেউ 'গ-ঞ'। চোটখণ্ডে ডাককুলির পালা বদল হয়। এখানে এক বিশাল তেঁতুল গাছের নিচে তাঁবু ফেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জায়গাটি বিচ্ছিন্ন বলে সুন্দর হলেও লোকজন রাজী হল না। অগত্যা রাতের তাঁবু পড়ল একটি কুটিরের পাশে, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে।

বড়শুল, দেবীদা

পরদিন সকালে যাত্রা শুরু হল সূর্য ওঠার আগে। মালপত্র নিয়ে আগে গেল লোকজন, তারা থামবে দেবীদায় (জাকমঁ লিখেছেন Dibda) মেঘলা সুন্দর দিন, মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে সূর্য দেখা দেয়। তখন রোদ বড়োই কড়া। কিন্তু তখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল-করা গ্রামাঞ্চল আরও সবুজ আরও আনন্দময় মনে হয়। গ্রামাঞ্চলের চেহারা একই ধরনের।

বড়শুল গ্রামটি বড়ো। লোকের মুখে জাকমঁ শুনলেন এখানে কুটিরের সংখ্যা দুশোর কম নয়। অনেক বড়ো বাড়ির ইঁটের পাঁচিলের ধ্বংসস্তূপও চোখে পড়ল। একদা বর্ধিষ্ণু ছিল গ্রামটি।

গ্রাম পেরিয়েই সামনে খোলা একটা বিশাল ফাঁকা জমি, সবুজ ঘাসে ঢাকা। এখানে ওখানে দু-চারটে ঝোপ। তারই সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি হিন্দু মন্দিরের অবশিষ্ট। দূর থেকে দেখে মনে হয় একটি মিনার। মন্দিরের পশ্চিম দিকে কিছু অলংকরণ আছে, একসময়ে বাইরেটা সাজানো ছিল। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটির সামনে খোলা জায়গায় বিরাট বিরাট ঘাটের ধাপ নেমে গেছে বিশাল চারকোণা একটি দিঘির মধ্যে। দিঘির আয়তন তিন হেক্টরের কম হবে না। চারধারে ঘেরা পাড়ে তাল গাছ নেই, তেঁতুল গাছ নেই। সবই ন্যাড়া ন্যাড়া, জনহীন পরিত্যক্ত, কেমন একটা বিষাদাচ্ছন্ন পরিবেশ। একসময় বড়শুল নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল।

হঠাৎ সামনে এসে পড়ল অস্থিসার এক বৃদ্ধ, পরনে একটি নেংটি, ন্যূনতম শ্লীলতার পক্ষেও যা অনুপযুক্ত। গায়ে ছাই মাখা, চুলগুলো ফাঁক ফাঁক, খোঁচা খোঁচা, মাটি মেশানো। চলতে চলতে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ এবং ভাবভঙ্গি মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হল না। ভয় দেখাতেই লোকটা দাঁড়িয়ে না থেকে দূরে সরে গেল।

বড়শুল থেকেই জমি উত্তর-পশ্চিমে উঁচু হতে শুরু করেছে, তবে সাদা চোখে তেমন চোখে পড়ে না। মাটিতে বালি মেশানো, হুগলির মাটি ছিল এঁটেল। তবে খুবই উর্বরা। পথের দুধারে সাবুই ঘাস, এক মিটারের মত লম্বা লম্বা পাতা জড়ো হয়ে মাথার দিকে চুড়ো হয়ে আছে। কোনো কোনোটা দু-মিটার পর্যন্ত উঁচু। দেখতে খুবই সুন্দর। এর চাষ হয় না। আপনিই জন্মায়, পাতায় মাদুর হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত কলাবন, আখের খেত, কলা এবং আখ দুটোই খারাপ জাতের। আখের খেত একেবারেই নিড়ানো নয়। অনেকগুলো আখের ডগা একসঙ্গে করে বাঁধা, যাতে বাতাসের ঝাপটা আটকাতে পারে। বুর্ব অঞ্চলের আখের চেয়ে এগুলো বেশি ঘন, কিন্তু জমিতে সার দেওয়া হয় না, ধোঁয়া দেওয়া হয় না, তাই ক্ষীণজীবী।

লোকজন আগেই পৌঁছে গেছে। তাঁবু পড়ল দেবীদায়। বর্ধমান দু-ক্রোশ দূরে। দেবীদা একটা ছোটো গ্রাম। বেশ বড়ো একটা খাতের পাড়ে গোটা কয়েক কুঁড়ে ঘর। খাতটা বর্ষায় জলে ভরে ওঠে, খালের জল এখন নিস্তরঙ্গ। এক দেবস্থানের পাশে বিশাল একটি বট গাছের নিচে তাঁবু খাটানো হল। খাতের ঢাল এবড়োখেবড়ো, প্রায় সাত মিটার উঁচু।

ভোর তিনটেয় জাকমঁ তৈরি হলেন খাল পেরুনোর জন্যে। কিন্তু চারধার ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোকজনের নামতে চারটে বেজে গেল। কোনোরকমে হামাগুড়ি দিয়ে তিনি পৌঁছুলেন অপর পাড়ে। সবাই মিলে চললেন সরু একটা বাঁধের ভাঙা পাড় ধরে। মশালের আলো খালের জলে প্রতিফলিত হচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে। গরুগুলো বেলে মাটিতে ভালো করে চলতে পারছে না। গাড়োয়ানরা প্রাণপণে ঠেঙাচ্ছে, পেছন থেকে গাড়ি ঠেলছে। সবার চোখেই ঘুমের জের। জলার পাড়ে এসে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে নামল মুষলধারে বৃষ্টি। দলটাকে মনে হয় যেন শ্মশানযাত্রী। হঠাৎ মশালগুলো নিভে গেল। আলো জ্বালার সরঞ্জাম গাড়ির মধ্যে বাক্সবন্দী। দুজন লোককে পাঠানো হল গ্রাম থেকে আলো আনতে। দূর থেকে দেখা গেল একটা আলো জলার ওপারে দিগন্তে দুলছে। তারপর সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর একই জায়গা থেকে অনেকগুলো আলো বেরুল; কিন্তু একই সঙ্গে নিভে গেল। বৃষ্টি ও হাওয়ার হাত থেকে বেঁচে একটা আলো যখন কাছে এসে পৌঁছুল, তখন দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। বৃষ্টির মধ্যে বহুবার পথ হারিয়ে গেল। গাড়া-গর্তে পড়তে হলো। অবশেষে বৃষ্টি থামল, দিনের আলো ফুটল। সবাই এসে পৌঁছুলেন সমতল চাষ-করা মাঠে।

সমতল চাষের মাঠটি গিয়ে মিলেছে বেশ বড়ো একটা পাকা রাস্তায়। রাস্তার দুধারে পিপুল, বট, কদম গাছ। ফুলে ঢাকা বিগনোনিয়া মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাদের পরাগ-কেশর অত্যন্ত সরু, সামনের দিকে বাড়ানো, প্রত্যঙ্গ প্রায় সুষম, বিগনোনিয়া বলেই মনে হবে না। উন্মুক্ত গ্রামাঞ্চলে ধান, সরষে এবং প্রচুর নীলের চাষ। দেখতে বিচিত্র ও সুন্দর। চাষ না করা জমি খুবই কম, খেজুর গাছ নেই বললেই চলে। জাকমঁর মনে হল যেন ইউরোপে এসে পড়েছেন। অনেকগুলো নীলকুঠি পার হয়ে এলেন। সেগুলো পেরুতেই মাঠগুলো ভাগ হয়ে গেছে। বেড়া পড়েছে, বাগান হয়েছে, আমগাছের কুঞ্জ গড়ে উঠেছে। সবকিছু জানিয়ে দিচ্ছে বড়ো একটা শহরের কাছে এসে পড়েছেন।

বর্ধমান

জাকমঁ দলবল নিয়ে বর্ধমানে পৌঁছুলেন ২৬ নভেম্বর। বর্ধমানে ঢুকতে প্রথমেই বাঁকা নদীর পুলটি। পুলটি পাকা, শক্ত গাঁথুনি। নদী চওড়া, নিচে বালি। জলে স্রোত নেই বললেই চলে। এটা পার হলেই বর্ধমানের ইংরেজ বসতি। বাঁদিকের পাড়ে, একটা সুন্দর বাড়ি। অনেক লোকজন, সিপাই-শান্ত্রী তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গায়ের উর্দি লাল, বেশিরভাগেরই পা খালি, শুধু দেশীয়দের মতো উরুতে পট্টি জড়ানো। দেখতে বিশ্রী, হাস্যকর, কিন্তু বিগত তিরিশ বছর ধরে এটাই ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যদের উর্দি। বাড়িটা সুন্দর একটি চওড়া বাগান দিয়ে ঘেরা। রাস্তার দুধারে একইরকম সুন্দর সুন্দর বাড়ি একটার পর একটা। তাদের সামনা সামনি একটা চমৎকার সবুজ লন, সেখানে বেশ কিছু গাছের ঝাড়

এবং কয়েকটি প্যাভেলিয়ন। ওখানে ওগুলো শুধু শোভার জন্যে। তাদের মধ্যে চমৎকার দেখতে একটি হচ্ছে গির্জা। এই হচ্ছে বর্ধমানের ইংরেজদের শহর। দেশীয়দের শহরটি প্রায় এক মাইল দূরে। সেটি একেবারেই চোখে পড়ে না।

জাকমঁ বর্ধমানে উঠেছিলেন ক্যাপ্টেন ভেচের বাড়িতে। ভেচ দিন পনেরো হল বর্ধমানে এসেছেন। তিনি জেলার রাস্তা তৈরির কাজের ভারপ্রাপ্ত। তাঁর নামে জাকমঁর এক পরিচিত ব্যক্তির সুপারিশপত্র ছিল। ক্যাপ্টেন ভেচ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি জাতে স্কচ, সৈন্যবিভাগে পেনশন পেলেই ফিরে যাবেন নিজের দেশে। তাঁর বাড়িঘর সাদাসিধে, বসতির এক প্রান্তে। তাঁর স্ত্রীও স্কচ, বয়স অনেক কম, মুখখানি খুবই সুন্দর। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, তারা বেশ চুপচাপ, ভারিক্কিগোছের, কিন্তু প্রীতিপদ ও সুন্দর। দুঘণ্টার মধ্যে ক্যাপ্টেন ভেচ কমিশনার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, প্রাদেশিক বাহিনীর কমান্ডান্ট, কালেক্টর, বাঁধ তৈরির ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার --- বর্ধমানের সমস্ত ইংরেজ বাসিন্দাদের সঙ্গে জাকমঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যাতে কেউ অখুশি না হন তার জন্যে জাকমঁ পরদিন ২৭ নভেম্বর ডাক্তার এবং পাদরির সঙ্গেও দেখা করলেন। কলকাতার বিপুল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের খরচে বর্ধমানে একজন পাদরি রাখেন। এঁরা ছাড়া বর্ধমানে আর একজন ইংরেজ থাকেন। তিনি পূর্ত বিভাগের কর্তা, ক্যাপ্টেন ভেচ তাঁরই সহকারী।

সকলের বড়ো অফিসার হচ্ছেন কমিশনার। তিনি সকলের কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন। জজের চেয়েও তাঁর ক্ষমতা বেশি, জজ পদমর্যাদায় তাঁর নিচে। জজ মৃত্যুদণ্ড দিলে তাঁর অনুমোদন প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন জেলার উপরেও তাঁর কর্তৃত্ব। ইংল্যান্ডের জজদের মতো তিনি বিভিন্ন সময়ে সেইসব জেলায় ঘোরেন। তাঁর হস্তক্ষেপ বা অনুমোদন ছাড়া জজেরা যেসব মামলার নিষ্পত্তি করতে পারেন না, সেই সবের তিনি নিষ্পত্তি করেন। তাঁর ক্ষমতা কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের চেয়েও বেশি। তাঁর পদটি বাংলা সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ।

জজের ক্ষমতা বর্ধমান জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জেলার মধ্যে তিনি বিনা বাধায় রায় দিতে পারেন, জরিমানা, জেল, বাধ্যতামূলক শ্রমদণ্ড দিতে পারেন। যেসব সম্পত্তির মামলার ক্ষেত্রে সরকার বাদী বা বিবাদী নয়, জজ সেসব ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে রায় দিতে পারেন।

কালেক্টরের উপরে ভার সরকারের রাজস্ব আদায় করার। তাছাড়া রাজস্ব-সংক্রান্ত কিছু মামলার বিচারও তিনি করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের তত্ত্বাবধান করেন। তাঁর বিচারের ক্ষমতা থাকলেও এ ব্যাপারে তিনি জজের অধীনে। তবুও তাঁর পদটি অনেক উঁচু দরের বলেই মনে হয়। জেলার সৈন্যবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে তাঁরই অধীনে।

জেলার সৈন্যবাহিনী গঠিত প্রাদেশিক রেজিমেন্টের একটি রেজিমেন্ট নিয়ে। এটা অনেকটা দেশীয় মিলিশিয়া, সংগ্রহ করা হয় জেলাগুলোর লোকদের মধ্যে থেকেই। তারা

বেতন পায় মাসে পাঁচ টাকা, কিন্তু লাইনের রেজিমেন্টের মাইনে সাত টাকা। এদের কাজ শান্তিরক্ষা করা, নিরাপত্তা বজায় রাখা, অনেকটা দখলদারি ফৌজের মতো। স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ অফিসার এবং কিছু হৃতস্বাস্থ্য সুবেদার এদের পরিচালনা করে। যুদ্ধের সময় এরা জেলার বাইরে যায় না। এখানকার অফিসারের পদ নিয়মিত ফৌজীবাহিনীর চেয়ে কম লোভনীয়, কিন্তু পদগুলো পূরণ করা হয় নিম্নস্তরের অফিসারদের দিয়ে। সাধারণত হেপাটাইটিজে মরমর এক ক্যাপ্টেনই এই রেজিমেন্টের কর্তা হয়। এখানে তেমন কোনো হাঙ্গামা নেই, ধীরে সুস্থে সে এখানে মরতে পারে, কারণ দেশের জলহাওয়ায় পেনসনের জন্যে তেইশ বছর চাকরির মেয়াদ শেষ হবার আগেই তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ছাড়তে সে বাধ্য হয়েছে। সেদিন সকালে এখানকার বাহিনীর কর্তার সঙ্গে জাকমঁ সাক্ষাৎ সেরে নিলেন। তাঁর গায়ে শুধু ফৌজী গাঢ় লাল ভেস্ট, রঙীন ট্রাউজার এবং সাদা টুপি। একে পুরো ফৌজী উর্দি বলা হয় না।

এইসব সামরিক অফিসাররা সাদাসিধে ভাবে থাকলেও, ধনী বেসামরিক কর্মচারীরা জমকালো ফ্যাশনের জামাকাপড়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান। যেন এখানে অনেক লোক আছে তাকিয়ে দেখার। তাঁরা বলেন, দিনে দু-তিন বার পোশাক পাল্টানো দরকার। তাঁদের মাথায় এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, এধরনের অস্বস্তিকর পোশাকে তাঁরা অপরের শ্রদ্ধা পাবেন।

যে-সব বেসামরিক ডাক্তারকে কোম্পানী এ-ধরনের জায়গায় রাখে তাদের ব্যবসা করার অধিকার আছে। বাংলাদেশে তাদের সবাই নীলের ব্যবসায়ী কিংবা ব্যবসার মালের ফাটকাবাজ। এখানে যিনি আছেন তিনিও তাই। মাঝে মধ্যে ডাক্তাররা অন্যান্য বাড়তি কাজও করে থাকেন, তার জন্যে উপরিও পান। যেমন পোস্টমাস্টারের কাজ। কিন্তু যখন কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী যেমন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা কালেক্টর নিজের কাজের সঙ্গে এই ধরনের কাজ করেন, তখন তার জন্যে বাড়তি কিছু পান না।

বর্ধমান রাজস্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, কোম্পানীর খরচে জেলার কোনো আধ্যাত্মিক সাহায্য পাবার উপায় নেই। কিন্তু দেশীয় কৃষ্ণাঙ্গদের আত্মার মুক্তির জন্যে ইংল্যান্ডের বহু খ্রিস্টীয় আত্মা চাঁদা দিয়ে প্রতি বছর জাহাজে করে কিছু পাদরি পাঠায় কলকাতার বিশপের অধীনে বাইবেল সোসাইটিতে। এই রকমই একজন ধর্মবিশ্বাসের সৈনিকের উপর এখানকার এ্যাংলিকান সম্প্রদায়ের মুক্তির ভার। তিনি এঁদের প্যাস্টর, নিজের সাধ্যমতো কাজ করেন এবং সেই সুযোগে কিছু হিন্দুর আত্মাকে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি এক জার্মান, নাম ডায়ের (Daerr)। জাকমঁর গৃহস্বামী অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, তাঁর সঙ্গে গিয়ে পাদরি মিঃ ডায়েরের সঙ্গে জাকমঁ দেখা করলেন। মিঃ ডায়ের নাকি খুব ভালো বাংলা বলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজিই যেমন উচ্চারণ করেন এবং বলেন তা শুনে জাকমঁর সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহ হল।

পাদরির বাড়িটা ইংরেজ বসতির এক অত্যন্ত বিশ্রী জায়গায়, সেখানে তিনি একটি ইস্কুল চালান, বলা হয়, সেখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েকে পড়ান। দেশীয়দের পড়াশোনা

কম-হোক, এই ভেবেই কি দেশীয় শহর থেকে দু-মাইল দূরে ইস্কুলটি করা হয়েছে? লোকে তা নিয়ে ঠাট্টা করে।

এখানে নিম্নপদের কোনো ইউরোপীয় নেই। কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার এটাই নিয়ম। যে স্বল্পসংখ্যক কর্মচারীকে এখানে রাখা হয়েছে এবং যাদের দেশীয়দের সামনে হাজির করা হয় তাদের সবারই এমন পদ যাতে দেশীয়দের সম্ভ্রম আদায় করতে পারে। কালেক্টর কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের যেসব সহকারী আছে, তারা সবাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে পলাতক তরুণ, তাদের জন্যে ভালো ভালো বাড়ির ব্যবস্থা। এদের দপ্তরের কেরানীরা সবাই দেশীয়।

ক্যাপ্টেন ভেচ ভারতে আছেন কুড়ি বছর। তিনি জাকমঁকে বললেন, ভারতের এই প্রথম যে বেসামরিক বসতিটি তিনি দেখছেন, সর্বত্র ঠিক একই রকমের। দেশীয় জনসংখ্যার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মুষ্টিমেয় ইংরেজের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কেবলমাত্র আশেপাশের নীলকরদের দিয়ে। এরা ধারে কাছের বসতিতে কিংবা বন্ধুবান্ধবের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করতে যায়, তাদের সঙ্গে সাহিত্যঘটিত নতুনতত্ব নিয়ে আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি করে।

প্রায়ই এইসব পরিবারের মধ্যে রেষারেষি, ঈর্ষার ব্যাপার ঘটে। একেই এখানকার মেলামেশায় উত্তাপ কম, তাতে তাদের সম্পর্ক আরও শীতল হয়ে পড়ে। শহরের মতো এখানে সামাজিকতার উচ্ছ্বাস নেই। প্রত্যেকটি পরিবার নিজের নিজের মতো থাকে। দু-চারটে ডিনার, যেখানে প্রায় সকলেই হাজির থাকে - বাদ দিলে সবাই নিরিবিলিতে সন্ধ্যা কাটায়। যে যাই বলুক, সোসাইটির অভাবে কোনো ইংরেজ কোনো ফরাসীদের চেয়ে কম নিঃসঙ্গ বোধ করে না, তবু সুযোগ থাকলেও ইংরেজ সোসাইটি গড়ে নিতে পারে না। ফরাসীদের মতো তারা বন্ধুবান্ধবের কাছে মন খুলে ধরতে পারে না, তাদের হাস্যকর অহমিকা বাধা ঘটায়, যা ফরাসীদের ক্ষেত্রে কোনো বাধাই নয়। ইংরেজরা নিঃসঙ্গবোধ করতেই ভালবাসে।

এখানে কলকাতা হচ্ছে সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন আকর্ষণ ও কৌতূহলের কেন্দ্র। সকলের চোখ কান কলকাতার দিকে খোলা। কুড়ি বছরেরও বেশি ইংল্যান্ড থেকে দূরে এখানকার সবাই কিছুটা বিজাতীয় হয়ে উঠেছে। কলকাতার কাগজের খবর ছাড়া ইউরোপের কোনো খবরই এরা রাখে না। ভারতীয় গেজেটে যা বেরোয় তাই নিয়ে তর্কবিতর্কে মেতে থাকে। কলকাতার বিপুল জনজীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। জাকমঁর মনে হল, এখানকার সবাই সরকারের বিরোধী মতের। কোম্পানীর সরকারের প্রতি বিরূপতায় সবাই এক। লর্ড বেন্টিংকের সদ্‌গুণাবলীর প্রশংসা করা হলেও, তাঁর সম্পর্কে সকলেই পোষণ করে বিদ্বিষ্ট মনোভাব, যদিও বেণ্টিংকের বেতন কমানোর আইনে এখানকার কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বেন্টিংক রাজধানী পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সম্প্রতি কোম্পানীর ডিরেক্টররা তা বাতিল করেছেন। তাই নিয়ে এদের উল্লাস, কারণ বেণ্টিঙ্ক অসম্মানিত হয়েছেন।

বর্ধমানের ভারতীয় শহরটি কিছু বিক্ষিপ্ত জনপূর্ণ বসতির সমষ্টি। কিন্তু বাড়িঘর হতকুচ্ছিৎ, চুনলেপা কাদামাটির কুটির, ঠিক কলকাতার মতো। উল্লেখযোগ্য কোনো মন্দির নেই। বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর বড়ো বাড়ি সামান্যই। রাজার বাড়ি অনেকটা জায়গা

জুড়ে এবং তা অনেকগু'লো বাড়ির সমষ্টি। সে-সব নানা আকারের, নানা রঙের, বিশৃঙ্খল, রুচিহীন ভাবে যুক্ত। ঢোকার পথগুলোই সবচেয়ে জঘন্য, বেশিরভাগই যতো দূর হওয়া সম্ভব নোংরা। বিশাল বিশাল বাগানের চারধারের রক্ষণাবেক্ষণও একই রকমের শোচনীয়। এখানকার রাজা ইংরেজদের এই সাম্রাজ্যের অন্যতম ধনী দেশীয় ব্যক্তি। তাঁর স্বীকৃত রাজস্ব তেরো লক্ষ টাকা। কিন্তু তিনি বড়োই কৃপণ। তাঁর কৃপণতার সঙ্গে লড়াই বাঁধে তাঁর জাঁকজমক প্রীতির। তিনি দুটোর সমন্বয় করেন দুহাতে নজর নিয়ে, (তাঁর সামনে কেউ এলে টাকা সামনে ধরতে হয়, তিনি তা ছুঁয়ে দিলেই রাজকীয় শিষ্টতা রক্ষিত হয়, কিন্তু সে টাকা তিনি পকেটে পোরেন) এবং সেইসঙ্গে কিছু পুল, কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করেন, যাতে লোকে তাঁর নাম করে। তাঁর রাজমিস্ত্রিদের কাজে নামানোর আগে তিনি সরকারের কাছ থেকে কিছু বাড়তি খেতাবের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন। হুগলী এবং পাণ্ডুয়ার মধ্যে দামোদরের উপরের ঝোলানো পুলটি তিনিই করেছেন।

তাঁকে মহারাজ বাহাদুর বলা হয়। বর্ধমানে পৌঁছেই জাকমঁ ক্যাপ্টেন ভেচের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছিলেন পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে। মহারাজা অসুস্থ। দেখা করার দিন পিছিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে তিনি সংবাদ পাঠালেন। মহারাজার সঙ্গে যোগাযোগের দৌত্য করেছিলেন পাদরি ডায়ের। জাকমঁর সন্দেহ হল, ডায়েরের যেমন বাংলায় দখল তাতে কী বলতে কী বলেছেন। মহারাজা আবার ইংরেজি বোঝেন না।

তেরো লক্ষ টাকার রাজস্ব সত্ত্বেও মহারাজা কিন্তু বর্ধমানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। লোকে জানে জন্ম কিংবা কমিশনারের ট্রাইবুনালের সামনে তারা যা তিনিও তাই। খুন করলে তাদের মতো তাঁরও ফাঁসি হবে। যার ফাঁসি দেবার ক্ষমতা আছে ভারতীয়রা তাকেই সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করে। মহারাজা শিক্ষাদীক্ষাহীন হলেও খুবই চতুর। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময় যখন টাকার টানাটানি চলছিল, লর্ড আমহার্স্ট তখন তাঁর কাছে ধার চেয়েছিলেন। সুদের হার ঠিক হবার পর ধার শোধের মেয়াদের প্রশ্ন উঠল। মহারাজা বললেন, কুড়ি বছরের দীর্ঘ মেয়াদে তিনি টাকা ধার দেবেন না। কারণ কুড়ি বছর পর কোম্পানীর রাজত্ব থাকবে কিনা, কে জানে।

কৃপণতা সত্ত্বেও তিনি অনেক রাণী রেখেছেন। অনেক হাতি ও ঘোড়া পোষেন যদিও কখনও তিনি বাইরে বেরোন না। তাঁর ভৃত্যবাহিনী বিরাট। প্রতিদিন তিনি তাদের হাজিরা দিতে ডাকেন, যারা হাজির হয় তাদের হাজিরার জন্যে বকশিস দেন। যারা হয় না তাদের জরিমানা করেন বেতন অনুসারে। জরিমানার টাকা নিজে আত্মসাৎ করেন। এদেশের রাজা-মহারাজের মতো নির্বোধ আর কিছু নেই। লর্ড লেক মারাঠাদের হাত থেকে দিল্লি দখলের পর বৃদ্ধ বাদশাকে মুক্ত করে তাঁকে অন্ধ করার জন্যে যখন দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, বাদশাহ বলেছিলেন, "অন্ধ হওয়াটা বড়োই দুর্ভাগ্য। আকাশের ঘুড়ি আর দেখতে পাবো না।" চোখ হারাবার আগে ঘুড়ি দেখাই ছিল তাঁর দুই চোখের মুখ্য কর্ম।

বর্ধমানের একমাত্র কৌতূহলের বস্তু হচ্ছে একটা দিঘি, অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই তার নামকরণ হয়েছে 'বড়ো দিঘি' (বড়ো তালাও)। এর আয়তন হবে বারো কি পনেরো

হেক্টর। ঝাঁকালো উঁচু পাড়। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া পোর্টিকো, নেমে যাওয়া ঘাটের সিঁড়ি। এগুলো আধুনিক কালের নির্মাণ, অতি সাধারণ গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণ। কলকাতায় হামেশাই চোখে পড়ে।

হুগলির পর থেকে নারকেল গাছ কমে গিয়েছিল, বর্ধমানে আবার নারকেল গাছের প্রাদুর্ভাব। এগুলো ফল দেয়, কারণ, বলা হয়, কোনো কোনো সময় সমুদ্রের হাওয়া এখানেও এসে পৌঁছোয়। যেখানে পৌঁছোয় না সেখানে ফলও হয় না, ফুলও হয় না। এর সীমা গঙ্গার পাড়ে পাটনা পর্যন্ত। নদীর পাড়ে উত্তরে অনেক নারকেল গাছ হয়।

পণ্ডিচেরির শাসনকর্তা মঁ দেস্‌বাস্যাঁ যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন তখন তাঁকে এখানেও দেখা গিয়েছিল। তিনি দেশীয়দের চিনি তৈরির কায়দাকানুন খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে আখ পাকে, তখন দুটি সিলিন্ডারযুক্ত একটি যন্ত্র মাঠের মধ্যে আনা হয়। সিলিন্ডারের মধ্যে হাতে আখ পেষাই হয়। এইভাবে বার করা রস সঙ্গে সঙ্গে জ্বাল দেওয়া হয়। এর জন্যে থাকে উনুনের উপরে বসানো মাটির সব পাত্র। এ থেকে যে চিনি হয় তাতে ঝোল থাকে। সাধারণত এর দাম চার থেকে পাঁচ টাকা মণ। তারপর তা পরিষ্কার করা হয় রক্তের বদলে ডিমের সাদা অংশ এবং দুধ দিয়ে। এই প্রক্রিয়া ভারতের যে কোনো প্রদেশের চেয়ে উন্নত। এর বিশুদ্ধি ইউরোপের মতোই। তখন দাম হয় আট টাকা মণ। বর্ধমানের চিনির বেশির ভাগই চালান যায় কলকাতায়। জুলাই, আগস্ট মাসে নদী পথেই মাল চলাচল করে।

বর্ধমান স্বাস্থ্যকর স্থান বলে গণ্য। গঙ্গার বদ্বীপ থেকে এর জমি কয়েক ফুট উঁচু, তাতে জল গড়িয়ে যায়। সর্বত্র মাঠের ধারে ছোটো ছোটো বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হয়। ধান চাষের জন্যে মাঠ ভাসাতে হয়। বর্ধমানের ধারে কাছে জঙ্গল নেই মোটেই, অনেক দূর গিয়ে জঙ্গলের দেখা মেলে। এখানে গ্রীষ্মকালে কলকাতার মতো গরম। চিমনি ছাড়া কোনো ইউরোপীয় বাড়ি নেই, দেশী কয়লায় শীতের দিনে আগুন জ্বলে।

বর্ধমান থেকে একটি অতি-ব্যবহৃত রাস্তা গেছে বাঁকুড়া পর্যন্ত, সেখানে রঘুনাথপুরে মিলেছে কলকাতা-বেনারস ফৌজীরাস্তার সঙ্গে। কিন্তু জাকমঁ রাণীগঞ্জের কয়লাখনি দেখতে চান। খনিগুলো প্রায় ষাট মাইল পশ্চিমে দামোদরের পাড়ে। যেতে হবে অরণ্য-প্রদেশের মধ্যে দিয়ে। রাণীগঞ্জ থেকে দামোদর পেরিয়ে রঘুনাথপুরে ফৌজীরাস্তায় পৌঁছুতে হাঁটতে হবে প্রায় একশো মাইল। তিনি ঠিক করলেন এই পথেই যাবেন। কিন্তু এ পথের অরণ্যে হাতি, গণ্ডার, বাঘ ও ভালুকের ভয়। তাই কিছু রক্ষীর প্রয়োজন। তাঁর কাছে রক্ষী সংগ্রহ করে দেবার অনুমতি পত্র ছিল। তারই জোরে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে পেলেন পাঁচজন সিপাই। তারা যাবে প্রাদেশিক রেজিমেন্টের সদর-দপ্তর পর্যন্ত। দলবল নিয়ে জাকমঁ বর্ধমান ছাড়লেন ২৮ নভেম্বর।

হলদি

সূর্যোদয়ের আগেই লোকজন রওনা হল, তারা হলদিতে গিয়ে থামবে। ঘোড়ায় চেপে জাকমঁ বেরুলেন দুপুর বেলায়। ভেবেছিলেন আট মাইল রাস্তা লোকজন অনেক

আগেই পেরিয়ে সব ঠিকঠাক করে রাখবে। কিন্তু রাস্তা বহু জায়গায় ভাঙা। মাঝে মাঝে দু ফুট আড়াই ফুট জল-কাদা। তাতে তারা তাড়াতাড়ি এগুতেই পারেনি। জায়গায় জায়গায় গাড়ি ঠেলতে গ্রামের লোক পর্যন্ত ডেকে আনতে হয়েছে।

রাস্তার দুধারে খেত। গ্রামগুলো সব সময়েই কোনো না কোনো দিঘির পাশে। পাড়গুলো গাছ ঢাকা, ছায়া ঘন। দেশটাকে জনবহুল বলে মনে হয় না। কিন্তু যে বিপুল পরিমাণে ধান চাষ হয়, তার উপযোগী মানুষ কোথা থেকে আসে? আখের ছোটো ছোটো খেত। অনেকগুলো গাছকে একসঙ্গে ঝুঁটি বেঁধে রাখার জন্যে গোড়ায় আলো যায় না, তার জন্যেই আখ এতো রোগাটে। খেতের ধান মাটিতে শুয়ে আছে। চাষীরাই লাঠি পিটিয়ে ডগাগুলো প্রায় ভেঙে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি পাকে।

পথে দেখতে পেলেন একদল বাহক ছুটছে ঘাড়ে একটা 'কিউব' নিয়ে। সেটা কাপড়ে ঘেরা, মনে হল বেশ ভারি। 'কিউবটা' দেখতে অনেকটা 'মিটসেফ' বা ঘেরাটোপ দেওয়া ঝাড়বাতির মতো। ভিতরে যাঁরা আছেন তাঁরা স্ত্রীলোক। তাঁরা অন্য কোনো পদ্ধতিতে পথ চলেন না। দেখতে পেলেন এক মুসলমান দরবেশ চলেছে টাট্টু চেপে। লোকটা নোংরা, হাস্যকর। নিজে বড়ো এবং ঘোড়া ছোটো হওয়ায় প্রতি পদক্ষেপে মনে হচ্ছিল ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়বে।

তাঁবু পড়ল হলদিতে। সেটা গণ্ডগ্রাম। সিপাইদের বেরুনোর সময় প্রত্যেকেরই গায়ে ছিল সরকারী উর্দি। সরু প্যান্টালুন তাদের পক্ষে এক যন্ত্রণা। পথে নেমেই তা তারা খুলে শুধু কোটটা গায়ে রেখে পরে নিয়েছিল পাজামা কিংবা মালকোঁচা মারা ধুতি। আস্তানায় এসে কোটও খুলে ফেলল। তারপর লেগে গেল নিজের নিজের রান্না। এদের দুজনে একসঙ্গে খায় না, পৃথক পৃথক রান্না করে। জাকমঁর ভৃত্যরাও তাই করে। তাঁর মুসলমান খালাসির চালের পরিমাণ দেখে প্রশ্ন করায়, সে উত্তর দিল, "আমরা বাঙালী নই যে দিনে আধ সের চালের ভাত খাব, আমাদের পশ্চিমের লোকের এক সেরও যথেষ্ট নয়"। কিন্তু সহিস তাঁকে দেখেই করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল, "দোহাই সাহেব! রান্নার কাছে আসবেন না। আমি হিন্দু"। সবচেয়ে হীনদশাগ্রস্ত সহিসের জোগানদারটিও তাঁকে একই কথা বলল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে সিপাইরা গায়ে উর্দি চড়িয়ে বন্দুক ঘাড়ে তাঁবুর দরজায় এলো রাতের নির্দেশ নিতে। তাদের একজন রইল তাঁবুর দরজায়। অন্যরা মালপত্র বোঝাই গাড়িগুলোর পাহারায়। পরদিন ২৯ নভেম্বর আবার যাত্রা দশ মাইল দূরে দিগ্‌নগরের উদ্দেশ্যে।

দিগ্‌নগর

এ অঞ্চলটি ধানে ভর্তি। অনেকগুলো সম্পন্ন গ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ। জমির উঁচুনিচু একটুও বোঝা যায় না। তবুও জল গড়িয়ে যাচ্ছে পূর্বদিকে। হলদি থেকে দুমাইল দূরে একটা নদী পেরুতে হল। এই প্রথম জাকমঁর চোখে পড়ল 'কংকর', যার প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকেরা অত্যন্ত বিব্রত। এ জিনিস পলল আকরিক লোহা ছাড়া আর কিছুই না। এখানে এ জিনিস কয়েক ফুট বালি ও মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকে, পুকুরের

পাড়ে খুঁড়ে তোলা মাটির সঙ্গে দেখা যায়। মাটিতে এর ভাগই বেশি। ভারতের বহু অংশে এই লৌহময় পলল মোটেই মাটির নীচে থাকে না, উপরেই থাকে। আকরিক লোহার মতো। একে কাজে লাগানো হয় কিনা তা তাঁর জানা নেই।

দিগ্‌নগরে বাড়ি আছে কয়েক শো। এখানে চিনি ও চিনির মিষ্টান্ন তৈরি হয়ে বিভিন্ন জায়গায় চালান যায়। এখানে অনেক খুদে 'বাবু' বা দেশীয় ভদ্রলোক থাকেন। তাঁদের আছে কিছু কম মাইনের ভৃত্য। একটা পড়ো বাড়ি, আর একটা ফুটোফাটা পুরনো পালকি। কেউ কেউ সরকারী ইজারাদার, অন্যরা ফাটকা খেলেন চিনি নিয়ে। এ গ্রামের শিশুরা কখনও কোনো ইউরোপীয় দেখেছে বলে মনে হয় না।

অভিরামপুর, সুয়াতা, জামতাড়া, মানকর, মানরু, কোটা

৩০ নভেম্বর দিগ্‌নগর থেকে কোটা। জমি বেলে, কিন্তু সমতল। এখানে সেখানে ধানচাষেরই আধিপত্য। দিঘি কম। রাস্তা কোনোরকম যান চলাচলেরই উপযুক্ত নয়। দিগ্‌নগর থেকে দু-মাইল দূরে অভিরামপুর, সুয়াতা সেখান থেকে দু মাইল, আরও দু মাইল পরে জামতাড়া, তারপর মানকর। মানকর বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে চিনি তৈরি হয়। এখানে কুটির শিল্পের পদ্ধতিতে সকলে চিনি পরিষ্কার করে। এদের ঝোল আলাদা করার প্রধান উপায় হচ্ছে চাপ দেওয়া। কেলাসিত অংশ আপনা থেকে এক ধরনের লেই হয়ে উঠলে সহজেই শক্ত দলা দলা চিনি হয়ে ওঠে। তখন দুটি তক্তার মাঝখানে রেখে একখানা ভারি পাথর চাপানো হয় এবং কারিগর তার উপরে কুকুরের মতো উবু হয়ে বসে আর হুকো টানে। মানকরের পর মানরু। তারপর কোটা। কোটাও একটি সম্পন্ন গ্রাম।

পেরাল, কাঁকসা

পেরাল এবং কাঁকসা খুবই কাছাকাছি গ্রাম। এ অঞ্চল বর্ধমানের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই। কাঁকসায় একপাল মোষ চরছিল। জাকমঁ লোক পাঠালেন দুধের জন্যে। মোষের দুধ খেয়ে তাঁর মনে হল গরুর দুধের চেয়ে অনেক বেশি ঘন, খুবই সুস্বাদু : মোষের পাহারা দিচ্ছিল একটি অতিবৃদ্ধ। জাকমঁ দুধের দাম দিতে গেলেন। লোকটি নিতে চাইল না। অনেক অনুরোধেও সে অনড় হয়ে রইল। কিছু দিতে না পেরে জাকমঁ জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা মাংস খায় কিনা। লোকটা ঘাড় নাড়তেই জাকমঁ জলার ধারের একটি বক গুলি করে মারলেন। বকটা উপহার পেয়ে বৃদ্ধ উল্লসিত হল। হিন্দু রীতি অনুসারে রক্তপাত না ঘটিয়ে সে বকটার গলা টিপে মারল। মুসলমান চাপরাশিটি কিন্তু এ ধরনের উপহার পেলে তলোয়ার দিয়ে গলা কাটত, তারপর কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে দিত। তার হাতে কাটা কোনো পাখি হিন্দু কোনো ভৃত্য স্পর্শও করত না।

বিরিয়া, বাঁদরা, গোপালপুর, আরারা, কালীগঞ্জ

কাঁকসা পেরুতেই সামনেএক নতুন দৃশ্য। এক বিশাল অনুর্বর প্রান্তর, প্রায় ন্যাড়া বন্য চেহারা এবং তার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম শেষ হয়েছে বনে, ওটাই জঙ্গল। কৌতূহলের ঝোঁকে জাকমঁ ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন, পিঠে বন্দুক। যেন তিনি জীবনে এই প্রথম ভারতীয়

একটি জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের মোকাবেলা করবেন। কিন্তু বড়োই হতাশ হতে হল। বাঘ-ভালুকের বদলে কিছু প্রায়-উলঙ্গ লোক চরম প্রশান্তিতে গাছ কাটছে এবং গাড়িতে কাঠ বোঝাই করছে। সমস্ত গাছই মাথায় সমান এবং একই জাতের। একটা ফুল কি একটা শুকনো ফলও তাঁর চোখে পড়ল না।

এখান থেকে পথ বনের মধ্যে দিয়ে। বন না বলে একে বলা উচিত বনভূমি। পথের ধারের বালিতে বনময়ূরের পায়ের চিহ্ন। এই বনভূমিতে তারা বিরল নয়। হিংস্রজন্তুর তখনও পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন ওঠে না। জাকমঁর মনে প্রশ্ন জাগল হিংস্র জন্তুরা কেন এক জায়গায় আটকে থাকে, কেন বেরিয়ে আসে না। কারণ, যে ছোট্টো ঘাসের এলাকাটা বন আর ধানখেতে, চাষজমিতে আলাদা হয়ে আছে, তাতে গরুর পাল চরছে। পাহারাদাররা অস্ত্রহীন। কোনো দেশীয়ের বন্দুক নেই। কারুর আছে হয়তো একটা তলোয়ার কিংবা বর্শা।

বিরিয়া, বাঁদরা পেরিয়ে গোপালপুরের কাছে এক জায়গায়, যেখানে রাস্তার দুপাশেই বন, দেখা গেল বলদের দুটো কাফিলা চলেছে। তারা নিয়ে চলেছে তামার তৈরি বাসনপত্র। প্রতিটি বলদের গলায় বিরাট একটা ঘণ্টা এবং বেশির ভাগই অদ্ভুত করে সাজানো — বিশাল পালক, ছোটো ছোটো কড়ি দিয়ে পাড় দেওয়া টকটকে লাল শালুর ঢাকনা। সবই বাঘকে ভয় খাওয়ানোর জন্যে। তাঁর যে ঘোড়া কানের পাশে পিস্তল ফোটালেও ঘাবড়ায় না, এই দৃশ্য দেখে সেও ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, এগুতেই চাইল না। গোপালপুরে ভালো থাকার জায়গা সত্ত্বেও সেখানে থামা হলো না। দলবল এগিয়ে চলল।

আরারা খুবই ছোটো একটা গ্রাম। মাত্র কয়েকটি বাড়ি। গ্রামটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি এক শৈল পার্শ্বের পূর্ব ঢালে। এই প্রথম জাকমঁর চোখে ধরা পড়ল পূর্ব ভারতের ভূমির উচ্চাবচতা। এক পুকুরের পাড়ের উপর থেকে পাঁচ মাইল দূরের উচ্চতা তিনি চোখে দেখলেন। এক 'বাবু' সেখানে কিছু নীলের চাষ করেন। এখানে চাষবাস জঙ্গলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কালীগঞ্জ বেশ হীনদশাগ্রস্ত। লোক বাস করে এমন কুড়িটার বেশি কুঁড়েঘর নেই। বাজার নেই। যেখানে তাঁবু পড়ল, জায়গাটা নির্জন, ছবির মতো। চারপাশ ঘিরে শুধু গাছপালা আর ধ্বংসাবশেষ। সিপাইরা গ্রাম থেকে লোক ধরে নিয়ে এলো তাঁবু ফেলা, উনুন পাতার জায়গার জঙ্গল সাফ করতে।

আবহাওয়ার এক লক্ষণীয় পরিবর্তন বুঝতে পারলেন জাকমঁ। উত্তর থেকে হাওয়া বইছে, আকাশ মেঘশূন্য, রোদ উষ্ণ, রাতে অতিশয় ঠাণ্ডা। বাংলাদেশের শীতকাল। ইউরোপীয়দের কাছে অতি উপাদেয় ঋতু। সকালে ঘুম ভাঙলো ঠাণ্ডায়। চারধারে ঘন কুয়াশা, আকাশ পরিচ্ছন্ন। এই পরিবেশের সুযোগ নেওয়া হয় হুগলি অঞ্চলে বরফ তৈরি করতে গিয়ে। মুখ ও মাথা কাপড়ে ঢেকে ভোরের আলো-আঁধারিতে লোকজন রাস্তায় নামল। গ্রামাঞ্চলের লোক যারা কাস্তে দিয়ে ধান কাটে তাদের পিঠ, বুক, মাথা, পা সবই খোলা, কোমরে শুধুই এক টুকরো খাটো কাপড়, ঠাণ্ডায় কোনো কষ্ট পায় বলেই মনে হয় না। কিন্তু জাকমঁর মনে হল শীতবোধ এদের ঠিকই আছে। গায়ে দেবার মতো জামাকাপড়

থাকলে নিশ্চয়ই গায়ে দিত। এরা বড়োই গরীব। সাধারণ চালের মণ আড়াই টাকা, সকলেই বিবাহিত। সুবছরে এরা যা উপায় করে তা দিয়ে শুধু খেয়ে থাকা যায়, দুর্বছরে এরা মরে না খেয়ে।

হরিবাজার, পেগুরা, মহিষ কাপড়ি, বিজুপাড়া, ইছাপুর

অঞ্চলটা উঁচুনিচু হতে শুরু করেছে। কয়েকদিকে প্রসারিত দিগন্ত, অন্যদিকে দিগন্ত সীমাবদ্ধ। যতোদূর দৃষ্টি যায় প্রসারিত বনভূমি। তাদের চেহারা বিস্ময়করভাবে ইউরোপীয়। যেন হলফ করে বলা চলে ওকের কচি চারা আর অন্যান্য ইউরোপীয় গাছ। কিছু শুঁটিজাতীয় ও মিশ্রজাতের এবং দুটি সুন্দর জাতের রুয়োলিয়া, বিশল্যকরণী ছাড়া অন্য কোনো ফুল নেই।

গ্রামগুলো বনভূমির গভীরে, কিছু ধানখেত দিয়ে ঘেরা, গরু মোষ চারধারে যথেচ্ছভাবে ঘুরছে। হিংস্র জন্তুর ভয় নেই। গাছপালার চেহারা এ পর্যন্ত একরকম হলেও বেশ বিচিত্র। বৃষ্টিতে তৈরি কোনো কোনো ছোটো খাতের কংকর আলাদা হয়ে আছে। দূরে উপরেই দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে জমাট বাঁধা পিণ্ডাকারের এবং দানার আকারের স্তূপ লৌহঘটিত বস্তুর অনুপ্রবেশের ফলে লেপ্টে থাকা স্ফটিকের দানা। পুরোপুরি এইরকম পিণ্ডীকরণ চোখে পড়ে পণ্ডিচেরিতে পাহাড়ের নরম বেলে পাথরে।

বিজুপাড়ায় এসে জঙ্গল থকে বেরুলেন। পথ গিয়েছে এক বালুকাময় সমতলের মধ্যে দিয়ে। ইছাপুর পর্যন্ত কম উর্বর। মাটি ঢাকা শুধুই ছোটো ছোটো জৌলুষহীন গাছপালায়। একটা ছোটো দিঘি ছাড়া জলাশয়গুলো সবই তৈরি ইউরোপের মতো নাবালে বাঁধ দিয়ে। ইছাপুরে শ খানেক বাড়ি আছে এবং এই রাস্তার প্রতিটি গ্রামের মতো আমবাগান দিয়ে ঘেরা। চারধারের খেতগুলো দুর্ভেদ্য কাঁটাঝোপের বেড়ায় ঘেরা। গতকাল থেকে এই অঞ্চলে চোখে পড়ছে বাসক আর রক্তকরবী।

সুরপি, হুকেরা, চূড়া, কেন্দা

ঈষৎ উঁচুনিচু সমতল ভূমি বনজঙ্গলে পুরোপুরি ঢাকা। কংকরে গঠিত মাটি শুধু ছোটো বিরল ও শুকনো এক জাতের ঘাসের পুষ্টি জোগায়। জল ঠেকেছে জলাগুলোর তলায়। চারধারে ছোটো ছোটো ধান খেত। যে মাটি জল পেতে সক্ষম তাতেই শুধু চাষ হয়। গ্রামগুলো ঘিরে আম আর তেঁতুল গাছ।

সুরপিতে আশি থেকে একশোটা বাড়ি। কিন্তু এই বন্ধ্যা অঞ্চলের অন্যান্যদের মতোই গ্রামটি হীন দশাগ্রস্ত। এখানে একটা তেঁতুল গাছের ব্যাস প্রায় দশ মিটার। আগের মতোই মালবোঝাই ঘণ্টাবাঁধা বলদের একটি কাফিলা চোখে পড়ল। এদিকের লোকে বাঘকে ভয় করে বলে মনে হয় না। তবুও কিছু দেশীয় মাঠে যায় এক ধরনের অদ্ভুত ও কিম্ভুত একটা ছোটো কুড়ুল* নিয়ে।

---

* জাকমঁ এই অস্ত্রটির যে ছবি এঁকেছেন, তা থেকে বোঝা যায় এটি টাঙ্গি।

শুকনো মাঠে কিছু কিছু ছড়ানো ছিটানো গাছ পিপুল, বট এবং এক জাতের গাব। তাদের ছায়ায় এক জাতের কাঁটা ঝোপ। তাতে ফল বোঝাই। কেন্দাকে ঘিরে তিলের চাষ, কিন্তু বনভূমি শুরু হওয়ার পর থেকে সরষের চাষ নেই।

কেন্দায় মাথা গোঁজার জায়গা নেই। তাঁবু ফেলতে হল গ্রামের বাইরে। বড়ো বড়ো পিপুল গাছের নিচে একেবারে খোলা জায়গায়। উষর মাঠে কংকরের স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পিণ্ডীভূত গিরিমাটি, তাতে হামেশাই লেপ্টে আছে স্ফটিকের দানা।

পরিশিয়া, মঙ্গলপুর, রোনাই, কুমারবাজার, এগরা

৪ ডিসেম্বর কেন্দা থেকে সামান্য কিছু দূরে জাকমঁকে একটা খাত পেরুতে হল। লোকজন থেমে ছিল এক ঘণ্টারও বেশি। এখানকার গাড়িগুলো করোমণ্ডলের উপকূলের নৌকোর মতো দড়ি আর কাঠে তৈরি। তাতে এক টুকরোও লোহা নেই। ধুরোও কাঠের। কিন্তু খুবই শক্ত এবং কাজের উপযুক্ত।

কেন্দা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে পথের চিহ্ন নেই। দক্ষিণে দামোদরের দিকে ছেঁড়া ছেঁড়া হতশ্রী বন। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জঙ্গল সম্পর্কে লোকের যে ধারণা তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। তবু ওই জঙ্গলেই দরকার হলে ভালুক, চিতাবাঘ মিলবে।

কেন্দা থেকে এক মাইল দূরে পরিশিয়া। ইংরেজদের কাছে Purassee। এর কাছে পাঁচ কি ছয় মিটার উঁচু একটি টিলা, গোড়াটা গোলাকার, মাথাটা সমতল। এই খুদে পাহাড়টার ব্যাস প্রায় একশো তিরিশ মিটার। এটা স্পষ্টতই একটা দিঘির তোলা মাটি, দিঘিটা কয়েক হাত দূরে খোঁড়া গ্রামের সেচের জন্যে। টিলার উপরে ঘরবাড়ি কিছু নেই।

সেখান থেকে এক মাইল দূরে এক নদী। নদীর নাম সিঙারুন। দুই পাড় খাড়াভাবে বালিতে ধাপ কাটা। দুই পাড়ের দূরত্ব প্রায় তিরিশ মিটার। এখন জল কম, কিন্তু বর্ষায় দু-কূল ছাপিয়ে যায়। গাড়িগুলোর ধুরো পর্যন্ত বালির মধ্যে বসে গেল। সেখান থেকে আবার উঠে এক মাইল দূরে নদী পেরুতে হল মঙ্গলপুর গ্রামের কাছাকাছি এসে। নদীর জল টলটলে, খুবই স্বাদু।

মঙ্গলপুর এবং রোনাই (রোনাই গ্রামে মাত্র দু-তিনটি বাড়ি) গ্রামের মধ্যে মাটির উপরেই অঙ্গারীভূত বেলেপাথর চোখে পড়তে শুরু করে। কংকরে ঢাকা, কিন্তু অস্পষ্টভাবে, কোনো কোনো টিলার ঢালে এ অপর্যাপ্ত। রোনাইয়ের কাছে এই জিনিসটি মাটির উপরিতলেই ছোটো ছোটো স্ফীতি ঘটিয়েছে। এর দানা মিহি, গঠন ফলকাকৃতি কিন্তু স্তরবিন্যাস অস্পষ্ট। জায়গা অনুযায়ী এ খুবই নরম এবং খুবই শক্ত, রং ধূসর ও হলদেটে।

কুমারবাজারে শুধু একটা যেন তেন ভাবে তৈরি কুটির। কুমারবাজারের মাথায় উঠে জাকমঁ দেখলেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে রানীগঞ্জ থেকে লোক এসেছে। অবশেষে এখান থেকেই তিনি পাহাড় দেখতে পেলেন। পাহাড় উঠেছে রঘুনাথপুরের দিক থেকে। এখান থেকে দামোদর দেখা যায়, সাদা বালির বিস্তার। দেখতে সুন্দর, কিন্তু কোনো তালগাছের মাথা দেখা যায় না। জাকমঁর মনে হল তিনি যেন ইউরোপে চলে গেছেন।

দূর থেকে ধোঁয়া দেখেই বোঝা যায় কোথায় রানীগঞ্জ। সবাই মিলে এগরা পেরিয়ে এসে থামলেন রানীগঞ্জে।

রাণীগঞ্জ

রাণীগঞ্জে জাকমঁ ঘোড়া থেকে নামলেন কয়লাখনির ইউরোপীয় কর্মচারীর বাংলোর দরজায়। কয়লাখনির মালিক মিঃ আলেকজাণ্ডার। যাতে জাকমঁর ভালোভাবে দেখাশোনা হয় তার জন্যে মিঃ আলেকজাণ্ডার তাঁর বাঁকুড়ার সুপারিন্টেডেন্ট মিঃ চিককে খবর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে খবর এসেছে মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় জাকমঁরই এক সিপাইর মারফতে। তিনি কে তা সিপাইটি বলতে পারেনি, শুধু বলেছে একজন সাহেব। সেই অনুসারে একটি ঘর সাফসুরৎ করে রাখা হয়েছে।

এখানকার কর্তার নাম মিঃ বার্টন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এক পুরনো অফিসার। মনে হল তিনি অসুস্থ। সবে কলকাতা থেকে তাঁর বগি এবং আসবাবপত্র এসেছে, কিন্তু সব ভেঙে চুরমার উপস্থিত এক বিদেশীর পক্ষে বড়োই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। তবু মি. আলেকজাণ্ডারের চিঠি হাতে পেয়ে তাঁর মুখের গুমোট ভাব কাটল। তারপর থেকে যে পঞ্চাশ ঘণ্টা জাকমঁ রাণীগঞ্জে ছিলেন সে সময়ের মধ্যে গৃহস্বামীর আচরণ প্রশংসনীয়ই ছিল।

জাকমঁ আসার দুদিন আগে ন'জন ইউরোপীয়ের একটি দল এসেছিল বাঁকুড়া থেকে। তারা এসেছিল শিকার করতে, সঙ্গে এনেছিল আঠারোটা হাতি।

রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল দামোদরের বাঁ পাড়ে, বর্ধমান থেকে পঁয়ষট্টি মাইল দূরে, সাতদিনের রাস্তায়। এখানে জাকমঁ কয়লার খনির মধ্যে নেমে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।

কয়লাখনি ছাড়াও রাণীগঞ্জে জাকমঁর খুবই কৌতূহলের বস্তু হয়ে উঠেছিলেন মি. বার্টন লোকটি। এ ধরনের ইংরেজের সঙ্গে তাঁর কখনও পরিচয় হয়নি। তাঁর বৈশিষ্ট্য যাই থাক, ভাবভঙ্গি ছিল অতি স্থূল। তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ অদ্ভুত, জাকমঁ ইংরেজি জানলেও হয়তো তাঁর উচ্চারণেও ক্রুটি ছিল। কিন্তু উচ্চারণের অসুবিধার জন্যে দুজনের ভাব বিনিময়ের পক্ষে যতোটা না বাধা হয়েছিল, সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়েছিল ভাব ও ভাষার। মিঃ বার্টনের ভাব ও ভাষা ছিল অমার্জিত। যাই হোক, এ অঞ্চলে যে বাঘ আছে, মি. বার্টন তার জ্যান্ত প্রমাণ। তাঁর মুখে বাঘের থাবার আঠারোটা আঁচড়ের দাগ। গুলি করার আগেই বাঘটা তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এখানকার কেরানী একজন তরুণ ভারতীয়, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, নাম গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত। তরুণটি অসাধারণ ভদ্র, নম্র, বিনয়ী। সে চমৎকার ইংরেজি বলতে এবং লিখতে পারে এবং তার বড়ো কর্তার চেয়ে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ। তবু বড়ো কর্তার ঘরে ঢুকতে তাকে বাইরে জুতো খুলে রেখে আসতে হয়। তার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে জাকমঁর অনেক কথা হয়েছিল। ছোটোবেলায় পিতৃবিয়োগ হলে সে যখন খুবই দুরবস্থায় পড়েছিল, তখন সাহায্য পেয়েছিল রামমোহন রায়ের। তাঁর ইস্কুলে সে পড়াশুনা করেছিল। জাকমঁর বিশ্বাস যে দরিদ্র বলেই রামমোহন তাকে সাহায্য করেছিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। রামমোহনের প্রতি

গোবিন্দপ্রসাদের অশেষ শ্রদ্ধা। তার বিশ্বাস তিনি ইউনিটেরিয়ান হলেও খৃস্টান নন। পাদরি কেরির ইস্কুলেও সে কিছুদিন পড়েছিল শ্রীরামপুরে। কেরি তার চেয়েও ভালো বাংলা বলতে পারেন, তবে তাঁর উচ্চারণে কিছুটা বিদেশী টান আছে।

রাণীগঞ্জ ছাড়ার জন্যে জাকমঁ ঘোড়ায় উঠেছেন এমন সময় গোবিন্দপ্রসাদ ছুটে এলো হাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে, সে একটা সার্টিফিকেট চায়। জাকমঁ বহু বোঝালেন, সে যে ধরনের মানুষ, গায়ের রং তার যাই হোক, কেউ তার উন্নতি রোধ করতে পারবে না। অবশেষে ঘোড়া থেকে নেমে তিনি সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। কোনো ইংরেজ এই তরুণটির ভদ্রতা, দক্ষতা ও চরিত্রগুণ বোধ হয় লক্ষ্য করেনি, জাকমঁর আগে কেউ কখনও তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেনি। জাকমঁর মনে হল, এই তরুণটির বড়ো কর্তা ভারতে আভিজাত্যের মহিমা বজায় রাখতে রক্ষী ছাড়া এক পা চলেন না, অথচ তিনি কয়লা শ্রমিকের পোশাক পরে খনিতে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন — এ দুটোর পার্থক্য দেখে সে তাঁর সম্পর্কে কী অদ্ভুত ধারণাই না করবে।

রাণীগঞ্জের সামনে দামোদর প্রায় পাঁচশো মিটার চওড়া। জাকমঁ নদী পার হলেন, কিন্তু কোনোদিকেই জল বেশি নয়। জলের স্রোত বইছে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম থেকে পুব-দক্ষিণ-পুবে। এখন যে জলের স্রোত বইছে তা বেশ জোরালো এবং জলও টলটলে।

দামোদরের ডানপাড় বাঁ পাড়ের একেবারে বিপরীত। নদীর পাড়ের উপরের জমি সমতল, বালুকাময়, চাষের খেতে ঢাকা; যেখানে জমিতে চাষ নেই সেখানে সর্বত্র বাঘ-ভেরেণ্ডা গজায়। এটি সম্পূর্ণ দেশী গাছড়া।

দিন শেষ হল হাড়গাঁ গ্রামে পৌঁছে। সেখান থেকে বনের পথ। এ পথে নিয়মিত লোক চলে, কিন্তু সন্ধ্যায় ম্লান চাঁদের আলোয় সব কিছু মনে হয় নির্জন, নিঃসঙ্গ। একা একা ঘণ্টাখানেক দ্রুত চলার পর জাকমঁ দেখতে পেলেন একটা ফাঁকা জায়গায় তাঁর সাদা তাঁবুটা খাটানো রয়েছে। পাশে একটা তেঁতুল গাছের নিচে সবাই আশ্রয় নিয়েছে। সেদিনের মতো বিশ্রাম। দিনটি ১৮২৯ সালের ৬ ডিসেম্বর।

(ভিক্টর জাকমঁর ভারত ভ্রমণের দিন-পঞ্জী আয়তনে বিশাল। দিন-পঞ্জীটি ছাপা হয়েছিল ১৮৩৫-৪৪ সালে ছয় খণ্ডে। ভারত সম্পর্কে এতো বিরাট গ্রন্থ আর কোনো ইউরোপীয় পর্যটক লেখেননি এবং বিরাট ভারত-ভুখণ্ডের এতো বিস্তৃত অঞ্চলের পরিচয়ও কেউ দেননি। গ্রন্থটি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো ভাষায় অনূদিত হয়নি।)

আলোচ্য অংশে জাকমঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে কেবলমাত্র বর্ধমান জেলার অংশটুকুর সারবস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামের নামগুলো যতদূর সম্ভব আধুনিক করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু নামের উচ্চারণ হয়তো বিকৃতই থেকে গেছে, কারণ সে নামগুলোর আধুনিক উচ্চারণ জানার সুযোগ হয়নি। কলকাতা থেকে বেনারস পর্যন্ত জাকমঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ 'কলকাতা ছাড়িয়ে' নামে প্রকাশের উদ্যোগ করেছেন 'ধ্রুপদী' প্রকাশনা সংস্থা।

□ বর্ধমান রাজ কলেজ শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, ১৮৮১-১৯৮১ থেকে সংগৃহীত □

বর্ধমানের পুরানো কথা

সুকুমার সেন

বর্ধমান মানে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলাদেশের ইতিহাস সত্য করে লভ্য হয়েছে আজ থেকে দেড়-হাজার দু-হাজার বছর আগে থেকে। তার আগেকার খবর কিছু পাবার যো নেই। ভবিষ্যতে প্রত্নবস্তু পাওয়া গেলে তার উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া চলবে। আপাতত গুপ্ত রাজাদের শাসনকাল থেকেই বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতা খুলতে হয়।

তখন অর্থাৎ ৪০০ খ্রী. দিকে বাংলাদেশ দুটি বৃহৎ প্রদেশে বিভক্ত ছিল—উত্তর ও দক্ষিণ। প্রদেশ দুটির মধ্যেকার সীমারেখা ছিল ভাগীরথী। উত্তর প্রদেশের প্রধান নগর পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন থেকে সেখানকার প্রশাসনিক নাম হয়েছিল পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি। দক্ষিণ প্রদেশের প্রধান নগর (?) বর্ধমানের নাম অনুসারে এদেশের নাম হয়েছিল বর্ধমান ভুক্তি। ইতিহাসগ্রাহ্য দলিল পত্রে বর্ধমান-ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া গেল প্রথম ষষ্ঠ শতাব্দের একটি ভূমিদান পত্রে। কিন্তু তার আগেকার কথা কিছু বলা আবশ্যক।

বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশ ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে খুব পুরানো স্থান। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রত্ন-ইতিহাসের দিক দিয়েও এ অঞ্চলের প্রাচীনত্বের প্রমাণ মিলেছে। দুর্গাপুরের পশ্চিমে দামোদরের কাছে নাডহা গ্রামে এমন কিছু প্রত্নবস্তু মিলেছে যাতে করে মনে হয় এ অঞ্চলে আর্যভাষীদের আগমনের অনেককাল আগে থেকেই মানব বসতি ছিল। কিছু দিন আগে দুর্গাপুরের কাছে দামোদরের বাঁধের জন্য ভিত খুঁড়তে গিয়ে অনেক কিছু প্রত্নবস্তু মিলছে বলে শুনেছি। সেগুলির পরিচয় প্রকাশিত হলে এদেশের প্রত্ন-ইতিহাসের আরও কিছু মালমশলা হাতে আসবে বলে আশা করা যায়।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এ দেশের উল্লেখ নেই। অন্ততপক্ষে এদেশের যে নাম আমরা জানি তার উল্লেখ নেই। তবে অবর্চীন বৈদিক সাহিত্যে "বঙ্গ" জাতির উল্লেখ আছে। জৈনদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে ভগবান মহাবীরের "লাঢ়" (রাঢ়) দেশে ভ্রমণ প্রসঙ্গে যা "সুব ভ ভূমি" ও "বজ্জভূমি" বলে উল্লিখিত তা আমরা সুহ্মভূমি ও "বজ্রভূমি (বা বাহ্যভূমি") বলে মনে করি। সুহ্ম মোটামুটি আধুনিক বর্ধমান ডিভিসনের পুরানো নাম। বজ্রভূমি তা হলে এখনকার সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর (আগেকার ঝাড়িখণ্ড) হতে পারে। কিন্তু এখানে একটু বলবার আছে। "লাঢ়" যদি রাঢ় হয় তবে সে প্রসঙ্গে "সুহ্ম" "বজ্র" বিভাগ অসমীচীন। তবে যদি সুহ্ম মানে দক্ষিণ-রাঢ় আর বজ্র মানে পাহাড়ে অঞ্চল বোঝায় তা হলে চলে।

মোট কথা এটা ঠিক যে মহাবীর এদেশে এসেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে জৈনধর্মের বেশ প্রসার হয়েছিল। অনেকে মনে করেন বর্ধমান নামটিতে জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমানস্বামীর নামের স্মৃতি রয়েছে।

মহাবীর যে "লাঢ়" দেশে ভ্রমণ করেছিলেন সে লাঢ় গুজরাটের "লাট" নয়, বাঙ্গালার রাঢ়। মহাবীর উত্তরপূর্ব বিহারের লোক। তিনি প্রব্রজ্যা নিয়ে পূর্বভারতেই ভ্রমণ

করেছিলেন, ভারতবর্ষের অপরান্তে নয়। পাল রাজাদের সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে দুটি বিভাগের নাম পাওয়া যায়, উত্তর-রাঢ় এবং দক্ষিণ-রাঢ়। এই বিভাগের মধ্যেকার সীমারেখা কী ছিল তা ঠিক করে বলা যায় না। তবে আধুনিক কালে দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়ের ব্যবহারিক সংজ্ঞা বিচার করলে মনে হয় এখনকার অজয়ের উত্তরে উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণে দক্ষিণ-রাঢ়। কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে অজয়ের গতি-প্রকৃতি কিরকম ছিল তা জানা নেই। দামোদরের গতি-প্রকৃতি অনেকটা বোঝা যায় এখানকার ভূসংস্থান ও ছোটখাট শাখানদীর খাত অনুসারে। মনে হয়, তখন দামোদরই উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের ছেদ রেখা ছিল। সামাজিক খুঁটিনাটিতে ও কথ্য ভাষার ঢঙ থেকে দামোদরের-- এখনকার নয়, যখন দামোদর কালনার কাছ বরাবর গঙ্গার সঙ্গে মিশত, তখনকার দামোদরের-- দুতীরের পার্থক্য এখনও খুব দুর্লক্ষ্য নয়।

"রাঢ়" কথাটি অনেক পণ্ডিত জাতিবাচক বলে মনে করেন। কিন্তু রাঢ় নামে কোন জাতির খোঁজ পাওয়া যায়নি। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চোয়াড় জাতির সঙ্গে "রাঢ়" এই বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন।

অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥

উড়িয়া ভাষায় "রাঢ়" মানে বর্বর, নিষ্ঠুর। আধুনিক বাংলায় "রেঢ়ো" (রাঢ় অঞ্চলবাসী) শব্দটির অর্থও ভালো নয়। চৈতন্যের সময়ে রাঢ় দেশ বলতে উত্তর-রাঢ় বোঝাত এবং তখন এ অঞ্চল খুব সভ্য অথবা উন্নত বলে পরিগণিত ছিল না। নিত্যানন্দের জন্মভূমি বলে এবং চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভগবদ্‌ভক্তি বিহ্বল হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দিন কয়েক রাঢ় দেশে ঘুরেছিলেন বলে বৈষ্ণব কবিরা লিখেছিলেন, "ধন্য রাঢ় দেশ"। ইতিহাসে ফিরে আসা যাক।

বাঁকুড়ার অনতিদূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের উপর এক বিধ্বস্ত গুহার গায়ে তিন ছত্র পুরানো লেখা আছে। লেখার উপরে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রও আঁকা আছে। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুষ্করণার রাজা চন্দ্রবর্মা এই গুহা উৎসর্গ করেছিলেন। এই কথা লেখা আছে। পশ্চিমবঙ্গে এইটি সবচেয়ে প্রাচীন দলিল। অক্ষরের ছাঁদ দেখে মনে হয় ৩৪০ থেকে ৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল। চন্দ্রবর্মার রাজধানী পুষ্করণা এখন পোখরনা-পলাশডাঙ্গা গ্রাম, দামোদরের দক্ষিণ তীরে, শুশুনিয়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরে।

তারপরে যে ঐতিহাসিক দলিল মিলছে তা প্রায় দেড়শ-দুশো বছর পরেকার। প্রায় বছর তিরিশ আগে গলসী থানার মল্লসারুল গ্রামে পুরানো পুকুর সংস্কার করতে গিয়ে একখানি উৎকীর্ণ তাম্রফলক পাওয়া যায়। এটি এক নবাগত ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের পাট্টা। ভূমি দিচ্ছেন মহারাজ বিজয়সেন, মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের 'উপরিক' অর্থাৎ মহাসামন্ত। বাংলা দেশে গুপ্তরাজাদের অধিকার লুপ্ত হলে পর স্থানীয় একাধিক স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গোপচন্দ্রও এইরকম একজন বড় রাজা। তবে এঁর রাজ্যসীমা সঙ্কীর্ণ ছিল না। কেননা ফরিদপুরেও এঁর অধিকারের সাক্ষ্য সূচক তাম্রপট্টলিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু ছোট রাজা বিজয়সেনের কোন কিনারা হচ্ছে না। মনে হয় এঁর বংশ বেশ কিছুকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গে

-- বর্ধমানের পশ্চিম ও উত্তর অংশে--রাজত্ব করেছিল এবং হয়তো এই বংশেরই নাম অনুসারে সেনভূম পরগণার নাম। এমনও সম্ভব যে একাদশ শতাব্দীর শেষে যে বিজয়সেন (হেমন্তসেনের পুত্র, সামন্তসেনের পৌত্র) পাল রাজাদের পর প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের অধিকার পেয়েছিলেন তিনি এই বংশেরই সন্তান। মঙ্গলকোটে সুলতান হোসেন শা নির্মিত পুরানো মসজিদের দেওয়ালে গাঁথা এক পাথরের টুকরোয় যে "শ্রী চন্দ্রসেন নৃপতি" লেখাটুকু পাই তা লক্ষ্মণসেন ও তৎপুত্রের পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যভ্রংশের পরে খ্রী. ত্রয়োদশ শতাব্দে বর্তমান এই বংশের কোন স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন ছোট রাজা হওয়া অসম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ যে এক দিনেই তুর্কী অধিকারভুক্ত হয়ে যায়নি -- তার এক প্রমাণ এই খণ্ডিত লিপিটুকু।

মল্লসারুল তাম্রপট্ট থেকে সেকালের টুকিটাকি কথা কিছু জানতে পারি। প্রথমত, সেকালের রাজারা জমির মালিক ছিল না। জমির মালিক ছিল দখলদার, কিন্তু ভূমি হস্তান্তর করতে হলে অনুমতি লাগত বীথী-অধিকরণের অর্থাৎ স্থানীয় পঞ্চায়েতের। এইখানে সেকালের প্রশাসনিক ভূমিবিভাগের কথা বলা প্রয়োজন। দেশ বলতে "ভুক্তি"। ভুক্তি কয়েকটি "বিষয়" বা "মণ্ডল" -এ বিভক্ত। বিষয় বা মণ্ডল আমাদের জেলার মত। তারপর "বীথি" আমাদের সাবডিভিসনের মত। শেষের দিকে বীথীর স্থানে "চতুরক" (অর্থাৎ চৌকি) পাওয়া যায়। আলোচ্য দলিলে রাজা বিজয়সেন টাকা দিয়ে আট বিঘা জমি কিনে নিয়ে 'বহ্বৃচ' অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে দিচ্ছেন যাতে তিনি নির্বাধে পঠন-পাঠন-যজন-যাজন-অতিথিসৎকার ইত্যাদি ব্রাহ্মণোচিত কাজে নিয়ত থাকেন।

দ্বিতীয়ত, সেকালের দেশশাসন ও রাজস্বসংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অনেক পদবীর উল্লেখ। এর মধ্যে কিছু কিছু পদ আছে যার উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া যায়নি। যেমন, "কার্তাকৃতিক", "ঔর্ণস্থানিক", "হিরণ্যসামুদায়িক", "পত্তলক", "আবসথিক", "দেবদ্রোণীসম্বন্ধ"। কার্তাকৃতিক --- যিনি কৃতকে অকৃত করতে পারেন অর্থাৎ Appellate Authority-ঔণস্থানিক যিনি ঊর্ণস্থানের (যেখানে পশমের বা রেশমের সূতা উৎপন্ন বা বিনিময় হয়) অধ্যক্ষ। (এ শব্দটির আসল অর্থ ও তাৎপর্য ঐতিহাসিকরা এখনও লক্ষ্য করেন নি। এদেশে সিল্কের চাষের প্রাচীনত্ব এবং তাহাতে রাজস্ব উৎপত্তির ইঙ্গিত এখানেই পাচ্ছি। ঔর্ণস্থানিক তাহলে -- Superintendent of Silk Production and Marketing)। তখনকার দিনে নদীর বালি থেকে সোনা সংগ্রহ করা হত। যিনি বা যাঁরা সেই ব্যাপারে রাজার বা অধিকরণের তরফে অধ্যক্ষতা করতেন তিনি বা তাঁরা 'হিরণ্য সামুদায়িক' বলে মনে হয়। পত্তলক বোধ হয় গুজরাটি পটেল, গ্রামের বা বীথীর Notary। আবসয়িক বোধ হয় বাসিন্দা ব্রাহ্মণদের নেতা। দেবমন্দিরের সম্পত্তির যিনি তদারক করতেন সেই কর্মচারীই সম্ভবত দেবদ্রোণীসম্বন্ধ বলে উল্লিখিত।

তৃতীয়ত, কয়েকটি উপাধি বা পদবী থেকে তখনকার ভদ্রলোকের কাজের বা জীবিকার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 'অগ্রহারীণ' যিনি রাজপ্রদত্ত ভূমি (অগ্রহার) ভোগ করতেন। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন, অব্রাহ্মণও আছেন। 'খাড়্গি' বোধ হয় সেনানায়কের পদবী। 'বাহনায়ক' যিনি বণিক-সার্থবাহের নেতা।

চতুর্থত, কতকগুলি গ্রামের নাম পাচ্ছি যে নামের গ্রাম এখনও পর্যন্তও রয়েছে। যেমন 'গোধগ্রাম' পরে গোহগ্রাম, আধুনিক গোঁগা (গুহগ্রামরূপে সংস্কৃতায়িত)।
'বক্কত্তক' (> বক্কত্তঅ), আধুনিক বাক্‌তা।
'কোড্ডবীর' (> কোড্ডইর), আধুনিক কোড্ডে।
'অধকরক' (> অদধঅরঅ), আধুনিক আদ্‌রা।
'কপিস্থবাটক' (> কইত্থআডঅ), আধুনিক কইতাড়া।
'মধুবাটক' (> মহুআডঅ), আধুনিক মওড়া।
'খণ্ডজোটিকা' (> খাণ্ডজোডিঅ), আধুনিক খাঁড়জুলি।
'শাল্মলিবাটক' (> সিম্মলিআডঅ) আধুনিক সিমলাড়া (সিমলুড়)।
'বিন্ধ্যপুর' (> বিঞ্জউর) আধুনিক বিজুর।

পঞ্চমত, প্রদত্তভূমির চৌহদ্দি ঠিক করে দেওয়া হত মাপজোপের পর এখনকার মতই কীলক (pillar) গেড়ে। বৎসস্বামীকে যে ভুঁই দেওয়া হয়েছিল তার কীলকে পদ্মবীজের মালা আঁকা ছিল।

মল্লসারুল শাসনপট্টের পরে এদেশের যে দলিল মিলেছে যেগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দের, সেন রাজাদের দেওয়া ভূমিদানপত্র। ইতিমধ্যে রাঢ়দেশে স্থানে স্থানে, বিশেষ করে বর্ধমান বীরভূম ও হুগলী জেলায়, শাস্ত্রাধ্যায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁরা ধীরে ধীরে ধনে মানে ক্ষমতায় দশের ও দেশের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। রাজশক্তিকে তাঁরা ইচ্ছামত পরিচালিত করবার শক্তিও লাভ করেছেন। রাঢ়ের ব্রাহ্মণের এই মর্যাদা বাংলা দেশের অন্যত্র এবং বাংলার বাইরেও স্বীকৃত হয়েছিল। কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে দক্ষিণরাঢ়ীর ব্রাহ্মণদের কুলগর্বের প্রতি বক্র কটাক্ষপাত আছে। মল্লসারুল তাম্রপট্টে শ্রীবর্ধমানভুক্তির বিশেষণ আছে। 'সততধর্মক্রিয়া বর্ধমানা"। সেন রাজারা রাঢ়ের লোক। বংশের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ও স্বদেশের গুণবর্ণনায় বল্লালসেন তাঁর এক ভূমিদানপটে (কাটোয়ার কাছে ঝামটপুরের পাশে নৈহাটীতে প্রাপ্ত) বলেছেন অর্থাৎ তাঁর সভাকবিকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন-এই কথা।)

বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্যানিরূঢ়ি -
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতগুণৈ র্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ
শশ্বদ্‌বিশ্বাভয়বিতরণস্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ
কীর্ত্যুল্লোলৈঃ, স্নপিতবিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ।

অর্থাৎ-তাঁর (চন্দ্রের) উন্নতিশীল বংশে রাজপুত্রেরা (রাউতরা) জন্মেছিলেন। সদাচারচর্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ প্রখ্যাত রাঢ়াকে তাঁর অসম্ভাবিত গুণ ও চারিত্র্য দ্বারা ভূষিত করেছেন। বিশ্বে সতত অভয় বিতরণে অকৃপণতার জন্য তাঁরা যশস্বী। তাঁদের কীর্তিসমুদ্রের ঢেউ আকাশকেও ধুয়ে দিয়েছে।

গুপ্ত রাজাদের সময় থেকে পাল রাজাদের সময় পর্যন্ত উপনিবেশী ব্রাহ্মণদের গঙ্গাতীরে বাস করবার দিকে প্রবল কোন ঝোঁক দেখা যায়নি। গঙ্গার বা অন্য নদীর কাছাকাছি

অথচ তীর হতে একটু দূরে তাঁদের উপনিবেশ হত। তার কারণ বোধ হয় বন্যার উপদ্রব। সেনরাজাদের সময়ে বোধ হয় গঙ্গা ও দামোদরের উপদ্রব অনেকটা সংযত হয়েছিল এবং বর্ধমান ডিভিসনের নদী-সংস্থান অনেকটা স্থিরত্ব পেয়েছিল। ইতিমধ্যে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্রাহ্মণ্যমতের প্রভাব জনগণের মনে দৃঢ়তর হয়েছে। তার ফলে গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং গঙ্গাতীরবাসের মর্যাদা বেড়েছে। বোধ করি এইসব কারণে (এবং গমনাগমনের সুবিধার জন্য) গঙ্গাতীরবাসের দিকে ব্রাহ্মণদের বেশি ঝোঁক পড়েছিল। বল্লালসেন অনেক সদাচারী ব্রাহ্মণকে গঙ্গাতীরে বাস করিয়েছিলেন। ব্যারাকপুরে প্রাপ্ত তাঁর তাম্রপট্ট থেকে জানতে পারছি যে রাজমহিষী বিলাসদেবীর তুলা- পুরুষদানের দক্ষিণারূপে ভাটপাড়ায় ("শ্রীপৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি খাড়ীবিষয়ে ঘাসসম্ভোগ ভাট্টবড়া গ্রামে") উদয়করদেবশর্মাকে ভূমিদান করেছিলেন। মুসলমান-অধিকার শুরু হবার পরেও একজন রাজা, দনুজমর্দন, একাধিক প্রবীণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে গঙ্গাতীরে বাস করিয়েছিলেন।

রাঢ়ের অনেক পুরানো গ্রামের ঐতিহ্যে প্রাচীন দেবতার স্মৃতি বিজড়িত। সেকালে দেবদ্বিজ নিয়েই ছিল গ্রামের মর্যাদা। দ্বিজের সন্ধান পাই ভূমিদান-পত্রে আর রাঢ়ী বামুনের "গাঁই" নামে যা প্রায়ই পদবীতে পরিণত। অনেক গাঁয়ে দেবতা এখনও আছেন, অনেক গাঁয়ে না থাক্‌লেও নামে বা স্মৃতিতে রয়েছেন, আবার কোন কোন গাঁয়ে স্মৃতিটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে। এমনি লুপ্তস্মৃতি দু-একটি গ্রামের নাম ও গ্রামাধিষ্ঠিত দেবতার ছবি মিলেছে অতর্কিতভাবে। নেপালে পাওয়া কয়েকটি অতি প্রাচীন (খ্রি. একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে লেখা) বৌদ্ধ মহাযান শাস্ত্রের পুঁথিতে স্থানীয় বৌদ্ধ দেবদেবীর ও পীঠের নাম ও চিত্র আছে। তার মধ্যে রাঢ়ে পাই -- কন্যারাম, রামজাত ও বৈত্রবনা গ্রামে লোকনাথ, তাড়িহা গ্রামে তারা, অনুল্লিখিত গ্রামে ধর্মরাজিক চৈত্য, আর লুতু গ্রামে বজ্রাসন। এসব গ্রাম আছে কিনা জানি না। হয়তো কোন কোন গ্রামের সঙ্গে নামে মিলবে। কিন্তু এখনো যেমন তখনও তেমনি একাধিক গ্রামের একই নাম।

দু-একটি প্রাচীন দেবতার খোঁজ যে পাওয়া যায় নি এমন নয়। তুর্কী অভিযানের মুখে সেকালের কোন সমৃদ্ধ দেউল-দেহারা পরিত্রাণ পায়নি। ত্রিবেণীর নিকটে সপ্তগ্রামের কাছাকাছি কোন স্থানে বিরাট দেবমন্দির ছিল, তার কোন চিহ্ন এখন নেই, তবে তার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে ওখানকার একটি প্রাচীন সমাধিসৌধের গায়ে। পুরানো দেবমন্দিরের গায়ে কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা বর্ণনাময় প্রস্তরচিত্র ছিল। সে পাথরগুলিকে মূর্তি চেঁচে ফেলে দেয়াল গাঁথার কাজে লাগানো হয়েছিল। যে মূর্তিগুলির নীচে চিত্র-পরিচয় লেখা ছিল সেগুলি সব চেঁচে ফেলা হয় নি। তার থেকেই বোঝা গেছে যে মন্দির ভেঙে পাথর নেওয়া হয়েছিল। মনে হয় এই মন্দির বিষ্ণু-মন্দির ছিল এবং তাতে আদিবরাহের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরও মনে হয় লক্ষ্মণসেনের প্রধান সভাকবি ধোয়ী তাঁর পবনদূতে সে কথা বলে গিয়েছেন।

তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সাক্ষাৎ বসতি কমলাকেলিকারো মুরারি ঃ।

অর্থাৎ—সেখানে সেনবংশভূপতি যেন সাক্ষাৎ কমলাপতি দেব মুরারিকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের প্রতিষ্ঠিত আদিবরাহের দেবরাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মহাসামন্তচূড়ামণি বটু দাস। এঁর পুত্র শ্রীধর দাস যে কবিতা-সংকলন বইটি করেছিলেন সদুক্তিকর্ণামৃত নামে, তাতে আদিবরাহের সেবক বটু দাসের প্রশংসা আছে। সে প্রশংসা-শ্লোকও সমসাময়িকদের রচনা। তার মধ্যে একজন বিখ্যাত কবি মহামন্ত্রী উমাপতি ধর আর একজন ধর্মাধিকরণিক মধু।

যে গ্রামীণ সংস্কৃতি বাংলা দেশকে অন্যান্য প্রদেশ থেকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র করেছিল তার একটা বিশেষ প্রকাশ দেখি গ্রাম্যদেবতার প্রাধান্যে। একদা পশ্চিমবঙ্গে এমন সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল না যেখানে কোন গ্রামদেব বা গ্রামদেবী (অথবা গ্রাম দেব ও দেবী) গ্রামের অধিদেবতা বলে গণ্য না হতেন। এখন এই ব্যাপার শুধু বর্ধমান বিভাগের কোন কোন গ্রামে দেখা যায়। রাঢ়ের গ্রামের অধিদেব ছিলেন ধর্ম (ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুর) আর অধিদেবী ছিলেন তাঁর সঙ্গিনী যিনি নানাস্থানে নানারূপ নানা নাম ধরে আছেন--কোথাও কেতকা, কোথাও বহুলা, কোথাও বাসুলী বা রঙ্কিণী, কোথাও চণ্ডী বা ষষ্ঠী কোথাও মনসা বা বিশালাক্ষ্মী। একদা ধর্মরাজই প্রধান গ্রামদেব ছিলেন (এবং কোন কোন গ্রামে এখনও আছেন), কেননা তিনি রাজশক্তির প্রতীক । এই প্রসঙ্গে মল্লসারুল তাম্রপটের আর একটি বিশেষত্বের কথা মনে পড়ে গেল। তাম্রপটের উপরে মহারাজা বিজয়সেনের সীল আছে। সেই সীলে যে মূর্তি আঁকা আছে তাহা ঐতিহাসিকরা বৌদ্ধদেবতা অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি বলে মনে করেন। আমি অন্যত্র দেখিয়েছি যে তা নয়, মূর্তি ধর্মের। তাম্রপট্টে প্রথম শ্লোকে এই ধর্মঠাকুরেরই বন্দনা আছে। ধর্মঠাকুরের মূর্তিকে সীল রূপে ব্যবহার করায় এদেশে পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুরের প্রভাব প্রতিপত্তির ঐতিহাসিক সমর্থন রয়েছে।

ধর্মপূজার প্রধান পীঠস্থান বর্ধমান জেলা যার মাঝখান দিয়ে দামোদরের প্রাচীন ও নবীন খাতগুলি বয়ে গিয়েছে। ধর্মঠাকুরের উপাসকদের কাছে দামোদরের মাহাত্ম্য গঙ্গারও বাড়া। তাঁরা বলেছেন, "সত্যের গঙ্গা দামোদর", "আদ্যের গঙ্গা দামোদর"। ধর্মপূজার ঐতিহ্যে যে বল্লুকা নদীর কথা পাই সে তো দামোদরেই প্রাচীন খাত। এই প্রাচীন খাতের উপরেই হাজার বছর আগেকার বর্ধমান শহর ছিল। ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন অনুসরণ করে সে বর্ধমান শহর এখন বড়োয়াঁ গ্রামে পরিণত। এইখানে প্রাচীন বল্লুকানদীর তীরে ধর্মঠাকুরের বিখ্যাত মন্দির ছিল। এই স্থানকে লক্ষ্য করেই ধর্মঠাকুরের উপাসকেরা বলে গেছেন,

বর্ধমান দেশ ভাই সবাকার নাভি।

ধর্মঠাকুরের কামিনী কেতকা-মনসারও প্রধান পীঠস্থান বর্ধমান। আমি চম্পাইনগর কসবার কথা তুলছি না। চাঁদো-বেহুলার স্মৃতিকল্পনা বাংলা-বিহার-আসামের অনেক স্থানেই জাগাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সব মনসামঙ্গল কাব্যেই বেহুলার ভাসানের যে যাত্রাপথ বলা হয়েছে তা দামোদরেরই পুরানো খাত অনুসরণে। স্থানে স্থানে এই খাত-পরম্পরার বিভিন্ন নাম-খড়ি, বাঁকা (বাঁকা দামোদর), ভালকো (বল্লুকা), বেউলো (বল্লকার রূপান্তর) ইত্যাদি। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে বাঁকা-ভালকোর উপরে অথবা আশেপাশেই মনসাপূজার আধুনিক

পীঠস্থানগুলি অবস্থিত। যেমন -- কেজ্যা, মণ্ডলগ্রাম, হাসনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা ইত্যাদি। এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে এখনও মনসার (জগৎগৌরী নামে) পূজা গ্রামের প্রধান উৎসব রূপে গণ্য। একদা মনসার ঝাঁপান বর্ধমান জেলার প্রায় সর্বত্র একটি প্রধান গ্রাম-উৎসব ছিল। দেড়শ-দু'শ বছর আগেকার একটি ঝাপান মেলার বর্ণনা আছে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীতে। জৌগ্রামের কাছে এই ঝাঁপান মেলা বসত। হাওড়া বর্ধমান রেলপথে এইখানে কিছুদিন আগে স্টেশন খোলা হয়েছে, তার নাম ঝাঁপানডাঙ্গা। সুপ্ত স্মৃতি গ্রামের নাম নিয়ে বেঁচে ছিল, এখন টাইমটেবলে উঠে স্থায়ী হল। চিরস্থায়ী বলতে ভরসা হয় না, যে গতিতে এখন ঘনঘন স্থান নাম বদ্‌লাচ্ছে। রাঢ়ের প্রাচীন স্থাননামে পুরানো দেবতার স্মৃতি ক্রমশ ঝাপসা হতে হতে এখন বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। ইঁদাস নাম ধরে এখন কে ইন্দ্রাবাসে পৌঁছবে ভাষাতাত্ত্বিক ছাড়া? ধর্মের দেহারা ছিল বলে গ্রামের নাম হয়েছিল "ধর্মবাস", এখন হয়েছে ধামাস। নামটি থেকে এখন ধামা মনে পড়ে, ধর্ম নয়।

গ্রামদেবদেবী ও তাঁদের বাৎসরিক ও সাময়িক উৎসবের অনুষ্ঠান উপলক্ষ করেই এ দেশের লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ধর্মের গাজন, মনসার ঝাপান, চণ্ডীর ব্রত, শিবের চড়ক— এই সব উৎসব উপলক্ষে সেকালে যাত্রা নাটগীত হত এবং তাতে গ্রামে সর্বসাধারণের সমান অধিকার থাকত। যাঁরা নাটগীত করতেন তাঁরা বন্দনায় স্থানীয় দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নতি জানাতেন। যে গ্রামে গাওনা হত সে গ্রামের দেবতাকে অবশ্যই বন্দনা করতে হত, যেখানে গান হত সেখানের ঠাকুরকে তো বটেই। গায়কদের নানা স্থানে গাওনায় যেতে হত, তাই তাঁদের বাঁধাবন্দনা পালায় দেশের প্রায় সব জাগ্রত স্থানীয় দেবদেবীর নামমালা গাঁথা থাকত। একে বলা হত দিক্‌বন্দনা। প্রাচীন পুঁথির দিগ্ বন্দনা থেকে লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় দেবদেবীর পরিচয় সূত্র এবং তা অনুসরণ করে ইতিহাসের খাদ্য উদ্ধার করা এখনও সম্ভব।

আমাদের সেকালের কবি-গায়কেরা দিগ্‌বন্দনায় মুসলমান পীরদেরও উপেক্ষা করেন নি। বাংলাদেশের দুটি প্রাচীন ও প্রধান পীরস্থান এই রাঢ় দেশেই। একটি পাণ্ডুয়ায় সুফীখাঁর দরগা আর একটি আরামবাগে পীর ইস্‌মাইলের দরগা। আগে আরও কিছু দরগা ছিল, তার মধ্যে একটি শিলিমপুরে বারা খাঁর দরগা। বলা বাহুল্য দরগাগুলি সব সমাধিস্থান। দিক্‌বন্দনার কিছু নমুনা দিই —

বর্দ্ধমানে বন্দো দেবী সর্বমঙ্গলা
অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুর বেলা।
মাথায় মল্লিকা চাঁপা সাজানো প্রচুর
আদ্যের দেহারা মায়ের বন্দো বিক্রমপুর।
রাজবলহাটে বন্দো শ্রীরাজবল্লভী
গায়ের বরণ যেন বৈকালের রবি।
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে পারি
আম্বুয়ার ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী।
কালীঘাটের কালী বন্দো বেতাতে বেতাই

একমন হয়ে বন্দো আমতার মেলাই।
বন্দনা বন্দিতে ভাই না করিহ হেলা
জুঝাটির ধর্ম বন্দো খাজুরের তলা।
বন্দিব বড়খাঁ গাজী রিসিবাটি গাঁ
নিজবাটী বন্দিব পেঁড়োর শুভি খাঁ।
ত্রিপিনির ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী
তাহার মোকামে বন্দোষোল শয় কাজী।
জাড়গ্রামের কালুরায় বন্দো সাবধান
গবপুরে বন্দো বাপা স্বরূপনারায়ণ।
রামনাম স্মঙরণে উদ্ধার হয় জীব
জোড়হাথে বন্দ্যা গাইব তাড়েশ্বরের শিব।
কোটশিমূলে বন্দি গাইব ঘোড়া সহিদ পীর
যার নাম স্মঙরণে রণে হয় বীর।
গোতানের বটেশ্বরীর বন্দিনু চরণ
অগ্নিমুখা হর বন্দো বাসা পলাশন।
কামালপুরে বন্দিয়া গাইব চন্দ্রমুখী
জলের ভিতরে দেবী জ্বলে ধিকি ধিকি।
পীর পাগাম্বর বন্দো আছে যতগুলি
মান্দারন গড়েতে বন্দিব পীরিসমালি।

স্থানীয় দেবদেবীর এই নাম গ্রহণ রাঢ়ের ধর্মমঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল গায়ক-কবিদের বড় বিশিষ্টতা। ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি দুজনই--রূপরাম চক্রবর্তী ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দক্ষিণ রাঢ়ের এবং বর্ধমান জেলার লোক।

কোন কোন গ্রামদেবতার পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন অনেক ব্যাপার লুকিয়ে আছে যা ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কিছু সমস্যা পূরণ করতে পারে। ক্ষীরগ্রামের দেবী খুব প্রাচীন। এখানে যে প্রাচীন মন্দির ছিল তার যৎকিঞ্চিৎ ধ্বংসাবশেষ মাত্র আছে। সম্প্রতি নবদ্বীপ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে ক্ষীরগ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য বর্ণনা উপলক্ষ্যে যোগাদ্যার পূজাবিষয়ে লিখেছেন-- 'অদ্যাপি ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যাবাটীতে প্রতি সংক্রান্তির সন্ধ্যায় দেবীর আরতির পর একটি অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে বলে গুয়া ডাকা। মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ একটি ক্ষুদ্র বেদীতে ঘটস্থাপন করিয়া পুরোহিতের ও যুগাদ্যাবাটীর ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচাবীর (দারোগা) সাক্ষাতে মালাকর পান ও সুপারি লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্লুতস্বরে ডাকে —"ফোপল মশায়ের গুয়ো" "ভরতদত্ত শাশমল্লের গুয়ো" "নাসগাঁয়ের আগুরি কেউ আছো" "কোলগাঁয়ের আগুরি কেউ আছো" "কুড়মুনের আগুরি কেউ আছো।" এই রূপে কুসুমগ্রাম, এড়োর ও মাঝগাঁয়ের আগুরিদের আহ্বান হয়। এমনিভাবে আহ্বান করে পান-সুপারি দেওয়া সেকালের

সম্ভ্রান্তসভায় সম্মান দেখাবার এক পদ্ধতি ছিল। (কাউকে কোন গুরু কার্যের ভার দিতে হলে তার হাতে পান-সুপারি দেওয়া হত)। তাই চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেবতা যখন হনুমানকে রাতারাতি দেউল তুলে দিতে আদেশ করছেন তখন তাকে পান বা পান সুপারি দিচ্ছেন। যে সব ব্যক্তির বা পদের নাম করা হয় তাঁরা একদা পূজা অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন। আশে পাশের গ্রামের অগ্রহার-ভোগীদেরও কাজের ভার দেওয়া হত। এবং সেইজন্যে সম্মান দেখানো হত। এখন কাজও নেই সম্মানও নেই, আছে গুয়া ডাকা, এখন তার অর্থও কিছু নেই।

যোগাদ্যার বাৎসরিক পূজায় একদা নরবলি দেওয়া হত। বৈশাখ মাসে বা তার আগে গাঁয়ে কোন অজানা অতিথি বা বেজানা লোক এলে তাকে খুব আদর যত্ন করে রেখে দেওয়া হত। সে ব্যক্তি ব: ব্যক্তিরা হত "মেরেয়া" অর্থাৎ নরবলির পশু। শুনেছি ক্ষীরগ্রামে বৈশাখ মাসে আত্মীয় কুটুম্ব বা অতিথি এলে যেতে দেওয়া হয় না। এ ব্যবহারে মেরেয়ারই স্মৃতিরেশ কালোচিত পরিবর্তন পেয়েছে।

ক্ষীরগ্রামের নিকটস্থ মাঝিগ্রামেও একটি কৌতুহলদ্দীপক ব্যাপার হয় গ্রামদেবতার বার্ষিক অনুষ্ঠানে। এখানে প্রধান গ্রামদেব 'দেউল-ঠাকুর' অর্থাৎ ধর্ম। এখন ভাঙ্গা দেউলের স্তুপের উপর বিরাজ করে এই নাম সার্থক করেছেন। প্রধান গ্রামদেবী শাকম্ভরী --- আসলে মনসা। এখানকার বার্ষিক পূজার মধ্যে একটা প্রধান অনুষ্ঠান হচ্ছে দেব-দেবীর বিবাহ। সে বিবাহ অনুষ্ঠান অর্ধপথেই রয়ে যায়। এর মধ্যে কী যে ইতিহাস লুকানো আছে বুঝতে পারি না। গভীর রহস্যও থাকতে পারে।

□ বর্ধমান সম্মিলনী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৩৬৪ □

কংকালেশ্বরী দেবীর মূর্তি

কংকালেশ্বরী কালীবাড়ি, কাঞ্চননগর, বর্ধমান

বর্ধমানের প্রত্ন নিদর্শন

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। একথা সমগ্র দেশের পক্ষে যেরূপ প্রযোজ্য; অনুরূপভাবে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যায়। উপাদানের অভাবে প্রামাণ্য আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ। বর্ধমান জেলার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান এখনও পর্যন্ত বহুলাংশে অনাবিষ্কৃত থেকে যাওয়ায় এই জেলার প্রত্ন-ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে কোন ইতিহাস রচনার উপাদানগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা -- সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সমূহ উৎখননের দ্বারা ভূস্তরের অভ্যন্তরভাগে আবিষ্কৃত পুরাবস্তুর বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন কালের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সমূহ কয়েকটি শ্রেণী বিন্যাসে বিভক্ত, যথা --

১। প্রাচীন অধিবসতির নিদর্শন ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি;

২। আবিষ্কৃত নরকঙ্কাল ও করোটি দৃষ্টে নরগোষ্ঠীর পরিচয় ;

৩। শিলালেখ ও তাম্র শাসন অর্থাৎ লেখমালা ;

৪। প্রাচীন মুদ্রা ;

৫। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ;

বর্ধমান জেলার ভূমি বিন্যাস ও জনজীবনের অধিবসতির ক্ষেত্র সুপ্রাচীনকালে গড়ে উঠে ছিল। সে কারণে নব্য প্রস্তর যুগ হতে শুরু করে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী, তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্বভারতীয় মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে মিশে গেছে। তবে একটা কথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, বিচ্ছিন্ন ভাবে এই জেলায় কোন সভ্যতার নিদর্শন বা মানব জাতি গড়ে উঠে নাই। রাঢ়, কলিঙ্গ ও মগধে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও তার বিশ্লেষণ হতে জানা যায় যে, ধাতু যুগের পূর্বে এই বিরাট অঞ্চলে কৃষিজীবী মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। বৃহত্তর রাঢ়ের লালজনা, সিজুয়া, বীরভানপুর, তুলসীপুর, মহিষদল, ডিহর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, শুশুনিয়া, বনকাটি, রাণীগঞ্জ, সুরথরাজার গড়, নানুর, বানেশ্বর ডাঙ্গা, সাঁওতাল ডাঙ্গা, এরুয়ার, মঙ্গলকোট, দেপুর, শ্রীপুর, ভরতপুর, গোস্বামীখণ্ড, বালুটিয়া, তাম্রলিপ্ত, অযোধ্যা পাহাড়, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, ময়ূরাক্ষী, কোপাই, বক্রেশ্বর ও অজয় উপত্যকায় প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, নব্য প্রস্তরযুগ হতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী রাঢ়ে বসবাস করত। তাম্রাশ্মীয় যুগে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠে, যার ক্রমবিবর্তিত রূপ হল নগর সভ্যতা এবং এই সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ বর্ধমান জেলায় ভরতপুরের বৌদ্ধস্তূপ, গোস্বামী খণ্ডে দেউলের ভিত্তি বেদী, বরাকরের ৪র্থ পাথরের মন্দির, সাতদেউলিয়ার শিখর দেউল ও মঙ্গলকোটে ধারাবাহিক অধিবসতির প্রমাণ মিলেছে।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ভিন্সেন্ট বালা কর্তৃক রাণীগঞ্জ, সীতারামপুর, মানভূম, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রস্তর কুঠার ফলক আবিষ্কৃত হলেও রাঢ়ে মানবদেহের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরে নিজুয়া গ্রামে। মেদিনীপুর জেলার লালজল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া ও পুরুলিয়ার কেলামু পাহাড়ে সম্ভবত গুহামানবেরা প্রথমে শিকার নির্ভরশীল জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত ছিল। লালজলের গুহাচিত্র আদিম মানবজাতির উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। শুশুনিয়ায় প্রাপ্ত দ্রব্য আবিষ্কার স্থান হতে বর্ধমান জেলার দূরত্ব ২৫/৩০ কিলোমিটারের মধ্যে এবং ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত জীবাশ্ম হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সুদূর অতীতে বর্ধমান জেলার অরণ্যে সিংহ, হস্তী, বন্য অশ্ব, মহিষ, জিরাফ প্রভৃতি বন্যজন্তু নির্ভয়ে বিচরণ করত।

বর্ধমান জেলার অজয়-দামোদর অববাহিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবগোষ্ঠীর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল তার প্রমাণ মিলেছে দুর্গাপুরের সন্নিকটে বীরভানপুরের প্রত্নক্ষেত্রে। এখানে নাবাশ্মীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক মসৃণ কুঠার ও অন্যান্য প্রত্ন বস্তুর প্রচলন হতে কোন সুনির্দিষ্ট অধিবসতি অথবা বিচ্ছিন্নভাবে কোন সভ্যতার ক্রমন্বয়ের ধারাকে চিহ্নিত করতে পারে। ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বি. বি. লালের পরিচালনায় বীরভানপুরে উৎখননের ফলে শিকারজীবী মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা ছিল প্রাক্ কৌশলযুগের বা মৃৎপাত্র ব্যবহারকারীগণের পূর্ববর্তী মানবগোষ্ঠী। বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রাচীন দামোদর নদের তীরে এক নির্মল পরিবেশে বসবাসকারী ও পশু শিকারজীবী মানবগোষ্ঠী প্রস্তরযুগের শেষ পর্বে দেখা গিয়েছিল। প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত আয়ুধ, বাসগৃহের খুঁটির গর্ত ও মৃত্তিকার গঠন প্রণালী দেখে অনুমান করা যায় যে, দক্ষিণভারতের তিরুচেন্দুরের ন্যায় খ্রীস্টপূর্ব ৪০০০ বছর পূর্বে অর্থাৎ বর্তমানকাল হতে ৬০০০ বছর পূর্বে নবপ্রস্তর যুগের শিকারজীবী বীরভানপুরে অনুরূপ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে রূপনারায়ণ নদের তীরে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত উৎখননের সময় একটি নবপলীয় বা নবাশ্মীয় অধিবসতি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

প্রস্তর যুগ অতিক্রম করে রাঢ়ের প্রাচীন মানুষ এক যুগান্তকারী সভ্যতার পরিচয় বহন করতে সমর্থ হয়। পশুশিকার ও পশুপালনের পর্যায় হতে উন্নীত হয়ে তামার নির্মাণকৌশল ও ব্যবহার তাদের আয়ত্তাধীন হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সময়কালকে তাম্রাশ্মীয় যুগ নামে অভিহিত করেছেন। আবার তামা ও লোহাকে একত্রে যেদিন মানুষ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে সক্ষম হল, সে কালকে প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষায় তাম্র-লৌহের মিশ্র যুগ আখ্যা দেওয়া যায়।

আউশগ্রাম থানার পাণ্ডুক গ্রামে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার এক প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। উৎখননের ফলে অজয় নদের তীরে যে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল তার বয়স আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার বছর। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডুক গ্রামে পাণ্ডুরাজার ঢিবি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা অন্যতম প্রাচীন জনবসতির গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। উৎখননের ফলে এই সভ্যতার চারটি স্তরের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর

মধ্যে বিভিন্ন রং ও গঠনের মৃৎপাত্র, পাথরের হাতিয়ার, তামার অলঙ্কার, বর্শা, বঁড়শি, পোড়া মাটির তকলী, কার্পাস বস্ত্রের অংশ, চুল্লি, পোড়াকাঠকয়লা, পোড়ামাটির মাতৃকামূর্তি, হাতীর দাঁতের চিরুনী, পোড়ামাটির পশুপক্ষী, গৃহপালিত পশুর হাড়, মাছের কাঁটা, রত্নপ্রস্তর প্রভৃতি সামগ্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ যুগের মানুষ ঘরের মেঝে চুন দিয়ে পেটানোর কৌশল আয়ত্ত করেছিল। অধিবসতি অঞ্চলে কাঠের খুঁটির গর্ত, চেরা বাঁশ, মাটির দেওয়াল, রোদে শুকানো ইট ইত্যাদি দৃষ্টে তাদের বাসগৃহের পরিচয় পাওয়া যায়। পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় স্তরে প্রাপ্ত একখণ্ড পোড়া কাঠকয়লা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ড. শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় তেজস্ক্রিয় অঙ্গার পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এই স্তরের সময় নির্মাণ করেছেন খ্রিস্টপূর্ব ১২১০ ± ১২০। তাহলে প্রথম স্তরের বয়স অন্ততপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ ধরা উচিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, লক্ষ্ণৌ-এর বীরবল সাহানী ইনস্টিটিউট তৃতীয় স্তরের অঙ্গার চতুর্দশ পরীক্ষান্ত মন্তব্য করেন এই স্তরের বয়স আরও ৩০০ বছর পূর্বে হওয়া উচিৎ। ভাতার থানার বানেশ্বর ডাঙ্গায় পাণ্ডুরাজার ঢিবির অনুরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মিলেছে। এখানে কৃষ্ণলোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র ও তাদের গঠনপ্রণালী দেখে অনুমান করা যায় যে, এখানে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ভাতাড় থানার সাঁওতালডাঙ্গায় অন্যান্য মৃৎপাত্র ব্যতীত ভগ্ন কলসের মধ্যে অস্থি সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখে এটিকে প্রাগৈতাহিক যুগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নিদর্শন বলে মনে করা হয়। ভরতপুরে উৎখননের সময় ৩টি স্তরে যে সকল পুরাবস্তু পাওয়া গেছে তন্মধ্যে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শনসহ গুপ্ত যুগের স্থাপত্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু চতুর্থ স্তরে পঞ্চরথাকৃতি একটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা খ্রিস্টীয় ৮ম-৯ম শতকের বলে অনুমান করা হয়।

মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্রে তাম্র প্রস্তর যুগ হতে শুরু করে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক উন্নত সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে তাম্রাশ্মীয় যুগের সভ্যতা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে বিকাশ ঘটে। মাটির নীচে পাকা ইঁটের তৈরী গৃহের ভগ্নাবশেষ, পয়ঃপ্রণালী, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের ব্যবহৃত শীলমোহর, মৃৎপাত্র, অলঙ্কৃত প্রস্তর, ছাঁচে - ঢালা তাম্রমুদ্রা ও টেরাকোটা মূর্তি ইত্যাদি প্রত্নসম্ভার হতে অনুমান করা হয়েছে যে, অন্তত পক্ষে ১৫০০ বছর পূর্বে মঙ্গলকোটেই এক সমৃদ্ধশালী নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মঙ্গলকোটের নিকটই শ্রীপুর-দেবপুর গ্রামে ক্যানেল কাটার সময় বহু আস্ত ও ভাঙা মৃৎপাত্র, হাতলযুক্ত মাটির কড়াই, কুঁজোর মুখ, বাটির আকৃতির ভোজন পাত্র, পোড়ামাটির পুতুল, যক্ষিণী মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এই স্থানে প্রাপ্ত আগুনে পোড়ানো ইঁটের আয়তন হল ১ $\frac{১}{২}$ x ১ফুট।

বর্ধমান জেলার প্রত্নক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় স্তরে লৌহের ব্যবহার। এই স্তরে লোহা গলানোর ভাটাতে সংযুক্ত পোড়ামাটির নল, লোহা পিণ্ড, কাস্তে, অর্ধভগ্ন তরবারি, ভগ্ন থালার অংশ, ব্রোঞ্জনির্মিত কানের মাকড়ির আবিষ্কার হতে অনুমান করা যায় যে, ধাতু বিদ্যা ও তার ব্যবহার ঐ যুগের মানুষের আয়ত্তাধীন ছিল।

উৎখননের সময়ে একটা বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। এই প্রত্নক্ষেত্রে লোহার আবিষ্কার কিন্তু ১৯৮৮-৮৯ খ্রিস্টাব্দে লৌহপিণ্ড ও লৌহনির্মিত দ্রব্যগুলি পৃথক ভাবে দুর্গাপুর ও রাঁচীর ইস্পাত কারখানায় পরীক্ষিত হয়েছে। লৌহনির্মিত দ্রব্যগুলি প্রায় ১১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপ সহ্য করার ক্ষমতা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকটি স্থানে প্রাচীন পদ্ধতিতে লোহা গলানো হত। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হল ১৪টি নরকঙ্কাল ও তাদের সমাধি। সমাধিগুলির মধ্যে ৬টি প্রথম যুগের এবং বাকি ৮টি দ্বিতীয় যুগের। কিন্তু কঙ্কালগুলি সবই মুণ্ডহীন। ভারতীয় নৃতত্ত্ব সংরক্ষণের বিশেষজ্ঞগণের মতে বর্তমান জনগোষ্ঠীর কঙ্কালের সঙ্গে প্রাপ্ত কঙ্কালের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আবার স্থানটি সাঁওতাল অধ্যুষিত, তাই ঐ জনগোষ্ঠী সাঁওতাল হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা সে সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ কঙ্কালগুলি যে কোন পূর্ণবয়স্ক সাঁওতাল অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতির।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় প্রাচীন লেখমালার সাহায্যে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লেখমালাকে প্রধান উপাদান বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। এগুলি অপরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায় এবং সে কারণে ব্যবহারিক দিক হতে মোটামুটি প্রায় নিশ্চিত বলা যেতে পারে। বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত লেখগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা - (১) শিলমোহর (২) শিলালেখ ও (৩) তাম্রপট বা তাম্র শাসন।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত গোলাকার শিলমোহর হতে আমরা বহিঃবাণিজ্যের ইঙ্গিত পাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ রিডলের মতে এই শিলাটি মিনোয়ান লিপি অনুসারে খোদিত হয়েছিল এবং ক্রীটস দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে এটি এখানে এসেছিল। মাইকেল রিডলের মতে A E T E A বা আতিয়া হল এক গ্রীক নাবিকের নাম অথবা শব্দটিকে যদি ভাঙা যায় তাহলে AE TEE AH যার অর্থ হল, জল, মাছ ও শিরস্ত্রাণ। আবার অন্য একটি মতে শিলের লেখার সঙ্গে সেলিকা দ্বীপের বুগীলিপির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। অধ্যাপক বঙ্কুবিহারী চক্রবর্তীর মতে প্রাপ্ত শিলমোহরের সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু ড অতুল সুর রিডলের মতকেই সমর্থন করেছেন। তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান মঙ্গলকোটেই মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের মুদ্রা ও শিলমোহর আবিষ্কার হলেও বিশ্লেষণের অভাবে এখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্যরূপে ব্যবহার করা যায় নাই।

বর্ধমান জেলায় আবিষ্কৃত না হলেও শুশুনিয়া পাহাড়ের গহ্বরে পুষ্করণাধিপতি মহারাজ চন্দ্রবর্মার শিলালিপি হতে অনুমান করা যায় যে, তিনি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে রাঢ়ের অধীশ্বর ছিলেন। খজুরবাহক (বর্তমান খাজুরাহ) মন্দির লিপিতে উৎকীর্ণ আছে যে, রাঢ়েশ্বরীকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সম্ভবত রাঢ়েশ্বর ধঙ্গের হস্তে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলাই শিলালেখে চোল সৈন্যদল কর্তৃক দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ়, উত্তর রাঢ় ও বঙ্গজয়ের উল্লেখ আছে। বীরভূম জেলার সিয়ান গ্রামের সন্নিকটস্থ শাহজালানপুরের

ভগ্নপ্রায় দরজা হতে প্রাপ্ত শিলালেখে ক্রুর সুক্ষ্ম নৃপতির উল্লেখ আছে এবং পালরাজ নয়— পালের হস্তে চেদিরাজ কর্ণের সেনাদল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। নতুনহাটে হোসেন শাহী মসজিদে গ্রথিত ও প্রাপ্ত শিলালিপি দৃষ্টে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন শ্রী চন্দ্রসেন নৃপতির কোন স্থাপত্য হতে এটি সংগ্রহ করে মসজিদের গাঁথুনি রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

মধ্যযুগে বর্ধমানে বহু মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু মসজিদ, মাজার বা দরগাগুলি বিনষ্ট হলেও প্রাপ্ত শিলালিপি হতে প্রতিষ্ঠাতার নাম, প্রতিষ্ঠার সময় ইত্যাদি পাওয়া যায়। কালনায় মজলিস সাহেবের মসজিদ ও সুলতান সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে নির্মিত মসজিদের শিলালিপি আবিষ্কৃত হলেও মসজিদের অস্তিত্ব নাই। নূতনহাটের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেলেও শিলালিপিটি ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সুয়াতায় বাহমান শাহের মাজারে রক্ষিত তিনটি শিলালিপি ও স্থানীয় মসিদ ডাঙ্গায় প্রাপ্ত স্তম্ভ হতে অনুমান করা যায় যে, মসিদ ডাঙ্গায় হোসেন শাহের আমলে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে মুসলমান সাধকদের সমাধি ও সমাধি গৃহগুলি পীর ও সুফীগণের স্মৃতিচিহ্নকে আজও ধরে রেখেছে।

বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত তাম্র শাসনগুলি যে প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদান, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে স্বাধীন বঙ্গ রাঢ় নৃপতিবৃন্দের মধ্যে গোপাল চন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের নাম জানা যায়। তন্মধ্যে গোপালচন্দ্র রাঢ় ও সমতটের অধিপতি ছিলেন। গলসী থানার অধীনস্থ মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে বর্ধমান ভুক্তির শাসনকর্তা বিজয় সেন ও মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের নাম সম্পাদিত ভূমিদানের তাম্র পট্টের ন্যায় এরূপ বিস্তারিত তাম্রশাসন বর্ধমানে আবিষ্কৃত হয় নাই। ভূমিদান, গ্রাম, নাম, পদস্থ কর্মচারী, শিক্ষা, ধর্মমত, জাতি, পরিচয়, রাজার অধিকার ইত্যাদি তাম্র শাসনের বিষয়সূচী। প্রত্যক্ষ ভাবে বর্ধমানের নাম উল্লেখ না থাকলেও শশাঙ্কের এগরা তাম্র শাসন দুটি হতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বর্ধমান জনপদ তাঁর অধীনস্থ ছিল। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হর্ষবর্ধনের বাঁশঘেরা তাম্র শাসনে উল্লেখিত 'বর্ধমান কোর্ট ' নামক জয়স্কন্ধাকারকে ড. বি. পি. সিংহ একালের বর্ধমানের পক্ষে মন্তব্য করেছেন। ড. কল্যাণ কুমার গাঙ্গুলীও একই মত পোষণ করেন। অষ্টম শতকে বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্র শাসনে বর্ধমানপুর জয়স্কন্ধাকারের উল্লেখ আছে। লে. কর্নেল আর. সি. মজুমদারের মতে অবিভক্ত বঙ্গদেশে বর্ধমানপুর নামে দ্বিতীয় কোন স্থানের অস্তিত্ব না থাকায় বর্তমান 'বর্ধমান' শহরে কান্তিদেবের জয়স্কন্ধকার ছিল বলে স্বীকার করতে বাধা নাই।

ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাম্র শাসনে ঢেক্করী, রামচরিতে ঢেক্‌করী — রাজা প্রতাপ সিংহ ও ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত ঢেকুর এক ও অভিন্ন। এই তাম্র শাসন হতে ঈশ্বর ঘোষের পরিচয় ও শাসন বিভাগের পদস্থ কর্মচারীর উল্লেখ আছে। গৌরাঙ্গপুরের জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ইছাই ঘোষের দেউল উক্ত নৃপতির নাম আজও বহন করে চলেছে। নয়াপালের

ইর্দালিপি হতে বর্ধমানভুক্তি বিস্তৃতি যে উড়িষ্যার উত্তর সীমা পর্যন্ত ছিল তার উল্লেখ আছে। দেবপালের পর দক্ষিণ রাঢ়ে পাল আধিপত্য শিথিল হয়েছিল এবং স্থানীয় কয়েকটি রাজবংশ দক্ষিণ রাঢ় ও শিখরভূম শাসন করতেন, তন্মধ্যে শূর বংশের রাজারা প্রধান ছিলেন। বিজয় সেনের 'ব্যারাকপুর তাম্রশাসন' হতে জানা যায় যে, তিনি শূর রাজকন্যা বিলাসদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব সামন্ত সেন রাঢ়ের গঙ্গাতীরে ব্যবসা করতেন। সমসাময়িক কলিঙ্গ রাজ দ্বিতীয় নরসিংহ দেবের কেন্দুপত্তন তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে অনন্তবর্মা গঙ্গাতীরবর্তী ভূ-ভাগে কর সংগ্রহ করেছিলেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুদারের মতে অনন্তবর্মা উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় অধিকার করেন এবং তাঁর সহায়তায় বিজয় সেন রাঢ়ের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। ড. সুকুমার সেনের মতে -- 'বাংলার সেন রাজাদের আদিনিবাস অজয়-দামোদর উপত্যকার মধ্যভাগে যা সেনভূম নামে পরিচিত ছিল। 'বল্লাল সেনের নৈহাটী শাসন তাঁর বংশ পরিচয়, পিতার ও তাঁর বীর খ্যাতি, মাতার নাম, ধর্মানুষ্ঠান, ভূমিদান ও বর্তমান কেতুগ্রাম থানার এক বংশের ঐতিহাসিক ভূগোলের পরিচয় বহন করছে। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেনের গোবিন্দপুর তাম্র শাসনের পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, বর্ধমানভুক্তির দক্ষিণ-পূর্বাংশের বিস্তৃতি ছিল আদি গঙ্গার প্রবাহ পর্যন্ত এবং দানকৃত ভূমি ২৪ পরগণা জেলার ধর্মনগর বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতডড়চতুরকের অধীনে ছিল। লক্ষণ সেনের শক্তিপুর শ্মশান হতে উত্তর রাঢ়ের সীমানা বিন্যাসের কথা জানা যায়। ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে প্রাপ্ত ও ভবদেবশখা কবি বাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক রচিত লিপিতে ভবদেবের বংশ পরিচয়, মাতার নাম, মাতৃকুলের গোত্র, রাঢ়ের অবস্থা ও রাঢ়ের শিক্ষা বিষয়ে এক প্রামাণ্য দলিল। পালযুগে সম্ভবত ধর্মপালের সময়ে দ্বিতীয় 'তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ' নামক একটি বৌদ্ধস্তূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরসী কুমার সরস্বতীর মতে 'তূলক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ' নামকরণের সার্থকতা এই যে, আলোচ্য স্তূপটি বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পানাগড়ের নিকট ভরতপুর গ্রামে ইষ্টকনির্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হলেও ৩০ বছরে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত সামগ্রীর বিশ্লেষণ হয় নাই।

কেবলমাত্র রাজা মহারাজাদের কথা নয় — একখানি পিতলের তাম্রফলকে এক বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধ্যান ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় দাঁইহাটের বেড়া পল্লীতে প্রাপ্ত নবপদ প্রতিমা বা নৌপজ্জী লিপিতে। লিপির তারিখ ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দ বা ১৯২৩ জৈনাব্দ। ফলকটি কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সংগ্রহ শালায় রক্ষিত আছে। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈনরা মনে করেন যে, পূজা করলে যে ফল হয় আশ্বিন মাসে নৌপজ্জী বা নবপদজীর পূজায় অনুরূপ ফল লাভ হয়।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হল প্রাচীন মুদ্রা। সাহিত্য ও রাজসভার পৃষ্ঠপোষকগণ বর্ণিত তথ্যের সত্যতা প্রাচীন মুদ্রা হতে যাচাই করে নেওয়া যায়। তারিখ সম্বলিত মুদ্রা ইতিহাসের কাল নির্ণয়ে সাহায্য করে। আবার মুদ্রার গুণগত মান হতে ঐ সময়ের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা দুরবস্থার বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া

যায়। উভয় দেশের মুদ্রা হতে বহিঃবাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিচয় বহন করে। বর্ধমান জেলায় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয় নাই, তাই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীর উপাদানটি বেশ দুর্বল। যে কয়েকটি মুদ্রা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল তার উল্লেখ করা হল।

মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্রে সংগৃহীত পুরাবস্তুর মধ্যে প্রাচীন যুগের তাম্রমুদ্রা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলির মধ্যে চারটি তাম্র মুদ্রা ভারতীয় যাদুঘর কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছিল। হস্তীপৃষ্ঠে আরোহী চিহ্নিত মুদ্রাগুলি খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে নির্মিত মৌর্য যুগের মুদ্রা। ১৩১৮ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ অজয়ের প্রবল বন্যার পর আউসগ্রাম থানার রাজারপোতাডাঙ্গায় একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল। ঐ মুদ্রার এক পৃষ্ঠে রাজমূর্তি ও বিপরীত ভাগে লক্ষ্মীমূর্তি খোদিত ছিল। রাজমূর্তি নিম্নে গুপ্তবাহ্মী অক্ষরে খোদিত লিপিকে 'নরেন্দ্র গুপ্ত' পাঠ ধরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন যে উহা গুপ্তযুগের মুদ্রা, গুপ্তযুগে মুদ্রামান ছিল সোনার এবং এত অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের জন্য সমসাময়িক কালের এক কবি রূপকার্থে স্বর্ণবৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রাটি মশাগ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছিল। জামালপুর থানার চকদীঘি ও কাটোয়া থানার বহরমপুর গ্রামে সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। শোনা যায় চকদীঘিতে প্রাপ্ত ১১৭ গ্রেন ওজনের স্বর্ণমুদ্রাটি লর্ড কারমাইকেলের তত্ত্বাবধানে ছিল। পরবর্তীকালে এই মুদ্রার কোন সন্ধান জানা যায় নাই। ময়ূর ও দেবীমূর্তি খোদিত প্রথম কুমার গুপ্তের স্বর্ণমুদ্রাটি বর্ধমান জেলায় পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ শালায় রক্ষিত আছে। বেলরুই গ্রামে বলরাম রায় কর্তৃক সংগৃহীত মিনান্দারের মুদ্রা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ শালায় রক্ষিত আছে। এই সংগ্রহের মধ্যে আলেকজাণ্ডার, স্কন্দগুপ্ত, ও দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের মুদ্রাগুলিও উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকোটে তক্ষশিলার ধাঁচে নির্মিত তিন শ্রেণীর তাম্রমুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এসকল মুদ্রার প্রচলন ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল স্থাপত্য-ভাস্কর্য। এ কালে যে সকল স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও তার কাঠামো বিনষ্ট হয়ে গেছে অথবা উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে সে সকল বস্তুর আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত। এগুলিকে ইতিহাস রচনার পরোক্ষ উপাদান বলা যায়, কিন্তু এর দ্বারা আঞ্চলিক ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিল্প-সংস্কৃতির চিত্র পরিস্ফুট হয়। পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত নিদর্শন হতে সে যুগের মানুষের জীবন ধারণ সম্পর্কে ও তাদের ধর্ম ও সমাজ চেতনার বিষয় অনুমান করা যায়। ভরতপুরের বৌদ্ধস্তূপ, গোস্বামীখণ্ডে মন্দিরের ভিত্তি বেদী, জার গ্রামের সিংহ লাঞ্ছন মূর্তি, চৈতন্যপুরের অভিচার বিষ্ণু, সাতদেউলিয়ায় তীর্থঙ্কর মূর্তি খোদিত প্রস্তর ফলক, ক্ষীর গ্রামের যোগদ্যামন্দিরের দরজার কাজ, দামুন্যায় দশাবতার মূর্তি খোদিত দ্বারপার্শ্ব, আড়ার কয়েকটি মূর্তি, রাইগ্রামের বরাহ মূর্তি, চম্পাই নগরী ও বর্ধমানেশ্বরের শিব, দাঁইহাটে ইন্দ্রেশ্বর শিব মন্দির, বেড়ায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু, সুয়াতার মসজিদ ইত্যাদি বর্ধমানের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অন্যতম

নিদর্শন। প্রমাণস্বরূপ বরাকরের চারটি পাথরের মন্দির, খুজিকার পাথরের মন্দির, ইছাই ঘোষের দেউল, সাতদেউলিয়ার শিখর দেউল, আমদপুরের মন্দির, দোগাছিয়ার গোপীনাথের মন্দির, সাঁকোর উষাদিত্য, সরের শিব মন্দির, কুলিন গ্রামের মন্দির, কুলুটের মসজিদ, কালনার লালাজি ও কৃষ্ণচন্দ্র মানুর, বৈদ্যপুরের দেউল, বনপাশ ও মৌখিরার মন্দির, বাবলাডিহির শান্তিনাথ, আদ্রাহাটির শিবমূর্তি, কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী প্রভৃতি বর্ধমানের শিল্পীরাই তৈরী করেছিলেন এবং এখনও এই সকল স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শনের সঙ্গে ধ্বংস প্রাপ্ত মন্দিরের নমুনা দৃষ্টে তুলনামূলক বিচারে সেগুলির শিল্পকর্ম সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বর্ধমান জেলার অবহেলিত স্থাপত্যগুলির মধ্যে মধ্যযুগের নির্মিত গড় ও প্রাসাদগুলির ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল—কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় নাই। রাঢ়পুরী, অমরারগড়, কাইতির বাণ রাজার গড়, দিসের গড়, সেনপাহাড়ী, সেলিমাবাদ, চুরুলিয়ার নরত্তম গড়, গড়সোনাডাঙ্গা, রামচন্দ্রগড়, সমুদ্রগড়, তালিতগড়, চম্পাইনগরী প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান করলে আঞ্চলিক ইতিহাস যথেষ্ট সমৃদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে রঙ্গবরা খাঁ ও তাঁর পুত্র খানজাদ খাঁ রায়ান থানার কোটশিমূল গ্রামে একটি গড় ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এই গড়ের দৈর্ঘ্য১০৬০ ফুট ও প্রস্থ ৮৯০ ফুট। কিন্তু একালে তার বিশেষ চিহ্ন নাই।

এত অল্প পরিসরে বর্ধমানের ন্যায় প্রাচীন ও বৃহৎ জেলার সামগ্রিকভাবে প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। জেলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য প্রাচীন মূর্তি দেখা যায়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল এই যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অধিকাংশ জেলার স্থাপত্য-ভাস্কর্য বিষয়ে গ্রন্থরচনা ও তালিকা প্রণয়ন করা হলেও বর্ধমান আজও অবহেলিত। অথচ বর্ধমানে বহু প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগুণী লোকের অভাব নেই। বর্ধমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—আর আছে মিউজিয়াম। উদ্যোগ, উদ্যোগী ও অর্থাভাবের জন্য প্রত্নকীর্তির অজস্র নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও বর্ধমান জেলার স্থাপত্য-ভাস্কর্য বিষয়ে কোন সাধু প্রচেষ্টার উদ্যোগ না থাকায় শিল্প সংস্কৃতির পর্যালোচনা হওয়ার আশা ক্ষীণ।

□ বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব স্মরণিকা, ১৪০৭ □

নগর বর্ধমানের অস্তিত্ব সন্ধানে
সুধীরচন্দ্র দাঁ

প্রাগিতির সন্ধানে

বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি, এই আত্মবিস্মরণ চরিত্রই আমাদের ঐতিহ্য বিমুখতার কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাই আক্ষেপ করেছিলেন, "বাঙালির ইতিহাস চাই, নইলে বাঙালি কোনদিন মানুষ হইবে না।" আমাদের প্রাগিতিহাসের কৌলীন্যকবচ কোনদিন রক্ষিত হয় নাই। অথচ প্রাগার্যযুগেও এই দেশ ছিল প্রকৃতই ইতিহাস ঋদ্ধ। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিশ উপত্যকার সুপ্রাচীন সুমেরু সভ্যতার সমকালীন এই "রাঢ়ের" সভ্যতা। পুরাতন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা, লিপি, লেখ, পোড়ামাটির অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র, শিল্পকর্মের ধ্বংসাবশেষ, পুরাতাত্ত্বিক প্রত্নমালা, পুঁথি ভূর্জপত্রে লেখা-লিপি যাদের বলা হয় ইতিহাসের প্রসাধিকা, সে সবের উপর নির্ভর করে চলা, আর আলো আঁধারির কানাগলিতে পথ হাতড়ানো -- একই ব্যাপার। পুরাতত্ত্বের উপকরণ, পুরাসম্পদ, পুরাতন সরদলের নক্সা, ক্ষোদিত মূর্তি, হাড়ের প্রত্নমালা, ব্যবহৃত দ্রব্যাদির ভগ্নাবশেষ, ফসিল, প্রস্তর বা হাড়ের অলংকরণ এসব আজ আমাদের দামোদর অজয়-গঙ্গা উপত্যকায় মাটির গর্ভ থেকে মুক্তির আলোয় হাঁফ ছেড়ে নূতন ও বিস্ময়কর জীবন পাচ্ছে। একদা গৌরবোজ্জ্বল অতীত ছিল। আজ অন্ধকাবের কালগর্ভে বিলীন। আরণ্য আদিম সভ্যতার বিবর্তনের কাহিনী প্রবাহিনী প্রতিম ও স্বভাবধর্মে রূপান্তরগামী। আজকের মানুষের কাছে, অতীতে কেমন ছিলাম আমরা, কেমন ও কোথায় স্থিতু ছিল আমাদের পূর্বসুরী জাতিগোষ্ঠী কোথায় ছিল আমাদের দেশ? স্রোতোস্বিনীর মত প্রবহমান, পরিবর্তনশীল অথচ ঘাত সহত্ব নিয়ে আবির্ভূত এই সভ্যতার বিবর্তনের রূপরেখা কোথায় গেল?

ইতিহাস আমরা যা পড়েছি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, বিদেশীদের ইতিহাসতো রাজায় রাজায় মারামারি, কাটাকাটি, ভাইয়ে ভাইয়ে খুনো-খুনি ও সিংহাসন নিয়ে টানাটানি কাড়াকাড়ি। বাইরে থেকে একদলের আসা ও ভিতরের রাজাদের সঙ্গে কেবলই সংঘর্ষ। দেশটা যেন ভাগাভাগির, হরির লুটের, কামড়া-কামড়ির দেশ এবং লক্ষ্য সেই সিংহাসন ও মসনদ। না-না এ আমার দেশের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। ঐ বিদেশীদের ইতিহাস লেখাও যা অন্ধের হস্তিদর্শনও তাই। ইতিহাস দেশের কথা বলে, সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস-অতীত ও বর্তমানের বিবর্তনের কথা। উদ্ভব ও রূপান্তরের পরিবর্তনসিদ্ধতার কথা। দেশ-মানুষ-জাতি ও নৃতাত্ত্বিকতার কথা। সমগ্রভাবে একটি বহমান সমাজের আত্মনুসন্ধান ও আত্মাবিষ্কারের ঋদ্ধতা। ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্তন পরিপূরক। ভৌম ও প্রাকৃতিক বস্তুর সম্মিলনে সৃষ্ট ও সৃজনকালের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ। তাই শিল্প - সুকৃতিই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ও ক্রমবিকাশে একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্যরূপ। রাঢ় অঞ্চল ও বর্ধমানভুক্তি গোটা ভারতের বিম্বিতরূপ। বর্তমান নগর-বর্ধমান ও বর্ধমান জেলায় যে সব প্রত্নদ্রব্য ও পাথুরে প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান প্রাগৈতিহাসিককালেও রাঢ় সভ্যতা ছিল সমুন্নত-সমুজ্জ্বল।

প্রাগিতির ইঙ্গিত

দুর্গাপুরের সন্নিকটে ভরতপুর, নাডহা (দামোদর তীরবর্তী), বীরভানপুর এবং অজয় নদের তীরবর্তী পাণ্ডুরাজার ঢিবি এবং অজয়-কুনুর-খড়িনদীর সঙ্গমস্থল মঙ্গলকোট — এই যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা যার শুরু কাঞ্চননগর দিয়ে; এই বিরাট উপত্যকায় মৃৎ-গর্ভে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদ ইঙ্গিত দেবে আমাদের পুরাতাত্ত্বিক কবচ কোথায় লুক্কায়িত? এতে আমরা নিশ্চিত যে বহু পূর্বেই উন্নত নগর সভ্যতায় বর্ধমান জনপদ ছিল উন্নত। কাঞ্চননগর সেই সভ্যতার ফসিল, এর মাটি খুঁড়লে ভূগর্ভ থেকে হয়ত আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত বের হবে অমূল্য যখের ধনের মত প্রাকৃতিক প্রত্ন সম্ভার। কংকালেশ্বরী কালীর প্রস্তর মূর্তি তারই বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ। আর দামোদর গর্ভে প্রাপ্ত সর্বমঙ্গলার অষ্টভূজা পাথুরে দেবী মূর্তি — এই দুটি মূর্তিই প্রাচীন ও প্রস্তরীভূত। দুটি মূর্তির তলায় যে ভাষায় লেখা, তা পাঠোদ্ধার হয়নি বলে ড. সুকুমার সেন তাঁর নাম দিয়েছেন -- পৈশাচীভাষা। কাঞ্চননগরের নদীগর্ভ ছাড়াও নির্মলঝিলে দামোদর গর্ভ থেকে কিছু মূর্তি যা পাওয়া গেছে তা সবই পাথরের। নির্মল ঝিলের চতুর্দিকে তা সযত্নে রক্ষিত আছে। এইসব মূর্তির সবগুলিই পাথরের যে যুগে কেবল পাথরের মূর্তি তৈরী হ'ত -- ছেনি -বাটালি দিয়ে পাথর কুঁদে মূর্তিতে শিল্পরূপ ও শিল্পভাবনা ফুটিয়ে তোলা হ'ত তাকেই বলে প্রস্তর যুগ। যার বয়স খ্রিস্টপূর্ব আট হাজার বছর। বছর কয়েক আগে বর্ধমানের মঙ্গলকোটে অজয় - কুনুরের সঙ্গমস্থলে পুরাতাত্ত্বিক খনন কার্য চালিয়ে এক সু-প্রাচীন উন্নত সভ্যতার সন্ধান মিলেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ববিভাগের প্রধান ড. সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় এই খননের নেতৃত্ব দেন। তিনি দাবি ক'রেছেন, তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে শুরু ক'রে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটানা উন্নত সভ্যতার নানাবিধ প্রাপ্ত প্রত্নমালা প্রমাণ ক'রে কুষাণ ও গুপ্তযুগে এই অঞ্চল সমৃদ্ধশালী নগর সভ্যতায় পূর্ণ ছিল। পাকা ইটের তৈরী ঘরবাড়ির অংশ বিশেষ, উন্নত ধরণের পয়ঃপ্রণালী, কুষাণ ও গুপ্তযুগে ব্যবহৃত শিলমোহর, বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্র, অলংকৃত প্রস্তর, ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা, বিভিন্ন প্রকার অলংকার, টেরাকোটার মূর্তি - প্রমাণ করে তাম্রপ্রস্তর ও মধ্যযুগের মানুষের সমাধি দেওয়ার রীতি। তাম্রপ্রস্তর যুগে কবর দেওয়ার সময় মৃতদেহের সঙ্গে কৃষ্ণলোহিতবর্ণের মৃৎপাত্র দেওয়া হ'ত। খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে, আর গলসী-বুদবুদ ব্লকের অন্তর্গত দামোদর নদের তীরে ভরতপুর সাক্ষ্য দিচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব দু হাজার বছর আগের সভ্যতা - কৌলীন্যতার। (এ সম্পর্কে লেখকের বর্ধমানের প্রামাণ্য ইতিহাস "বর্ধমান পরিক্রমার" পুরাসম্পদ ও ভাস্কর্য দ্রষ্টব্য)।

খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে মেসিডানের অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার যখন সমগ্র উত্তর ভারত জয় করে পাটলী পুত্র অধিকার ক'রে পূর্ব ভারতের গঙ্গা-দামোদর-অজয় মধ্যবর্তী — এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হন, তখন তাঁর সেনাপতি সেলুকস, প্রমুখ এই নদী অধ্যুষিত ভূ-ভাগ আক্রমণ করতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস তার 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে এই উন্নত ভূ-ভাগের যে বিস্তীর্ণ বিবরণ দিয়েছেন তাকে "গঙ্গারিডি" বলে বর্ণনা করেছেন Gangaridium। যাকে প্রাচ্য - বিদ্যার্নব ননীগোপাল

মজুমদার বলেছেন - গঙ্গারিডি, তা অপভ্রংশিত হয়ে "গঙ্গা-রাঢ়ীতে পরিণতি লাভ ক'রেছে। এর অর্থ হল "গঙ্গা অববাহিকায় রাঢ় অঞ্চল।" গ্রীক আগমনের পর গ্রীক মহাকবি ভার্জিল (Virgil) তার জর্জিক গ্রন্থে এই গঙ্গারাঢ়ীদের বীরত্বের কথা ল্যাটিন ভাষায় উল্লেখ ক'রেছেন "In foribus pugnam exauro Solidioque elephanto Gangaridium faciam, Victorisque arma quirne - Virgil (From Georgics - Latin) আমার বক্তব্য - কাঞ্চননগর - ভরতপুর - নাডহা - বীরভানপুর - এই দামোদর প্রবাহ পথ অধ্যুষিত এবং উত্তর-পূর্বে গঙ্গা এবং মধ্যস্থানে অজয় প্রবাহ পথের পাণ্ডুরাজার ঢিবি - মঙ্গলকোটে অজয়-কুনুরের সঙ্গমস্থলে মধ্যবর্তী ভূ-ভাগই (যেখান থেকে এখন প্রত্নমালা পাওয়া যাচ্ছে) — এই গ্রীক পর্যটক ও সাহিত্যিক-কবি বর্ণিত "গঙ্গারাঢ়ী" অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলই উন্নত সভ্যতার সাক্ষী। ইণ্ডিকা গ্রন্থে যেটুকু পাওয়া যায় তাহল, "গঙ্গানদী গঙ্গারিডয় দেশের পূর্বসীমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে পতিত হয়েছে। গঙ্গারিডয় অধিবাসীদের অসংখ্য বৃহদাকার রণহস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাদের দেশ কখনও সহজে বিদেশীয় রাজ্য কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশের নরপতিগণ গঙ্গারিডিয়গণের অসংখ্য এবং দুর্জয় রণহস্তী নিচয়কে ভয় করে।" বাঙলার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত তা - এখনকার কালনা, কাটোয়া, বর্ধমান সদর মহকুমা, আসানসোল, দুর্গাপুর এবং বাঁকুড়া, বীরভূম জেলা সমগ্র —এই এলাকাই গ্রীকগণবর্ণিত ঐতিহ্যপূর্ণ ভূ-খণ্ড। মেগাস্থিনিসের পর গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনিও অনুরূপ ক্ষাত্রশক্তি ও ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়েছেন, "এই রাজ্যের রাজধানী Portalis (বা পর্তালিস > পারতালিত > গড়তালিত - অপভ্রংশে গড়তালিত), সেখানে ৬০,০০০ পদাতিক, ১০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ রণহস্তি সজ্জিত থেকে এই রাজ্যের অধিপতির দেহ রক্ষা করছে।" মহাকবি ভার্জিল এই গঙ্গারিডিদের বীরত্বের এমন প্রশংসা করেছেন, যে তিনি বলেছেন, দেশে ফিরে গিয়ে গঙ্গারিডিয়গণের ক্ষাত্রবীর্যের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন রোম নগরীর প্রবেশদ্বারে নির্মিত তোরণে। এতক্ষণ আমার ইঙ্গিত নিবদ্ধ ছিল - এই বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডকেই রাঢ় বলা হত এবং রাঢ়ের রাজধানী (এক বা একাধিক) এই অঞ্চলের মধ্যেই অবস্থিত ছিল - একথা সহজেই অনুমেয়।

প্রাগিতির যুক্তি

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন 'নগর বর্ধমান', 'শহর বর্ধমান' বা 'বর্ধমানপুর' কতদিনের বা আদৌ প্রাচীনকালে ছিল কিনা, থাকলে কত তার বয়স এবং কোথায় তার অবস্থান? এই প্রশ্নের উত্তর জটিল, একোন বিজ্ঞানের সূত্র বা গণিতের রাশিমালা নয় যে অংক কষে হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। প্রত্ন গবেষকরা পুরাতন পুঁথি বা পাথুরে প্রমাণের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হন, কিম্বা সমসাময়িক কালের ঘটনা আমাদের সে হদিস দেয়। সব চাইতে পুরাতন প্রমাণ ছিল, "জৈন আচারাঙ্গ সূত্র"; কিন্তু তাতে মহাবীর জিন অস্থিগ্রাম বা অট্টীয়গ্রামে 'পথহীন লাঢ় (রাঢ়)' অঞ্চলে এসেছিলেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ, আর এই অঞ্চলটি দামোদর প্রবাহপথে জঙ্গলময়, তাই 'পথহীন' বলা হয়েছে। এই স্থানটি বর্তমানে মোহন্তর অস্থল বলে চিহ্নত করেছেন রাঢ়ের অগ্রজ গবেষক ড. পঞ্চানন মণ্ডল ও এই

গ্রন্থের লেখক স্বয়ং। আর একটি অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে — মহাবীর জিনের পিছনে তু-তু বা ছু ... ছু করে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তু-তু বা ছু ... ছু ধন্যাত্মক অষ্ট্রিক ভাষা এবং এর অর্থ হ'ল কুকুর। সে সময় এই অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠী কিরাত, শবর, বোড়ো, ডোমদের বাস ছিল এখানে, তারা আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন, যে ধর্ম তাঁরা লালন করতেন তা হল শাঁম্হা বা শাঁমা ধর্ম। এরা শবদাহ না করে স্তূপীকৃত করে রাখতেন এক নিরাপদ জায়গায়, কিম্বা কবর দিতেন। এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলে অন্ত্যজ শ্রেণী অর্থাৎ দুলে, বাউড়িরা মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে দেয়। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প অভাগীর স্বর্গে অভাগীর ছেলে কাঙালীচরণকে জমিদারের নায়েব বলছে, "তোদের জেতে কে করে মড়া পুড়িয়েছে, গর্ত করে মাটিতে পুঁতে দে।" কাঙালী তার মায়ের মুখে আগুন দিয়ে স্বর্গে যাবার বাসনাই পূরণ করতে চেয়েছিলেন, সে সময় এখানে আদিম জনগোষ্ঠী মৃতকঙ্কালের স্তূপের পাশে "যক্ষিণীর" পূজো করত, সারারাত নাচ-গান উৎসব করত। তারা ছিল অতিথি পরায়ণ। মহাবীরের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু মহাবীর "দিগম্বর" সম্প্রদায়ের, তাই কৌতূহল বশত ছেলেদের দল ও কুকুর পিছু নিয়েছিল। আজও গ্রামাঞ্চলে অস্বাভাবিক কোন বিদেশীর আগমন ঘটলে — এই ঘটনাই ঘটে। আদি জনগোষ্ঠী এই কংকালের স্তুপের পাশে যে "যক্ষিণীর" পূজা করত, সেই "যক্ষিণী" হল এই কংকালেশ্বরী, অস্থির স্তূপ থেকে এই স্থানের নাম হয় অস্থিকগ্রাম এবং তার সঙ্গে অল্ প্রত্যয় যোগে - অস্থিক + অল = অস্থি অল অস্থ্যল > অস্থল হয়েছে। বর্তমানে নিম্বাক সম্প্রদায়ের রাজপুরোহিতদের আবাস-স্থল বলে লোকে এখনও এই এলাকাকে বলে "মোহন্তর-অস্থল" — এই নামের বুৎপত্তিগত অর্থ "মোহন্তর স্থল" নয়। এই স্থানটি আমরা সনাক্ত করেছি। এই একদা অস্থিপূর্ণ অস্থিকগ্রাম বা অট্রিয় গ্রাম বর্তমান ত্রিশ সংখ্যার জে. এল. নম্বরের মূল বর্ধমান বাঁকা নদীর তীরবর্তী নিম্বার্ক অস্থ্যল থেকে উত্তরে বল্লুকাতীরে বাহির সর্বমঙ্গলা এলাকা পর্যন্ত গ্রাম বা পল্লী। মহাবীর মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স্যে এসেছিলেন এবং রাঢ় অঞ্চলে আচারিকা করেছিলেন। এখান থেকে মহাবীর জৃভক বা জম্ভীয় (বর্তমান জৌগ্রাম) গ্রামে যান ও সেখানে ঋজুকুল নদীর তীরে তপস্যায় কৈবল্য লাভ করেন।

দ্বিতীয়ত সাধু - সন্তগণ ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশে কোন স্থানে এলেও জনপদ থেকে দূরে নির্জন অরণ্যে বসতি স্থাপন করতেন। তাই জৈন আচারাঙ্গ সূত্র থেকে আমরা হদিশ করতে পারি সে সময় শহর বা নগর বর্ধমান অস্থিক গ্রাম থেকে দুরে ছিল। মহাবীরের চারিকা সূত্র থেকে জানা যায় তিনি দামোদর প্রবাহপথের তীরবর্তী নির্জন আরণ্য পরিবেশকেই সাধন ভজনের উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু মহাবীরের কালে একমাত্র জৈন আচারাঙ্গ সূত্র গ্রন্থ ছাড়া আর কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। জৈন ধর্মগুরু মহাবীর, বুদ্ধদেব, গুরুনানক ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন ও আচরণ পথ ছিল নগর বা শহর বর্ধমানের কোল ছুঁয়ে। সুতরাং নগর বা শহর বর্ধমানের অস্তিত্ব ছিল — মল্লসারুল-গলসী লাকুড্ডি-কাঞ্চননগর-গড়তালিত-মেমারি-শক্তিগড় এই প্রবাহ পথেই। আমার এই যুক্তি পরবর্তী অংশে আরও স্ফটিক স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। দুর্গাপুরের কাছে দামোদর নদের তীরে বীরভানপুর,

ভরতপুর নাডহা সাক্ষ্য দিচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগের কৌলীন্যকবচ আমাদের হাতের মুঠোয়। সম্প্রতি "বর্ধমান শহরের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে (পরে প্রকাশিতব্য) এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। তালিত গ্রামে রয়েছে গড়ের ভগ্নদুর্গের অংশ বিশেষ এবং গড় নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ। গত বৎসর এই গ্রাম থেকে একটি গুপ্তযুগের সুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেছে - মুদ্রার একপিঠে ধ্যানমগ্ন বৌদ্ধমূর্তি ও অন্যপিঠে তীর ধনুক হাতে রাজা। মুদ্রার লিপির পাঠোদ্ধার করা যায়নি। সুতরাং গ্রীক আক্রমণকালে বর্ণিত গড়তালিত বা পারতালিতই (Portalis) সেই উন্নত রাজধানী বলে অনুমান করলে কোন ভুল হবে না। আবার মেমারির অদূরে করন্দা গ্রাম থেকে আমরা বৃন্দাবন দাসের হস্তলিখিত একটি অপ্রকাশিত পুঁথি আবিষ্কার করেছি। পুঁথির নকল করেছেন শ্রীপাট দেনুড় নিবাসী রাসবিহারি অধিকারী, পুঁথির নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'-বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট পালসিটের নিকটবর্তী করন্দাগ্রামের
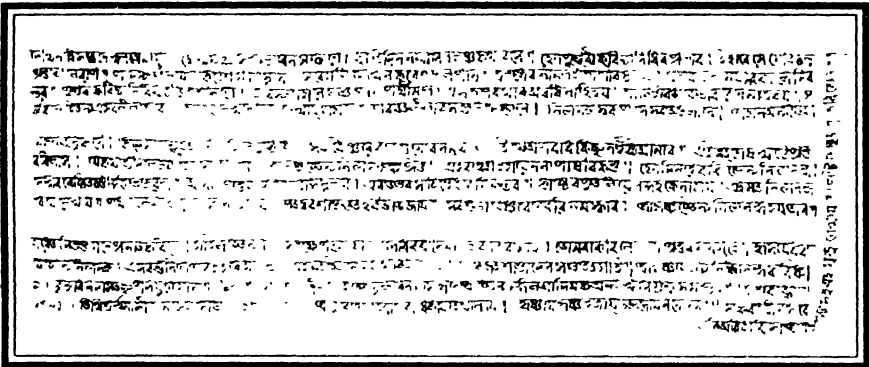
করন্দা গ্রামে প্রাপ্ত বৃন্দাবন দাসের হস্তলিখিত একটি অপ্রকাশিত পুঁথি

কৃষ্ণবলরাম মন্দিরের সেবাইত শশাংক গোস্বামীর বাড়ি থেকে এটি উদ্ধার করা হয়েছে। ঐ পরিবারের রামকৃষ্ণ গোপীবল্লভ গোস্বামীর নিকট হ'তে সম্প্রতি নরোত্তম দাস কৃত "স্মরণমঙ্গল" (১৯ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ), বলরামদাসকৃত "বৈষ্ণববন্দনা" (৫ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ)। দ্বিজবদন চন্দ্র (করন্দাগ্রামের) কৃত সত্যনারাযণের ব্রতকথা প্রভৃতি কয়েকটি পুঁথি এতদঅঞ্চল থেকে উদ্ধার করায় একথা প্রামাণ্য যে মহাপ্রভুর "কুলীন গ্রাম" যাবার পথে বৈষ্ণবতীর্থ গড়ে ওঠে ও তা বল্লুকা নদীর তীরবর্তী। পরবর্তী অংশে আমরা উল্লেখ করবো এই বল্লুকা-দামোদর প্রবাহপথেই মিলবে নগর বর্ধমানের অস্তিত্ব। বৃন্দাবন দাসের যে পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠা মুদ্রিত হ'য়েছে, তার কিয়দংশ পাঠ —

"বৈষ্ণবাদিভক্তগণে প্রণতি করিয়া।
গাইল চৈতন্যলীলা সংক্ষেপ করিয়া।।
গদাধর শ্রীনিবাস ঘরবারি রামাই।
তোমরা করিলে পাঠ সত্তর গুণ গাই।।
হৃদয় ধরফে যে চৈতন্যলীলা নন্দ।

এসব শুনিলে তার হইবে আনন্দ।।
এমত চৈতন্যের কথার অন্ত নাই।
যারে যত শক্তি দেন মতে তত গাই।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নির্মাণন্ধ করি ধ্যান।।
বৃন্দাবন দাস কৈছে পদযুগে গান।। ইতি'

"শ্রীবৃন্দাবন দাস কৃতৌ" "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" আদি মধ্য অন্ত্যাখ্যান গ্রন্থ সমাপ্ত - শকাব্দ ১৪৯২।। তিথি পূর্ণমাসী। মাহ আষাঢ়ে।। ইতি শ্রীগুরো গৌরচন্দ্রায় রাধাকায় তথা লয়ে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমোঃ সাক্ষরং শ্রী রাসবিহারী অধিকারী। সাং শ্রীপাট খড়দহ। এই গ্রন্থলেখায় শ্রীপাট দেনুড়।। হরিবোলত।"

এই পুঁথি লেখার ১৯ বছর পরে ১৫১১ শকাব্দে বৃন্দাবন দাসের তিরোভাব হয়। অনুমান বৃন্দাবন দাস এই পুঁথিটি খসড়া করার পর লিপিকারকে দিয়ে যে কপি করিয়েছিলেন, — এটি তাই।

সুতরাং কাঞ্চননগরের নির্মলঝিলে প্রাপ্ত প্রত্নরাজি, কঙ্কালেশ্বরীমূর্তি, আলমগঞ্জে প্রাপ্ত বৃহৎ শিবলিঙ্গ, সর্বমঙ্গলামূর্তি প্রমাণ করে রাঢ়ের সভ্যতা প্রাগৈতিহারিক কাল থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে মধ্যযুগ পর্যন্ত। আর বর্ধমান ভুক্তি বলতে এককালে গোটা বঙ্গকেই বোঝাত, প্রশাসনিক খড়গাঘাতে ভুক্তি অর্থাৎ প্রদেশ আজ জেলায় পরিণত হয়েছে। কাঞ্চননগর থেকে ভরতপুর নাড়হা - বীরভানপুর - পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও সেখান থেকে মঙ্গলকোটের - কনুর অজয় সঙ্গমস্থল - এই বিশাল চতুষ্কোণ সীমাবদ্ধ উপত্যকা ভু-খণ্ডই তখনকার প্রাচীন বর্ধমান জনপদ।

নদী নির্ভর নগর সভ্যতা

মিশরের নীল নদী উপত্যকা, টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদী উপত্যকার সুমের সভ্যতা, কানাডার ইনকা ও আমেরিকার মায়া সভ্যতা এবং সিন্ধু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। আর দামোদর-অজয়-গঙ্গা উপত্যকার রাঢ় সভ্যতাও খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। কারণ এই সভ্যতাগুলির সাধারণ নিদর্শন একই প্রত্ন বস্তু-ক্ষুদ্রাকৃতি ইট, কুমোরের চাকা ও পোড়ামাটির পাত্র। আর এটা বলাই বাহুল্য যে নগর সভ্যতা আজও নদী নির্ভর। সভ্যতার উত্থান পতনে নদীর অবদান অন্বিত। বর্ধমানের নদীগুলির খাতবহত্বের প্রসঙ্গ আলোচনা করলেই জনপদ বর্ধমান ও নগর বর্ধমানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। নীহার রঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাসে" (আদি পর্ব) দেখা যায় বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদর প্রবাহপথের পরিবর্তন খুব বেশি হয়েছে। ফান-ডেন-ব্রোকের মানচিত্রে (১৬৬০ খ্রি.) দেখা যায় বর্ধমানের দক্ষিণ পথে দামোদরের একটি শাখা সোজা উত্তর পূর্ববাহী হয়ে আম্বোনা কালনায় ভাগীরথীতে পড়েছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে (১৬৪০ খ্রি.) এই শাখাটিই বল্লুকা নদী, যেখানে এককালে বল্লুকা সভ্যতা গড়ে ওঠে। আবার দামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহ পথেই একসময় সরস্বতীর প্রবাহপথ ছিল—জাও-ডি-বারোসেনের নকসা তারই ইঙ্গিত দেয়। খাত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও উচ্চ ও নিম্নমালভূমি

ফান-ডেন-ব্রোকে মানচিত্র (১৬৬০ খ্রি.) যেখানে দেখানো হয়েছে দামোদরের একটি শাখা উত্তর পূর্ববাহী হয়ে কালনায় ভাগীরথীতে পড়েছে

ভৌগোলিক পরিবর্তনে নগরও স্থানান্তরিত হয়। ষষ্ঠ শতকের মল্লসারুল লিপিতেই সর্বপ্রথম বর্ধমানভুক্তি ও 'বর্ধমান' নামের প্রথম সংকেত পাই -- "পুণ্যোত্তর জনপদধ্যাসিতায়াং সততধর্মাক্রিয়া বর্ধমানাং বর্ধমানভুক্তৌ"—। এখান থেকে যে ইঙ্গিত পাই (১) এই জনপদ পূণ্যকর্মে রত, (২) সততধর্মক্রিয়ায় ব্যস্ত ও (৩) বর্ধমানভুক্তি এতদঞ্চলে প্রদেশ ও 'বর্ধমান' এই জনপদের নাম। তাম্রলিপিটি সামন্তরাজ বিজয়সেনের, অর্থাৎ সামন্ত রাজার উপরে একজন ক্ষমতাবান ও পরাক্রমী অধীশ্বর ছিলেন। দশম শতকের ইর্দালিপি, লক্ষণ সেনের নৈহাটি ও গোবিন্দপুর লিপিতে "বর্ধমানভুক্তির" নাম পাই। বরাহমিহির গৌড়ক, বর্ধমান ও তাম্রলিপ্তক -- তিনটি পৃথক জনপদ বলে উল্লেখ করেছেন। পাল ও সেন আমলেই দণ্ডভুক্তি ছাড়া বর্ধমানভুক্তি আরও তিনটি ভাগের কথা জানা যায় - উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ় এ পশ্চিমাখাটিকা। বারহমিহির (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক) 'বর্ধমান'কে একটি পৃথক জনপদ বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যে পরাক্রমী রাজচক্রবর্তীর কথা বলেছেন ও যাদের প্রতি আক্রমণে গ্রীক সৈন্যগণ প্রতিহত হয়েছিল, তা এই রাঢ়ের রাজচক্রবর্তী ছাড়া কেউ নয়। তারপরেই আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে গৌড়রাজ কান্তিদেব পাল "হরকলা-বর্ধমানে" রাজধানী স্থাপন ক'রে রাজত্ব করছেন। আর একটি হরকলা বা হরিকেল আছে, তা সমতটের সঙ্গে যুক্ত। অতএব কান্তিদেবের রাজধানী যে বল্লুকা নদীর তীরে মেমারির সন্নিকটে বর্তমানের "হরকলা-বড়েগ্রা'ই সেকালের প্রতাপশালী রাজধানী "বর্ধমান" এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অগ্রজ গবেষক ভট্টাচার্য জ্ঞানতাপস সুকুমার সেন সঙ্গত কারণেই একে প্রাচীন বর্ধমান বলে উল্লেখ করেছেন। কান্তিদেব বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি রাজধানীতে যে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন তা বর্তমানের 'বোহার' গ্রাম। এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ও ছাত্রাবাস ছিল। পরবর্তী পাঠান আক্রমণে এটি ফারসীভাষা শিক্ষার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয় - তার প্রাচীন নমুনা আজও মিলবে।

রাঢ় অঞ্চলের নদীগুলি স্রোতপ্রবাহের খাত পরিবর্তনে স্বভাবধর্মী। গঙ্গা বহুপূর্বে পূর্ববাহিনী ছিল না, কেবলই দক্ষিণ বাহিনী । সে সময়ের বহুজনপদলুপ্ত, বহুজনপদ গঙ্গার
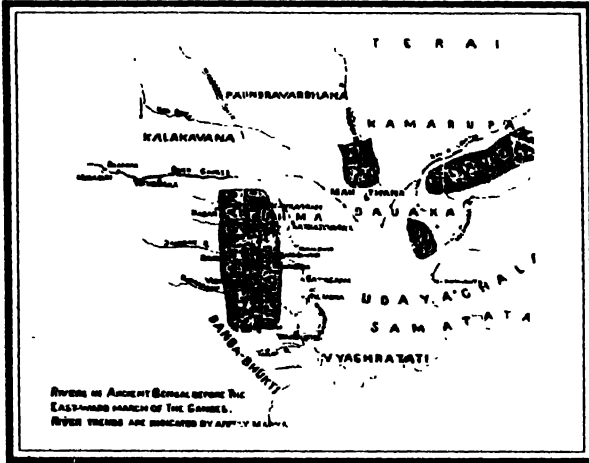
গঙ্গা বহুপূর্বে
পূর্ব বাহিনী ছিল না,
দক্ষিণ বাহিনী ছিল।

নূতন পূর্ববাহিনীর গর্ভে বিলীন। বহু নতুন নামে গড়ে উঠেছে নূতন নগর ও জনপদ। তাই ফন-ডেন-ব্রোকের ও জাও-ডি-ব্যারোসের মানচিত্রে কেবলই ভাঙাগড়ার খেলা। অন্যনদীগুলি কালপ্রবাহে পরিবর্তন ও দিগবদলে ভৌমঅভিগাতেই সমর্পিত। ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ''বাঙলা ও বাঙালি'' গ্রন্থে যে কয়েকটি প্রাচীন মানচিত্র সন্নিবিষ্ট করেছেন, তাতে দেখা যায়, গঙ্গাপূর্ববাহিনী হবার পূর্বে উত্তরবঙ্গকে ''পৌন্ড্রবর্ধন''; মধ্যবঙ্গকে ''সূহ্ম'' ও দক্ষিণবঙ্গকে ''দণ্ডভুক্তি'' বলে চিহ্নিত করেছেন। আর পূর্ববঙ্গকে তিনটি -- ডাউকা (DOUCA) বর্তমান 'ঢাকা', উদয়াচল ও সমতট - ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার গঙ্গার পশ্চিম তীরে Upland Plateau বা উচ্চমালভূমি অবস্থিত। এই মালভূমির মধ্যস্থল দিয়ে দামোদর কেবলই পূর্ববাহিনী হয়ে ভাগীরথীতে সমুদ্রগড়ের কাছে মিশেছে; এই নদীই বল্লুকা - যা আজ মজে খালে ও বিলে পরিণত। সে সময়ে আসামকে কামরূপ ও পূর্ববঙ্গকে ডাউকা (বর্তমান ঢাকা), উদয়াচল ও সমতটে চিহ্নিত করা হত। দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার প্রবাহপথে ছিল - কঙ্কগ্রাম, কর্ণসুবর্ণ, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম। রাঢ় বাঙলার বুক চিরে যে নদীগুলি আবহমানকাল বইত - দামোদর, অজয়, বরাকর, ব্রাহ্মণী, খড়ি, বাঁকা, কুনুর, বেহুলা, মুন্ডেশ্বরী, গাঙ্গুড়, দেবখাল, কানা দামোদর, খড়েগশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, শিবা, খুদিয়া, নুনিয়া, বাবলা, তমলা, সিঙ্গারণ, চাঁদা, কণ্ডেশ্বরী, গৌরী, ইলসরা, ঘিয়া, খরিণখালি, কামাখ্যাখাল, সাইনি, পাঠাননালা, ভনওয়ারখাল, কামালের খাল, কাঁটাখাল, ময়ূরাক্ষী, কোপাই, রূপনারায়ণ প্রভৃতি অনেকগুলি আজ অস্তিত্বহীন। কোন কোন নদী আবার পল্লীনামের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। বহু নদী যেমন অনেক জনপদকে গ্রাস করেছে, তেমনি বহু নদী অপর দিকে নূতন পল্লীকে উগরে দিয়েছে। তেমনি নগর বর্ধমান ও তার অস্তিত্ব স্থানান্তর করেছে। গঙ্গাপূর্ববাহিনী

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দামোদরও ক্রমশ খাত পরিবর্তন করে দক্ষিণ বাহিনী হয়েছে। আর পূর্ববাহিনী দামোদর, তখনকার বল্লুকা আজ মজে যাওয়া অস্তিত্বহীন কাঁদর, জোল বা জলায় পরিণত দামোদর আরও একবার খাত পরিবর্তন করে আঝাপুর জৌগ্রাম-কুলীন গ্রাম, ঋজুকুলা (জুলকুলা), ভাস্তারা পাণ্ডুয়ার নিকট মহানদ প্রভৃতি গ্রাম ছুঁয়ে ত্রিবেনীর কাছে সরস্বতী নদীতে পড়ত। এই নদীর নামই ছিল বেহুলা, সতী বেহুলা এই নদীতেই ভেলা ভাসিয়েছিলেন। দামোদর তৃতীয়বার খাত বদল করে জামালপুর ব্লকের সেলিমাবাদ আর জামালপুরের কোলছুঁয়ে সুঁড়ে কালনা, চকদীঘি, তারকেশ্বর হয়ে বর্তমান দামোদরের রূপ নিয়েছে। মনসামঙ্গলে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বেহুলা নদীতীরবর্তী যে জনপদগুলি পাই তা হল -- কুঝাটি, গোবিন্দপুর, গঙ্গাপুর, দেপুর, নেয়াদা, কেজুয়া, আদমপুর, গোদাঘাট, কুকুরঘাটা, হাসনাহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, গহরপুর এবং তারপরেই বেহুলা গঙ্গায় মিশে গেল। এই খাতটি দ্বিতীয়বারের পরিবর্তিত খাত। বেহুলা নদী বর্ধমান শহরের মধ্যস্থল কমলাকান্ত কালীবাড়ি, খোসবাগান, বহিলাপাড়া (বেহুলা থেকেই এই পল্লীর নাম বহিলাপাড়া) হয়ে ভৈটা, পালসিট, করন্দা হয়ে মেমারির দক্ষিণ দিক হয়ে বইত। বল্লুকার তীরে রামাইপণ্ডিত দশম শতাব্দীতে শূন্যপুরাণ রচনা করেন ও ধর্ম পূজার প্রচলন করেন। প্রাচীন ইতিহাস আর ভূগোলের পরিপ্রেক্ষিতে আজ যে চিত্র তা বর্তমান ভৌমপ্রকৃতির নবতম রূপ। দামোদর প্রথমে ছিল কেবলই পূর্ববাহিনী এবং তা সরাসরি পূর্বমুখে গিয়ে গঙ্গায় পড়ত, আর এরই তীরে গড়ে উঠেছিল অতীতের রাজধানী "বর্ধমান"। দামোদর দ্বিতীয়বার খাত পরিবর্তন করে মনসামঙ্গলের যুগে (১৬৪০ খ্রি.), তখন এর নাম ছিল বেহুলা, চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য নগরী গলসীর কসবা-চম্পাই নগরী, সেটি বল্লুকার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সরস্বতী নদীতে পড়ত। তখনকার নগর বর্ধমান ক্রমশ পশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুরের দিকে সরে আসতে থাকে।

নগর বর্ধমানের অস্তিত্ব সন্ধানে

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের "বাঙলা ও বাঙালী" থেকে দেখা যাচ্ছে -- দামোদর তিনবার খাত বদল করেছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে গৌড়েশ্বর কান্তিদেব পালের রাজধানী ছিল 'বর্ধমান', বর্তমান নাম হরকলা - বড়েএগ্রা - মেমারির সন্নিকটে বল্লুকা নদীর তীরে। কান্তিদেবের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার প্রাচীন পালি ও সংস্কৃত ভাষা চর্চার প্রধান পীঠস্থান ছিল। পাঠান আক্রমণের পর ১১৮৯ হিজরীতে বোহার ও বড়েএগ্রার বহু পুরাকীর্তি এর সাক্ষী। সুবে বাঙলার নবাব আলিবর্দীর আমলে রাজধানী মুর্শিদাবাদের রমরমার ফলে বর্ধমানের কদর কমে যায়। কিন্তু বোহার তখনও ফারসী ও আরবি চর্চার কেন্দ্র ছিল। রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজার প্রচলনের ফলে বল্লুকা, বেহুলা ও দামোদরের প্রবাহপথে ব্যাপকভাবে ধর্মপূজার প্রচলন শুরু হয়, যা আজ গ্রাম বর্ধমানে প্রতিটি গ্রামেই দেখতে পাওয়া যায়। বর্ধমানের প্রাচীনত্বের বহু নজির ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে "বর্ধমানের" উল্লেখ রয়েছে, জৈনধর্মগ্রন্থ "আচারাঙ্গসূত্রে" রাঢ়ের উল্লেখ রয়েছে। পৌন্ড্রবর্ধন বর্তমান বরেন্দ্রভূমি, কিন্তু সুহ্ম (SUHMA) কেন বর্ধমান ভুক্তি হল, এর উত্তরে বলা যায় -- "বর্ধমানের"

উল্লেখ ও তার প্রাবল্যই সুহ্মা বর্ধমানভুক্তিতে পরিণত। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার অজয়নদকে সাধারণত উত্তর রাঢ়ের ও দক্ষিণ রাঢ়ের বিভাজক বলেছেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বর্ণিত দক্ষিণ রাঢ়ই গঙ্গারিডি। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থে যে সব নগরের উল্লেখ পাই তা হল — তাম্রলিপ্ত, পান্ড্রবর্ধন (পাণ্ড্য), পার্থলিস (বর্তমান গড়তালিত), গৌড়, কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদে শশাংকের রাজধানী), উচাপ্রদেশ (সন্ধ্যাকর নন্দীর "রাম চরিতে এই 'উচা' প্রদেশের উল্লেখ আছে), হরিকেল, পুষ্করণা (পোখরান), "বর্ধমান বা বর্ধমানপুরম", কোটিবর্ষ, বিক্রমপুর নব্যাকাশিকা, ভুরশুট, বিজয়পুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, নদীয়া ইত্যাদি। এর মধ্যে উল্লেখ্য হরিকেল ও বর্ধমানপুরম নগরটি উল্লিখিত জনপদগুলিকে কেন্দ্র করেই তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে। যেমন পার্থালিস (গ্রীক উচ্চারণ) > পারতালিত > গড়তালিত। উচা হিউয়েন সাং বর্ণিত উছাপ্রদেশ বর্তমান উচালন, নবাবকাশিকা -- অধুনালুপ্ত হাওড়া ও মেদিনীপুরের নয়াবাকশি ও বাকশি বন্দর, আর 'বর্ধমানপুরম্' হল উক্ত জনপদগুলির রাজধানী, যার প্রাদেশিক নাম "বর্ধমানভুক্তি", যেমন বর্ধমান জেলার সদর শহর "বর্ধমান"। এই বর্ধমানের অস্ট্রিক নাম "বড়েঞা"; আবার যেহেতু সুহ্মভূমিই পরবর্তী 'রাঢ়' অতএব রাঢ়ের আদিবাসিন্দা "বোড়ো-ডোম" অর্থাৎ অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় অনার্য সম্প্রদায় এবং এদের কেন্দ্রীয় বাসভূমি "বড়েঞা" ও তৎপার্শ্ববর্তী প্রদেশ সেই কারণেই অপভ্রংশিয় নাম "বোড়ো-ডোমন > বড়োডোমন > বড়ডমন বা বরডোয়ান ইংরাজিতে বার্ডোয়ান (Burdwan); যার সংস্কৃতায়িত নাম "বর্ধমান" হওয়াই স্বাভাবিক। ধর্মঠাকুরের উপাসকদের কাছে দামোদর ছিল -- "সত্যের গঙ্গা দামোদর, আদ্যের গঙ্গা দামোদর"; আর এর সমর্থন পাই, ছোটনাগপুরের সোনাঝুরি ঝর্ণাকে সাঁওতালরা 'দামুদা'কে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করে, "The Damodar is the sacred river of Santals" - Dist. Gazetteer by J.C.K. Peterson।

পাঠান আমলে নগর বর্ধমানের সন্ধান

স্বভাবতই বল্লুকা ও বেহুলা মজে যাওয়ায় এবং দক্ষিণ বাহিনী দামোদর প্রবল খরস্রোতা হওয়ায় বর্ধমান নগরী বল্লুকার খাত হতে সরে মূল দামোদর প্রবাহ পথে সরে আসে পশ্চিম দিকে পাঠানদের অব্যবহিত আগমনের পরেই। সুলতান সুলেমান কররানীর সময় থেকেই নগর বর্ধমান আবার পাদপ্রদীপের আলোয় এসে যায় পাঠানশক্তির সুসংহত কেন্দ্রস্থল হিসেবে (১৫৬৫ খ্রি.)। আকবর বাঙলা অভিযানে মানসিংহকে ও মুনিমখাঁকে পাঠালে রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬ খ্রি.) সুলেমান কররানীর পুত্র দায়ুদ খাঁ পরাস্ত ও নিহত হন এবং অপর সেনাপতি টোডরমল বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে ঘাঁটি স্থাপন করেন ও দাউদের পরিবারবর্গকে বর্ধমান রাজবাটিতে অবরোধ করেন। সে সময় দায়ুদের রাজধানী ছিল কাঞ্চননগরে। দায়ুদ পিতা সুলেমান কররানী বাঙলার সিংহাসনে বসেন ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে ও দায়ুদকে বর্ধমানের শাসনকর্তা করে পাঠান। দায়ুদ খাঁ সম্রাট হয়েই স্বাধীন নরপতি বলে নিজেকে ঘোষণা করেন, নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রার প্রচলন করেন। দায়ুদ মোগল সম্রাট আকবরের রাতের ঘুম কেড়ে নেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর দায়ুদ পুত্র কুট্টি খান দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সন্ধি

করে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। ভারতে ইসলাম রাজত্বের সময় প্রথম ১৫৭৪ খ্রি. অব্দে "বর্ধমানের" নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উঠে আসে "Burdwan is first mentioned in Muhammadan histories in 1574 in which year, after Daud Khan's defeat and death at Rajmahal, his family were captured in the town of Burdwan by Akbar's troops". মোগল ইতিহাসে বর্ধমানের প্রথম নাম পাওয়া যায় ১৫৯০ খ্রি. অব্দে আবুলফজল রচিত Ain-i-Akbari গ্রন্থে "We find Burdwan mentioned in the Ain-i-Akbari as a mahal or paragana of Sarcar Sharifabad" – Prof. Blockman. তারপর সর্বভারতীয় ইতিহাসে জাহাঙ্গীর -শের আফগান - নূরজাহান - কুতুবদ্দীনকে কেন্দ্র করে "বর্ধমান" শিরোনামে উঠে আসে। পাঠানদের আক্রমণে রাঢ় অঞ্চলের সামন্তরাজাগণ ছত্রভঙ্গ ও পরাস্ত হলে অল্প আয়াসে বর্ধমান তাদের দখলে চলে যায়। বল্লুকার বড়েঞা ক্রমশ ক্ষীণকায় ও পরিত্যক্ত হয়ে উঠলে কাঞ্চননগর - লাকুড্ডি তখন নদীবন্দর হিসাবে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। বল্লুকার খাত মজে যায়, নদীবন্দরের সমৃদ্ধি হারিয়ে ফেলে। সুলেমান কররানী সুলতানী আমলেই কাঞ্চননগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ১৫৫৬ খ্রি. অব্দে। সেই সঙ্গে শহরের মাঝ দিয়ে বহে যাওয়া বেহুলাও অন্তঃ সলিলায় পরিণত হয়ে ভূ-গর্ভে যেন আত্মগোপন করে। লাকুড্ডির বিখ্যাত বণিক ধূসদত্তের রমরমা বাণিজ্য, সে সময় কাঞ্চননগর - লাকুড্ডি ছিল Upland Platcau অর্থাৎ উচ্চ মালভূমি। ধূসদত্তের বিশাল বিশাল বাণিজ্যপোত দামোদরের শোভা বৃদ্ধি করত। ধূসদত্তের নাতির অন্নপ্রাশনে বহু নিমন্ত্রিত রাজা মহারাজা ও বণিক বাণিজ্যপোত নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন - এই এলাকা ছিল বাঁকা ও দামোদরের উপদ্বীপের মত লক্ষপতির দ্বীপ থেকে নাম হয়ে যায় লক্ষদ্বীপ, অপভ্রংশিত হয়ে লাকুড্ডি। তখনও অষ্টম শতকের রাজধানী 'হরকলা - বড়েঞা' ইতিহাসের কীর্তি কংকাল হয়ে বহু বিখ্যাত অতিথিকে আকর্ষণ করত, তার প্রমাণ বর্তমান রাজবংশের পূর্ব পুরুষ সঙ্গমরায় বল্লুকা নদী তীরে বৈকুণ্ঠপুরেই বসত করেন, তাঁর শিবমন্দির আজও আছে।

আধুনিক বর্ধমানের অস্তিত্ব সন্ধানে

লাহোরের কোটলি মহল্লার ক্ষেত্রী কপুর শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করে ফেরার পথে এখানে স্থিতু হন বাণিজ্য করার জন্যই। এই পরিবারের বড়গুণ শাসকশ্রেণীকে তোষণ করে মনজয় করা। মোগল পাঠানের যুদ্ধের সময় সঙ্গমরায়কে বাদশাহী সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহে মুগ্ধ হয়ে পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয় চারহাজারী (কোতোয়ালী) মনসবদার। শাহজাদা জাহাঙ্গীরের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন সঙ্গম রায়। তার পুত্র বঙ্কুবিহারী রায় আরও একধাপ এগিয়ে যান। দিল্লীশ্বর বঙ্কুবিহারীকে রায়-রায়ান উপাধিতে ভূষিত করেন। বঙ্কুরায়ের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবুরাম রায় বর্ধমান ফৌজদারের অধীন বর্ধমান শহরের হৃৎকেন্দ্র রেকাবিবাজার ও মোগলটুলির কোতোয়াল ও পাকাপাকিভাবে চৌধুরী পদলাভ করেন জায়গীর পদসহ। তিনিই বৈকুণ্ঠপুর থেকে বাস তুলে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কাঞ্চননগরে চলে আসেন ১৬৫৭ খ্রি. অব্দে। এখান থেকেই বর্ধমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক নগর বর্ধমানের

সূত্রপাত। "Shortly afterwards the great Burdwan Horse where history from this period onwards is identical with that of the district was founded. *** Abu Rai, who was appointed Choudhury and Kotwal of Rekabi bazar in the town in 1657 under the Faujdar of Chakla Burdwan" (-Imperial Gazetteer. - IX Part-101 to 109 pages)। আমার "বর্ধমান পরিক্রমা" গ্রন্থের মুখবন্ধে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন "এ বছর তো ইংরেজ বণিক নগরী কলিকাতার তৃতীয় জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান জমকালো ভাবে হচ্ছে। খাস বাঙালী বণিক প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান নগরের ইতিহাস তো সাড়ে চারশো বছরও ছাড়িয়ে যায়। এখন বর্ধমান শহরের একটি ছোট খাটো ইতিহাস রচনা করলে কেমন হয়?" আমার "বর্ধমান শহরের ইতিবৃত্ত" রচনার কাজ শেষ, শীঘ্রই শহরবাসীকে তা উপহার দিতে পারব বলেই মনে করি।

গ্রন্থসূত্র —

১। Dist. Gazetteer (1910) — By J.C.K. Peterson
২। বর্ধমান পরিক্রমা — সুধীরচন্দ্র দাঁ
৩। বাঙালীর ইতিহাস — ড. নীহাররঞ্জন রায়
৪। লেখকের বাল্যে ভরা দামোদরের নৌকায় মাঝিদের কণ্ঠে শোনা গান
৫। Response to Challenge — D.V.C.
৬। দিনের পর দিন যে গেল — ড. সুকুমার সেন
৭। রাজবংশানুচরিত — রাখালদাস মুখোপাধ্যায়
৮। ভারতচন্দ্রের কাব্য — রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র
৯। Ain-i-Akbari — Prof. Block Man
১০। রেনেলের এটলাস, ফন-ডেন-ব্রোক, জাও-ডি-ব্যারোস মানচিত্র
১১। বাঙলা ও বাঙালী — রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়
১২। বাঙলার ইতিহাস (২য়) — ড. সুকুমার সেন
১৩। রাঢ় চর্চা — ড. পঞ্চানন মণ্ডল
১৪। বর্ধমান পরিচিতি — বলাই দেবশর্মা
১৫। বিজয়তোরণ ১৯৯৮ শারদীয় - বল্লুকার সভ্যতা — গদাধর কোঙার
১৬। জৈন আচারাঙ্গ সূত্র (অনুবাদ) — হীরাকুমারী বোথরা
১৭। বর্ধমান সম্মিলনী হীরকজয়ন্তী সংখ্যা
১৮। Imperial Gazetter

গড়তালিতে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ

বারদুয়ারী কাঞ্চননগর

খণ্ডিত অণুতে পাই সমগ্রের সচল মহিমা

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিগলিত অথচ রুখোশুখো, ঐতিহ্যভরাট অথচ আশুচল, লোকায়ত অথচ ধ্রুপদী, স্থিতিবৎসল অথচ গতিক্ষিপ্ত বর্ধমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই এক জৈব খণ্ডাণু। প্রত্যহের স্বেদরক্তে সে একাধারে পরিবর্তনমান, অন্যধারে প্রত্নবর্ধিষ্ণু। কালকালান্তরের কত বিচিত্র আভা তার প্রত্নস্থাপত্যে, কত বিচিত্র মূর্ছনা তার সঙ্গীত সাহিত্যে। চলাচলেও কত আকরিক উত্তরাধিকার তার শ্যামবৈভবে, শস্যঝংকারে, খনিজ ঐশ্বর্যে, তার প্রবাহিত জলগরিমায়। কখনও সে ফেনিয়ে ওঠে রৌদ্রতুমুলে, কখনও অঘোর চন্দ্রচারিতায়।

আসলে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ থেকে পাথর তামা ব্রোঞ্জ আর লোহার যুগের প্রত্নসম্ভারকে বহন করে শক, হুন, পাঠান, মোগল আর ইংরাজের হাজার চিহ্ন বহন করে বর্ধমান এগিয়ে চলছে ভবিষ্যতের দিকে। এমনকি পণ্ডিতেরা এ কথাও বলে থাকেন যে গণ্ডোয়ানা যুগের পুরানো নদ-নদী বাহিত পলিমাটি অঞ্চল এই বর্ধমান। পশ্চিমবাংলার প্রথম প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা এখানেই গড়ে উঠেছিল। রাঢ় বঙ্গের তরঙ্গায়িত ভূভাগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই বর্ধমানের ভৌগলিক অবস্থান ২২°৫৬´ ও ২৩°৫৩´ উত্তর অক্ষাংশ ৮৬°৪৮´ ও ৮৮°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বিস্তৃত। কর্কটক্রান্তি ২৩ $\frac{১}{২}$ ও উত্তর অক্ষাংশে জামালপুর-পোষলা-গুসকরা-দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের উপর দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে সম্প্রসারিত। জেলার মোট আয়তন ৭০২৪ বর্গ কি.মি.। বর্তমানে ৬টি মহকুমার চৌহদ্দী নিয়েই বর্ধমান জেলা। মহকুমাগুলি হল বর্ধমান উত্তর, বর্ধমান দক্ষিণ, কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল। জেলার মূল সীমারেখা উত্তরে অজয় নদ, পূর্বে ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে দামোদর ও দ্বারকেশ্বর, ও পশ্চিমে বরাকর নদী। চারদিকের সীমা হচ্ছে পূর্বে ভাগীরথী নদী ও নদীয়ার কিছু অংশ, পশ্চিমে বিহারের ধানবাদ ও দুমকা জেলা, উত্তরে বিহারের দুমকা ও বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার আংশিক ও দক্ষিণে হুগলী, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কিছু অংশ। জেলার ভূপ্রকৃতির গঠন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ছোটনাগপুর মালভূমির উচ্চতর পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পাঞ্চেত, মাইথন ও মাসানজোড় পাহাড় ও এদের সৃষ্ট লাল কাঁকুড়ে মাটির পুরাভূমি, অজয়-বরাকর-দামোদর-ভাগীরথী প্রভৃতি নদীর অববাহিকা দ্বারা গঠিত নব্যভূমি বা নতুন পলিমাটির স্তরের সহাবস্থানে গড়ে উঠেছে, বর্ধমান জেলা। তবে এ জেলার ওপরস্তর সৃষ্ট হয়েছে দামোদর উপত্যকা অববাহিকা দ্বারা।

বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ অঞ্চলে প্রথম পুরোগলীয় যুগের পাথর কুঠার পাওয়া যায়। কাঁকসার বনাঞ্চল থেকে কোয়ার্টজের ও নুড়ি পাথরের তৈরী কুঠারও পাওয়া যায়। দুর্গাপুরের কাছে বীরভানপুরের প্রত্নক্ষেত্রে পাওয়া যায় নবাশ্মীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক মসৃণ কুঠার ফলক, তীর, খনিত্র, তক্ষণ ছেদক প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন থেকে অনুমান করা হয় যে এখন থেকে ৬০০০ বছর আগে দামোদর নদের তীরে প্রথম বসবাসকারী আদিম জনগোষ্ঠী ছিল এ অঞ্চলের মানব সমাজ। আবার উৎখননের ফলে অজয় নদের

তীরে তাম্রাশীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। যাই হোক, বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব প্রত্ন নিদশর্ন পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ক্রমপরম্পরাকে ধরে রেখেছে এই জেলা। সভ্যতার বিকাশের স্পষ্ট নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এই জেলা জুড়ে। মধ্যযুগেরও বহু স্থাপত্য নিদর্শন ও শিলালিপির চিহ্ন বহন করে চলেছে বর্ধমান।

বর্ধমানের সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো মঙ্গলকাব্যের অনেক কবিই বর্ধমান থেকে উঠে এসেছে। মঙ্গলকাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ রূপরাম রায় ছাড়াও মানিকরাম গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামকান্ত রায়, রসিক মিশ্র প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের কবিরাও এই বর্ধমানেরই লাল মাটির সন্তান। এছাড়াও চৈতন্যজীবনী রচয়িতা গোবিন্দ দাসেরও জন্মভূমি বর্ধমান। সাধককবি কমলাকান্তও এই বর্ধমান থেকেই উঠে এসেছেন। মধুযুগের সমাজ, সংসার, আধ্যাত্মিক ভাবভাবনা এই সব কবির লেখায় সুপরিস্ফুট। রাষ্ট্রীয় দমন, পীড়ন যে বারে বারেই জৈবিক ও সামাজিক নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেছে এ সব লেখায় তার পরিচয় কোথাও প্রত্যক্ষে আবার কোথাও বা পরোক্ষে দেওয়া আছে।

এ তো বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের মত বর্ধমানের অতীত আর মধ্যযুগকে আংশিক এক ঝলক দেখা গেল। কৃষি ও খনিজ সম্পদের এক পোক্ত বনেদের ওপর শিল্পের পত্তনী শুরু হল আধুনিক বর্ধমানে। মূলত ভারী শিল্প আর যান্ত্রিক চাল প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাপনা বর্ধমানের মূল শিল্পোদ্যোগ। অন্যান্য শিল্পের বিকাশ বাড়লেও তা আশানুরূপ বাড়েনি। মূলত কৃষি ফসলের ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ভবিষ্যৎ এখানে যথেষ্ট উজ্জ্বল। কারণ কৃষি ফসলের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি বর্তমানে বর্ধমানের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিরই সাক্ষ্য বহন করছে।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বর্তমানের বাজারসর্বস্ব বিশ্বায়নবাতিকতা বর্ধমানের সরকারী ভারী শিল্পের ওপর আঘাত করছে। এ থাবায় কৃষিপণ্যের দাম কমছে, সারে সরকারী ভর্তুকীও তুলে নেবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও। ফলে বর্ধমানের আর্থিক সামর্থ্যও দিনের পর দিন কমজোরী হয়ে পড়ছে।

শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা বর্ধমানে মধ্যযুগের যে উচ্চতায় উঠে এসেছিল, সে উচ্চতা এ যুগে আমরা আয়ত্ত করতে পারিনি। যদিও নজরুল, শৈলজানন্দের হাতে বর্ধমানের সাহিত্যক্ষেত্র অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে তবু বর্তমান সংস্কৃতির প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্প সাহিত্যের মানদণ্ডে এখানকার নন্দনচর্চা প্রত্যাশিত গুণমান অর্জন করতে পারে নি। শিল্প সাহিত্যের প্রবাহিত ধারা এখানে যতটা অনুশীলন-সমৃদ্ধ, পরীক্ষানিরীক্ষামূলক ধারাটি ততটা অনুশীলনসমৃদ্ধ নয়। তা ছাড়াও এ ধারাটিকে যথাযথ সহায়তা দানের ক্ষেত্রেও অনেক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।

বর্ধমানে বিচিত্র লোকায়ত শিল্পের ধারাটি কিন্তু হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার স্পন্দনকে এখনও সচল রেখেছে। সরকারী সহায়তা এই শিল্প কিছুটা পায় বটে, কিন্তু ছুট্ ছুট্ চটুল সংস্কৃতির প্রভাব জনরুচিকে বহুলাংশে যেভাবে প্রভাবিত করেছে তাতে লোকায়ত

সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হয়ে উঠছে। শুধু এ সংস্কৃতি কেন, রুচিস্নিগ্ধ ও ঋদ্ধ সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি ওই আগ্রাসী সংস্কৃতির সামনে অসহায় বোধ করছে। এরই ফলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে অস্থিরতা, অসংলগ্নতা ও উৎকেন্দ্রিকতার প্রকোপ বাড়ছে তাকে প্রতিহত করতে না পারলে সুস্থ ও সবল জীবনাচরণের উৎসগুলি ক্রমশই শুকিয়ে যেতে থাকবে।

বিলগ্নতার এ চোরাবালি থেকে উঠে আসতে গেলে এ মাটির চলাচলের ইতিহাসের গভীরে আমাদের ডুব দিতে হবে। এখানকার লতাপাতায়, পাখপাখালিতে, লাল কাঁকুড়ে মাটির অভ্যন্তরে, পলিপ্রলেপে, লোকায়ত জীবনের সকাল সন্ধ্যেয় উৎসারিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ পথচিহ্নের কত ইঙ্গিত। বর্তমানের চাহিদার প্রতি মান্যতা দেখিয়েও সেই উৎসারিত সংকেতের পাঠোদ্ধার আমাদেরই করতে হবে। সাম্প্রতিক সর্বস্বতার মত্ততা আমাদের নেশাকেই শুধু এক মাত্রা থেকে আর এক মাত্রায় বাড়িয়ে যাবে। প্রকৃতিচারিতার, সংযোগ প্রাবল্যের যে শিক্ষা বর্ধমান আমাদের যুগযুগান্তর ধরে দিয়ে যাচ্ছে, তথাকথিত আধুনিকতার কুহকে সে শিক্ষা থেকে আমরা যদি ভ্রষ্ট হই তবে শেষ পর্যন্ত ক্ষতি আমাদেরই। বিশ্বজনীনতার পাঠ এ প্রবণতাকে মান্য বই অমান্য করে না। আঁতুড়মাটিকে ভালবাসলে জগৎমাতা মুখ ফিরিয়ে নেয় না, বরং আরও কাছেই টেনে নেয়।

(প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী ও ঝর্ণা বর্মনের প্রবন্ধ থেকে তুলে এনেছি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।)

□ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বর্ধমান জেলা কমিটি, স্মরণিকা, ডিসেম্বর ২০০০ □

বিজয়তোরণ, বর্ধমান

কাঞ্চননগরের অবক্ষয় ও বর্ধমান শহর

কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত

পুরনো বর্ধমান নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। সেই ব্রিটিশ শাসক-ঐতিহাসিকেরা শুরু করে গেছেন গঙ্গাহৃদি রাজ্যের রাজধানী বর্ধমানে ছিল কিনা, এই শহরের নাম কিভাবে হল, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব প্রাচীন রাঢ়ের কেন্দ্র বর্ধমানে ছিল কিনা এসব বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। আজও চলছে তা নিয়ে গবেষণা ভাষণা, এখনও অনুমান সিদ্ধান্তের শেষ হয় নি।

মোটামুটিভাবে সপ্তম শতাব্দীতে বর্ধমান যখন কর্ণসুবর্ণের অন্তর্গত, সে-সময় থেকে বর্ধমানের ইতিহাস একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে। এও আজ স্বীকৃত যে তখন থেকেই কাঞ্চননগর বর্ধমানের নগর-জীবনের মূল কেন্দ্র। আজকে বর্ধমান বলে যে শহরকে আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম বৃহত্তম দ্রুত বর্ধমান সেই শহরের মূল বীজটি প্রোথিত হয়েছিল এই কাঞ্চননগরেই। ঐতিহাসিকদের মধ্যে বর্ধমান শহরের অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে যতই মতান্তর থাকুক না কেন, কাঞ্চননগরের অতীত গুরুত্ব নিয়ে কোনও দ্বিমত অন্তত আজ আর নেই।

কিন্তু যে কাঞ্চনগরের থেকে বর্ধমান শহর গড়ে উঠেছে আজ তার কি রূপ? যেখানে বর্ধমান শহরের অন্যান্য অংশ সদা কর্মব্যস্ত, জনসংখ্যার চাপে ফেটে পড়তে চাইছে, শহরের দুই প্রান্তে জি. টি. রোড ধরে নগর-জীবন ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে চাষের জমি চিহ্ন মুছে ফেলে, কাঞ্চননগর সেখানে প্রায় ঘুমন্ত এক আধা-শহর বা শহরতলীর মুখোশ পড়ে ঝিম ধরে আছে তার অজস্র বাঁশঝাড়-ঝোপ-ঢিবি-ডোবা-পুকুর-কাঁচা রাস্তা-নদীর ঘাটের অলস-মন্থর জীবন যাপনে।

অথচ ১৮৬৫ সালে যখন বর্ধমান পৌরসভা স্থাপিত হয় তখন থেকেই কাঞ্চননগর এই পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত। শহরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণের এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই গেছে ১৮৮১ সালে নির্মিত ইডেন ক্যানেল, এরই দক্ষিণের সীমানা এঁকেছে দামোদর নদ। এখানেই রয়েছে শহরের তিনটি উল্লেখযোগ্য নদীর ঘাট, এখানকারই অংশ হল বহু পুরনো পাড়াগুলি -- ইদিলপুর, রথতলা, আজগুবিতলা, আঞ্জিরবাগান, বারোদুয়ারি (পরে যার নাম হয় উদয়পল্লী এবং খড়েগশ্বর।)

শুধু বড় বড় প্রাসাদোপম বাড়ির ধ্বংসাবশেষই কাঞ্চননগরের পুরাতন সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করছে এমন নয়। পুরনো চওড়া রাস্তা, বড় বড় দুয়ার (গেট), পুকুর, বাজার এসবের থেকেও বোঝা যায় এককালে এই অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগর এলাকা ছিল। এখনও কাঞ্চননগরের অনেকেই নতুন বাড়ির ভিত খুঁড়তে গিয়ে পুরনো ইটের বাড়ির কংকাল ছুঁয়ে ফেলেন। তাছাড়া বর্ধমানেশ্বরের মত বিশালায়াতন পাথরের শিব মূর্তিও এই অঞ্চলের ভূ-গর্ভ থেকেই পাওয়া গেছে। সর্বোপরি এখানকার স্থানীয় নামগুলি —পাথুরে মহল, কর্মকার মহল, গুড়ে হাটা, লবণগোলা, পসারী মহল, খোট্টা মহল, চুনে পট্টি, তুলো মহল, মুসলমানপাড়া, বামুনপাড়া, পূর্ব পাড়া, ডাঙাপাড়া ও আরও অন্যান্য সাক্ষ্য দেয় অতীতের এক অত্যুন্নত স্থান বিভাজনের। কোথাও ভূমি ব্যবহার, কোথাও অধিবাসীদের কর্মনিযুক্তি

পেশা, কোথাও আবার অধিবাসীদের মূল দেশ, জাতি ধর্ম থেকে শুরু করে স্থানটির দিক ও ভৌগলিক চরিত্র পর্যন্ত এই বিভাজনের ভিত্তি।

ঠিক কবে থেকে কাঞ্চনগরের এই সমৃদ্ধির শুরু তা আর এখন বলা যায় না, কিন্তু কাঞ্চননগরের পতন হয়েছে অত্যন্ত ধীরে ধীরে, গত দু-তিনশো বছর ধরে, একটার পর একটা প্রতিকূল ধাক্কায়।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে, যেখানে মাটির রঙে ক্রমশ লালচে ছোপ ধরেছে আর নদীবাহিত পলির একঘেয়ে সমভূমির জায়গায় উঁচুনীচু ঢেউ খেলানো পাহাড় ও শালের বন দেখা দিয়েছে তার প্রান্ত ঘেঁষে উত্তর থেকে বরাবর দক্ষিণে পরপর গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি জনপদ। বীরভূমে যেমন এ ধরনের জনপদ রয়েছে, বর্ধমান-বাঁকুড়াতেও রয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের এই জনপদগুলির মুখ্য কাজ ছিল মালভূমি ও সমভূমি অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন সম্পদ ও উপকরণের আদান প্রদান। শুধু রাঢ়েই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গেছে, এরকম ভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে এ ধরনের গঞ্জ বা শহর। কাঞ্চননগরের গুরুত্ব এসব জনপদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়ে যাবার কারণ দামোদর। প্রকৃতপক্ষে তার মরা-মজা-কানা শাখাগুলিকে নিয়ে দামোদর যে এক আভ্যন্তরীণ বদ্বীপ তৈরী করেছে তারই শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে কাঞ্চননগর। যে সময়ের কথা আলোচনা করছি মনে রাখতে হবে তখন এ অঞ্চলের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যই সম্পন্ন হত নদীপথে। এসব জলপথের মাধ্যমে কাঞ্চননগর যুক্ত হত নদীপথে। এসব জলপথের মাধ্যমে কাঞ্চননগর যুক্ত ছিল দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর--সপ্তগ্রামের সঙ্গে। জলবাহিত এই বাণিজ্যের গুরুত্ব কতখানি ছিল তা বোঝা যায় যখন শুনি কাঞ্চননগরের শিল্পজাত পণ্য দেশের বাইরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও রপ্তানি হত। দামোদর সুনাব্য ছিল পশ্চিমদিকে প্রায় রাণীগঞ্জ পর্যন্ত। কাঞ্চননগরে ছুরি কাঁচি ছাড়াও তৈরি হত তরোয়াল, তালা, কুঠার, কামান প্রভৃতি যুদ্ধের হাতিয়ার ও অন্যান্য প্রয়োজনের সাজ-সরঞ্জাম। এছাড়া ব্যবসা--বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে কাঞ্চননগরের গুরুত্ব বেড়ে উঠেছিল পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমি ও পূর্বের কৃষিপ্রধান এলাকার মধ্যে জলপথে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে। বর্ধমান জেলার পূর্বাঞ্চলেও তখন শুধু চাষবাস নয়, সূতিবস্ত্র উৎপাদনের শিল্প-কর্মও বেশ উন্নতি করেছে। ফলে মোগল শাসকদের কাছে নদীবন্দর কাঞ্চননগরের কদর যে ভালোই হবে তাতে আর সন্দেহ কি।

আদতে ব্যবসায়ী বর্ধমানের রাজপরিবারও গোড়ার দিকে কাঞ্চননগরেই বসবাস শুরু করেছিলেন। তেজচন্দের আমল পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজ-উদ্যোগে পরপর নির্মিত হয়ে চলে বর্ধমানের রাজাদের আবাসগৃহ,বারোদুয়ারি ও নানান মন্দির প্রভৃতি। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা বহন করে আনছে এখানকার নানান মেলা ও উৎসব প্রভৃতি।

এই কাঞ্চননগরের অবক্ষয় ঘটল কেন, প্রশ্ন ওঠে মনে। খুব প্রচলিত একটা উত্তর আছে বন্যা। বন্যা নিম্ন দামোদরের উপত্যকায় এক সাধারণ ব্যাপার। দক্ষিণের প্রায় সমতল নদী জলা অঞ্চলে বৃষ্টির পর মৌসুমী মেঘগুলো পৌঁছায় পশ্চিমের ছোটনাগপুর অঞ্চলে। সেখানকার খাড়াই ভূমির ঢাল বেয়ে চট করে নদী নালা ধরে সেই বৃষ্টির জল এসে পৌঁছায়

নিম্ন উপত্যকায় যেখানে আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টি জল তখনও সরে যেতে পারেনি দক্ষিণে সাগরের দিকে। ফলে প্রাকৃতিক কারণেই এই অঞ্চলে বন্যা অবশ্যম্ভাবী। কয়েক বছর অন্তরই বন্যা হত, দামোদরের উভয় পাড়ে এই বন্যার তীব্রতা ছিল ঢের বেশি। তার মধ্যে ১৭৭০ সালের বন্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে ইংরেজ পণ্ডিত হান্টার লিখে গেছেন, 'The town of Bardwan was almost totally destroyed'¼ মনে রাখতে হবে হান্টার-বর্ণিত এই বর্ধমানের কেন্দ্র হল কাঞ্চননগর। এর পরে ১৮২৩ ও ১৮৫৫ সালের বিধ্বংসী বন্যাগুলির পরে স্থির হয় দক্ষিণ পাড় বাদ দিয়ে দামোদরের উত্তর পাড়ের বাঁধগুলিকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, যাতে বর্ধমান শহরকে উপর্যুপরি বন্যার কবল থেকে বাঁচানো যায়। কিন্তু ততদিনে কাঞ্চননগরের মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে গেছে।

আমার ধারণা বন্যার প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও কাঞ্চননগর বেঁচে থাকত যদি ইতিহাসের ঘটনাগুলোর ধারা অন্যরকম হত। কাঞ্চননগরের মাটির নিচে পরপর কয়েক স্তর ভিত পাওয়া যায় পাকা বাড়ির, তা থেকেই প্রমাণ হয় বন্যার বারবার আক্রমণে কাঞ্চননগর ধ্বংস হয়েও আবার গড়ে উঠেছিল অতীতে। এমনকি বন্যার পরে জমা জলের থেকে মহামারীও কাঞ্চননগরের অবক্ষয়ের মূল কারণ নয়। ইডেন খাল তৈরির মূল উদ্দেশ্যই এই জমা জলের সুষ্ঠু নিকাশ। কিন্তু কাঞ্চননগরের গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে দামোদরের নাব্যতা কমার সঙ্গে সঙ্গে মোগল শাসকদের পরিবর্ত সড়কপথ নির্মাণের প্রচেষ্টা থেকে। নদীবাহিত বাণিজ্য এর ফলে সরে যেতে থাকে বর্ধমান শহরের পূর্ব দিকে, সড়কপথে। তা সত্ত্বেও দেশীয় বাণিজ্যের বেশিরভাগই সম্পন্ন হত নদীপথে, যতদিন পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ সমাধা না হয়। পরিবহনের বিভিন্ন উপায় এবার উপস্থিত হল তাদের নিজ নিজ তুলনামূলক সুবিধেগুলো নিয়ে। দামোদরের উত্তর পাড়ের বাঁধ ও রেলপথ নির্মাণ প্রায় এক সময়েই ঘটে, কিন্তু তার বছর কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই রেলপথের গুরুত্ব বেড়ে যায় বহুগুণে। ফলে মোগল আমলে ভিন্ন ধরনের পরিবহন মাধ্যমের সূচনার মধ্য দিয়ে কাঞ্চননগরের অবক্ষয়ের যে সূত্রপাত, তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় ব্রিটিশ যুগে, রেলপথ নির্মাণের পর। তাছাড়া দ্রুতহারে জনবৃদ্ধি ও চাষবাসের প্রসার পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের অরণ্য নিধন ও ভূমিক্ষয়কে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছিল। তারই ফলে দামোদরের নিম্ন উপত্যকার নদী নালাগুলি বুজে যেতে শুরু করে। আর এই ক্রমহ্রাসমান নাব্যতায় অনিবার্য শিকার কাঞ্চননগর। পলি পড়ে নদীর বুক যত বুজে যাবে, ততই বাড়বে বন্যার সংখ্যা ও প্রচণ্ডতা। ফলে পরিবর্ত পরিবহনের প্রয়োজন অনুভূত হবে, এবং শেষ পর্যন্ত নগর-কেন্দ্র অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হবে। কাঞ্চননগরের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই দেখতে পাই।

কিন্তু কি হল কাঞ্চননগরের অত্যুন্নত শিল্পের? ব্রিটিশ আমলে দেশীয় পণ্যের বাজারকে নষ্ট করে দেওয়া হল ভেবেচিন্তে, নানান সরকারী নিয়মকানুনের মাধ্যমে। দেশীয় পণ্যের বাণিজ্য, আগেই বলেছি, সম্পন্ন হত নদীপথে। চাপিয়ে দেওয়া হল উচ্চহারে কর, প্রতিটি ঘাটে নৌকার মাল তোলা-নামানোর ওপরে, নৌকা ভেড়ানোর ওপরে। এই অসম দ্বন্দ্বে কাঞ্চননগরের দেশীয় শিল্পের, কুটির, ভিত্তিক শিল্পের নাভিশ্বাস উঠল। শেফিল্ডের ছুরি কাঁচি দখল করে নিল কাঞ্চনগরের ছুরিকাঁচির বাজার।

যে কোন শিল্প গড়ে ওঠে, টিকে থাকে সমসাময়িক রাজারাজরাদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে। হয়ত ইতিহাসের এত বিরূপতা সত্ত্বেও কাঞ্চননগরের গৌরব অটুট থাকত যদি না বিরূপ হতেন তেজচন্দ্রের পরবর্তী বর্ধমান রাজকুল। খ্যাতি ও সমৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রাজবংশের প্রয়োজন হল কাঞ্চননগরের চেয়ে নিরাপদ অঞ্চলে বাসগৃহ গড়ে তোলার। শুধু বন্যাই নয়, বর্গী আক্রমণের সময়েও কাঞ্চননগর ছিল সবচেয়ে নিরাপত্তাবিহীন এলাকা। ফলে বাঁকার উত্তর পাড়ে, উঁচু জমিতে, সড়ক ও রেলপথের অনেকটা কাছাকাছি তৈরি হল মহাতাব-মঞ্জিল, বর্মানের রাজপ্রাসাদ গোষ্ঠী, যা এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও উইমেন্‌স্ কলেজের এলাকা। আর রাজবাড়ি থাকলেই তাকে ঘিরে গড়ে উঠবে শহরের ধনী, উচ্চবর্গের ব্যবসায়ীদের আবাস-এলাকা, ভারতে এ-ও একটা পুরনো ঐতিহ্য। সেই সঙ্গে ব্রিটিশবিদ্বেষী মনোভাবের পরিবর্তে ইংরেজ তোষণের মানসিকতা দেখা দিল এই রাজ পরিবারে। রাজনীতির এই পট পরিবর্তনের যেন বাহ্যিক লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পেল রাজবাড়ির স্থানান্তরণ, ইংরেজদের তৈরি রেলপথ ও সড়কের কাছাকাছি সরে আসার মধ্যে দিয়ে বর্ধমানের রাজপরিবারের চিন্তাধারার এই আমূল পরিবর্তন প্রকাশ পেল। এর আগেই জাল প্রতাপচাঁদের ঘটনা ঘটেছে; কাঞ্চননগরেই দেখা দিয়েছিল সেই সন্ন্যাসী যাকে প্রতাপচাঁদ বলে সাজানোর চেষ্টা করা হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সন্ন্যাসীর প্রধান সমর্থক ছিলেন কাঞ্চননগরের বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনীরা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই এলাকার প্রতি রাজপরিবারের বিরাগ গড়ে উঠেছে। তারই জের চলেছে বর্ধমান পৌর এলাকা গঠনের পরবর্তী কালেও।

বর্ধমান শহরের নগর কার্যকলাপের মূলকেন্দ্র এভাবেই কাঞ্চননগরকে ফেলে রেখে ক্রমশ পূর্ব উত্তরপূর্ব দিকে সরে গেছে। এখনও গত এক দশকে, এই শহরের বৃদ্ধি লক্ষ্য করলেও বোঝা যাবে শহরটা ক্রমশ বাড়ছে উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্বে, জি.টি. রোড বরাবর। আধুনিক পরিবহন কেন্দ্রিক এসব এলাকা থেকে (যেমন রেল স্টেশন, কার্জন গেট, তিনকোনিয়া, বি. সি. রোড) কাঞ্চননগরের অবস্থান বহু দূরে -- স্থান ও কাল দু'য়ের হিসেবেই। কাঞ্চননগরের আপেক্ষিক দুর্গমতা আরো বাড়িয়েছে তার অবহেলিত, সরু, কাঁচা পথগুলি। কাঞ্চননগরে দামোদরের ঘাটগুলিতে শস্য বোঝাই সোনার তরী এসে ভিড় করে না আজ বহু যুগ।

তবুও, শেষ হয়েও সব শেষ হয় নি। ইতিহাসের অমোঘ লীলায় কাঞ্চননগর তার গুরুত্ব হারিয়েছে, বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র সরে গেছে সেখান থেকে। আবার হয়ত ইতিহাসেরই কোন এক সোনার কাঠির ছোঁয়ায় কাঞ্চননগর জেগে উঠবে।

কাঞ্চননগরের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে জি. টি. রোডের বাইপাস। দুর্গমতা যেখানকার মূল সমস্যা, শহরের অন্যান্য অংশ থেকে সহজে পৌঁছানোর একটা ব্যবস্থা হলে সেখানে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠতে পারে বইকি। হয়তো দেখা যাবে অদূর ভবিষ্যতে এই রাস্তাই কাঞ্চননগরের জীয়নকাঠি হয়ে উঠবে।

□ 'নভস্পৃক', ১ম বর্ষ, ১লা এপ্রিল, ১৯৯৪ □

বর্ধমানের দর্শনীয় স্থান

সঙ্কলক - মদনমোহন সাধু

পীর খোক্কর শাহ (দরগা) যতদূর জানা যায় --সকল মানুষকে যারা সম-মর্যাদা দেবার কথা ভাবতেন সেইরকম একজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ কাবুল ও পেশোয়ার মধ্যবর্তী 'খাক্‌রোহী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আজমীরে খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগায় সিদ্ধিলাভ করবার পর চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজবাটির দক্ষিণ অংশে পায়রা খানায় এখন যেখানে তার দরগাটি আছে--- সেই স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন। আনুমানিক ১৩৫০ খ্রি. তিনি দেহত্যাগ করেন। বর্তমানে এই দরগাটি হিন্দু মুসলমানের মিলিত তীর্থস্থান। এখানে বৎসরে চারবার উৎসব হয় সবেবরাত, ঈদলফেতর, ইদ্দুজুহা ও ওরস (প্রতিষ্ঠা দিবস)।

পীরবাহারাম (সাক্কা) (ভিস্কিওয়ালা) ইনি প্রথম জীবনে কাবুলের উ. প. অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে গুরুর আদেশে জলদান ব্রত গ্রহণ করেন। বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান পুরাতন চক এলাকায় আসেন ও হিন্দুযোগী জয়পালের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৫৬৩ খ্রি. তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট ফারুকশিয়রের নির্দেশে তাঁর কবরের উপর স্মৃতি সৌধটি নির্মিত হয়।

শের আফগান ও কুতুবুদ্দিনের সমাধি বর্ধমানের তদানীন্তন শাসনকর্তা শের আফগান (মেহেরউন্নিসা বা নূরজাহানের প্রথম স্বামী) এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রেরিত সেনাপতি ও দুধভাই কুতুবুদ্দিনের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ১৬১০ খ্রি. উভয়ে নিহত হন। তাদের কবর স্থানটি পীরবাহারামের কবর স্থানের পাশেই। এটি জাতীয় সৌধ হিসাবে সংরক্ষিত।

কালো মসজিদ পায়রাখানা থেকে পীরবাহারামের কবরের দিকে যেতে ডান দিকে এই মসজিদটি (১৫৫৭ খ্রি. নির্মিত) অবস্থিত। এইস্থানে 'শেরশাহ' তৎকালীন দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে ১৫৩১ খ্রি. কিছুকালের জন্য অজ্ঞাতবাসে ছিলেন।

খাজা আনোয়ার বেড় বাংলায় পাঠান বিদ্রোহের সময় দিল্লির বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত মোগল সেনাপতিদ্বয় খাজা আনোয়ার ও আবুল কাশেমকে--বর্ধমানে রহিম খাঁ হত্যা করেন। নিহত খাজা সাহেবের সম্মানে ১৭১৫ খ্রি. সম্রাট ফারুকশিয়রের নির্দেশে মোগল স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন-স্বরূপ এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়। বর্তমানে সদরঘাট যাবার রাস্তার থেকে ডান দিকে সামান্য ঘুরেই এখানে হাজির হওয়া যায়।

জিমা মসজিদ বর্তমান পায়রাখানায় এই মসজিদটি পাঠান বিদ্রোহীদের পরাজিত করার পর সম্রাট আলমগীরের পৌত্র 'আজিম-উশ-শান' এই আজিমা বা জিমা মসজিদটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রতিষ্ঠা করেন।

শিখদের পবিত্র স্মৃতি সৌধ বর্তমান শ্যামবাজার জল টাঙ্কির (সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দক্ষিণ দিকে) কাছে ১৬০৫ খ্রি. গুরু নানক যেখানে পদার্পণ করেছিলেন--সেইস্থান শিখদের নিকট পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। গুরু নানকের জন্মদিনে বর্ধমানের গুরুদুয়ারা থেকে বিরাট শোভাযাত্রা এখানে আসে ও বিশেষ ধুমধাম সহকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

বারদুয়ারী বর্ধমানের রাজ পরিবারের পূর্বপুরুষ আবু রায় ১৬৫৭ খ্রি. বর্তমান কাঞ্চননগরে (সে সময় বর্ধমানের এটাই বর্ধিষ্ণু অঞ্চল ছিল) বসবাসের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করান। সেই প্রাসাদটি এখন ধ্বংস প্রাপ্ত। এই প্রাসাদের নিকট যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি হিসাবে রাজা কীর্তিচাঁদ রায় এই তোরণ দ্বারটি ১৭৩০ খ্রি. কাছাকাছি নির্মাণ করেন। তার তোরণ দ্বারটি এখনও অক্ষত। এই তোরণ দ্বারের উপরিভাগে ছোট ছোট বারটি তোরণের মত তৈরি করা আছে। এখানে কয়েকটি ভগ্নদশাগ্রস্ত মন্দির এখন বাংলার বিখ্যাত পোড়ামাটির কাজের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এই তোরণ দ্বারটি ভারতের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে কর্তৃক সংরক্ষিত। পুরো এলাকাটি বর্ধমানের শেষ রাজপুরুষ উদয়চাঁদ মহাতাব-- পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য দান করেন।

কঙ্কালেশ্বরী বর্ধমানের পশ্চিম প্রান্তে কাঞ্চননগর মধ্যযুগে অনেক রাজারই রাজধানী ছিল। অনেকের মতে কাঞ্চননগরের পুরানো নাম ছিল--'কর্ণসুবর্ণ'। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল 'কর্ণসুবর্ণ'। এখানে জঙ্গলের ভিতর (এখন অনেক পরিষ্কার) 'কঙ্কালেশ্বরী' মন্দির যে কোন পর্যটককে আকর্ষণ করবে। এর বহির্গাত্রের কারুকার্য বেশ প্রাচীন কিন্তু উঁচু মানের, মন্দিরের থেকে কৌতূহল জাগায় এর প্রতিষ্ঠিত মূর্তি। মানব দেহের গঠনশৈলীর (Anatomy) অপূর্ব প্রকাশ--পাথরে খোদাই করা অষ্টভূজা চামুণ্ডা মূর্তি--এক মানব কঙ্কালের মত। জনৈক পরিব্রাজক কমলাকান্ত (সাধক কমলাকান্ত নন) এ মূর্তি মন্দিরের নিকটবর্তী দামোদর বালির ভিতর থেকে উদ্ধার করেন এবং এই মন্দিরে (পূর্বে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল) প্রতিষ্ঠা করেন। সন্দেহাতীতভাবে মূর্তিটি অতি প্রাচীন--কিন্তু এর বয়স এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি।

গোবিন্দ দাসের স্মৃতি সৌধ (করচা প্রণেতা) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত ও অনুচর ছিলেন। কাঞ্চননগরে বাড়ি ছিল। ১৪৩০ সালে ইনি গৃহত্যাগ করেন।

দেবী সর্ব্বমঙ্গলা (বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী) ১৭৪০ খ্রি. কিছু পূর্বে মহারাজ কীর্তিচাঁদ স্বপ্নাদেশ পেয়ে বর্তমান বাহির সর্বমঙ্গলা অঞ্চলে খোঁজ করে দেবী মূর্তিটি পান। বর্তমান মন্দিরের পূর্ব দিকে পূর্বদুয়ারী মন্দির, নাট মন্দির ও দক্ষিণ দিকে সদর তোরণ নির্মাণ পূর্বক দেবী মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দিকে যে দুটি দক্ষিণ দুয়ারী শিব মন্দির আছে তা তাঁর দুই পুত্রবধূ (চিত্রসেনের স্ত্রী) ইন্দ্রকুমারী ও চন্দ্রকুমারীর নামে। পরে রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান দক্ষিণ দুয়ারী মন্দির, নাট মন্দির ও তিনটি শিব মন্দির নির্মিত হয়েছে। বর্তমান মূল মন্দির ও শিব মন্দিরগুলি, বিশেষত মধ্যেরটি (মিত্রেশ্বর শিব) বাংলার বিখ্যাত পোড়ামাটির কাজে সমৃদ্ধ।

প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এই মূর্তি ১১/১২শ শতাব্দীর কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত অষ্টাদশ ভুজা, মহিষমর্দিনী, মন্বন্তরা মূর্তি। মূর্তির পাদমূলে লেখাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এর মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

এটি ১৯৫৬ হতে ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত।

জমিদারী অধিগ্রহণের পর রাজ এস্টেটের আয় কমায় ও রাজবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করার পর ১৯৫৮ সালে উদয়চাঁদ মহাতাব তাঁর সবকটি কামানের লাইসেন্স (৫২টি) সরকারে প্রত্যর্পণ করলেও জনসাধারণের দাবিতে মহারাজা সরকারকে অনুরোধ করায় একটি কামান ১৯৫৯,১৬ জুন সম্পাদিত ট্রাস্ট বোর্ডের হাতে হস্তান্তরিত হয় ও ১৯৬০, ১২ই মে থেকে সরকার লাইসেন্স ফি মুকুব করেন। এই কামান হতে এখনও প্রতি বৎসর বীরাষ্টমীর দিন তোপধ্বনি করে সন্ধিক্ষণ ঘোষিত হয়।

দুর্লভা কালী প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার শালিপুর/লক্ষ্মীপুর (বর্তমান উচালন) হতে স্বপ্নাদেশ পেয়ে গোকুলানন্দ স্বামী নামে এক গৃহী সাধক এই স্থানে আসেন। পূর্বে এখানে বেহুলা নদী প্রবাহিত হত। এই স্থানে স্বপ্নের নির্দেশমত একটি কালিমূর্তি পরিত্যক্ত অবস্থায় পান। তিনি এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মৃত পুত্র দুর্ল্লভ এর নামে এর নামকরণ করেন।

১০৮ শিব মন্দির ১৭৮৯ খ্রি. (১১৯৪ বঙ্গাব্দ) মহারাজ তেজচাঁদ মাতা ও তিলকচাঁদ মহিষী বিষণকুমারী কর্তৃক রাস পূর্ণিমা লগ্নে প্রতিষ্ঠিত। আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট জপমালার আকরে ১০৮টি শিব মন্দির ও পূর্বদিকে বহিঃপ্রান্তে জপমালার মেরুর মত একটি মন্দিরের অবস্থান--নবাবহাট (রেল স্টেশন থেকে ২ কি.মি. পশ্চিমে) অঞ্চলে। জমিদারী অধিগ্রহণ হওয়ার ফলে বহুদিন অবহেলিত থাকার পর ১৯৬৭-৬৯ সালে বিড়লা জন কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক পূর্ণ সংস্কার হওয়ায় ও বর্তমান ট্রাষ্ট বোর্ড এটির বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করায় এটি এখন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

প্রতি বৎসর শিব চতুর্দশীর সময় লক্ষাধিক ভক্ত সমাগমে ৭দিন ব্যাপী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। শ্রাবণ মাসে প্রচুর শৈব ভক্তরা আসেন শিব পূজা মানসে।

বর্ধমানেশ্বর শিব ১০, ৮, ১৯৭২ খ্রি. আলমগঞ্জে মাটির নিচে থেকে এই সুবৃহৎ শিবলিঙ্গটি পাওয়া যায়। লিঙ্গটির বেড় ৫ ফুট, গৌর পট্ট ১৮ ফুট, উচ্চতা ৫৩ ইঞ্চি, ওজন ৯ টন-- কালো কষ্টি পাথরের। এখনও মন্দির নির্মিত হয় নি। অস্থায়ী চালা ঘরে মূর্তিটি আছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদদের কারও কারও মতো এটি পাল বংশের রাজাদের আমলের।

কমলাকান্ত কালী সাধক কবি কমলাকান্তের জন্ম ১৭৭৯ খ্রি. অম্বিকা কালনায়। বাল্যকাল অতিবাহিত হয় মাতুলালয়ে -- খানাজংশনের কাছে চান্না গ্রামে। মহারাজ তেজচাঁদ তাঁকে কোটাল হাটে সাধনার ও বাসস্থানের জায়গা দেন এবং তাঁকে বর্ধমানের রাজসভার সভাপণ্ডিতের আসন দেন। তাঁর সাধন স্থানে তাঁর পঞ্চমুণ্ডির আসন ও পূজাবেদী এখানে বিদ্যমান। এখন সেখানে পাকা মন্দির গৃহনির্মিত রয়েছে এবং ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক নিয়মিত পূজা, ভোগ ও বার্ষিক উৎসব যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে।

বিদ্যাসুন্দর কালী ১৭৯০ খ্রি. কাছাকাছি বর্ধমানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মহারাজ তেজচাঁদ-- একটি বসতি স্থাপন করেন--তেজগঞ্জ। এই কালিমূর্তি এখানকার স্থানীয় আরাধ্যা দেবী। পরে উহা বিদ্যাসুন্দর কালী নামে খ্যাত হন। এই মন্দিরটি এখন জরাজীর্ণ।

সোনার কালী (মিঠাপুকুর) ১৮৯৮/৯৯ খ্রি. (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৩০ ফাল্গুন) মহারাজ মহতাব চাঁদের দ্বিতীয়া মহিষী নারায়ণকুমারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মূল ঁভুবনেশ্বরী মূর্তির বামে পঞ্চমুণ্ডির আসন। পূর্বদিকের ঘরে শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবী, দক্ষিণদিকে শিব। প্রবেশ দ্বারের উপরে নহবৎখানা। প্রথম দেউরিতে সুদৃশ্য ফোয়ারা ছিল।

রাধাবল্লভজীর মন্দির বর্তমান মন্দিরের কাছেই ১৮১৯ খ্রি. হিজহাইনেস বর্ধমানাধিরাজ মহাতাব চাঁদ 'রাজ রাজেশ্বর' শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২০ খ্রি. রাজমাতা কমল কুমারীর ইষ্ট দেবতা 'রাধাবল্লভের' জন্য এই মন্দির নির্মাণ করান। এরই সংলগ্ন অবস্থিত 'অন্নপূর্ণা' ও শ্বেত-প্রস্তর নির্মিত দশভুজা দুর্গা মূর্তি।

লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির বর্ধমান রাজবংশের ইষ্ট দেবতা 'লক্ষ্মীনারায়ণ'। এই মন্দিরটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে এই মন্দির চত্বরটিতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় আড়াইশো বৎসরের ত্রিস্তর কাজ বিদ্যমান। মূল মন্দির দরজায় প্রবেশ করেই বাঁদিকে দক্ষিণ মুখে গিয়ে পুনরায় পশ্চিম মুখে যাবার সময় প্রথম ভগ্নপ্রায় প্রবেশ পথ আছে, তার দক্ষিণে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরের একটি ছাদের খিলানের কাজই প্রমাণ করে যে সেটি ১৬০০খ্রি. কাছাকাছি কোন সময়ের। মূল মন্দির ও তার ডান ও বাম দিকের দ্বিতল অংশের প্রথম তলের সঙ্গে মূল মন্দিরের সংযোগ দুটি বিভিন্ন সময়ে নির্মিত বলে পরিষ্কার বোঝা যায়। যাইহোক রেকাবী বাজার (বর্তমান নূতনগঞ্জের পূর্বদিকের আগে এই নাম ছিল) এলাকায় ১৮৪৯ খ্রি. মহতাব মঞ্জিল (বর্তমান রাজবাটি) নির্মাণের আগে এই মন্দিরের মূল বা বর্তমান অংশ নির্মিত হয়। প্রথমে স্বয়ম্ভু ভুবনেশ্বর শিব (পাতাল শিব) মন্দির ও পরে লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির নির্মিত হয়। এখানে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজিউ ছাড়া ও ঁরঘুনাথ জিউ, ঁগোপাল জিউ, ঁরাধাকৃষ্ণ জিউ, ঁগণেশ জিউ পূজিত হয়। এখানে রূপার ও পিতলের রথ ছিল। পিতলের রথটি এখনও জীর্ণ অবস্থায় আছে--রথের মেলাও হয়। ঝুলনের সময় মেলা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হয়।

প্রকাশ থাকে এখানকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহ, বিজয়ানন্দ বিহারের শিবরাত্রির অনুষ্ঠান, রাধাবল্লভীর জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান, সর্বমঙ্গলার বীরাষ্টমী, খোক্কর সাহেবের ওরস উৎসবে রাজবংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ড. প্রণয়চাঁদ মহতাব নিজে সস্ত্রীক উপস্থিত থেকে তত্ত্বাবধান করেন।

বিজয়ানন্দ বিহার কৃষ্ণসায়র পুষ্করিণীর উত্তরে রমনার বাগানের পূর্বে মহারাজ বিজয়চাঁদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বিহার। এটি মহারাজ বিজয়চাঁদের জপক্ষেত্র বা আধ্যাত্মিক জগতের লীলাক্ষেত্র। এখানে ১টি পুষ্করিণী বিজয়েশ্বর শিব ও শঙ্করাচার্যের মূর্তিসহ মন্দিরগাত্রে শঙ্করাচার্যের শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। এই এলাকায় প্রবেশ করলে একটা পবিত্র ভাব মনের মধ্যে আপনিই এসে যায়। এখানকার মন্দিরগুলির বিশেষত্ব এগুলি লাল বেলে পাথরের (Red Stand Stone) তৈরী। এই স্থানে তিনি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের উদ্যোগে সকল ধর্মের আরাধনার ব্যবস্থা রাখেন।

বিজয় তোরণ গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড হতে পশ্চিম মুখে বর্ধমানের প্রবেশ পথে ১৯০৪ সালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের বর্ধমান শহরে আগমন উপলক্ষ্যে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ 'কার্জন গেট' তোরণটি নির্মাণ করেন। বর্তমানে এটির নাম 'বিজয় তোরণ'।

মহন্ত-অস্থল মহারাজ কীর্তিচাঁদ চন্দ্রকোনা ও ঘাটাল জয়ের জন্য যখন যুদ্ধযাত্রা করেন -- তখন পথে রাজগঞ্জে এক সাধুবাবা (নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের) মহারাজকে যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদ করেন। যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসে সন্ন্যাসীর আরাধ্য দেবতা রঘুনাথ কৃষ্ণমূর্তিকে এক সু-উচ্চ দেউলে প্রতিষ্ঠিত করেন ও উক্ত সন্ন্যাসীকে পাঁচশ বিঘা নিষ্কর জমিসহ উক্ত মন্দির ও বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন--আনুমানিক ১৭৩০ খ্রি.। তাঁকে বর্ধমানের মহন্ত পদে বৃত করেন। ঐ সময় বারদুয়ারী তোরণ ও কাঞ্চননগরের বৃহৎ কাঠের দুটি রথের ও মেলার সৃষ্টি হয়। মহন্ত-অস্থল প্রাসাদ ও মন্দির জীর্ণদশাপ্রাপ্ত। পূর্ব জৌলুসের কণামাত্র নাই। এখানে এখন হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ চলছে।

উড়েকালী কালীতলা বলতে বর্ধমানের রূপমহল সিনেমার কাছে এই কালীমূর্তি এলাকাকেই বোঝে।

ঈশানেশ্বর শিব শ্যাম সায়রের ঈশান কোণে অবস্থিত। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাতায়াতের পথে কয়েকবার এই মন্দিরে আসেন ও এর পাশেই মহারাজের নির্মিত যাত্রী নিবাসে বিশ্রামও নিয়েছেন।

সিদ্ধেশ্বরী কালী ও সিদ্ধেশ্বর শিব সন্ধানে জানা যায় প্রায় একশত বৎসর পূর্বে রাজবাটির অবসর প্রাপ্ত পদস্থ কর্মচারী রায়না-পলাসন নিবাসী জনৈক ঘোষ মহাশয় সাধন মানসে এই দেব ও দেবীর দুটি মন্দির নির্মাণ করান। উক্ত সাধকের মৃত্যুর পর রাজ এস্টেট এই মন্দিরদ্বয়ের ভার নেন। জমিদারী প্রথা বিলোপের পর ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ হতে স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা গঠিত পরিচালন সমিতি কর্তৃক নিত্যসেবা ও উৎসবাদি পরিচালিত হচ্ছে।

ধনেশ্বরী মন্দির মহতাব চাঁদ কন্যা ধনদেয়ীদেবী এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সর্বমঙ্গলা মন্দির সংলগ্ন।

শক্তিদেয়ী দেবীর মন্দির মহারাজ বিজয়চাঁদের ভগিনী নূতনগঞ্জ এলাকায় এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

ওঁ ক্লীং কালীবাড়ি সদরঘাটে স্বামী অভয়ানন্দ গিরির সাধন ক্ষেত্র ও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

সায়র ঃ—

শ্যাম সায়র ১৬৭২ খ্রি. জমিদার ঘনশ্যাম রায় খনন করান - পরিধি $\frac{১}{২}$ মাইল।

কৃষ্ণ সায়র ১৯৬২ খ্রি. (১২৭৬ মন্বন্তরের পর) রাজা কৃষ্ণরাম রায় খনন করান - পরিধি ১ মাইল।

রাণী সায়র ১৬০৯ খ্রি. জগৎরাম রায় মহিষী ও রাজমাতা ব্রজকিশোরীর স্মরণে কীর্তিচাঁদ রায় খনন করান। পরিধি ৩/৪ মাইল।

কমল সায়র আনুমানিক ১৬৯৮ খ্রি. রাজা তেজচাঁদ মহিষী কমলকুমারীর নামে খনন করান।

মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল (প্লানোটোরিয়াম) এশিয়ার সর্বাধুনিক তারামণ্ডলের মধ্যে একটি। গোলাপবাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত।

বিজ্ঞান কেন্দ্র সাধারণে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েক বৎসর পূর্বে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। গোলাপবাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত দিকে অবস্থিত।

কৃষ্ণসায়র পরিবেশ উদ্যান বর্ধমানের মধ্যে মনোমুগ্ধকর, দৃষ্টি নন্দন পুষ্প, বৃক্ষ, শোভিত সর্পগৃহ, মৎসাগার ও নৌকা বিহারের মনোরম স্থান।

রবীন্দ্রভবন নৈমিষারণ্য, বোরহাটে অবস্থিত রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অন্যান্য শহরের সঙ্গে এটিও গড়ে উঠে।

রাধারাণী স্টেডিয়াম ভাতছালা এলাকায় শেষ রাজবধূ মহারাণী রাধারাণীর নামে এই স্টেডিয়ামটি বর্ধমানে খেলাধূলার জগতের প্রথম স্টেডিয়াম।

অরবিন্দ ভবন কোর্ট কম্পাউন্ডে ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত একটি পুস্তকাগার এবং ভারতীয় কৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সুন্দর কক্ষ।

অরবিন্দ স্টেডিয়াম ভলিবল, বাস্কেট বলের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলা এখানে হয়।

কৃষক সেতু জেলার দক্ষিণাঞ্চল, হুগলীর আরামবাগ ও বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে বর্ধমানের যোগাযোগের প্রধান ও সুদৃশ্য সেতু।

উইলবাটি এটি বর্তমানে পুরোনো ঐতিহ্য হারিয়েছে। প্রথম দিকে এটি বর্ধমানে রাজবংশের সম্পত্তি ছিল না। তারাচাঁদ কাপুর উইল দ্বারা রাজবংশে হস্তান্তরিত করেন। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পূর্বে অবস্থিত। পূর্বে প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার দিন হতে শিব চতুর্দশীর দিন পর্যন্ত উইলবাটির ছবি ও মেলা বসত। মাটির তৈরী বড় বড় মানুষের মাপের পুতুল দিয়ে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে দৃশ্যপট তৈরী করে প্রদর্শন করা হত। এতে একদিকে যেমন লোকশিক্ষা ও জনসাধারণ বিশেষত কিশোর-কিশোরীরা জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করত, অপরপক্ষে শিল্পী ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সহায়তা করা হত। পূর্বে এখানে রথও ছিল। এর মধ্যস্থলে একটি সুরম্য অট্টালিকাও ছিল। এই বাড়িতে গুপ্ত কবি (ঈশ্বর গুপ্ত), কে বর্ধমান মহারাজা সসম্মানে অতিথি হিসাবে রেখেছিলেন। এখানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিশেষ অতিথিদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে এর পূর্বদিকে ভারত সেবাশ্রম সংঘের অধীনে হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

চাঁদ সদাগরের শিবমন্দির বর্ধমান থেকে পানাগড়ের নিকট দামোদর তীরবর্তী রণ্ডিয়া বাসযোগে যেতে হবে। রণ্ডিয়া থেকে ট্রেকারে করে চাঁদ সদাগরের বাসস্থান কসবা (পূর্বতন চম্পাই নগর পরগণার অন্তর্গত) যাওয়া যায়। অথবা বর্ধমান থেকে মোটর যোগে (প্রায় ৪০ কিলোমিটার) সোজা যাওয়া যায়। পুরাকালের ধ্বংসস্তূপের উপর একটা শিবলিঙ্গ ও পরে নির্মিত শিবমন্দির ও কিছু ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। চাঁদ পূজিত রামেশ্বর শিব উপরের অংশটা প্রায় ৪ ইঞ্চি তার ঊর্ধ্বাংশ ২ ইঞ্চি স্বাভাবিক গোল, আর বাকি ২ ইঞ্চি আটটা পলকাটা আর নিচের অংশের উপরে পদ্ম পাপড়ির মত গৌরীপট্ট ও তার নিচের অংশটি মাটির নিচে থেকে গেছে। মন্দিরটা ১৩৩৫ সালে গন্ধবণিক মহাসভার পক্ষে ইন্দুভূষণ বিদ মহাশয় সংস্কার সাধন করেন। এখানে প্রতি বৎসর মকর সপ্তমী থেকে শিবচতুর্দশী পর্যন্ত একটি মেলা হয়।

□ গন্ধবণিক মহাসম্মিলনী স্মরণিকা, ১৯৯৭ □

ছড়ায় মোড়া বর্ধমান

চারু দত্ত

নীলপুরে নীলের চাষ ছিল নীলকুঠি
রাজার ছিল রেসের মাঠ ঘোড়দৌড়চটি।
রাণীসায়র, কৃষ্ণ, শ্যাম কমল সায়র তার —
রাজা-রাণীর নামে আছে বিরাট দিঘী চার।
ব্রজকিশোরী, কমলকুমারী দুই রাণীর নামে
রাণীসায়র, কমলসায়র প্রবীণেরা তা জানে।
কৃষ্ণরাম রায় আর ঘনশ্যাম রায়
খনন করান কৃষ্ণ শ্যাম সায়র জলাশয়।
বাদামতলা, তেঁতুলতলা, আমড়াতলা চেনো?
আমরা তেঁতুল বাদাম গাছের চিহ্ন নাই আজ কোনো।
আলুডাঙ্গা, শিয়ালডাঙ্গা, সরিষাডাঙ্গা আছে
বালিডাঙ্গা, শালবাগান গ্রাম দুখানি কাছে।
গোলাহাট, বোরহাট, টিকরহাট আর
বেচারহাট গ্রামটি আছে দামোদরের পাড়।
কলু তেলির ঘানি ছিল তেলমারুই পাড়ায়
রাধারাণী স্টেডিয়াম আছে ভাতছালায়।
বারদুয়ারী না বীরদুয়ারী? আছে একটি দ্বার
উদয়পল্লী প্রতিষ্ঠিত উদয়চাঁদ মহারাজার।
বাবুরবাগ, গোলাপবাগ রমনার বাগ আছে
বর্ধমানের বনদপ্তর ভরা শালগাছে।
হরিণ, হনু, কৃষ্ণসার আছে বাঘের ছাও
ছোট্ট মতো চিড়িয়াখানা দেখবে যদি যাও।
জিম্‌নাসিয়াম হলের পাশে কৃষ্ণসায়র পার্ক
ভ্রমণচারী পর্যটক ঘুরছে ঝাঁকে ঝাঁক।
কাচের ঘরে সাপের বাসা ঘুমায় তারা সুখে
রবীন্দ্রভবন, সংস্কৃতি হল আছে শহর বুকে।
গোলাপবাগের পুব সীমানায় মেইন রোডের ধারে
মেঘনাদ-তারামণ্ডল, যাও বিজ্ঞান যাদুঘরে।
খোসবাগান ডাক্তারপাড়া, আছে নার্সিংহোম
ওষুধপত্তর, প্যাথলজিস্ট ধন্বন্তরী ও যম।
ময়ূরমহল, পায়রামহল আছে পাখমারা,

মুচিপাড়া, ঘোষপাড়া পাওয়ার হাউস পাড়া।
বঙ্গদেশের দুঃখ নদ দামোদরের বানে —
বালিডাঙ্গা উঠল জেগে পলি বালির টানে।
ইডেন ক্যানেল,বাঁকানদী, নদ দামোদর
গোটা পাঁচেক সেতু আছে বাঁকার উপর।
সদরঘাটের কৃষক সেতু, দামোদবের বুকে
যোগ করেছে বর্ধমান আর হুগলী বাঁকুড়াকে।
আনন্দপল্লী, সুভাষপল্লী, শ্রীপল্লী আছে
সারদাপল্লী, বিধানপল্লী, অরবিন্দ পল্লীর কাছে।
নারীকলোনী নাম রেখেছে কোন্ আনাড়ি ভাই?
অরবিন্দ পল্লী নাম রেখেছে বাসিন্দারা তাই।
রাণীগঞ্জ, নূতনগঞ্জ আছে গঞ্জ হাট,
আলমগঞ্জে মহাশিবের আছে রাজ্যপাট।
পীরপুকুর, শাঁখারীপুকুর, গুলিপুকুর নাম
নবাবহাট একশোআট শিবঠাকুরের ধাম।
তিনকোনিয়া কালীবাড়ি, জি টি রোডের পাশে
সৎ শ্রীআকাল শিখভাইদের গুরুদোয়ারা আছে।
ধর্মগুরু নানকজী আসেন বর্ধমানে
গড়গড়াঘাট শ্যামবাজার নামক পুণ্যস্থানে।
কাঞ্চননগর কঙ্কালকালী, কড়চা রচয়িতা
গোবিন্দদাস কর্মকারের আছে নাকি ভিটা।
মিঠাপুকুর সোনারকালী গৌড়ীয়মঠ পাবে
কমলাকান্ত কালীবাড়ী? বোরহাটেতে যাবে।
লাকুড্ডি, টিকরহাট, হাইওয়ের পাশে
জলকল, দুর্লভাকালী, শ্মশান কালী আছে।
ইছলাবাদের কাজীবাড়ি রহস্যেতে ঘেরা
মোগলযুগের মোকামখানি লুটেছে বর্গীরা।
বয়েলপাড়া বহিলাপাড়া রাজার গোয়ালঘর
মোগল পাঠান বৃটিশ ঘেঁসা বর্ধমান শহর।
ভাঙাকুঠি ভেঙে গেছে, কেশবগঞ্জ চটি
৩৫টি ওয়ার্ড নিয়ে গড়া মিউনিসিপ্যালিটি।
জগৎবেড়ে কালাচাঁদ, জগৎরামের নামে
খাজা আনোয়ার নবাববাড়ি আছে বেড় স্থানে।
স্পন্দন, কল্পতরু, হাউসিং, পুলিশলাইন

মোহনবাগান, মেডিকেল মাঠ ক্রীড়াঙ্গন ফাইন।
রাধারাণী, অরবিন্দ নামে স্টেডিয়াম
ফুটবল, ক্রিকেট, ভলির স্বর্গউদ্যান।
বংশগোপালনন্দেও নির্মল প্রকাশ
টাউনহল, নির্মলঝিলে মহিমা প্রকাশ।
মিহিদানা, সীতাভোগ রসনা লোভন
শহরের প্রবেশদ্বার বিজয়তোরণ।
দেশবন্ধু, গান্ধী, সুভাষ, বিদ্যাসাগর মশাই
রামতনু, রামকৃষ্ণের চরণ ধূলি পাই।
শরিফাবাদ, রাঙামাটি, কুসুমপুব নাম
নানা নামে পরিচিত আমার বর্ধমান।
আওরঙ্গজেবের নাতি ছিল আজিমউস্ সান,
কলকাতার সূতিকাগৃহ শহর বর্ধমান।

□ শারদীয় সাপ্তাহিক 'প্রফুল্ল', ১৪০৬ □

রাজবাড়ির বিখ্যাত ঘড়ি, চাঁদনীচক্, বর্ধমান

শহর-বর্ধমানের বাণিজ্য ঐতিহ্য
একটি অনুসন্ধানী দৃষ্টিপাত
ভব রায়

১৬১০ সালে বর্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ সপার্ষদ সঙ্গম রায় শহর বর্ধমানে পাকাপাকি থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এই সূত্রে তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ প্রায় সাড়ে তিনশো বছর বর্ধমান-এলাকার 'রাজ্যপাট' নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান রাখতে সমর্থ হন। শহর-বর্ধমানের বাণিজ্য-ঐতিহ্য আলোচনা প্রসঙ্গেও এই ১৬১০ সালটিকেই আমরা যুক্তিসঙ্গত কারণে যাত্রা শুরুর সন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করে একেবারে হাল আমল ইস্তক মোটামুটি চারশো বছরের প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, এই চারশো বছরের আগে বর্ধমান নামাঙ্কিত প্রাচীন স্থানিক পটভূমির কোন বাণিজ্যিক ঐতিহ্য ছিল না। বরং, সমগ্র বঙ্গদেশের প্রাচীনতর বাণিজ্যিক প্রাসঙ্গিকতায় বর্ধমান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বরাবর। কিন্তু, শহর-বর্ধমানের আধুনিক সময়ভিত্তিক বাণিজ্যিক বিকাশের কয়েকটি আর্থ-সামাজিক তথা সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য-অনুসন্ধানই যেহেতু আপাতত আমাদের প্রধান আলোচ্য, তাই প্রাচীনতর সময়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা এখানে প্রধানত উহ্যই থেকে যাবে।

তবুও, এক ঝলক বিহঙ্গ দৃষ্টিপাতে, আমরা যদি চারশো বছর আগের প্রায় দু হাজার বছরব্যাপী জনপদ বর্ধমানের বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, তাহলে আমরা দেখবো, সেই আমলে বাণিজ্য-অভিযানে তাম্রলিপ্ত যাওয়ার পথে বর্ধমান ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কেন্দ্র। এছাড়া, তৎকালীন পাটলিপুত্র থেকে বঙ্গদেশের অন্যতম প্রধান-বাণিজ্য কেন্দ্র সপ্তগ্রামে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে দামোদর নদ যেমন ছিল অন্যতম মাধ্যম, তেমনি দামোদর তীরবর্তী বর্ধমান-জনপদ ছিল এই সুদীর্ঘ বাণিজ্য- পথে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-কেন্দ্র--এর সন্নিহিত বিভিন্ন অঞ্চলের হস্ত ও কুটির শিল্পভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রপণ্য, লৌহ-পিতল-কাঁসা জাতীয় নানা ধরনের ধাতুপণ্য, বিভিন্ন ঘরানার লোকশিল্পজাত সৌখিন পণ্যাদি ও সর্বোপরি কৃষিজাত বাজারীকরণযোগ্য (Marketable) দ্রব্যাদিই ছিল প্রাচীন বর্ধমানের প্রধান বিপণন উপকরণ। এইভাবে তৎকালীন বর্ধমান জনপদেরও সামগ্রিক সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বাণিজ্যিক স্ফুরণ, সুকুমার সেনের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে ও বিশ্লেষণেও তার প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত মেলে।

যাই হোক, আবার মূল প্রসঙ্গ অর্থাৎ ১৬১০ সাল ও সঙ্গম রায় প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আধুনিক যুগের শহর-বর্ধমানের বাণিজ্যিক ইতিবৃত্তের সূত্রে কেন এই বিশেষ প্রসঙ্গটি ঘুরেফিরে বারবার আসে, পরবর্তী আলোচনার সূত্রে তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের একটি পর্যবেক্ষণমূলক উক্তিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, '....আধুনিক কালে বাংলাদেশের দুইটি স্থান নানা দিক দিয়াই বাংলাদেশকে আগাইয়া আনিয়াছে। একটি ইংরাজ কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত ও সংবর্ধিত কলিকাতা, অপরটি কল্পিত অথবা অকল্পিত আবু রায় বাবু রায়দের প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান রাজপরম্পরা যাহা বর্তমান

শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আসিয়া মহারাজ উদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের আমলে আসিয়া উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়।' তাই বর্ধমান সম্পর্কে '... নানা দিক দিয়াই বাংলাদেশকে আগাইয়া আনা' জাতীয় উক্তির মধ্যে নিশ্চিন্তভাবেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাণিজ্যিক -সমৃদ্ধির বিষয়টিও।

আসলে, আধুনিক যুগের শহর -বর্ধমানের বাণিজ্যিক বিকাশের বীজটি ১৬১০ পর্বে সঙ্গম রায়ের হাত দিয়েই উপ্ত হয়েছিল, একথা সরাসরি বললেও সম্ভবত তা অত্যুক্তি বা অনৈতিহাসিক হবে না। কারণ, সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর থেকে আগত এই সঙ্গম রায় ও তাঁর বংশধরগণ জাতিতে ক্ষত্রিয় হলেও পেশাগত ঐতিহ্যে বণিক বৃত্তিতে ছিল তাঁদের সর্বাধিক আগ্রহ ও স্বাভাবিক প্রবণতা; এবং কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হল -- মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য করার অভিপ্রায় নিয়েই সঙ্গম রায় শহর বর্ধমানে পাকাপাকি থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কারণ বর্ধমানের সামগ্রিক পটভূমিতে তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি খুঁজে পেয়েছিল বহুমুখী বাণিজ্য-বৃত্তির সম্ভাবনা। তারপর--বণিকের মানদণ্ড... রাজদণ্ড রূপে তাঁদের ক্ষেত্রেও দেখা দিলেও কোন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বা কূট রাজনীতির দৌলতে সঙ্গম রায়দের 'রাজ্যপাট' অর্জন করতে হয় নি। বরং অনেকটাই 'ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার' মত প্রায় কাকতালীয় ভাবেই মোগল প্রশাসকদের হাত থেকে বর্ধমানের 'কোতোয়ালি' অর্জন করেছিলেন সঙ্গম রায় প্রমুখ বর্ধমানে সদ্যাগত অবাঙালী পরিবার। আর এর পাশাপাশি, তাঁরা তাঁদের বংশানুক্রমিক পেশা--শাল কম্বল বিক্রি, ধানচাল বিপণন ও তেজারতি কারবারের ব্যবসাকেও বর্ধমানের মাটিতে অব্যাহত রেখেছিলেন ও সম্প্রসারিত করেছিলেন।

ঐতিহ্যগতভাবে এই বাণিজ্যাগ্রহী 'রাজকীয়' প্রভাবপুষ্ট হয়ে শহর বর্ধমানের বাণিজ্যিক পরিকাঠামো ও চালচিত্রটিও ক্রমশ অনেকাংশেই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছিল, যার ধারাবাহিকতা সামাজিক বিকাশের নিয়মেই প্রায় পরবর্তী তিনশো বছর ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল; এমনকি, স্বাধীনোত্তর অর্ধশতাব্দী পরে, সাম্প্রতিকতম সময়েও যার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিনে নেওয়াও খুব দুরূহ নয়। এখন সঙ্গত কারণেই কৌতূহল জাগতে পারে--শহর বর্ধমানের বাণিজ্য-ঐতিহ্যের কী সেই স্বাতন্ত্র, যা বাংলার অন্যান্য শহরের ভিড় থেকে তাকে আলাদা ভাবে চিনে নেওয়া যায়? আর এই অনুসন্ধিৎসাও খুব স্বাভাবিক যে, বর্ধমানের এই স্বকীয়তাবিশিষ্ট বাণিজ্যিক বিকাশের নেপথ্য কারণগুলি বা আর্থ সামাজিক কার্যকারণের স্বরূপটিই ঠিক কীরকম?

এই কারণগুলি অনুসন্ধানের সময়ে আমাদের যে সাধারণ বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে, সেগুলি হল--সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের বাণিজ্যস্বার্থমুখী প্রভাব, বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, শিল্পবিপ্লব ও নগরায়ণ ও সবশেষে দেশভাগ তথা অগণিত উদ্বাস্তু জনসাধারণের পশ্চিমবঙ্গ পটভূমিতে স্থায়ী বসতিস্থাপন। এই ঘটনাবলী কলকাতা ও সন্নিহিত শহরাঞ্চলের বাণিজ্যবৃত্তে যতটা ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল ও সেইসূত্রে পুরনো বাণিজ্য-পরিকাঠামো ও বিন্যাসে যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, শহর বর্ধমানের মৌল বাণিজ্যিক চালচিত্রে কিন্তু এসবের প্রভাবে সেই তুলনায় খুব নামমাত্রই পরিবর্তনের দোলা লেগেছিল। তাই, কালের বিবর্তনে বর্ধমানের বাণিজ্য ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্রের ছবিটি আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল।

বর্ধমানের বাণিজ্য ঐতিহ্যের আরও কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা যাক। এবং এই রকম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধানমূলক বিষয়গুলিকে তালিকাবদ্ধ করলে মোটামুটি যা দাঁড়ায় তা হল --

(১) আমাদের আলোচ্য সময়ের শুরু থেকে প্রায় চারশো বছর ধরেই শহর বর্ধমানের গুরুত্বপূর্ণ পাইকারি ও খুচরো পণ্যদ্রব্যের বিপণন ও মহাজনী বাজারে সাধারণভাবে অবাঙালী ব্যবসায়ী-মহাজন ও বিশেষভাবে 'মারোয়ারী' সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ দেখা যায় না। অথচ আমরা জানি, কলকাতার এক অতি বৃহৎ বাণিজ্য-পটভূমি জুড়ে তো বটেই, মফঃস্বল বাংলার রাণীগঞ্জ-আসানসোল, বোলপুর-সাঁইথিয়া, এমনকি উত্তরবঙ্গের অনেক ছোট-বড় শহরেও দীর্ঘকাল ধরে বাণিজ্য মহলের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে এই মারোয়ারী সমাজ।

(২) বর্ধমান জেলার অন্যতম প্রধান বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় হল 'আগুরি' বা উগ্রক্ষত্রিয়। সর্বতোভাবে 'কৃষি' তাদের পেশা হলেও শহর বর্ধমানের বাণিজ্যিক কর্মবৃত্তের অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক হল এইসম্প্রদায়।

(৩) বাংলার সেনরাজত্বের সময় থেকে পেশাভিত্তিক বর্ণবিভাজনের যে ধারা প্রচলিত হয়েছিল সারা বাংলায়, সময়ের অভিঘাতে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে এই সামাজিক পেশা-বিন্যাসের প্রায় আকাশপাতাল পরিবর্তন ঘটে গেছে--কিন্তু শহর-বর্ধমানে দীর্ঘকাল ধরে, এমনকি আজও জাতি-বর্ণভিত্তিক পেশাগত ঐতিহ্য বহুলাংশেই বজায় রয়েছে।

(৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকগুলিতে শহর-বর্ধমানের আর্থ-সামাজিক ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামোগত বিন্যাসে অনেক নতুন অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে, ১৯৭০ দশকের পরবর্তী সময়ে দ্রুত শহর সম্প্রসারণ ও মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত মানুষদের ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী বৈচিত্রময় প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানকার বাণিজ্য-চালচিত্রেও যুক্ত হয়েছে বাড়তি মাত্রা ও বহুমুখী অঙ্গসজ্জা।

শহর-বর্ধমানের বাণিজ্যবৃত্তের উপরোক্ত স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্টময়তার নেপথ্য কার্যকারণগুলির তত্ত্বতালাশে আপাতত আমরা কিছুটা সচেষ্ট হতে পারি। এখানকার বাণিজ্য-ঐতিহ্যে কেন মারোয়ারী গোষ্ঠী শরিক হতে পারেনি, সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সূত্র বা তথ্য আজও অজানা। তবে, সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের সূত্রে এর কারণ সম্পর্কে কিছুটা অনুমানলব্ধ সম্ভাবনাকে আমরা যাচাই করে দেখতে পারি। মারোয়ারী সম্প্রদায় পশ্চিমবাংলায় এমন সব বাণিজ্যিক মহলে প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়ে স্থিতিশীল ও সক্রিয় হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন ছিল বৃহৎ পুঁজি সরবরাহকারী ব্যবসায়িক মহাজনের। শহর-বর্ধমানের ক্ষেত্রে সেই অতীতে এই বিশেষ ভূমিকাটি পালন করেছেন বর্ধমানের কোতোয়াল রাজপরিবার ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য বা সাহায্যপুষ্ট মহাজন-ব্যবসায়ী শ্রেণী। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না- বর্ধমান রাজপরিবারের, অন্তত তাঁদের রাজত্বের প্রথম পর্বে, রাজ্যপাট চালানোর পাশাপাশি একটি পরিপূরক পেশা ছিল--মহাজনী ও সুদের ব্যবসা। এই অবস্থায় মারোয়ারী সম্প্রদায় শহর-বর্ধমানের ব্যবসাবৃত্তিতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি ও খুব সক্রিয় উদ্যোগও নেয়

নি। অবশ্য, পরবর্তীকালে কিছু অঙ্গুলিমেয় মারোয়ারী, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের কিছু ব্যবসায়ী পরিবার বর্ধমানের বাণিজ্য অঙ্গনে প্রবেশ করেছিল। যাই হোক, রাজপরিবারের সহযোগিতায় পুষ্ট হয়ে স্থানীয় জাতি-বর্ণের কয়েকটি বিত্তবান ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী পরবর্তী সময়ে মহাজনের ভূমিকাটি পালন করতে থাকেন, যার ধারাবাহিকতা আজও শহর বর্ধমানে অনেকাংশেই অব্যাহত রয়েছে।

বর্ধমানের প্রধানতম হিন্দু-গোষ্ঠী উগ্রক্ষত্রিয়দের মূল জীবিকা কৃষি হলেও তাঁদের মধ্যে বিত্তবান অনেক পরিবার বর্ধমান রাজ্যের প্রদত্ত 'পত্তনিদারী' বা 'জমিদারী' লাভ করেছিলেন এবং এই কারণে ও অন্যান্য আঞ্চলিক সামাজিকতায় উগ্রক্ষত্রিয়রা রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা বিশ্বস্ততার বন্ধনে ঐতিহ্যগতভাবেই আবদ্ধ ছিলেন। তাই, প্রাচীন বর্ণবিভাজনে উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় কোন নির্দিষ্ট অ-কৃষি বৃত্তি বা কারিগরি বৃত্তিতে চিহ্নিত না হয়েও সাধারণভাবে শহর-বর্ধমানের বাণিজ্য- বৃত্তকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। উগ্রক্ষত্রিয়রা ছাড়াও শহর-বর্ধমানের আজও বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন ধরনের বাঙালী বণিক সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষ করা যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় তেল-নুন-চাল-ডালের মুদি-ব্যবসা অথবা সৌখিন সোনা-রূপার কারবার, এমনকি কাঁসা-পিতল বা সীতাভোগ মিহিদানা অন্যবিধ মিষ্টান্ন ব্যবসা-- এরকম নানা কিসিমের বাণিজ্য নিমগ্ন শতাধিক বছরের বা তারও বেশি প্রাচীন বেশ কিছু পরিবার বংশানুক্রমিক ভাবে শহর-বর্ধমানের বাণিজ্যিক ঐতিহ্যে আজও প্রভাবশালী সক্রিয়তা বজায় রেখে চলেছেন। স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, কাংসবণিক এবং মোদক বা ময়রা--এরাই হলেন এই ঐতিহ্যের প্রধান শরিক।

কৌতূহলী মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, সারা বাংলার আধুনিকতর, সদাপরিবর্তনশীল ও নিত্য নতুন পুনর্বিন্যস্ত বাণিজ্য পরিমণ্ডলে ঐতিহ্যগত বৃত্তিধারক বর্ণ বা সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপস্থিতি যেখানে কদাচিৎ চোখে পড়ে, সেক্ষেত্রে শহর-বর্ধমানে এই ঐতিহ্যগত প্রবণতা আজও অনেকাংশে প্রচলিত রয়েছে কীভাবে? এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের কিছুটা পিছু হেঁটে বর্ধমানেতিহাসের বৈশিষ্ট্যময় গতি-প্রকৃতির দিকে এক ঝলক দৃষ্টি ফেরাতে হবে। বর্ধমান রাজবংশের তিনশো বছরের ইতিহাসকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, এই রাজা জমিদাররা একদিকে যেমন ছিলেন মূলত বাণিজ্য বৈষয়িকতা অনুরাগী, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা ছিলেন প্রজাবৎসল, সমাজসেবী, উদার ও শান্তিপ্রিয়।

অধীনস্থ প্রজাবর্গের ওপর শাসক রাজবংশের মদমত্ত 'ক্ষাত্রতেজ' প্রদর্শনের কোন অভিসন্ধি বা প্রয়াস তাঁদের ছিল না। অন্যদিকে, কোন বড়সড়ো বহিঃশত্রুর হাঙ্গামা, আভ্যন্তরীণ বা আঞ্চলিক হাঙ্গামাও তাঁদের শাসনকালে লক্ষিত হয়নি, যার ফলস্বরূপ শহর-বর্ধমানের সামাজিক স্থিতাবস্থা মোটামুটিভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। উপরন্তু, বর্ধমান রাজবংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ধমানের শিল্প-বাণিজ্যের মৌলিক ধারক, বাহক বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এর সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে একদিকে যেমন শহর বর্ধমানের আঞ্চলিক বৃত্তিধারী গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক স্বাতন্ত্র্য (Identity) বরাবর অক্ষুণ্ণ থেকেছে, অন্যদিকে তেমনি তাদের ইতিবাচক, সামাজিক বিকাশের ধারাটিও

দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত রয়েছে। এসব কারণেই শহর-বর্ধমানে বিভিন্ন বনেদী ব্যবসায়ী পরিবারের বাণিজ্যধারা অনেকাংশে আজও চোখে পড়ে।

বিভিন্ন ঘরানার বণিক পরিবার ছাড়াও শহর-বর্ধমানে আরও কয়েকটি বৃত্তি-অনুসারী বনেদী পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে বিশেষ কয়েকটি ব্যবসায়িক ধারায় নিজেদের যুক্ত রেখেছেন অদ্যাবধি। এই ধারার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কয়েকটি 'কলু' বা 'গড়াই' পরিবার যুক্ত রয়েছেন ভোজ্য তেল নিষ্কাশন/বিপণন ও মুদিখানা ব্যবসায়, কয়েকটি স্থানীয় মুসলমান পরিবার হারমনিয়ম, ফ্লুট, তবলা ইত্যাকার যন্ত্রসঙ্গীত-অনুষঙ্গ বিক্রয় মেরামতি, লেপ-তোষক-বিছানার ব্যবসা ইত্যকার বিশেষ ধরনের বাণিজ্যিক কর্মোদ্যোগে যুক্ত রয়েছেন পুরুষানুক্রমে। অবশ্য উপরোক্ত বর্ণ-গোষ্ঠী ছাড়াও এইসব উদ্যোগে রয়েছেন অন্যান্য জাতি-বর্ণের মানুষরাও।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী কয়েকটি দশকে সারা দেশের সঙ্গে শহর বর্ধমানের আর্থ-বাণিজ্যিক পরিমণ্ডলে ঘটেছে বিপুল পরিবর্তন। ঐতিহ্যময়তার পাশাপাশি এই ক্ষেত্রটিতেও ঘটে চলেছে নিত্য নতুন সংযোজন। টি. ভি, টেপরেকর্ডার, ফ্রিজ-গ্যাস, আধুনিক গ্যাজেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক পণ্য থেকে শুরু করে কন্ট্রাকটরি, হোটেল ব্যবসা, ডিস্ট্রিবিউটরশিপ, প্রোমোটর বৃত্তি--এই ধরনের আধুনিক বাণিজ্যিক সংযোজনে প্রবেশ ঘটেছে পাঁচমিশালি ব্যক্তি উদ্যোগ ও সংস্থার। গ্রামীণ বর্ধমানের এক শ্রেণীর বিত্তবান চাষী পরিবার কৃষিসূত্রে অর্জিত উদ্বৃত্ত আয়ের বিনিয়োগ করে চলেছেন শহর-বর্ধমানের উপরোক্ত আধুনিকতর, পাঁচমিশালি বাণিজ্যচর্চায়। নিঃসন্দেহে, এরাও শহর বর্ধমানের বাণিজ্য অঙ্গনে একটি নতুন শ্রেণী হিসেবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে চলেছে।

বিহঙ্গ-দৃষ্টিপাতে ও অনুসন্ধানী আলোকে এই হল শহর-বর্ধমানের বাণিজ্য ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি। আরও অনুপুঙ্খ ও বিস্তৃততর অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উন্মোচন ঘটতে পারে। উপসংহারেও একথা আর একবার স্মরণযোগ্য যে, সারা পশ্চিমবাংলার পটভূমিতে নিশ্চিতভাবে শহর বর্ধমানের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে অলঙ্কৃত বাণিজ্য লক্ষ্মীর একটি উজ্জ্বল মুখচ্ছবি।

□ 'বর্ধমান সমাচার' শারদ সংখ্যা, ১৯৯৮ □

কৃষিতে সমৃদ্ধ জেলা বর্ধমান
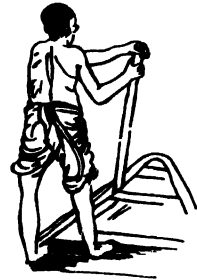
বর্ধমানে অবাঙালী ব্যবসায়ী পরিবার

বর্ধমানের মাড়োয়ারী সমাজ

সমীরণ চৌধুরী ও নিরুপম চৌধুরী

মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন প্রত্যাশিতভাবেই ব্যবসাদার কথাটি এসে যায়। সুতরাং বর্ধমানের অবাঙালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কথা বলতে গিয়ে যদি মাড়োয়ারীদের কথা না বলা হয় মনে হবে প্রতিমা ছাড়াই দুর্গাপুজো হচ্ছে। মাড়োয়ারী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে কেউ ব্যবসায়ী হবে না এ কথা বিশ্বাস করাই কষ্টকর। বর্ধমান শহরের মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ও সে কথা বিশ্বাস করেন এবং বলেনও। তাঁদের রক্তে বা জিনে ব্যবসার ভবিতব্য লেখা হয়ে যায় তাঁদের অজান্তেই। তবে ব্যবসা ছাড়া যে একজন মাড়োয়ারী আর কিছু বোঝেন না এমন ভাবনারও কোন কারণ নেই। বর্ধমান শহরেই এমন মাড়োয়ারী আছেন যিনি নজরুলের সংস্পর্শে এসেছেন। কাজী সব্যসাচী যাঁর বন্ধু ছিলেন। সেই পূরণমল গাড়িয়া সিটি কলেজে পড়ার সময়েই হেমন্ত বসুর সঙ্গে রাজনীতি করেছেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। এখন সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। ইন্দু গাড়িয়াকে অনেকেরই মনে আছে। সাতের দশকে হিংসাত্মক রাজনীতির বলি হয়েছিলেন তিনি।

পূরণমল যখন তাঁর বাড়িতে বসে কথা বলছিলেন দেখলাম তাঁর কাঁচের দেওয়াল আলমারি নানারকম বাংলা বইয়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে। যার মধ্যে রবীন্দ্র রচনাবলী, বঙ্কিম রচনাবলী ইত্যাদি শোভা পাচ্ছে। পুরণমলের বয়েস এখন পঁচাত্তরের কোটায়। বর্ধমানের মাড়োয়ারীদের পুস্তক প্রেমের ইতিহাস জানা গেল ঐ আলমারির বইগুলির প্রসঙ্গেই। তিনি জানালেন ১৯৪৪/৪৬ সালে এই বর্ধমান শহরেই ছিল দানমল স্মৃতি গ্রন্থাগার। সে গ্রন্থাগার আজ লুপ্ত হলেও তারই কিছু বই আজ পূরণমল সংগ্রহে রেখেছেন। অধিকাংশ বই বিনষ্ট হয়েছে অবহেলায়। ১৯৪২/৪৩ সালে বর্ধমানে দানমলের স্মৃতিতে ফুটবল টুর্নামেন্টও হত। আবার বর্ধমান শহরে একজন মাড়োয়ারীর নামে রাস্তাও রয়েছে। বোরহাটে বক্সিরাম মাড়োয়ারী লেনের কথা হয়ত অনেকেই জানেন। মাড়োয়ারী ধর্মশালা নির্মাণের জন্যে জমি দান সহ অনেক সমাজসেবামূলক কাজের জন্যে বর্ধমানের মাড়োয়ারী সমাজ আজও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। বর্ধমান শহরে আজ যে মাড়োয়ারীদের আমরা দেখছি তাঁদের পূর্বপুরুষরা তাহলে কতদিন আগে এসেছিলেন? কি জন্যেই বা সুদূর রাজস্থান থেকে তাঁদের বর্ধমানে আগমন?

সাল তারিখ দিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব একাশি বছরের গোকুলচাঁদ পোদ্দার বা পূরণ মল গাড়িয়া দিতে পারেন নি। তবে গোকুল চাঁদ স্মৃতি হাতরে জানালেন তাঁর বাবা-লছমি নারায়ণ পোদ্দার ২২/২৩ বছর বয়সে বরাকর থেকে বর্ধমানে এসেছিলেন। গোকুলচাঁদ সে আমলে আর এক মাড়োয়ারী লাদুরাম পণ্ডিতের টোলে পড়েছেন। তারপর রাজ স্কুলে পড়েছেন। বললেন, তখন বর্ধমানে ৫০/৬০ ঘর মাড়োয়ারী পরিবার ছিল। তাঁদের পরিবারে

ম্যাট্রিক পাশ ছেলে তখন হাতে গোনা যেত। সবাই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ব্যবসার মধ্যে প্রধানত ছিল আটা চাকী, চালের দোকান ইত্যাদি। আজ যে মাড়োয়ারী ধর্মশালা রয়েছে তা তৈরী হতে দেখেছেন গোকুলচাঁদ। এই গোকুলচাঁদের নাতির ছেলে তাঁর ভাষায় 'পুতি' কিন্তু এখন রাজ কলেজে একাউন্টেন্সিতে অনার্সের ছাত্র। একই সঙ্গে কম্পিউটার প্রশিক্ষণও নিচ্ছে। সেই কলেজ পড়ুয়া সন্দীপ পোদ্দারও কিন্তু জানালেন বড় হয়ে সে ব্যবসা করতে চায়। তবে ভালো চাকরি পেলে তা করতে সে নারাজ হবে না। প্রথম পছন্দ অবশ্যই ব্যবসা।

এই প্রজন্মের মাড়োয়ারী পরিবারের ছেলেরাই শুধু নয় মেয়েরাও লেখাপড়ায় পিছিয়ে নেই। যেমন সন্দীপ জানালেন সাধনপুর থেকে নাইট কলেজে একজন মাড়োয়ারী সহপাঠিনী পড়তে আসে। বিবাহিতা হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়েছেন সঙ্গীতা আগরওয়াল। খুঁজলে এরকম আরও উদাহরণ পাওয়া যাবে, তবে সাধারণভাবে এবং মুখ্যত ব্যবসাই হল মাড়োয়ারী সমাজের প্রধান জীবিকা। তাই সুরেশ আগরওয়াল কার্যতই হাতে গুনে বলে দিলেন বর্ধমানে তাঁদের সমাজের কে কোথায় চাকরি করছেন। সংখ্যাটা ৬-এর বেশি হবে না। ব্যবসার ধরনও খুব একটা বদলায় নি। এখনও অধিকাংশই চাল, ডাল, কলাই, তেল ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রীর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ব্যবসার ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া বলতে চালের গদী অথবা রাইস মিল। সন্দীপের মতে 'ফিফ্‌টি পার্সেন্ট মাড়োয়ারীর চালের গদী আছে' সুরেশ অবশ্য নিজে শেয়ার কেনা বেচা বা ভিডিও লাইব্রেরির মত আধুনিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কেউ কেউ হিরে জহরতের ব্যবসা করছেন- যেমন জানকীদাস আগরওয়াল, দ্বারিকাদাস প্রমুখ। আবার সুরাণা, কাঠিয়া, খাণ্ডেলওয়াল, চৌধুরী এরকম কিছু পরিবার রয়েছেন যাঁরা কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত।

বর্ধমান শহরে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের আগমন অন্তত দেড়শো বছর আগে বলে মনে করেন পূরণমল গাড়িয়া। রাজ পরিবার বা রাজ এস্টেটের লঙ্গরখানার সাপ্লায়ার অর্থাৎ চাল, ডাল, কলাই ইত্যাদির সরবরাহকারী হিসেবেই বর্ধমানে তাদের ব্যবসার সূত্রপাত। তাইবোধহয় বর্ধমান রাজবাড়িকে কেন্দ্র করেই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের জনবসতি গড়ে উঠেছে। রাজ পরিবারের সমস্ত পোশাক পরিচ্ছদের সরবরাহকারীর ভূমিকায় তাঁরাই ছিলেন। যেমন উদাহরণ হিসেবে বালমুকুন্দ চৌধুরী পরিবারের কথা বলা যায়। কেউ বা আবার ছিলেন রাজার গো-শালার খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বে।

একটা মজার ব্যাপার দেখে কিছুটা ধন্দে পড়ে গেলাম। পূরণমল গাড়িয়ার ছেলের নাম সুরেশ আগরওয়াল। এটা কেমন করে হল? গাড়িয়ার ছেলে আগরওয়াল! আমার কাছে যা ধাঁধা তা খুব সহজেই সমাধান করে দিলেন পূরণমল। বললেন, বাঙালীদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয় রয়েছে তেমনি মাড়োয়ারীদের এক একটি কাস্ট বা জাতের নাম আগরওয়াল, খাণ্ডেলওয়াল, মাহেশ্বরী, অসওয়াল ইত্যাদি। কেউ জৈন কেউ বা বিষ্ণুর উপাসক। এই জাতের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন পদবী যেমন গাড়িয়া বা সুরাণা ইত্যাদি। মাড়োয়ারীরা অনেকেই জাত পরিচয়টিকেই পদবী হিসেবে ব্যবহার করেন। পদবী বা জাত কোনটিকে ব্যবহার করবেন তা নিয়ে বাধ্যবাধকতা কিছু নেই।

মিঠাপুকুরের ভুতুরিয়া পরিবার সহ বর্ধমান শহরে উপরোক্ত জাতের বা গোষ্ঠীর মাড়োয়ারীরাই এসেছিলেন রাজার আমলে। কালক্রমে ব্যবসা বাণিজ্য করতে করতে আজ তাঁরা চোদ্দ আনাই বাঙালী হয়ে উঠেছেন। বাকি দু-আনা তাঁরা সংরক্ষিত রেখেছেন। যেমন খাদ্যাভাস। সুরেশের কথায় ভাত খেতে অভ্যস্ত হয়েছি। ভাতঘুমও দিই। কিন্তু কোন পরিবারে আজও আমিষ ঢোকে না। এখনকার ছেলেরা কেউ কেউ বাইরে আমিষ খেলেও বাড়িতে পেঁয়াজ পর্যন্ত ঢোকে না। ২/১ বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বিয়ে হয় স্বজাতিতেই। তবে নানা সমস্যার কারণে ঘোড়ায় চেপে বিয়ে করতে যাওয়া আর সম্ভব হয় না। দেশে মানে রাজস্থানে ভিটে জমি থাকুক বা না থাকুক সকলেই একবার করে কুলদেবতার পুজোয় দেশে যায়। বাড়িতে পুত্র সন্তান হলে তার প্রথম চুল দিয়ে আসতে হয় কুলদেবতার চরণে। রাজনীতির প্রতি আগ্রহ নেই। অধিকাংশই ব্যবসা আর কিছু সমাজসেবা নিয়েই থাকেন। তাই গড়ে উঠেছে মাড়োয়ারী সংস্কৃতি পরিষদ। বন্যাত্রাণে সাহায্য থেকে শ্রাবণ মাসে ১০৮ শিব মন্দিরে জলসত্র খোলা অথবা হনুমানজির মন্দির সংস্কার এসব নিয়ে তাঁরা দিব্যি আছেন। পারিবারিক স্বাতন্ত্র রক্ষা করেও মিশে গেছেন বর্ধমান তথা বাঙলার বাঙালী সমাজে। ব্যতিক্রম বাদ দিলে আজ বর্ধমানের প্রায় দুশো মাড়োয়ারী পরিবারের এটাই চালচিত্র।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মানুষ

'বর্ধমান-কাটোয়া ছোট রেললাইন তখন ছিল না। উটের গাড়ি আর গরুর গাড়ি ছিল একমাত্র যানবাহন। পায়ে হেঁটেও লোকে কাটোয়া গেছে। আমার বাবাই পায়ে হেঁটে কাটোয়া গেছেন বললেন উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার ব্রাহ্মণ ৭৬ বছরের দ্বারিকানাথ তেওয়ারী। তেওয়ারীজি ১০-১২ বছর বয়েসে বর্ধমানে এসেছিলেন। বলছিলেন সেদিনের বাণিজ্যের পরিকাঠামোর কথা। রাজনীতির কথাও চলে আসছিল তাঁর স্মৃতিচারণে। প্রকৃতপক্ষে তিনি যত না ব্যবসায়ী তার চেয়ে বেশি রাজনীতির মানুষ। এখন সক্রিয় রাজনীতি না করলেও ব্রিটিশ আমলে বর্ধমানের ডাকাবুকো দারোগা বাবর আলীকে চটি ছুঁড়ে মেরে বর্ধমান থেকে পালিয়ে সাড়ে তিন বছর আত্মগোপন করেছিলেন। তৎকালীন সোশ্যালিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন তেওয়ারীজি।

ব্যবসার প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললেন, সেই তিনের দশকেই বোরহাট, নতুনগঞ্জ, সদরঘাট, বাজেপ্রতাপপুর, মেহেদীবাগানে অবাঙালী ব্যবসায়ীরা বসতি স্থাপন করেছিল। মেহেদিবাগানে অবশ্য তখন 'উচ্চবর্ণের' মানুষ কম বাস করতেন। উত্তরপ্রদেশের রামলাল গুপ্ত পরিবার প্রথম দিকে বর্ধমানে এসেছিলেন। বোরাহাটের তেওয়ারী পরিবার এবং মিঠাপুকুরের ভুতুরিয়ারা (মাড়োয়ারী) প্রথম দিকে বর্ধমান শহরে আসেন। বিহারীদের মধ্যে খাউরা (নটরাজ সিনেমা হলের মালিক) এবং শর্মারা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। দাশু ও হরি দুই শর্মার বংশধরেরা প্রধানত কাঠের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সূর্য শর্মা পরে স্টার সিনেমাও চালু করেছেন। বর্ধমানে নটরাজ সিনেমা হলের সঙ্গে যুক্ত সাউ পরিবারের রাজকুমার, শিবকুমারের বাবা রামদাস সাউ বর্ধমানে এসে পাঁড়েজির আটা কলে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে নিজে আটাকল তৈরী করেন। বর্ধমানে কিছু বিহারী আছেন যাঁরা ফলমূলের

কারবারে যুক্ত। উত্তরপ্রদেশের কালোয়ারদেরও সাউজি বলা হয়। জানালেন দ্বারিক তেওয়ারী। ইউ পি-র ভগতরাও বর্ধমানের খুব পুরনো অবাঙালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। নতুনগঞ্জে যেমন রয়েছেন প্রচুর বালিয়া জেলার ভগৎ তেমনি বোরহাটে আছেন মাড়োয়ারী আর বিহারের তিলি সম্প্রদায়। আবার দুবরাজ অঞ্চলে রয়েছেন বহু সংখ্যক বিহারী মুসলমান।

কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকায় চটকলে এবং পুলিশ বাহিনীতে কাজ করার জন্য এক সময়ে বহু ইউ পি এবং বিহারের ছেলেরা পশ্চিমবঙ্গে আসত। এখন সেই প্রবাহ অনেক কমে গেছে। রাজনীতি, কাজের পরিবেশ আর অন্য রাজ্যের মানুষকে আকর্ষণ করছে না। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষরাও অবাঙালীদের বরদাস্ত করতে পারে না। দেশ বিভাগের পর থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে থাকে। তারাই মূলত পশ্চিমবঙ্গ বাঙালীদের এই জিগির তুলেছিল এক সময়ে। পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে এই ধরনের ভেদবুদ্ধি নেই বলে তেওয়ারীজি মনে করেন।

প্রবীণ মানুষ হিসেবে তিনি দেখেছেন এখনকার ইউ পি-র বা বিহারের ছেলেদের মধ্যে চাকরি করার প্রবণতা যথেষ্ট রয়েছে। ব্যবসাতে আর তেমন আয় চায় হয় না। দু নম্বরী না করলে ব্যবসা চালানো মুশকিল। তাঁর মতে চাকরিতেই এখন সুখ বেশি।

বছরের পর বছর বাঙলার মাটি জল হাওয়ায় বেড়ে ওঠার জন্যই বোধহয় বাঙালীর সংস্কৃতি খাদ্যাভ্যাস তাঁদের প্রভাবিত করেছে। মাড়োয়ারী এবং গুজরাটিরা খাদ্যাভ্যাস বাড়ির অন্দরে অপরিবর্তনীয় রাখলেও উত্তরপ্রদেশের মানুষ যাঁরা বর্ধমানে থাকেন তাঁরা অনেকেই আমিষাহারী হয়ে উঠেছেন। বাঙালীদের সঙ্গে বিয়ে শাদিতে দ্বারিক তেওয়ারীদের প্রজন্মের আপত্তি থাকলেও পরবর্তী প্রজন্মে বিধি নিষেধের বাঁধ ভেঙে পড়ছে। তেওয়ারিজী নিজেই মনে করেন আর ১৫/২০ বছর পর কোথাও কোন বিধি নিষেধ থাকবে না। ব্যবসার ক্ষেত্রেও বোধহয় তাই যৌথ উদ্যোগ গড়ে উঠছে। বর্ধমানে এখন অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা বাঙালী-অবাঙালীর মিলিজুলি উদ্যোগ।

বর্ধমানে চিনা ব্যবসায়ী

এখন কেব্‌ল্ টি ভি-র যুগ। পাড়ায় পাড়ায় বেশিরভাগই কেবল লাইন গেছে। এর মধ্যে বর্ধমানে সর্ববৃহৎ লাইন যাদের সেই 'পাইওনিয়ার কেব্‌ল্ নেট ওয়ার্ক' কে কেউ কেউ 'চিনাদের কেব্‌ল্ লাইন' বলেও উল্লেখ করে। ওদের পার্টনার আরও আছে, দেবু, পিন্টু কিন্তু হাউজি ওয়াং-এর নামটাই সবার আগে ভেসে ওঠে।

হাউজি ওয়াংদের জাত ব্যবসা জুতোর। 'বাটার' বিজ্ঞাপন নকল করে বলা যায় 'ওরা জুতো বোঝে'। চিনে নাকি এরকমই এক এক প্রদেশের ব্যুৎপত্তি এক এক বিদ্যায়। কেউ দাঁত বোঝেন, কেউ রেস্টুরেন্ট আবার কেউ বা চমড়া বা জুতো। স্বাধীনতার আগে থেকেই হাউজিদের ঠাকুর্দার ভারতে আসা যাওয়া। ওর বাবা, ওয়াই থাও হুয়া, ১৯৫২ সাল থেকেই এখানে আছেন। ভারতে আসা ব্যবসার খাতিরেই। ক্রমে বাঙালীদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা। এমনকি চিন-ভারতের যুদ্ধের সময়ও এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ঘাটতি হয়নি। এখন জুতা ছাড়াও ভিডিও ফটোগ্রাফি, কেব্‌ল্ টি. ভি., বিউটি পার্লার নানান দিকে

ব্যবসার বিস্তার। হাউজিরা আরও পাঁচটা বাঙালী ছেলেদের মত স্থানীয় সি. এম. এস বা এই ধরনের স্কুলে পড়লেও, প্রতিযোগিতার বাজারে খাপ খাওয়ানোর জন্য ছেলে মেয়েদের কার্শিয়াং বা কলকাতাতে পড়াতেও পিছপা নয়।

জিজ্ঞেস করেছিলাম চিনে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা যায় কিনা? হাউজিদের তাড়াতাড়ি উত্তর আমরা এই জেনারেশনের ছেলেরা জন্মসূত্রে ভারতীয়। কৌতুহল বশত দেখার ইচ্ছা যায় কিন্তু মন টন কাঁদার ব্যাপার নেই। ওদের মা-মাসি বা ধর্মপ্রাণা যাঁরা নিরামিষ খেলেও হাউজিরা হিন্দু বা মুসলিম খ্রীস্টান বন্ধুদের দৌলতে সবরকম খাবারেই অভ্যস্ত। ধর্মে বৌদ্ধ হলেও দুর্গাপুজা বা ঈদে সমান আনন্দ উপভোগ করেন। শতকরা হিসাবে আসেনা এমন সংখ্যক সংখ্যালঘু হলেও এরা বর্ধমানে দাপটের সঙ্গে যেভাবে ব্যবসা করে যাচ্ছেন, তা চিনের হাক্কা প্রদেশ থেকে আসা বাপ ঠাকুর্দারা কখনও ভাবতেই পারেন নি।

গুজরাতি পরিবার

কথাবার্তায়, বাজারের থলি হাতে আর পাঁচটা বাঙালীর মত মনে হলেও ঋজু ভাবভঙ্গির মানুষটি আসলে গুজরাতি! নাম জয়ন্তীলাল মেটা। নিজে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়েছেন, ছেলেমেয়েদেরও স্থানীয় স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। গুজরাতী মানেই একশোভাগ বেনিয়া নয়। দাদু যাঁর শিক্ষক ছিলেন রক্তে তাঁর রেশ তো থাকতেই পারে। গড় বাঙালীর সংস্কৃতির অহংকে টেক্কা দিতে পারেন তিনি। কোলিয়ারীর ব্যবসাতে বাবা এসেছিলেন আসানসোল-রাণীগঞ্জ এলাকায়। রাষ্ট্রীয়করণের পর বর্ধমানে এসে বাবা চাঁদুলাল মেটা বিশাল কয়লার ডিপো করলেন গুডশেড রোডে। এখন যেখানে সিনডিকেট ব্যাঙ্ক সেখানে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। পরে পরে গুডশেড রোডে বাড়ি, পরে স্থায়ী বসবাস। জয়ন্তীবাবুরা প্রথমে পার্টনারশীপ ব্যবসায় বি সি রোডে গড়ে তোলেন বিড়ি পাতার ব্যবসা। ১৯৫৫ সাল থেকে সে ব্যবসা ছেড়ে চিঁড়ে কল। সে চিঁড়ে কলও এখন বন্ধ। বর্ধমানে এঁরা ছাড়াও গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের পটেলরা (প্রেমজি-রামজি) বর্ধমানে ভাল কাঠের ব্যবসা ফেঁদে বসেন। গুজরাতের এক এক অঞ্চলের লোকেরা, সে সেই নেটিভ স্টেটথাকার সময় থেকে এক এক ব্যবসায় দক্ষ।

জয়ন্তীবাবুরা নবরাত্রি পালনে সবাই মেতে ওঠেন, এইসময় থেকেই এঁদের বর্ষারম্ভ। স্বাভাবিকভাবে দুর্গাপুজো থেকে কালী পুজোর পরদিন পর্যন্ত এঁরা উৎসবে মেতে থাকেন। খাওয়া-দাওয়ার দিক থেকে কিন্তু এঁরা নিরামিষভোজি। এমনকি বাঙালী পরিবারে উৎসব অনুষ্ঠানে গেলেও এঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকে।

বিয়ে শাদির ব্যাপারে গোঁড়ামি নেই। কেউ ইচ্ছা করলেই বাঙালী পরিবারে বিয়ে করতে পারে, তবে সাধারণত কলকাতা থেকে ধানবাদ পর্যন্ত বসবাসকারী গুজরাতী পরিবারেই বিয়ে শাদি হয়। সুদূর গুজরাতে যাওয়ার খুব একটা প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রদেশে যদি একটি ভারতীয় ব্যবসায়ী থাকে তাহলে সেই ব্যবসায়ীটি নিশ্চিত হবেন একজন গুজরাতি। সুতরাং বর্ধমানে এঁরা তো থাকতেই পারেন।

হিন্দু পাঞ্জাবী

বাপ-ঠাকুর্দার মত কাপড়ের পাইকারী ব্যবসা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন ব্রীজমোহন মেহেরারা। এখনও মেঝের ওপর পুরু গদি, টেবিল-চেয়ার পড়ে আছে এক কোণে, উনি নিচেই বসে।

চোদ্দপুরুষের কেউ কবে হয়ত সঙ্গম রায়দের মতই সুদূর পাঞ্জাব থেকে শাল-আলোয়ান নিয়ে আসতেন বিক্রি করার জন্য। এসব কথা শোনা গেলেও ওঁর ঠাকুর্দার গল্প বেশিদিনের নয়। নাম ছিল জয়গোপাল মেহেরা। পাইকারী দোকান হিসাবে বর্ধমানের শ্যামবাজারে খোলেন দোকান, পরে বাবা সাইদাস মেহেরা এবং কাকা জঙ্গিলাল মেহেরা যৌথভাবে ১৯৫২ সালে খোলেন, 'বেঙ্গল ক্লথ হাউস'। ১৯৭২ থেকে ব্যবসা ভাগ হয়ে নতুন আর একটি দোকান (দোতলায়) 'নিউ বেঙ্গল ক্লথ হাউস' তৈরি হয়।

বর্ধমানে পাঞ্জাবী হিন্দুদের সেরকম আর কারও নাম চোখে পড়ে না। এঁদেরই আত্মীয়রা আছেন পুরনো বর্ধমানের দিকে। 'খান্না ক্লথ হাউস' তাঁদের। এঁরা চাকরি-বাকরিতে কেউ যান নি। দু-একজন বিক্ষিপ্তভাবে স্টেনলেস স্টীলের বাসনের কারখানা করা, 'প্রমোটার' ব্যবসা করা ছাড়া বাকিরা সেই কাপড়-চোপড় নিয়েই আছেন।

ইদানিংকালে অবশ্য দুটি নতুন জিনিষস লক্ষ্য করা গেছে। এক নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে 'ইলেকট্রনিক্স গুড্‌সে'র ব্যবসা বা 'নার্সিং হোম ব্যবসা' করা। তাও আবার ব্যক্তি মালিকানায় নয়, পার্টনারশীপ ব্যবসা এবং স্থানীয় বাঙালী ছেলেদের সঙ্গেই নিঃসন্দেহে একটি ধারা বিরুদ্ধ প্রয়াস।

পাঞ্জাব থেকে বহুকাল হল চলে এলেও এখনও ব্যবসা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সেখানে যাওয়া ও আসা আছে। বিয়ে-শাদীর জন্য যে বর-কনে সবসময় পাঞ্জাব থেকেই আনতে হয় তার কোন মানে নেই। বাংলা উচ্চারণে কোনও অস্পষ্টতাও নেই। বাবা-কাকাদের সময় থেকে রাজস্কুল, সি. এম. এস. মিউনিসিপ্যাল স্কুলেই পড়াশোনা। রাজনীতি বা জনজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ সেরকমভাবে নেই। ব্যবসাই মূলত ধ্যান জ্ঞান। দু-একজন লায়ন্স রোটারী ক্লাবের সদস্য হলেও পাড়ার ক্লাব, নাটক করা, সঙ্গীত চর্চা এসবে সেরকম কারও আগ্রহ নেই। বাঙালী পরিবারের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনের সেরকম কোনও নজির নেই। তবে বিয়ে-শাদীর মত সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলে যান, নিজেদের বাড়িতেও চেনা-জানা মানুষদের নিমন্ত্রণ করেন। এঁদের বর্ধমানে বসবাসকারী তিনপুরুষের কেটেছে ব্যবসাতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। নতুন প্রজন্মের ছেলেরা যেটুকু 'লিজার আওয়ার' পায় তা তারা বেশির ভাগ টিভিতেই সময় দেয়। এই প্রজন্মের যাঁদের এখানেই জন্ম তাঁরা বাড়িতে বাঙলায় কথা বললেও ব্রীজমোহন (বিজু)-রা সাধারণত পাঞ্জাবী ভাষাতেই কথা বলেন। কথাপ্রসঙ্গে এঁদের এক প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম অবাঙালী ব্যবসাদার বলে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা? উত্তরে তিনি বলেন, তেমন ভাবে কিছু নয় তবে চাঁদা--পয়সা, দাবী দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ছোটখাটো লেভেলে 'নন বেঙ্গলী' বলে কখনও কখনও চাপ একটু বেশিই আসে।

শিখ পাঞ্জাবী

পাঞ্জাবে অশান্তি শুরু হওয়ার আগে কোনও বাঙালী ছেলেই বর্ধমানের গুরুদ্বারটিকে অন্যধর্মের উপাসনা গৃহ ভাবত না, হিন্দুদের আরও একটা মন্দির বলেই মনে করত। তখনও এরকম নিরাপত্তার দীর্ঘ প্রাচীর ওঠেনি, খোলামেলা আবহাওয়া, দু-পাশের খোলা বারান্দায় একদিকে বাঙলা মিডিয়াম অন্যদিকে হিন্দি বা গুরমুখী পড়ান হত। সর্দার ব্যাশম সিং সিভিল কন্ট্রাকটার ছিলেন, এবং ১৯২৮ সাল থেকে প্রবন্ধক কমিটির সম্পাদক ছিলেন। গুরুনানকজী পুরনো বর্ধমানের পায়রাখানা গলির কাছাকাছি অঞ্চলে এসেছিলেন। সেই সময়ের পর থেকেই যেমন শিখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, সেরকম ব্যবসায়িক কারণেও বর্ধমানে আসা শুরু।

একসময় ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল এই শিখদের। তৎকালীন সময়ে এই ব্যবসায় "চান্‌দা সিং" এক বিখ্যাত নাম। এরকমই সর্দার তারলোক সিং, জ্ঞানী সোহন সিং, অর্জন সিং, গুরদয়াল সিং প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত নাম। এঁদের মধ্যে ব্যবসায়ীও ছিলেন যেমন সেরকম চাকরি-বাকরিতেও ব্যস্ত এরকম ব্যক্তিও ছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ১৯৫২ সালের পর এসেছেন এই শিখরা, বর্ধমানে। ব্যবসাতেও বৈচিত্র্য এসেছে। সবাই আর ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় ব্যস্ত নয়, কারও গ্যাসের দোকান, কারও বা হোটেল, কাগজের দোকানও আছে অনেকের। চাকরি-বাকরির মধ্যে অর্জন সিংয়ের পুত্র তারলোচন সিংহ বর্তমানে তরুণ আই. এ. এস্। কুলদীপ সিং আলুওয়ালিয়ার মত সকলেই মিক্সড্ কালচারে বিশ্বাসী নয়। বিয়ে-শাদি নিজেদের মধ্যেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়। কেবল কুলদীপ বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে নজির সৃষ্টি করেছেন। এরকম দু-চারটি উদাহরণ বর্ধমানে খুঁজলে আরও পাওয়া যাবে। বাঙালীরা যেমন গুরুদ্বারকে সমান ভক্তিভরে প্রণাম করে সেরকম বর্ধমানে বহু শিখ ব্যক্তি দুর্গাপুজা প্রভৃতি কমিটিতে পদ অলংকৃত করে বসে আছেন। খুব ব্যাপক হারে না মিশতে পারলেও শিখ পাঞ্জাবীরা অনেক ক্ষেত্রেই বাঙালীর জীবনে প্রবেশ করে ফেলেছেন।

□ 'বর্ধমান সমাচার' শারদ সংখ্যা, ১৯৯৮ □
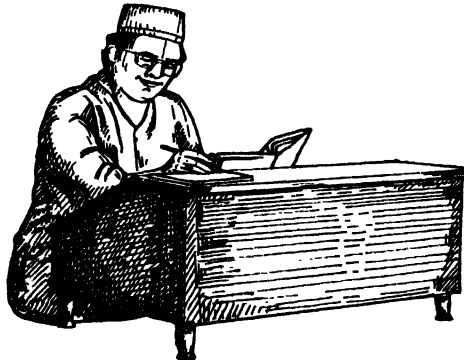
স্থান-পরিচয় কাটোয়া

নগেন্দ্রনাথ বসু

কাটোয়া বর্ধমান জেলার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন বন্দর। প্রাশ্চাত্য ঐতিহাসিক আরিয়ানের গ্রন্থে কাঁটাদীয়া বা কন্টকদ্বীপের অপভ্রংশে 'কাঁটাদুপা' (Katadupa) নামে এই স্থান পরিচিত হইয়াছে। গঙ্গা ও অজয়-নদের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া পূর্বকালে দূরদেশ হইতে সমুদ্রপোত বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে আগমন করিত। যদিও এখানে এখনও জেলার মহকুমা থাকায় এই স্থান এককালে শ্রীহীন হয় নাই, কিন্তু পূর্বকালের তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির কিছুই নাই। পূর্বতান কীর্ত্তিরাশির অধিকাংশ গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী। পূর্বে এই স্থান 'কাঁটাদীয়া' নামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের একটি প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। মুসলমান বিপ্লবে সেই সমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানের সমৃদ্ধি ও অবস্থান লক্ষ্য করিয়া নদীয়া-বিজয়ের পরই মুসলমানেরা এখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করেন। তজ্জন্য ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ববঙ্গ আশ্রয় করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল। মহাপ্রভু এই কাটোয়ায় আসিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্মৃতি লইয়া বর্তমান কাটোয়া শহরে 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বাড়ি' বলিয়া একটি বৃহৎ দেবালয় নির্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরটি বেশিদিনের প্রাচীন না হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এই গৌরাঙ্গ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনের স্থান। এখানে অনেক বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া মাথা মুড়াইয়া কেশ দিয়া যান। এই মুণ্ডন-স্থানের পূর্বদিকে মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি রহিয়াছে। গদাধর দাস জাতিতে কায়স্থ, বাটী আঁড়িয়াদহ। তিনি চৌষট্টি মোহন্তের মধ্যে একজন। ভক্তিরত্নাকরে তাঁহার পরিচয় আছে। তিনিই এখানকার গৌরাঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর দাসের সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে ঘেরা প্রাচীর মধ্যে কেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধি-স্থান। তথা মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, গুরু-শিষ্যের পদচিহ্ন ও তাহার সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি আছে। দীক্ষা-স্থানের পশ্চিমে এখানকার গৌরাঙ্গবিগ্রহের সেবাইত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি। তৎপরে বাড়ির ভিতর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধর দাস-প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর মূর্তি। তাঁহার পার্শ্বে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দের মূর্তি আছেন। মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দির ভাঙিয়া যাওয়ায় গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। ইহার সম্মুখে নাটমন্দির ও পার্শ্বে ভোগমন্দির। গদাধর দাস তাঁহার প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন ঠাকুরকে-গৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া যান। এই যদুনন্দন ঠাকুরই প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থরচয়িতা। যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই এখানকার সেবাইত। ভেট দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা চলে, কোন দেবোত্তর নাই। গৌরাঙ্গ-বাড়ি ছাড়াইয়া কিছু দূর গেলে গঙ্গা-অজয়-সঙ্গম। এই সঙ্গম ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিয়া গৌরাঙ্গ-ঘাট, এখন সেই প্রাচীন স্থান গঙ্গা-গর্ভে। এই খানেই কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল। এই স্থান ছাড়াইয়া প্রায় অর্ধক্রোশ দূরে মাধাই-তলা।

কাটোয়া শহর মধ্যে বড়-প্রভুর আখড়া, ফারুখ্‌শিয়ারের মস্‌জিদ ও গড়খাই,* পলাশী যাইবার সময় ক্লাইব যেখানে শিবির করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং কেরি সাহেবের কুঠী— এই গুলি দেখিবার জিনিস।

দাঁইহাট

কাটোয়া শহরের সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণপূর্বে দাঁইহাট। এক সময় কাটোয়া হইতে দাঁইহাট পর্যন্ত একটি বৃহৎ সংলগ্ন শহর ছিল ও লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল। অদ্যাপি সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্মৃতি বর্তমান দাঁইহাট হইতে কাটোয়া পর্যন্ত বিদ্যমান। এক সময় যে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দির, কত ঘাট ছিল, অদ্যাপি সেই সমুদায়ের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের অদূরে কাটোয়া হইতে দাঁইহাট যাইবার রাস্তার ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। এক সময় এই স্থানেই ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্র ছিল। তিন শত বর্ষ পূর্বে কবি কাশীরাম এই ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

'ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।'

এই দ্বাদশ তীর্থের মধ্যে অধিকাংশ কাটোয়া হইতে দাঁইহাট আসিবার রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, গঙ্গা তাহার এক মাইলেরও দূরে সরিয়া গিয়াছে। কাটোয়া হইতে আসিবার সময় ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর, পাতাই-হাটে পাতাই-চণ্ডী ও একাই-হাটে একাই-চণ্ডী প্রথমে নয়নগোচর হয়। ইন্দ্রাণী পরগণার রাজা ইন্দ্রেশ্বর গঙ্গাতটে যে সুবৃহৎ শিব-মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, মুসলমান হস্তে তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। যেখানে সেই শিবমন্দির বা রাজবাটী ছিল, সেই স্থান আজও 'রাজার ডাঙ্গা' নামে পরিচিত। তাহার নিকটে একটি মস্‌জিদ রহিয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে ইন্দ্রেশ্বরের দ্বারের চৌকাটের মাথার প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। এই সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহার মধ্য ভাগে এক দ্বিভুজ গণেশ মূর্তি। এই সুন্দর ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্রেশ্বরের প্রস্তরমন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ সুন্দর ছিল! উক্ত মস্‌জিদের ভিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পূর্বতন প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন-স্বরূপ কত কাটা-পাথর রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ইন্দ্রেশ্বেরের অতীত গৌরবের কতকটা সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ঐ স্থানের পার্শ্ব দিয়া যে ভাগীরথী বহিতেন— এখন তিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশি দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মস্‌জিদ হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' দেখাইয়া থাকেন। এখানে প্রাচীন ইষ্টক-স্তূপ রহিয়াছে। আজও কেবল ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটে বহু যাত্রী স্নান করিতে আসেন। মস্‌জিদ, তাহার নিকটস্থ 'রাজার ডাঙ্গা' এবং 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' পুরাবিদ্‌গণের অনুসন্ধেয় প্রাচীন স্থান।

---

* গেজেটিয়ারে উক্ত গড় ও মস্‌জিদ মুর্শিদকুলী (ওরফে জাফর খাঁর) কীর্তি বলিয়া ধরা আছে, (Burdwan District Gazetteer 1910, P - 200) কিন্তু কাটোয়াবাসী ইহাকে ফারুক্‌শিয়ারের কীর্তি বলিয়াই জানে।

ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটের নিকট সিদ্ধেশ্বরী-তলার মধ্যে রামানন্দের পাট। সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরে রামানন্দ সিদ্ধি লাভ করেন। এখানে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। এই রামানন্দই 'শ্যামা দিগম্বরি রণমাঝে নাচো গো মা!' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান-রচয়িতা। মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে "কেশেগ'ড়ে"। এখানকার কেহ কেহ এই কেশগ'ড়কে কাশীরাম দাসের স্মৃতি-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু কাশীরামের জন্মস্থান সিঙ্গি গ্রাম এই স্থান হইতে বহু দূর।

বর্তমান দাঁইহাটের উত্তরাংশে দেওয়ানগঞ্জ। পূর্বে এখানে বহুলোকের বসতি ও একটি বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় ভাঙা বাড়ি পড়িয়া আছে। হাটও দাঁইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। গঙ্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপর সরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্বে এই দেওয়ানগঞ্জের হাটের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন এবং এই স্থানে বহুলোকের বাস ও যথেষ্ট জাঁকজমক ছিল। বিজয়রাম বিশারদের তীর্থমঙ্গল গ্রন্থ হইতে তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছি। সে সময়ে এখানে 'মাণিকচাঁদের ঘাট' প্রসিদ্ধ ছিল।* এখানকার স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, এখানে 'পাতালঘর' আছে। পূর্বে বড় বড় পাথরের মন্দির ছিল, তাহারই কতক অংশ লইয়া বর্তমান 'বদরশার কবর' প্রস্তুত হইয়াছে। এই দরগার সম্মুখ-দ্বারে প্রাচীন দেবমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তর বিদ্যমান, তাহা দেখিলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দিরেরই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। একটি বৃহৎ-স্তূপের উপর বদরশার দরগা উঠিয়াছে। ইহার নিকট এখনও বহু পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে। ঐ দরগার সেবাইত আমায় জানাইলেন যে, বর্ধমানরাজের দেওয়ান মাণিকচাঁদ বদরশাহ্ আউলিয়াকে এই স্থান দান করেন। সুতরাং যে সময়ে দেওয়ান মাণিকচাঁদ ছাড় দেন, তাহারও বহু পূর্ব হইতেই হিন্দুর এই দেবস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দেওয়ান মাণিকচাঁদ হইতেই 'দেওয়ানগঞ্জ' নাম হইয়াছে।

দাঁইহাটের পূর্ব গৌরবের শেষ চিহ্ন ভাস্করবংশ এখনও বিদ্যমান। ভাস্কর শিল্পনৈপুণ্যে এখানকার ভাস্করবংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। দাঁইহাটের পার্শ্বে জগদানন্দপুরে উত্তররাঢ়ীয় ঘোষচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে। কাশী, মৃজাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা বর্ণের পাথর আনাইয়া তদ্দারা এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে। এরূপ ভাস্কর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত চমৎকার বৈষ্ণব-মন্দির রাঢ়দেশে বিরল। কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন ব্যতীত দাঁইহাটের পাইকপাড়ার পার্শ্বে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন এবং প্রাচীন গঙ্গা-গর্ভের অদূরে বর্ধমানরাজের সমাজবাড়ি বিদ্যমান। বর্তমান বর্ধমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ কীর্তিচন্দ্র পর্যন্ত বর্ধমানাধিপগণের ঐ সমাজ-বাড়ি মধ্যে অস্থিসমাধি আছে।

পূর্বে লিখিয়াছি যে, গঙ্গা দাঁইহাট হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বর্ষ হইতে গঙ্গা প্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব গর্ভে ফিরিয়া আসিতেছেন।

* তীর্থমঙ্গল ১০১১ শ্লোক (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)

বিল্বেশ্বর ও কুলাই

কাটোয়া শহর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলাই গ্রাম। কাটোয়া হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে কুলাই যাইবার পথে বিল্বেশ্বর। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতে দেখা যায়—অট্টহাসে যে ফুল্লরা শক্তি আছেন, বিল্বেশ্বর বা বিল্বনাথ তাঁহারই ভৈরব। বিল্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ায় বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এখানে শিবরাত্র ও চড়ক সংক্রান্তির সময় বহু জনতা হয়। এই বিল্বেশ্বর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে কুলাই। প্রসিদ্ধ পদকর্তা মহাপ্রভুর পার্ষদ বাসুদেবঘোষ ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই স্থান প্রসিদ্ধ। ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণাস্থ রসোড়া হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বল্লভ ঘোষ বাইশটি করণ করিয়া উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

"রসোড়া ছাড়িয়া গোপাল কুলায়ে বসতি।
বাইশ বল্লভঘোষ নাম হইল খ্যাতি॥" (কুলপঞ্জী)

এই বল্লভঘোষের ৯ পুত্র—১ম পক্ষে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় পক্ষে দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন এবং ৩য় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধি পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যদেবের অনুবর্তী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। অগ্রদ্বীপ-প্রসঙ্গে তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কংসারি ঘোষের সন্তানেরা অদ্যাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই ঘোষবংশেই দিনাজপুরের মহারাজ সর্ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

কুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাঙ্গের বিশ্রামস্থল ও উহার এক পোয়া উত্তরে গ্রামের মধ্যে বাসুদেব ঘোষঠাকুরের সাধনার স্থান এবং বাসুদেব, মাধব প্রভৃতির বাসচিহ্ন আছে। এখানে বাসুদেবঘোষ যে নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতেন, সেই নিম্ববৃক্ষ লইয়া গিয়াই মহাপ্রভুর বিগ্রহ মূর্তি প্রস্তুত হয়। কাহারও মতে সেই বিগ্রহ কাটোয়ার, কাহারও মতে শ্রীখণ্ডে বর্তমান।

কেতুগ্রাম : বহুলাপুর

কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দূরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরে বহুলাদেবী একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, পূর্বে এই মূর্তি এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে মরাঘাটে ছিলেন, পরে তাঁহাকে সেখান হইতে আনিয়া গ্রামমধ্যে রাখা হয়, অল্পদিন হইল বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বহুলা এই গ্রাম মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাঁহারই দেবসেবার জন্য বহুলাপুর নির্দিষ্ট ছিল, তাঁহার নাম হইতেই কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই স্থানের নাম 'বহুলা' এবং এখানে ভগবতীর বামবাহু পতিত হওয়ায় এইস্থান মহাপীঠ মধ্যে ধরা হইয়াছে। বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাঁহার বর্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে

যে সকল পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বহুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট শুনা গেল, এই গ্রামের পশ্চিমে ভূপাল-রাজার পাথরের দালান ছিল, বহুলার পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-পাথর পাওয়া যায়, তাহা উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনা হইয়াছে।

এখানে প্রবাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চন্দ্রকেতু রাজা রাজত্ব করিতেন এই চন্দ্রকেতু হইতেই কেতুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুষ্করিণীর সহিত অপর এর পুষ্করিণীর মধ্যে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাটী পাথরের ছিল। তাঁহার সময়ে এখানে বিস্তর অট্টালিকা ও পাকা রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্বত্র মৃত্তিকা মধ্যে পুরাতন ইট্ পাওয়া যায়। বিশেষত বর্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাঙা ইটের ঢিবি আছে এবং তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির হয়।

বহুলাদেবীর (বহুলাক্ষীর) পরিমাণ উচ্চতায় সাড়েতিন হাত, কালোপাথরে গড়া, অতি সুন্দর মূর্তি --দেখিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। দেবীর ডান পার্শ্বে গণেশ ও বামপার্শ্বে শক্তিধর। মূলমূর্ত্তি সর্বদাই কাপড়ে ঢাকা থাকেন। বহু অনুরোধের পর মূলমূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার সময় পুরোহিত মহাশয় এককালে কাপড় সরাইতে রাজী হইলেন না। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির ধ্যান —

"ধ্যায়েচ্ছ্রীবহুলাং নগেন্দ্রতনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম্।
দোভিঃ কঙ্কতিকাং বরাভয়যুতাং (ত্রিনয়নাং) বামে স্বপুত্রান্বিতাম্॥

গৌরাঙ্গী মণিহারকণ্ঠনমিতাং চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম্॥"

অর্থ--হিমালয়সুতা পদ্মাসনস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করিবে। (তাঁহার চারি হাতের মধ্যে এক হাতে) কাঁকুই, (অপর দুই হাতে) বর ও অভয়, বাম পার্শ্বে নিজ পুত্র। গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বারা নমিত কণ্ঠ, আনন্দময়ী, কামদাকে চিন্তা করিবে।

এই ধ্যানের মাত্র তিনটি চরণ পাওয়া যাইতেছে। ধ্যানে তিনটি হস্তের বর্ণনা আছে, বাকি চতুর্থ হস্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে। ধ্যানে আছে, 'বামে স্বপুত্রান্বিতাম্'। কিন্তু পূর্বেই লিখিয়াছি যে, মূর্তির এক পার্শ্বে কার্তিকেয় ও এক পার্শ্বে গণেশ আছেন। ধ্যানের অপ্রাপ্ত চরণটি পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণ-ধ্যানেই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। স্থানীয় লোকেরা শ্রীখণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্ষীর ভৈরব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবরচিত উভয় গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীরুক।

মরাঘাট

স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বহুলাক্ষী ও অট্টহাসের ফুল্লরা এই উভয় লইয়া যুগ্মপীঠ। বাস্তবিক তাহা নহে। যাঁহাকে তাঁহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন,

তাঁহার প্রকৃত নাম বহুলা, উদ্ধৃত ধ্যানেই প্রকাশ। বহুলা ও বহুলাক্ষী দুটি ভিন্ন দেবীমূর্তি। শিবচরিতে বহুলা ও বহুলাক্ষী দুইটি বিভিন্ন পীঠশক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে। শিবচরিত-মতে যেখানে ভগবতীর ডান কুনুই পড়িয়াছিল, সেই স্থানের নাম রণখণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম বহুলাক্ষী ও ভৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে ভগবতীর বামবাহু পড়িয়াছিল সেই স্থানের নাম বহুলা, শক্তির নামও বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুলা ও বহুলাক্ষী উভয় লইয়াই যুগ্মপীঠ। শিবচরিতে যে স্থান 'রণখণ্ড' নামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন মরাঘাট নামে পরিচিত। পূর্বোক্ত বহুলা দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল মধ্যে এখানে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শক্তির ভৈরব মহাকাল এখানে নূতন গৃহে বিদ্যমান। এই মরাঘাটে উত্তরকাহিনী 'কাঁদড়' আছে, ব্রহ্মখণ্ডে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীই 'বকুলা' বা 'বহুলা' নামে কীর্তিত হইয়াছে। অদ্যাপি এই মহাশ্মশানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী আগমন করিয়া থাকেন।

অট্টহাস

পূর্বোক্ত মরাঘাট হইতে ১ মাইল দূরে অট্টহাস। এই মহাপীঠ অতি প্রাচীন। কুব্জিকাতন্ত্রের মতে, এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দা দেবী অবস্থান করিতেছেন। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত-মতে এখানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বেশ বা বিশ্বনাথ। অদ্যাপি অট্টহাস মহাজাগ্রত মহাপীঠ বলিয়া পরিচিত। এই স্থানের পূর্ব সমৃদ্ধির কিছুই নাই। ভগবতীর মূর্তিও নাই। মুসলমান-বিপ্লবে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। মূলপীঠস্থানে কিছুদিন পূর্বে একটী ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল, অল্পদিন হইল তাহারই উপর খেড়ুয়ার জমিদার দেবীদাস চক্রবর্তী মহাশয় একটি পাকাঘর ও রান্নাঘর প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। ইহার অদূরে একটি উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে, স্থানীয় লেকেরা এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এই স্তূপটি এখানকার পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর ও চারিপাশে বহু পাতলা ও ভাঙা পুরাতন ইট পাওয়া যায়। এই স্তূপের নিকট শিবানন্দের সিদ্ধিস্থানে ও রটন্তীর ভগ্ন মন্দির আছে।

এই পীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পূজার পর ভোগ লইয়া ডাকিলেই দলে দলে শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবাহের এখানে বহু লোকে পূজা দিতে আসেন। দেবীর কৃপায় অনেকেরই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, শুনা যায়। পীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' বা স্রোতস্বতী আছে।

এখানকার পীঠদেবী ফুল্লরার জয়দুর্গার ধ্যানে পূজা হয়। যথা --

"কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়খ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥"

কিন্তু কুব্জিকাতন্ত্র-বর্ণিত চামুণ্ডা বা মহানন্দার সহিত এই ধ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই।

দেবালয়ের বামপার্শ্বে একটি অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী হইতে একটি ভগ্ন দেবী-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি ভাঙা হইলেও এমন সুন্দর ও অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত দেবীমূর্তি আমরা বড় একটা দেখি নাই। রাঢ়ে——বর্ধমান জেলায় ভাস্করশিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র মূর্তিটি তাহার অতীত সাক্ষীর সামান্য নিদর্শন। ইহা কোন্ দেবীর মূর্তি তাহা এখনও তন্ত্রশাস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাদদেশে একটি গর্দভের আকৃতি থাকায় কেহ কেহ ইঁহাকে রাসভস্থা শীতলা মূর্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মূর্তির মিল নাই। দেবীর পাদদেশে যে অস্পষ্ট মূর্তি আছে, তাহা শিবারও রূপ হইতে পারে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ভগবতীর যে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, ঐ মূর্তি যেন সেই ভাবের চণ্ডীদেবী বলিয়া মনে হয়। কুব্জিকাতন্ত্রে যে চামুণ্ডা বা মহানন্দার উল্লেখ আছে-এই সুপ্রাচীন মূর্তিটি তাহার অন্যতর হইতে পারে।

অট্টহাসের সেবার জন্য বর্ধমানরাজ হইতে ১০ বিঘা বাগান ২০ বিঘা জমি দেওয়া আছে।

অগ্রদ্বীপ

অগ্রদ্বীপ কাটোয়া মহকুমরা অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ও বর্ধমান জেলার মধ্যে একটা প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। পূর্বতন অগ্রদ্বীপ বর্তমান অগ্রদ্বীপের প্রায় অর্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতেই অগ্রদ্বীপ সুপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিলে সেইরূপ ফল হয়। এখানকার ফল মাহাত্ম্যের জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্যই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-ঘোষবংশে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি নয় ভাই জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপুর বিষ্ণুতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্দ ঘোষের বিবাহ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রদ্বীপের নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। এক দিবস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর তেজোময় অপূর্ব মুখশ্রী দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন, মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভো! আমি সংসার চাই না, ধন মান ঐশ্বর্য চাই না, আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার ঐ চরণকমল সেবা করিতে চাই।"

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব গোবিন্দকেসংসারের নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক

নহেন। তিনি বলিলেন, "ধন মান ঐশ্বর্য সমস্ত দূর হউক, উহারা আমাকে আর জ্বালাইতে পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন্।" এই বলিয়া তিনি চৈতন্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "যদি নিষ্কাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার সহিত থাকিতে পাইবে।" গোবিন্দ ইহা শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্যের পদরেণু গ্রহণ করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাপ্রভুর সহিত মহানন্দে কাটাইলেন।

একদিন মহাপ্রভু আহারান্তে মুখশুদ্ধি না পাইয়া ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আর মুখশুদ্ধি হইল না।" শিষ্যগণ নীরব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া কহিলেন, "প্রভো! আমার নিকট একটি হরীতকী আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে "গোবিন্দ তোমার উক্তির সামগ্রী আমি আপনার সেবার জন্য অর্পণ করি।" এই কথায় শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" গোবিন্দের মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেব! দাস এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য এ কঠোর আদেশ করিলেন?" চৈতন্যদেব কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হরিপূজার অধিকারী। কিন্তু নিষ্কাম ব্রত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাসনা দূর হয় নাই, এখনও তোমার সঞ্চয়-স্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরধনা করিও, তাহাতেই মুক্তি হইবে।" "আমি কিছু চাই না, সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব না"—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে গোবিন্দ এই কয়েকটি কথা বলিলেন।

চৈতন্যদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থই সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার সম্মুখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে। আজ একটি হরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটি সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটি। এইরূপ কামনাই নিষ্কাম ব্রত-পালনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্য বলিতেছি, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আবার আমার দর্শন পাইবে। যদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্নসহকারে রাখিয়া দিও। তোমরা আশা পূর্ণ হইবে।" মহাপ্রভু এই প্রকারে গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে আসিয়া "আবার কবে প্রভুর দর্শন পাইব"- এই আশায় নির্ভর করিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুদিন গত হইল। শুভ মধুমাস আসিল। একদিন ভক্তপ্রবর গোবিন্দ জাহ্নবীসলিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস আসিয়া তিনবার তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন যে, ঐ কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী। একি হইল! বিস্ময়ে গোবিন্দের মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনের সেই অপার্থিব

ভাব কিছুতেই দূর হইল না—এই চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোবিন্দ! ভুল না, ভুল না, সেই কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া গৃহে রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন, আসিলে তাঁহাকে দিও।"

গোবিন্দের নিদ্রা ভাঙিল, দেখিলেন চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিবিড় অন্ধকারে যেন কোন কুহকের বলে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই কাঠখানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্দ অতি যত্নে কাঠখানি স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে কুটিরে আনিলেন। সে রাত্রি আর তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। ক্রমে প্রভাত হইল। গোবিন্দ অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবদাহের কাষ্ঠ নয়—একখানি সমুজ্জল কৃষ্ণ-প্রস্তর। গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। চৈতন্যদেবের কথাগুলি তাঁহার স্মরণ হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন। ভিক্ষান্তে কুটিরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কুটির-দ্বারে চৈতন্যদেব। ভক্তপ্রধান গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে দেখিয়া পুলকে পূরিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের ভক্তিদর্শনে চৈতন্যেরও প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে?" গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার কোন চিন্তা নাই। ভগবান্ তোমার মঙ্গলের জন্য ঐ শিলা পাঠাইছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নির্মাণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাঁহার সেবাইত হইবে।"

পর দিন যথাকালে এক অজ্ঞানকুশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়া মূর্তি নির্মাণ করিয়া সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন—নবদূর্বাদলশ্যাম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার পূজক নিযুক্ত হইলেন। ঐ কৃষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। গোবিন্দ ঘোষই পরে 'ঘোষ-ঠাকুর' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ ঠাকুর বহু দিন জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পূর্বে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা--আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, গ্রামের এক পার্শ্বে সমাধি দিও।" এই বলিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রবাদ এইরূপ, সেইদিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরী পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর ঐ দিনে গোপীনাথ কর্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখানে আগমন করিতেন। তাহাতে যথেষ্ট আয় হইত। ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আসিয়া সেবা

চালাইতেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রভাব রাঢ় ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে পঁহুছিল। পূর্ববঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহারও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেকে পূর্ববঙ্গ আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়া যাইবার আশা বলবতী হইল। কিন্তু তাঁহাদের যে সকল সরিক রাঢ়ে ছিলেন, তাঁহারা গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পূর্ববঙ্গগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়া চলিলেন, জ্ঞাতিগণ সংবাদ পাইয়া পথ আটকাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে বেশি লোকজন থাকায় জ্ঞাতিগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাটুলীর রাজারা তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য পাঠাইয়া কুষ্ঠিয়ার নিকট হইতে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং পাটুলীর রাজবাটীতেই কিছুকাল রাখিয়া দিলেন। এইরূপে গোপীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজা অগ্রদ্বীপ ও নিকটবর্তী জমিদারী গোপীনাথের সেবার জন্য অর্পণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর দিন অগদ্বীপে গোপীনাথকে পাঠাইয়া পূর্ববৎ শ্রাদ্ধাদি উৎসব নির্বাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লোকের জনতায় কতকগুলি লোক মারা যায়। এ সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুলীর পক্ষে যিনি উকিল ছিলেন, তিনি নিজ প্রভুর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না। মোকদ্দমার ডাক হইলে নদীয়া-রাজের উকিল উঠিয়া বলিলেন, 'হুজুর! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। এত ভিড়ের মধ্যে দুই চারি মরিবে, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। তবে আমার প্রভু নবদ্বীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন।' উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া নবাব সন্তুষ্ট হইলেন। নবদ্বীপের উকিলের কৌশলে সেইদিন হইতে গোপীনাথসহ অগ্রদ্বীপ-জমিদারী নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইল। যেখানে গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, তাহারই পার্শ্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিলেন।

ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রদ্বীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কবি বিজয়রাম তীর্থমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

> "অগ্রদ্বীপ আসি নৌকা হৈল উপস্থিত॥ ১০১২
> সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
> অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর॥ ১০১৩
> রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
> দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত॥" ১০১৪

কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবাটীতে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে অথবা তাঁহার গোবিন্দজী প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে যত বিষ্ণুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ সে সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়া ছিলেন। কার্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু গোপীনাথের মোহন মূর্তি দেখিয়া তিনি আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন না। এই বিগ্রহ

লইয়া নবদ্বীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অগ্রদ্বীপে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসাময়িক ইংরেজলেখক ওয়ার্ডসাহেব কিন্তু লিখিয়াছে—

"গোপীনাথের অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণের নিকট তিন লক্ষ টাকা ধারিতেন। সেইজন্য রাজা নবকৃষ্ণ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান। অবশেষে কৃষ্ণনগরপতি মোকদ্দমা করিয়া সেই মূর্ত্তি উদ্ধার করেন।"*

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার জন্য প্রত্যহ ৫০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তৎপরে ২৫৲ টাকা হয়,ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া এখন দৈনিক ৷৷০ আনা ব্যবস্থা হইয়াছে।

তীর্থমঙ্গলে গোপীনাথের যে "অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী"র উল্লেখ আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে। সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে নাটমন্দির ও ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রায়। মূল-মন্দির সামান্য সংস্কারের ফলে এখনও দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত সংস্কার না হইলে শ্রীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।

অগ্রদ্বীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাস্থানের নিকট বর্দ্ধমানরাজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাধাকান্তজী আছেন, নাটোর রাজদত্ত বৃত্তিতে তাঁহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

ঘোড়াইক্ষেত্র

অগ্রদ্বীপ হইতে ৩ মাইল উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র প্রাচীন স্থান। বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল পাঠে জানিতে পারি যে, দেড়শত বর্ষ পূর্বে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন—

"কাশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্রে কন্যা গাজীপুর।
ডাহিনে রাখিয়া চলে ঘোষাল ঠাকুর॥
সন্ধ্যার সময় সবে আইলা গোটপাড়া।
গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া॥
সেই স্থানে কালুরায় মহাশয়ের ঘর।
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা শীঘ্রতর॥"

(তীর্থমঙ্গল ১০১৭-১০১৯ শ্লোক)

বর্ত্তমান ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে গঙ্গা প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছেন। ঘোড়াইক্ষেত্রের বর্তমান কালীতলার পাশ্ব দিয়াই গঙ্গা বহিতেন। গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অল্পদিন হইল জঙ্গল কাটা হইয়াছে। ইহার অপর পারে নোহাসায় কালুর ঘাট। এখানকার নোহাসার বিল প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের পরিচয় দিতেছে। এই বিল বরাবর গোটপাড়ায় গিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

* Ward's History of the Hindoos, Vol. I. p. 205 - 206

বহু পূর্ব হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র তান্ত্রিক প্রধান স্থান। কুব্জিকাতন্ত্রে যে অশ্বতীর্থ বা অশ্বপদ পীঠের উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই প্রাচীন পীঠ ছিল, বহু কাল হইল গঙ্গা সেই স্থান আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। তৎপরেও এখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। কিন্তু গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এখনও পীঠস্থান ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে কালীতলায় সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

দেবগ্রাম

বর্তমান নদীয়া জেলার উত্তরাংশে রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ-রেলপাথের দেবগ্রাম স্টেশন হইতে অর্ধ মাইল দূরে এবং অগ্রদ্বীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত।

দেবগ্রামের অবস্থান বর্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার বিঘা। এই ভূভাগের উত্তরসীমা পাণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, চাঁদপুর ও বনপলাসী, পূর্বে বরেয়া ও দিক্‌বরেয়া, পূর্ব-দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়াতলা ও হাটগাছা। উত্তর সীমার দেবগ্রামের অবস্থান মধে লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই চণ্ডীর দহ বা পাণিঘাটার দহ, দক্ষিণে ও দেবগ্রামের উত্তরপশ্চিমসীমায় দেবগ্রামের পাড়া পাথরজলা বা নূতনগ্রামের গড়। গ্রামবাসী বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর ও গড়ের পার্শ্ব দিয়া পূর্বকালে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন, গঙ্গার খাদের উপরই বর্তমান মীরেগ্রাম। এখানে শুকুইআরা, ডোখলঘাট, বাধাঘাট প্রভৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পূর্বে যেখানে গঙ্গার জল থাকে, সেই স্থান অদ্যাপি দহ বা বিল নামে পরিচিত। শুষ্ক গঙ্গাগর্ভ বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়। দেবগ্রামের পূর্বে (বর্তমান দেবগ্রাম স্টেশনের পার্শ্বে) দুর্গাপুর, তাহার পার্শ্বে গহড়াপোতা; ইহার মধ্যে নৌকাঘাটা বা 'নাঘাটার মাঠ' -এখানে বর্ষাকালে ৮।১০ হাতের উপর জল চলে।

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব দেবগ্রাম অতি পূর্বকাল হইতে একটিমহাসমৃদ্ধিশালী লোকালয় বলিয়া পরিচিত ছিল। পূর্বকালে যখন ইহার পূর্ব পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব ছিল, তৎকালে বর্তমান পূর্বোত্তর নাঘাটা বা নৌকাঘাটা নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোত আসিয়া লাগিত। সাঁওতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানেই তৎকালে বহু লোকের বাস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা মীরগ্রাম।** এবং পশ্চিমে কালীগঞ্জ হইতে

* এই প্রাচীন স্থানের পরিচয় পূর্বে বড় প্রকাশ ছিল না। ইহার প্রাচীনত্বেব সন্ধান পাইয়া আমি ক্রমান্বয়ে চারিবার ঐ স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম দুইবারে ঐ স্থানের প্রাচীন অধিবাসী কৃষকদিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বারে গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট স্থানীয় কিংবদন্তী শুনিয়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুরাকীর্তিগুলি দেখি। ৪র্থ বারে (গত ১৩ই চৈত্র) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও পুরাতত্ত্বানুরাগী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে ঐ সকল স্থান ও বিক্রমপুর পরিদর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। এই কয়েক বারের অনুসন্ধানের ফলে এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মজুমদার প্রভৃতি গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিত হইল।

** ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে দেবগ্রামের উল্লেখ না থাকিলেও এই মীরগ্রামের উল্লেখ আছে।

ঘোড়াইক্ষেত্র পর্যন্ত ইহার অন্তর্গত ছিল বর্ত্তমান সাতবেগে* এই বিস্তীর্ণ ও বহুসংখ্যক সুপ্রাচীন মজা পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবগ্রামের সর্ব্বপ্রাচীন স্মৃতি সম্ভবত মঞ্জুশ্রী।** এখন ইনি কলুইচণ্ডী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সকলের পূজা পাইতেছেন। এখানে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, এই মঞ্জুশ্রীই তাহার নিদর্শন।

দেবকুণ্ড দেবগ্রামে যত পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে দেবকুণ্ড সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ -পূর্বে প্রায় দেড়শত বিঘায় জল থাকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগান এবং অপর তিন দিকে লোকের বাস ও মধ্যে মধ্যে দেবালয় ছিল। এখন দেবকুণ্ডের অধিকাংশই ভরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, তাহা তিনটি পুষ্করিণী, ৪টি জোল এবং দক্ষিণে একটি লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে। উত্তরাংশ অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অনেক অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। পুরাতন ফুলবাগান এখন নামমাত্র-একটি পাড়া হইয়া গিয়াছে। বর্তমান দেবকুণ্ড-সংস্কারকালে ইহার মধ্য হইতে নানা লোকে নানা দেবমূর্ত্তি পাইয়াছে,তাহার কতকগুলি দেবকুণ্ডের পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানান্তরে গিয়াছে। কিছুদিন হইল, এই দেবকুণ্ড হইতে কষ্টিপাথরের একটি অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্তি পাওয়া যায়। সেই মূর্তিটী দেবগ্রামভব স্বনামধন্য ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কলিকাতার বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্তমান সাহিত্যসম্মেলনে প্রদর্শন করিবাব জন্য তিনিই উহা আমায় অর্পণ করিয়াছেন। এই মূর্তির শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন দেখিলে ৬।৭ শত বর্ষের প্রাচীন মূর্তি বলিয়া মনে হইবে।

পচাদীঘি গ্রামের উত্তরাংশে 'লালদীঘি' নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, পূর্বে ইহার 'পচাদীঘি' নাম ছিল। ১২৮০ সালে এই দীঘির সংস্কার-কালে ব্রহ্মাণী বা মাহেশ্বরী মূর্ত্তিযুক্ত একখণ্ড পাথর***, হাতীর মাথা এবং ইষ্টকস্তূপ বাহির হয়। এই স্তূপ হইতে এত পুরাতন ইট উঠিয়াছিল যে, তাহাতে ইহার নিকট একটি পাকা কোটা প্রস্তুত হইয়াছে। ওরূপ দেবীমূর্তিশোভিত প্রস্তরফলক সাধারণত দেবমন্দিরের বহিগাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে মূল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাও কতকটা বুঝা যায়।

দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান। উত্তরের গড়টি প্রায় দৈর্ঘ্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় দুইশত ফুট এবং ইহার বর্তমান উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্যন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পূর্বকালে একটি বেগেই ছিল, কিছু দিন হইল উহার সাতভাগ হইয়াছে। এই সাতবেগের নাম পূর্ব হইতে পশ্চিমে যথাক্রমে ১ চিনিমিনি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ৩ চক বেগে, ৪ গড়ের বেগে, ৫ আড়ার বেগে, ৬ খোরদ বেগে ও ৭ পালিত বেগে।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মূর্তিটিকে "মহারাজলীল মঞ্জুশ্রী" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রে মঞ্জুশ্রীর যেরূপ সাধন লিখিত আছে, তাহার সহিত মিল নাই। তবে মূর্তিটি যে সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মূর্তির বাহন ও লাঞ্ছন অস্পষ্ট হওয়ায় ইনি ব্রহ্মাণী কি মাহেশ্বরী তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

ইহার দুই পার্শ্বেই পরিখার চিহ্ন রহিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিমাংশের গড়টি 'বেগের গড়' বা 'গড়বেগে' নামে পরিচিত। প্রবাদ-এই গড়ে পাতালঘর আছে। তাহাতে এখানকার পূর্বতন নৃপতির গুপ্তধন রক্ষিত আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

দেবগ্রামের অবস্থান দেখিয়া প্রাচীন লোকেরা মনে করেন যে, ইহার দুই পার্শ্বে গড় ও দুই পার্শ্বে স্রোতস্বতী এই স্থানকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। এখন এইস্থান বাগড়ীর মধ্যে পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন, সেই সময় এইস্থান রাঢ়দেশেরই সামিল ছিল। রামচরিতে পাইয়াছি -

"**দেবগ্রাম** প্রতিবদ্ধ বসুধাচক্রবাল - **বালবলভী** তরঙ্গবহল-গলহস্ত-প্রশস্তহস্তবিক্রমো **বিক্রমরাজ**"।

রামচরিতের বিক্রমরাজ যে, বর্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, তাহার আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিয়া রাখি, রামচরিত হইতে আমরা পাইতেছি যে, পালবংশের অধিকারকালে খ্রিস্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই দেবগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। খ্রিস্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে-

"**দেবগ্রামভবা** ধন্যা দেবীসু তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্‌গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্‌॥"

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খ্রিস্টীয় ১০ ম শতাব্দীর পূর্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরবমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লালের ভিটা পূর্বোক্ত গহড়াপোতার নিকট (বর্তমান দেবগ্রামের পূর্বভাগে) দমদমা। এখানে একটি উচ্চ স্তূপ বা ঢিবি আছে-স্থানীয় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাসিমাত্রই ঐ ঢিবিকে 'বল্লালের ভিটা' বা 'বল্লালসেনের বাড়ি' বলিয়া থাকে। এই স্থানে এবং ইহার উত্তর ও পূর্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে আসিয়া বাঘ শিকার করিত। অল্পদিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে। ইহারই পার্শ্বে সাঁওতার দীঘি। ইহার উপর দিয়া ডিস্ট্রীক্টবোর্ডের যত্নে বহরমপুরবোড হইবার পূর্বে বল্লালের ভিটা ও সাঁওতার দীঘি পাশাপাশি ছিল, এই জন্য প্রাচীন লোকেরা ঐ দীঘি বল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীঘি বলিয়া মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়াদী লোকের মুখে এই দীঘির অপর নাম "বল্লাল-দীঘি" শুনা গিয়াছে।

বল্লাসেনের জঙ্গাল এই সাঁওতা হইতে দুইটি প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটি পশ্চিমদিক্‌ দিয়া বরাবর ভাগা, চাঁদপুরে বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের 'জিতের মাঠ' দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর,সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্বদিক্‌ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগরে, ধুবী ও সেনপুর হইয়া ঘুনীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্বদিয়া গবীপুর পর্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্বে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের

কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত সভায় জাঙ্গালই 'রাজার জাঙ্গাল' বা 'বল্লালসেনের জাঙ্গাল' নামে স্থানীয় অধিবাসীগণের নিকট পরিচিত। ঐ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩.৪ ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুষ্করিণী দেখা যায়, তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাছী, বিক্রমপুর, ভবানীপুর, রাজাপুর, বিল্বগ্রাম ও নবদ্বীপের পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ। ভবানীপুর ও নবদ্বীপের পুষ্করিণী আজও "বল্লালের দীঘি"নামেই পরিচিত। আজও কেহ কেহ অপর স্থানের মজা পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপভ্রংশে 'বল্লামসেনের কীর্তি' বলিয়া মনে করেন।

পূর্বে এই স্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন ছিল। প্রায় ৫০ বর্ষ হইল, কাটোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ˚ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় কার্যগতিকে দেবগ্রামে আসিয়া কিছু দিন অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় জমিদার ˚বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে "বল্লালের ভিটা" খনন করাইয়াছিলেন। দেবগ্রামের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন- খননকালে ঐ স্তূপ হইতে বহুতর কাটা-পাথর, ভগ্ন পাথরের মূর্তি, ভাস্কর কার্য্যযুক্ত পাথরের চৌকাট, পদ্ম ও নরনারী মূর্ত্তিযুক্ত পাথর (চিত্র দ্রষ্টব্য), ৪।৫ হাত লম্বা পাথরের থাম, পাথরের মকরমুখ'নর্দামা, দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও প্রস্থে দুই হাত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তরফলক এবং কটি হইতে জানু পর্যন্ত মালকোচা করিয়া কাপড়পরা মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। ˚ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিপিযুক্ত প্রস্তরফলক ও কতকগুলি ভাঙা মূর্তি মিউজিয়মে পাঠাইবার জন্য কাটোয়ায় লইয়া যান। বামনদাসবাবু অনেক পাথর তাঁহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মডেল স্কুলের শিক্ষক ˚দীননাথ ন্যায়ালঙ্কাব মহাশয় তাঁহার স্বগ্রাম সালুগাঁ দোগাছিয়া গ্রামে এখান হইতে মকরমুখ' নর্দামা ও কয়েকটি মূর্তি লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামস্থ নানা লোকে সেই সকল কাটা-পাথর স্ব স্ব গৃহে আনিয়া নানা কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোচা করিয়া কাপড়পরা ভগ্ন মূর্তিটি বহুদিন কুলাইচণ্ডীতলায় পড়িয়াছিল। উহা ওজনে প্রায় ২ মণ হইবে, অনেকে বলবান্ ব্যক্তি সেই ভগ্ন মূর্তিটি তুলিয়া স্ব স্ব বলপরীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকের নিকট তাহা "বল্লালসেনের বুক' বা "বল্লালসেনের ধড়" বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল বৈরামপুর গ্রামে সেই ধড়টি লইয়া গিয়াছে। এই ধড়টির অনুসন্ধান আবশ্যক। এখনও "বল্লালের ভিটা" রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। যখন 'বহরমপুর রোড' প্রস্তুত হয় নাই, তখন এই
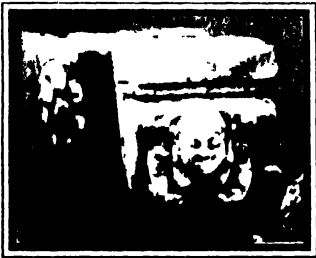
বল্লালের ভিটা থেকে
প্রাপ্ত পাথরের একধার

বল্লালের ভিটা থেকে
পাথরের অপর ধার

ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার দীঘির উত্তর পাড় হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর প্রায় অর্ধ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখনও ঐ অংশ খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে পুরাতন ইট বাহির হয়। পূর্বে এই সাঁওতার দীঘি প্রায় ৪০ বিঘা ছিল, ইহার উপর দিয়াই 'বহরমপুর-রোড' গিয়াছে, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই শুষ্ক গোচারণ মাঠ হইয়া পড়িয়াছে।
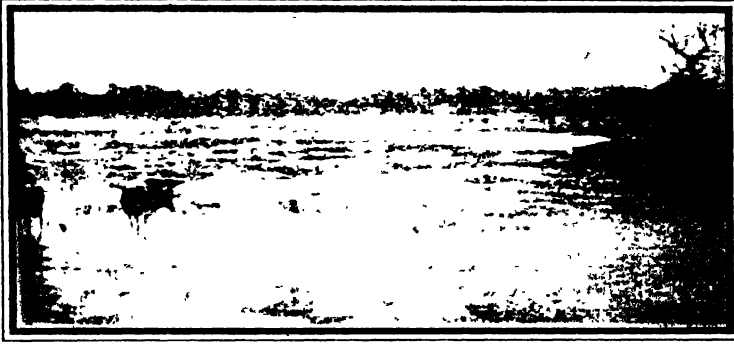
সাঁওতার দীঘি প্রবাদানুসারে বল্লালের অন্তঃপুর পুষ্করিণী)

বল্লালভিটার সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে পুরাতন পুষ্করিণী আছে *, তাহার উত্তর পার্শ্বে দেবগ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ ৪০ বর্ষ পূর্বেচারি হাত মোটা চৌকা থামের গোড়া দেখিয়া ছিলেন, এখন তাহা চাপা পড়িয়াছে।

দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস, সাঁওতার উচ্চ জমিতে পূর্বকালে বহু লোকের বাস ছিল-নানা নৈসর্গিক কারণে ও মুসলমানবিপ্লবে তাঁহারা পূর্ব স্থান ছাড়িয়া উত্তরে দেবকুণ্ডতীরে আসিয়া বাস করেন।

বিক্রমপুর

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোনাডাঙ্গা হইতে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্ত্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাট **, বিক্রমপুরকুঠী প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্তী ডিঙ্গেলগ্রামের দক্ষিণে যে জোল বা নিম্নভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব-সীমা ততদূর বিস্তৃত।

বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙ্গীর খাল' আছে, সেই খাল দিয়া পূর্বে ভাগীরথীর স্রোত বহিত। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে এক টি প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম 'জিতের মাঠ'। এখানে 'জিতের পুষ্করিণী' নামে একটী সুপ্রাচীন ও বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। প্রবাদ-উক্ত জিতের মাঠে বহু পূর্বে শহর ছিল। পুষ্করিণীর নিকটবর্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও

* অল্প দিন হইল গ্রামের কলুরা এই পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করায় ইহার নাম 'কলুপুকুর' হইয়াছে।

** বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

লোকাবাসের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে অল্প মাটি খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি 'কুমারের সাজ' পাওয়া যায়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে যে, বিলুপ্ত শহরের পূর্বে দিয়া ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর্তমান বিক্রমপুরের ষষ্ঠীতলায় কয়েক খণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানিতে সামান্য খোদাই কাজ আছে। সাঁওতায় বল্লালের ভিটা হইতে যেরূপ কাটা-পাথর বাহির হইয়াছে-এখানকার পাথর সেই ধরনের। নিকটবর্তী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। প্রবাদ-পুরাকালে এখানে এক রাজার বাড়ি ছিল।

বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্তী সেনপুর ও ঘুর্নীর মধ্যে অতিপ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পুষ্করিণী' আছে। প্রবাদ-উহা বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত।

'বল্লালসেনের জাঙ্গালের' কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, তাহাও সাঁওতা হইতে আরম্ভ হইয়া এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই রামচরিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, গৌড়াধিপ রামপালের সময় বিক্রম নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-তরঙ্গবহুল-বালবলভী প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। বর্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রদ্বীপে শুনিয়া আসিয়াছি যে, বিক্রম নামে এক রাজা প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। বর্ধমানের নূতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, উজানি হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে আসিয়া স্নান করিতেন।* পূর্বেই লিখিয়াছি যে,দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কাটোয়া মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের প্রাচীন ভূসংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্তমান অগ্রদ্বীপের মত দেবগ্রাম এবং বিক্রমপুরও এক সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যেই ছিল। দেবগ্রাম বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশ ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজই সম্ভবত উজানি মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বর্তমান বিক্রমপুরের পার্শ্বে যে সুবিস্তীর্ণ 'জিতের মাঠ' বা 'জিতের পুষ্করিণী' বিদ্যমান, তাহা 'বিক্রমজিতের পুষ্করিণী' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার নিকট যে সুপ্রাচীন বিক্রমপুর শহর ছিল, তাহা যে রাজা বিক্রমজিতের প্রতিষ্ঠিত বা তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত, তাহাও অসম্ভব নহে।

বিজয়সেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি বিক্রমপুরের প্রাসাদ হইতে 'শাসন' প্রদান করিতেছেন। এদিকে বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে তৎপিতা বিজয়সেনের পরিচয় প্রসঙ্গে নিবদ্ধ হইয়াছে—

Burdwan District Gezetteer by J.C. Peterson 1913. P-113. এখানে সাহেব ভুলক্রমে উজানিকে রাজপুতানায় লইয়া ফেলিয়াছেন। বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অধীন উজানি মঙ্গলকোটের বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎই উক্ত প্রবাদের নায়ক বলিয়া বোধ হয়।

"তস্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্ত্তী নির্ব্যাজবিক্রমতিরষ্কৃক **সাহসাঙ্ক**ঃ।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনপদপ্রকাশঃ॥"

'তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অকপট বিক্রমে **সাহসাঙ্ক** অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং (দিক্) পালচক্রের নগরে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত।'

অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, একে একে পালরাজগণের সামন্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল।* রামচরিতে দেবগ্রাম-বালবলভীপতি বিক্রমরাজও রামপালের সামন্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছিল। রাঢ়ের একাধিপত্য লাভের জন্য বিজয়সেনকে বিক্রমরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই বিক্রমরাজও একজন অতিবিক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়াই সম্ভবত প্রশস্তিকার ভারতপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া 'সাহসাঙ্ক'** নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন। বিজয়সেনের প্রশস্তিসম্বলিত তাম্রশাসন বিক্রমপুরের রাজবাটী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাম্রশাসনে 'দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ প্রসঙ্গে যেন তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সীতাহাটী গ্রামে ভূমি খননকালে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তাম্রশাসন লিখিয়া যে ভূভাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভূভাগ সীতাহাটী হইতে বেশী দূর নয়।*** এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে —

"প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ"

অর্থাৎ যে সেনবংশ প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাব দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতেই মনে হয় যে, রাঢ়দেশই সেনবংশের পূর্বলীলাস্থল। এই তাম্রশাসনখানি "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার" হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ববর্ণিত বল্লালের ভিটা, বল্লালের দীঘি ও বল্লালের জাঙ্গালসম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনবর্ণিত "বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার" বর্তমান দেবগ্রাম বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল।

চারিশত বর্ষ পূর্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে-বল্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন।****

---

* রঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজকাণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা

** জটাধরের সুপ্রাচীন সংস্কৃত কোষ অভিধান তন্ত্রে 'সাহসাঙ্ক' বিক্রমাদিত্যের নামান্তর বা পর্যায় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

*** সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা ২৩২ পৃষ্ঠা।

**** "বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে॥
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমানঃ সহ স্ত্রীভির্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ॥"
(বল্লালচরিত, ১ম অধ্যায়।)

চারিশত বর্ষের এই প্রবাদ বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ়দেশে বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজকার্য্যোপলক্ষে সময় অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই পূর্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজের রাজধানী ছিল, আজকাল সেই সেই স্থানেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যায়। বর্তমান বিক্রমপুর গ্রামে বা মৌজায় হিন্দুর বাস বেশি নাই, শতকরা ৯০ জন মুসলমান। কেবল ভাগীরথীর তরঙ্গাঘাত নহে- মুসলমান-হস্তেও যে এখানকার সমুদয় হিন্দুকীর্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতল ও ভগ্ন দরগাই পূর্ব্বতন মুসলমান-প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন*।

□ অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, বর্ধমান, ১৩২১ 'স্মরণিকা' □

বিক্রমপুরের প্রাচীন ভগ্ন দরগা

* দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সে জন্য এ সমন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না।

উজানি ও মঙ্গলকোট

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিনাথ পালিত
মনীন্দ্রমোহন বসু

উজানি নগর

উত্তর-রাঢ়ভূমি পরিদর্শন পূর্বক লুপ্ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার ও প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার জন্য আমরা মঙ্গলকোট ও উজানি-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলাম। উজানি ও মঙ্গলকোট প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। ধনপতি দত্ত ও শ্রীমন্ত দত্ত এবং খুল্লনা সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যে সবিশেষ উল্লেখ আছে, তাঁহাদের বাসভবন উজানি নগরে ছিল। উজানি বা মঙ্গলকোটে বিক্রমকেশরী নামক এক রাজা ছিলেন।

উজানি একটি পীঠস্থান। তথায় দেবী ভগবতীর কনুই পতিত হইয়াছিল। দেবী মঙ্গলচণ্ডী এবং ভৈরব কপিলাম্বরের অবস্থান জন্য উজানি বা মঙ্গলকোট হিন্দুমাত্রেরই তীর্থস্থান। এই উজানিতে লোচনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাকে বড়াইবুড়ীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত পরগণা আজমৎসাহীর মধ্যে উজানি নগর অবস্থিত। 'উজানি নগর' বলিলে এখন আর সাধারণে বুঝিতে পারিবেন না। উজানির সে গৌরবস্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে। উজানির সম্পদ বাণিজ্য ও জনবহুলতা এক্ষণে কল্পনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যখন গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল, তখন উজানির গৌরব ছিল। গৌড়ের ধ্বংস হইয়াছে, উজানিও সেই সঙ্গে মহিমাচ্যুত হইয়াছে। যখন ধনী বণিকগণের বাণিজ্যপোতগুলি ভ্রমরার ঘাটে বাঁধা থাকিত, তখন এই স্থানের নাম ছিল উজানি; মুসলমান বাদশাহী দপ্তরে উজানির নাম হয় 'সুগ্রাম'। চৈতন্যমঙ্গল- প্রণেতা লোচনদাস (ত্রিলোচনদাস) তাঁহার জন্মভূমির নাম 'কোগ্রাম' বলিয়াছেন। তাঁহার ভার্যা পতিসহবাসে বঞ্চিতা হইয়া এই গ্রামের নাম 'কুগ্রাম' রাখিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা সতীর সম্মান রক্ষার জন্য 'কুগ্রাম' এবং লোচনদাসের সম্মানের জন্য 'কোগ্রাম', এই উভয় নামই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাদশাহী 'সুগ্রাম' নামের ব্যবহার আর নাই।

মঙ্গলকোটের পুলিশ-স্টেশন হইতে উত্তর-পূর্বাংশে উজানি অবস্থিত। এই উন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া উজানি নগর দেখিতে বড়ই সুন্দর বোধ হয়। কুনুর নামক কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বাঁকিয়া বাঁকিয়া কোগ্রামের দক্ষিণ ও পূর্বপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া অজয়নদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কুনুরের উত্তরে ক্ষুদ্র প্রান্তর, পার্শ্বে 'আড়ওয়াল (আড়াল) নামক ক্ষুদ্র পল্লীর ঘন পাদপশ্রেণী, দূরে উজানিকে আবৃত করিয়া ছোট ছোট গুল্ম হইতে অশ্বত্থ ও বট তরুগুলি নিবিড় ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জটাজুটধারী তালতরুগুলির শীর্ষদেশ দেখা যাইতেছে, দূর হইতে উজানি যেন একটি বনভূমি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

মঙ্গলকোট হইতে স্বল্পতোয়া কুনুর নদী পার হইয়া উত্তরমুখে কিঞ্চিৎ গমন করিলেই নাতিবৃহৎ এক অশ্বত্থ তরুতলে কতিপয় বন্যবৃক্ষলতাচ্ছাদিত ধ্বংসপ্রায় একটি প্রাচীন মস্‌জিদ্‌ দেখা যায়। এখন সেটি প্রায় ইষ্টকস্তূপ, তন্মধ্যে মস্‌জিদের ভগ্নপ্রায় কিয়দংশ আজিও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে মস্‌জিদ্‌টি ইষ্টক ও চুন দিয়া গাঁথা হইয়াছিল। ইহা দুই হইতে তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার কি নাম, স্থানীয় লোকে তাহা অবগত নহে। এই মস্‌জিদের অতি নিকটে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামের নাম 'আড়ওয়াল'। তথায় যে কয়েক ঘর অধিবাসী আছে, তাহারা মোসলমান। এই ক্ষুদ্র আড়ওয়াল গ্রামটি দুই ভাগে বিভক্ত; মধ্যভাগে একটি শুষ্ক কেদারবাহিনী নদীর গর্ভ বর্তমান রহিয়াছে। এই শুষ্ক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর গর্ভ অতিক্রম করিয়া আড়ওয়ালের উত্তর অংশ দিয়া গ্রামান্তরে যাইবার পথ প্রসারিত রহিয়াছে। গ্রামের এই অংশে আর একটি মস্‌জিদের চিহ্ন মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। কুনুর নদীতীরে এক অজ্ঞাতনাম কাজির বাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে। আজিও কাজির সানবাঁধা রোয়াক ও গৃহের মেঝের কিয়দংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিকাংশ গৃহচিহ্ন কুনুর-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কুনুরনদীর শুষ্কপ্রায় সামান্য জলধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। নদীগর্ভ ইষ্টকস্তূপে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থানের নদীর 'আড়ানী' বড় উচ্চ। নদীগর্ভে অবতরণ করিয়া আড়ানী-গাত্রে কোন প্রকার প্রাচীন চিহ্ন বর্তমান আছে কিনা, অনুসন্ধান করা হইল। ইষ্টকময় গৃহভিত্তি এবং মৃত্তিকাপাত্রের চূর্ণরাশি নদীপ্রবাহে মৃত্তিকা হইতে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, দেখা গেল। ক্রমে উত্তর অংশে মৃত্তিকাপাত্রচূর্ণপরিপূর্ণ একটি ডাঙ্গ' পার হইয়া দু চারিটি বাব্‌লাগাছের পার্শ্ব দিয়া কোগ্রাম-সীমায় উপস্থিত হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি. এ. মহাশয় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুবর্গ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঘন বন্যবৃক্ষসমাকীর্ণ নিবিড় বনভূমির মধ্যস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। গ্রামটিও বনভূমি। সম্মুখে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষের পশ্চিম পার্শ্বে ভগ্নপ্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণমধ্যে একটি ক্ষুদ্র নবনির্মিত ইষ্টকগৃহ দেখা গেল। ইহাই বর্তমান কালের চণ্ডীর দেউল। এই স্থানেই মঙ্গলচণ্ডীর অবস্থান। ইহারই পার্শ্বে ধনপতি দত্ত সদাগরের বাসভবন ছিল।

মঙ্গলচণ্ডিকার মন্দির

মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হইলে, পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করিতে হয়। বর্তমান মন্দিরটি দক্ষিণদ্বার। দীর্ঘে ২২ ফিট্‌ ৬ ইঞ্চি, প্রস্থে ২১ ফিট্‌। মন্দিরমধ্যে কাঠের সিংহাসনের উপরে পিত্তলময়ী দশভুজা মহিষমর্দিনী সিংহবাহিনী চণ্ডিকা দেবী বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার সিংহাসনের পুরোভাগে একটি প্রস্তবের বৃষ। বামে প্রস্তরের পলতোলা কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গমূর্তি -- ইঁহার নাম কপিলেশ্বর। তাঁহার বামে পদ্মাসনোপরি অবস্থিত ধ্যানী বুদ্ধমুর্তি, তাঁহার বামে গৃহের কোণে একটি বৃহৎ খড়গ। বুদ্ধমূর্তিটি উর্ধে ১´-- ৯´´, প্রস্থে ১১´´, পুরু ৩´´। উজানির মঙ্গলচণ্ডিকা পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং উজানি একটি পীঠস্থান মধ্যে গণ্য—

"উজানিতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি॥" -- পীঠমালা।

তন্ত্রচূড়ামণি নামক তন্ত্রের মতে উজানি নামক স্থানে ভগবতীর কূর্পরদেশ পতিত হইয়াছিল এবং দেবী মঙ্গলচণ্ডীকা ও ভৈরব কপিলাম্বর তথায় নিয়ত অবস্থান করেন; কুব্জিকাতন্ত্রে মঙ্গলকোটে উক্ত পীঠস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। শিবচরিত নামক সংগ্রহ পুস্তকে উজানিতে পীঠস্থানের কথা লিখিত আছে।

লোচনদাসের পাট

মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীর দেউল হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্বকোণে গমন করিলে 'লোচনদাসের পাটে' উপস্থিত হওয়া যায়। লোচনদাসের সমাধি-গৃহটি ক্ষুদ্র ও ইষ্টক-নির্মিত। সমাধিগৃহের প্রাঙ্গণে দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি দক্ষিণ দ্বারী। এই সমাধি-গৃহটি দীর্ঘে ১৫ ফিট্ ৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ১২ ফিট্ ১ ইঞ্চি। গৃহের মধ্যে লোচনদাসের পিরামিডাকৃতি (Pyramidal) সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাধির উত্তরাংশে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাধিগৃহ-প্রবেশের দ্বারের উভয় পার্শ্বে ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তরের দুইটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি আবদ্ধ রহিয়াছে। মূর্তিদ্বয় অতি সুন্দর ও অনুমান একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

সমাধিমন্দিরের বাহিরে পূর্বভাগে মাধবীলতার তলে ছোট বড় দশটি পিরামিডাকৃতি সমাধিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক-নির্মিত স্থান, তাহার তিনটি অংশ। উহার দুই পার্শ্বে দুইটি দেড় বা দুই হস্ত উচ্চ ছাদযুক্ত অতি ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ, মধ্যস্থল উন্মুক্ত। এই ক্ষুদ্র গৃহের পূর্বপার্শ্বে উদয়চাঁদ মহান্তের সমাধি এবং পশ্চিমে বীরচাঁদ অবধূত গোসাঞির ও তাঁহার প্রসূতির সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুই সমাধিস্থানের মধ্যস্থিত অংশে একটি সুন্দর কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্মিত জৈন তীর্থঙ্করমূর্তি বিদ্যমান ছিল। এই মূর্তিটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় আনীত হইয়াছে।

তীর্থঙ্করমূর্তি-পরিচয়

মূর্তিটি দিগম্বর, কালো প্রস্তরের উপর খোদিত, প্রস্তরটি উচ্চতায় সাড়ে ২৩" ইঞ্চি, প্রস্থে ১৪" ইঞ্চি, স্থূলতায় ৩ ইঞ্চি। মূর্তির মস্তকে একটি ছত্র বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ঢক্কা কোন অদৃশ বাদক কর্তৃক ধ্বনিত হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, দুন্দুভিনিনাদ হইতেছে। তন্নিম্নে মালা হস্তে দুইটি উড্ডীয়মান অপ্সরামূর্তি, তাহাদের নিম্নে, মূর্তির দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটি দেবমূর্তি খোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটির বদন শ্মশ্রুবিমণ্ডিত, তাহার এক হস্তে গদা, অন্য হস্তে অভয়মুদ্রা। দ্বিতীয় মূর্তিটি ধ্যানমুদ্রা অবস্থিত। তৃতীয়টির দক্ষিণ হস্তে গদা আর বামহস্তে জানুদেশ সংস্থাপিত। চতুর্থ মূর্তির দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা, বামহস্তে বরদ-মুদ্রা এবং তাহার শ্মশ্রুও বিদ্যমান রহিয়াছে। বামদিকের পাঁচটি মূর্তির মধ্যে প্রথমটির দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, বামহস্তে ঘট। দ্বিতীয় মূর্তির দক্ষিণ হস্তে পদ্ম এবং বামহস্তে গদা, তন্নিম্ন মূর্তির দুই হস্তেই পদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে। চতুর্থটি পুরুষের উর্ধ্বাঙ্গের মূর্তি, তাহার দুই হস্ত অস্পষ্ট, মস্তকে আভামণ্ডল রহিয়াছে। সর্বনিম্ন মূর্তির উপরার্ধ কোন স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি এবং নিম্নার্ধ সর্পপুচ্ছবৎ, তাহার দক্ষিণ হস্তে অসি ও বামহস্তে চর্ম বিদ্যমান। এই নয়টি মূর্তিই আসনে উপবিষ্ট। বিশেষ পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে যে, এই

মূর্তি নয়টি নবগ্রহের। ইঁহাদের নিম্নে তীর্থঙ্করের দুই পার্শ্বে দুইটি চামরধারী পুরুষ-মূর্তি, তাহারই ন্যায় দুইটি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার পরই পাদপীঠ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার মধ্যভাগে তীর্থঙ্করের ঠিক পদতলে একটি শায়িত মৃগমূর্তি। এই লাঞ্ছন দেখিয়া মূর্তিটিকে ষোড়শতম তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ অবধূত বলা হইয়াছে।* মৃগের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্মাতার কল্পিতমূর্তি আর পাদপীঠে দুই ধারে দুইটি নৈবেদ্য।

লোচনদাসের পাটের বর্তমান মহান্তের নাম হরিদাস মহান্ত, তিনি বাউলপন্থী সমাধি-প্রাঙ্গণের পূর্বভাগে উক্ত বাবাজীর আখড়াবাড়ি।

অজয় নদ

কুগ্রাম বা কোগ্রামের উত্তর পার্শ্বে অজয় নদ। লোচনদাসের বাটী হইতে অজয় অতি নিকটে। আমরা অজয়তীরে এক অশ্বত্থমূলে গিয়া উপবেশন করিলাম। অজয় অতি বৃদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, বালুকাস্তূপের অন্তরালে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পূর্বমুখে প্রবাহিত। উদ্যম নাই, চঞ্চলতা নাই। অজয়ের এই অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, ঘনরাম যে অজয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, এ অজয় বুঝি সে অজয় নহে। ঘনরামের অজয় যথার্থই অজয় ছিল।

"প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেন কালে।
তরল তরঙ্গ তেজে দুকূল উথলে॥
কূল কুল কুবর কখন কানে কান।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ॥"

ঘনরাম-ধর্ম্মমঙ্গল, অষ্টাদশ সর্গ।

বর্তমান কালে অজয় কুগ্রাম গ্রাস করিতেছেন। কোগ্রামের তীরভূমি সুউচ্চ আড়ানী। এই স্থানের সমতল ক্ষেত্রে লোচনের স্মরণার্থ উজানির মেলা বসিয়া থাকে।

কুনুর - সঙ্গমস্থল

এই স্থান হইতে পূর্বমুখে অগ্রসর হইলে, অজয় ও কুণুরের সঙ্গমস্থল। অজয় ও কুণুর-সঙ্গমের পশ্চিমেই উজানির মহাশ্মশান-ভূমি।

এই উজানির মহাশ্মশানের এক পার্শ্বে 'খড়্গামোক্ষণ' নামক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ইহার পার্শ্বেই 'খাড়গড়া', তৎপরেই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকাব্যোক্ত 'ভ্রমরার দহ'। প্রাচীন 'ভ্রমরার দহ' উপস্থিত বালুকাস্তূপ ও পলিমাটী পড়িয়া কৃষিভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

খড়্গামোক্ষণ

সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

প্রথম-বিক্রমাদিত্য নামে কোন নরপতি বেতালসিদ্ধি ব্যাপারে খড়্গাঘাতে জনৈক সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদন করেন। ব্রহ্মহত্যাপরাধে সেই খড়্গ সেই রাজার হস্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে। বহুতীর্থ ভ্রমণের পর উজানির এই মহাশ্মশানে অজয়নদতীরে খড়্গ হস্ত চ্যুত হইয়া পড়ে এবং মহারাজ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

* Ind. Aut. Vol. II P. 138

দ্বিতীয়--এক ব্যক্তি খড়্গদ্বারা তাহার ভ্রাতার মস্তক ছেদন করে। এই ভ্রাতৃহত্যারূপ মহাপাপে সেই খড়্গ তাহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া যায়। এই 'খড়্গমোক্ষণ' বলিয়া খ্যাত প্রান্তরে আসিলে তাহার সেই মহাপাপ-বিমোচনের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ হস্তসংবদ্ধ খড়্গ স্খলিত হয়। এই উভয় প্রবাদবশত এই খড়্গমোক্ষণের মাঠ তীর্থরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি পৌষসংক্রান্তির দিনে এই স্থানে স্নানার্থ বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে এবং এই স্থানে একটি মেলা বসে। ইহার পার্শ্বেই।

মাড়গড়া

নামক স্থান। এই স্থানটির নাম 'মাড়গড়া' কেন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় বলিলেন, এই স্থানে অজয়ের ধারে ধনপতি দত্ত সদাগরের দ্বিতীয়া স্ত্রী খুল্লনা ছাগী চরাইবার সময় বিশ্রাম করিতেন। প্রবাদ এই যে, খুল্লনা এই স্থানে ভাত রাঁধিয়া ভাতের মাড় গালিয়া ফেলিতেন।

ভ্রমরার দহ

খড়্গমোক্ষণ ও মাড়গড়ার অনতিপূর্ব্বভাগে কুণুর ও অজয়সঙ্গম-পার্শ্বে ভ্রমরার দহ। উজানি যখন বণিক্-সমাকুল ছিল, তখন এই ভ্রমরার দহে তাঁহাদের বাণিজ্য-তরণী লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইত। ধনপতি এই ভ্রমরার দহে ডিঙ্গার চাপিয়া সিংহলে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত এই ভ্রমরার দহে সাতখানি সমুদ্রগামী পোত ভাসাইয়া সিংহলে পিতার অনুসন্ধানে গমন করেন।

"প্রথমে ভ্রমরাজলে, শ্রীমন্ত নৌকায় চলে,
পূজিয়া মঙলচণ্ডিকায়।
এড়ায় ভ্রমরা-পাণি সম্মুখেতে উজানি
নিজ-গ্রাম এড়াইয়া যায়॥" —কবিকঙ্কন

বণিকেরা যখন সফরে বাহির হইতেন না, তখন তাঁহাদের ডিঙ্গাগুলি ভ্রমরার জলে নিমগ্ন থাকিত। বাণিজ্য-গমনের পূর্বে জল হইতে নৌকাগুলি তুলিয়া মেরামত ও গাবকালী করাইয়া ব্যবহার করিতেন। ভ্রমরার দহ তখন খুব গভীর ছিল। ডুবুরী নামাইয়া ডিঙ্গাগুলি তুলিতে হইত।

"পূর্ব্ব হইতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবুরী লইয়া সাধু গেল তার কূলে॥
ঘাটে জলদেবতার করিল পূজন।
জলেতে ডুবুরী গিয়া নামে দুই জন॥" — কবিকঙ্কণ

এই ভ্রমরার জলে ধনপতির মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রবাল, ছোটমুখী, গুয়ারেখী ও নাটশাল নামক সাতখানি সুবৃহৎ-নৌকা নিমগ্ন ছিল।

শ্রীমন্তের ডাঙ্গা

মঙ্গলচণ্ডীর দেউল হইতে পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই দক্ষিণভাগে একটি সুবৃহৎ উন্নত ডাঙ্গার উপর বৃহৎ অশ্বত্থতরু বর্তমান রহিয়াছে। এই স্থানটি প্রাচীন কালে লোকবাস-ভূমি

ছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। বর্তমান কালে এই স্থানটি বনাবৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এই স্থানের অনতিপূর্বভাগে একটি উন্মুক্ত উচ্চ ভূখণ্ড বর্তমান রহিয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে আকন্দ পুষ্পের ক্ষুদ্র গাছ হইয়াছে, এই স্থানের নাম শ্রীমন্তের ডাঙ্গা। ডাঙ্গার অনতি উত্তরে অজয়নদ এবং পূর্বভাগে ক্ষীণ কুণুরনদী প্রবাহিত। শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহলে যাইবার জন্য মঙ্গলচণ্ডীর দেউলে মহামায়াকে পূজা ও প্রণাম করিয়া যাত্রা করেন এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে এই ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া অনতিদূরস্থ ভ্রমরার দহের পোতগুলি দেখিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত যাত্রা করিয়া এই স্থানে প্রথমে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'শ্রীমন্ত-ডাঙ্গা' হইয়াছে। এই স্থানে জননী খুল্লনা আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,--

"খুল্লনা বলেন ছিরা শুন মোর বাণী।
বিপদে রাখিবে তারা নগেন্দ্রনন্দিনী॥"-- কবিকঙ্কণ

বর্তমান কালে কোগ্রামনিবাসী নরনারীগণ বিজয়াদশমীর দিবস দেবীর ঘট-বিসর্জনের পর মঙ্গলচণ্ডীর দেউলে গমন করিয়া মহামায়ার চরণে প্রণাম করিয়া, এই শ্রীমন্ত-ডাঙ্গায় আগমন করিয়া যাত্রা করেন। শ্রীমন্ত এই স্থানে যাত্রা করিয়া সিংহলে গমনপূর্বক সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাস রহিয়াছে।

মঙ্গলকোটের বর্তমান দর্শনীয় স্থান

মঙ্গলকোট-পরিক্রমণ

মঙ্গলকোটের পুলিশ-স্টেশনটি অতি উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত,কুণুর নদীতীরস্থ সমতলক্ষেত্র হইতে এই স্থানের উচ্চতা পঁচিশ হইতে ত্রিশ ফিট্ হইবে। অতি সুন্দর স্থান। যখন মঙ্গলকোট সজীব ছিল, তখন এই স্থান কোন দেবালয় বা ধনী জনগণের হর্ম্যাবলীতে পরিশোভিত ছিল বলিয়া মনে হয়। স্থানটির চতুর্দিক্ ইষ্টক-সমাকীর্ণ ও ভূপরি ইষ্টক-নির্মিত বহু গৃহভিত্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই স্থানটির দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরভাগে নিম্নভূমি। পুলিশ-স্টেশনটি যেন একটি অন্তরীপের নাসাগ্রে অবস্থিত। এই স্থান হইতে চতুর্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর। এই স্থানের পশ্চিমাংশে অশ্বত্থ, খেজুর ও বিবিধ বন্যবৃক্ষে একটি কুঞ্জবাটিকার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই স্বভাবজাত কুঞ্জবনের মধ্যে কয়েকটি ইষ্টক-নির্মিত সমাধি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে

গোলাম পঞ্জতন

নামক পাঁচ জন গাজী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। তাঁহার মঙ্গলকোট অধিকার করিতে আসিয়া জনৈক হিন্দু নরপতির হস্তে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল সাহেব আমাদিগকে মঙ্গলকোটের মোসলমান অধিকারকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু কাহিনী সংগ্রহ করিয়া দেন। উক্ত মৌলবীসাহেব মঙ্গলকোট-পরিক্রমার প্রধান পাণ্ডা হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে মঙ্গলকোটের দর্শনীয় স্থানগুলি অনায়াসে দর্শন এবং প্রত্যেক স্থানের প্রাচীন কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি।

গোলাম পঞ্জতনের সমাধিস্থান হইতে পূর্বমুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি গ্রাম্য পথের সহিত আমাদের গন্তব্য পথ মিশিয়া গেল। এই স্থানের ঠিক

পূর্বদিকে চতুর্দিকে ইষ্টক-বিক্ষিপ্ত ভগ্ন প্রাচীর-বেষ্টিত একটি নূতন মস্‌জিদ্ দেখা গেল। মস্‌জিদ্‌টির বাহিরের প্রাঙ্গণে পূর্বমুখে প্রবেশ করিয়া মূল মস্‌জিদ্-প্রাঙ্গণে উত্তর-মুখে প্রবেশ করিতে হয়। এই মস্‌জিদের নাম

কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদ্

প্রাচীন মস্‌জিদ্‌টি ভগ্ন হইবার পর উহার স্থানে এই মস্‌জিদ্‌টি নির্মিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে একখানি খোদিত শিলাফলক সংবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা হইতে হিজরি ১২২৫ সালে ইহা সংস্কৃত হইহাছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

মস্‌জিদের উত্তর অংশ প্রাচীর-বেষ্টিত। তথায় কয়েকটি প্রাচীন ধরনের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে চারিটি প্রস্তরগ্রথিত পয়ঃপ্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে।

মৌলবী সাহেব ফকিরের মস্‌জিদ্

কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদ্ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পূর্বমুখে খানিক পথ অতিবাহিত করিলেই ডাহিন ভাগে একটি প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জিদ্ নয়নগোচর হয়। এই মস্‌জিদের দ্বার পূর্বমুখে। মস্‌জিদ্‌টি প্রাচীন ধরনের ও বহির্দেশ বাঙ্গালা ঘরের আকারে নির্মিত। গৌড়ের কদম-রসুল মস্‌জিদ্ যে ধরনের, ইহার আকার ও গঠন কতকটা সেই প্রকার। অনেকে এই মস্‌জিদের নাম বলিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন, "মৌলবী সাহেব ফকীরের মস্‌জিদ্।"

মঙ্গলকোটের হাট

এই মস্‌জিদের নিকট হইতে পূর্বমুখে আন্দাজ এক রশি গমন করিলে বামে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং তাহারই পূর্ব-দক্ষিণ কোণে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ভগ্নস্তূপের উত্তরে একটি ক্ষুদ্র হাট, সেই দিন বসিয়াছিল।

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের মস্‌জিদ্

মঙ্গলকোটের হাটের দক্ষিণেই দুইশত পঞ্চাশ বর্গ ফিট্ পরিমাণ ভূখণ্ডের উপর একটি বাসভবনের চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। এই বাসভবন তিন ভাগে বিভক্ত, -- পূর্ব পশ্চিমের অংশে মস্‌জিদ্ ও সমাধিক্ষেত্র, তৎপরে দুই খণ্ড দুই জনের সদর ও অন্দর বিশিষ্ট বাসভবন চিল। হাটের উপর দিয়া দক্ষিণমুখে উক্ত প্রাচীন বাসভবনে প্রবেশ করা যায় যে স্থান দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, সেই স্থানটি উক্ত বাটী-প্রবেশের প্রধান দ্বার। দ্বারের উপর

নাকারাখানা

ছিল। উক্ত নাকারাখানা ১৮ বর্গ ফিট্ পরিমাণ ভূমির উপর নির্মিত ছিল। এই দ্বার দিয়া দক্ষিণ মুখে কয়েক হস্ত অগ্রসর হইলেই একটি কাঠচাঁপা বৃক্ষ দেখা যায়। এই স্থানের পশ্চিমাংশেই বাঁধান। প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জিদ্‌টির ইষ্টকরাশি অপসারিত করিয়া সেই স্থানে সেই প্রাচীন মস্‌জিদ্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকর্মরের এই মস্‌জিদ্‌টি নির্মিত হইয়াছে। অদ্যাপি সেই প্রাচীন মস্‌জিদের কোণের একটি স্তম্ভ বা মিনার বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নূতন মস্‌জিদে একখানি তোগড়া-অক্ষরমালা-খোদিত শিলাফলক আবদ্ধ রহিয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, ১০৬৫ হিজরিতে সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্বকালে প্রাচীন মস্‌জিদ্‌টি নির্মিত

হইয়াছিল। এই মস্‌জিদের দক্ষিণপার্শ্বে কারুকার্য -খচিত বাঙ্গালা ধরনের একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধি

বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার দ্বারদেশ কাষ্ঠের খুপ্‌রিকাটা কপাট দ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে। সমাধিগৃহটি দীর্ঘে ২২ ফিট্ ২ ইঞ্চি। এই সমাধিগৃহের সম্মুখভাগে মৃত্তিকোপরি বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা সুলতান হোসেন শাহের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত একখানি প্রস্তর পতিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরের খোদিত লিপিটি বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯১৬ হিজিরিতে নির্মিত হইয়াছিল।

মৌলানা দানেশমন্দের সমাধির দক্ষিণে আর একটি ক্ষুদ্র সমাধিগৃহ বর্তমান রহিয়াছে। তাহাতে

মিঞা হজ্জৎ উল্লাশাহ

নামক জনৈক ব্যক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। ইহার সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী সাহেলা বিবির সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানের দক্ষিণভাগ বহু সমাধি-চিহ্নিত রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী। একদিন এই পুষ্করিণীটির চারিদিক্ সোপান-শ্রেণীতে শোভিত ছিল, তাহার চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে এই পুষ্করিণীর নাম

মাইনে পুকুর

মাইনে পুকুরে স্নান করিয়া মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধিপ্রাঙ্গণে দেহ লুণ্ঠন করিলে বহু প্রকার চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, এ প্রকার বিশ্বাস এতদঞ্চলে বিশেষভাবে বদ্ধমূল রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম পাহাড়ে সুবৃহৎ বহু ইষ্টকগৃহ-শোভিত

কাজি খোদা নওয়াজ

সাহেবের বাসভবন ছিল। এক্ষণে ইহার বহু অংশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হইয়া গিয়াছে কাজি সাহেব একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

বাঁধাপুকুর ও হামামখানা

মৌলানি হাজি দানেশমন্দের ও মিঞা শা হজ্জৎ উল্লার বাসভবনের উত্তরে প্রায় ৭৫ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৫০ ফিট্ প্রস্থ জলভাগময় একটি সুন্দর পুষ্করিণী রহিয়াছে। যখন এই সকল স্থান সৌধমালায় শোভিত ছিল, তখন এই পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক-গ্রথিত সোপানাবলীতে পরিশোভিত ছিল। আজিও তাহার চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। আজিও জলের উপর ৩০টি সোপান বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বাঁধা পুষ্করিণীর বিশেষ কোন নাম নাই। দেশের লোকে বাঁধাপুকুর বলিয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বদিকে সুন্দর ইষ্টকময় হাউজখানা বা হামাম্‌খানা বিদ্যমান ছিল। এখন তাহার কতক চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর জল নলপথে উক্তগৃহে প্রবেশ করিত। এই পুষ্করিণীর জল অন্য এক প্রকাণ্ড বাঁধান সুড়ঙ্গপথে মৃত্তিকাভ্যন্তর দিয়া আট দশ রশি দূরে

ফুলবাগ

জল সরবরাহ করিত। প্রবাদ, মাইনে পুকুর, বাঁধাপুকুর ও ফুলবাগের পুকুর এই তিনটি

পুষ্করিণীতে মৃত্তিকাভ্যন্তর দিয়া নলপথে জলের সংযোগ ছিল। বাঁধাপুকুর হইতে পূর্বভাগে 'ফুলবাগে' যাইবার পথ। বর্তমানকালে ফুলবাগে আর ফুলগাছ নাই, ইক্ষুক্ষেত্র, আলুর ক্ষেত্র ইত্যাদিতে শোভিত রহিয়াছে। ফুলবাগে একটি ছোটখাট পুষ্করিণী আছে। তাহার উত্তর দিকের ঘাটটি বাঁধান ছিল। ঘাটটি প্রস্থে ৭১ ফিট্ ৬ ইঞ্চি। পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারে একটি সুন্দর ইষ্টকগৃহ ছিল। সাধারণে সেই গৃহটিকে

ফুলবাগের হাউজ ঘর

বলিয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীন। এই হাউজঘরটি দীর্ঘে ৫০ ফিট্ এবং প্রস্থে ৪০ ফিট্ মাত্র। পুষ্করিণীর দিকে হাউজগৃহের মধ্যগত বাঁধান "ইঁদারা" দেখা যায়। ইহা ইষ্টক ও লতাপাতায় বুজিয়া গিয়াচে। ইঁদারার ব্যাস ৫ পাঁচ ফিট্ ৮ আট ইঞ্চি। হামামখানার পশ্চিমে ভিত্তিগাত্রে তিনটি মৃত্তিকানলের ছিদ্রমুখ পর পর উপরি উপরি বর্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। উক্ত নল দিয়া হাউজঘরে ফোয়ারার জল উঠিত এবং তথা হইতে ফুলবাগে বিতরিত হইত। উক্ত নলের মুখের ব্যাস ৬ ইঞ্চি।

গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণভাগ বেষ্টন করিয়া আসিবার সময় আমরা একটি নামহীন ভগ্ন মস্জিদ্ দেখিতে পাই। তথায় কয়েকটি বাঁধান কবর ছিল। তৎপরে পুনশ্চ পুলিশ স্টেশনে আসিয়া বিশ্রামের পর অপরাহ্নে মঙ্গলকোটের উত্তরাংশ পরিভ্রমণে গমন করা গেল। কোয়ার সাহেবের মস্জিদের উত্তর পার্শ্ব দিয়া পূর্বমুখে সুউচ্চ ভূভাগের উপর দিয়া গমনকালে বহু বাসভবনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সম্মুখে একটি উন্মুক্ত উন্নত ক্ষেত্র, তথায় বৃক্ষাদি নাই। খোলামকুচি, ইটের কুচিতে সেই স্থানটি বিছান রহিয়াছে। ডাঙ্গার মধ্যস্থলে বৃষ্টির জলপরিমাণ - জ্ঞাপক যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। এই স্থানটির নাম

বিক্রমাদিত্যের ডাঙ্গা বা বিক্রমজিতের বাড়ি

বিক্রমাদিত্যের রাজভবনের আর কোন চিহ্ন বর্তমান নাই। চিহ্নগুলি বিবিধ কারণে কালের স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। কেবল স্মৃতি জাগাইবার জন্য নামটি বর্তমান আছে। পতিত উন্নত ভূমিটির পরিমাণ আন্দাজ কুড়ি পঁচিশ বিঘা হইবে। ইহার আয়তন আরও সুবৃহৎ ছিল, এই স্থলের অবস্থা দর্শনে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিক্রমাদিত্যের বাসভবনের অধিকাংশ অংশ সাধারণের বাসভবনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অনেক উদ্‌বাস্তু হইয়া পড়িয়া আছে। চতুর্দিক্ ঘুরিয়া দেখিলে বোধ হয়, অনুমান দুই শত বিঘা লইয়া একটি বাড়ি ছিল। গ্রামবাসীর অধিকারে আসিতে আসিতে এই সামান্য মাত্র স্থান পতিত রহিয়াছে। এই স্থানের উত্তর-পশ্চিমাংশ আরও উচ্চ, তথায় ইষ্টক-মণ্ডিত কতকগুলি সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে নাকি

গজনবী গাজী

চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ এই স্থানে সমাহিত হইয়াছে। ইহাও বিক্রমাদিত্যের গড়ের এক অংশ। এই বিক্রমাদিত্যের বাড়ি নামক ডাঙ্গাটি মঙ্গলকোটের অর্থাৎ প্রাচীন গড়বেষ্টিত স্থানের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে রাজার প্রাসাদ ছিল। এই রাজপ্রাসাদ মঙ্গলকোট নামক দুর্গ দ্বারা অভিরক্ষিত ছিল।

'উজানি নগর অতিমনোহর
বিক্রম-কেশরী রাজা।''

এই সেই উজানিরাজ বিক্রমকেশরীর রাজবাড়িতে আমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। উজানির ''মঙ্গলকোট'' নামক দুর্গ অধিকার করিবার জন্য

সপ্তদশ গাজী বা পীরের

প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, তবে মঙ্গলকোট মোসলমানের হস্তগত হয়। মঙ্গলকোটের অধিবাসিগণ বর্ষাকালে বা খুব এক পসলা বৃষ্টি হইলে পর এই রাজবাড়ির উপর, পথে ঘাটে সোনা খুঁজিয়া বেড়ায়। অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণকণা প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে অনেকে অনেক প্রকার ধাতব দেব-দেবী মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বা মঙ্গলকোটের বহু স্থান হইতে অনেকে অনেক অর্থও প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিক্রমাদিত্যের ডাঙ্গা বা বাড়ি খনন করিলে বহু প্রাচীন নিদর্শন প্রাপ্তির সম্ভবনা রহিয়াছে। উচ্চ ভূখণ্ড হইতে জল গড়াইয়া নিম্নভূমিতে পড়াতে অনেক স্থানের মৃত্তিকা কর্তিত হইয়া গিয়াছে। উন্নত ডাঙ্গা কাটিয়া একটি পথও নির্মিত হইয়াছে। সেই পথের ধারে ডাঙ্গার একাংশে প্রাচীন প্রথায় গ্রথিত ইষ্টকের সুবৃহৎ স্তূপের নিম্নভাগ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখা গিয়াছে। এই স্থানে সুবৃহৎ ইষ্টকালয় থাকার ইহাই একটি চিহ্ন বলিতে হইবে। এই ডাঙ্গাটি অন্য জমি হইতে বিশ ফিট্ উচ্চ হইবে এবং যে অংশে কবর রহিয়াছে, সেই অংশের উচ্চতা ত্রিশ ফিটের কম হইবে না।

বামে 'ভাদুপাড়' দৃষ্ট হয়। উত্তর মুখে কয়েক রশি পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তীর্ণ একটি প্রকাণ্ড দীঘি দেখা গেল। তাহা যথেষ্ট জলচর পক্ষীতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই দীঘির নাম

মজলিসদীঘি

এই মজলিসদীঘির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া উত্তরমুখে দীঘি অতিক্রম করিলেই সম্মুখে উন্নত ভূখণ্ডের উপর সুবৃহৎ একটি ভগ্ন মস্‌জিদ্ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মস্‌জিদের উপর বটতরু বিরাজ করিতেছে। এই মস্‌জিদের নাম

বড়বাজারের মস্‌জিদ্ বা হোসেনশাহী মস্‌জিদ্

প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফিট্ উচ্চ ভূখণ্ডোপরি লোহিতবর্ণের এক বৃহৎ মস্‌জিদ্ ছাদহীন প্রায় ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণের মস্‌জিদ্‌গাত্র ধূলিতে মিশাইয়া গিয়াছে। মস্‌জিদের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্বদিকে

রাজদীঘি

নামকএকটি চতুষ্কোণ বৃহৎ পুষ্করিণী বর্তমান রহিয়াছে। ইহার পূর্বপার্শ্ব দিয়া কাটোয়া গমনের পাকা রাস্তা প্রসারিত রহিয়াছে। মস্‌জিদ্‌টি যে স্থলে নির্মিত হইয়াছে এই স্থানটি উন্নত করিবার জন্য রাজদীঘি র কর্তনকালে সমুদায় মাটি পশ্চিম পাহাড়েই জমা করা হইয়াছিল। অন্য তিনটি পাড়ে আদৌ মাটির স্তূপের চিহ্ন নাই।

মস্‌জিদ্‌টি চতুষ্কোণ, সম্মুখে ও পশ্চাতে পাঁচটি করিয়া খিলান বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তরদিকের দেওয়ালে দুইটি করিয়া দ্বার ছিল। সম্মুখভাগের দেওয়ালের বাহির

দিকে বিবিধ প্রকারের খোদিত ইষ্টক -সমবায়ে আম্রশাখা ও লতা পুষ্প-পাতার আকৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। মস্‌জিদের এই সব অলঙ্কার এখন একে একে খসিয়া পড়িতেছে। গত ভীষণ ভূমিকম্পে এই মস্‌জিদের যথেষ্ট অতি হইয়াছে।

প্রত্যেক খিলানের অধোদেশে পাথরের "হাসকল" ও কবাট পরাইবার স্থান-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কপাট দ্বারা মস্‌জিদের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া রাখা হইত।

খিলানগুলি প্রায় ১৫ ফিট্ উচ্চ। উত্তরদিকের খিলানটি পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক খিলানের অভ্যন্তরদেশ সুন্দর কারুকার্যবিশিষ্ট। অভ্যন্তরদেশ ইষ্টক দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহার উর্ধ্বে প্রস্ফুটিত পদ্ম খোদিত রহিয়াছে। দুই খিলানের মধ্যস্থিত প্রাচীরগাত্রে স্তম্ভ প্রস্তর দ্বারা গঠিত। স্তম্ভের পাদদেশে একখানা প্রশস্ত প্রস্তর, তাহার উপরে তদপেক্ষা আকৃতিতে ছোট আর একখানা প্রস্তর। এইরূপ পরস্পর প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত প্রস্তরের সমষ্টিতে সমস্ত স্তম্ভগুলি নির্মিত হইয়াছে। স্তম্ভসকলের পাদদেশের প্রস্তরগুলি গৃহতলের উপর স্থাপিত এবং তাহার সমসূত্রে আর এক সারি প্রস্তর ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ থাকিয়া গৃহতলের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এইরূপভাবে আর এক সারি প্রস্তর স্তম্ভসকলের শিরোদেশস্থ প্রস্তরের সমান্তরালে চতুর্দিকের প্রাচীরের গাত্রে বিদ্যমান ছিল। ভিত ৭ সাত ফিট্ ৩ তিন ইঞ্চি পুরু। এই মস্‌জিদ্‌টি দীর্ঘে ৯১ ফিট্ ও প্রস্থে ৪১ ফিট্; চারি কোণে চারিটি মিনারেট ছিল। মস্‌জিদের অভ্যন্তরভাগে দেওয়ালগাত্রে কয়েকটি কুলুঙ্গী ছিল।

এই মস্‌জিদে যে সমুদায় প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এক শ্রেণীর নহে এবং সমস্ত প্রস্তরগুলি সমানভাবে মসৃণ করা হয় নাই। প্রস্তরগুলির আকৃতি ও গঠন দেখিলেই মনে হইবে, ইহা এই মস্‌জিদের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। পূর্বে এই সমুদায় প্রস্তর অন্য কোন গৃহে ব্যবহার করা হইয়াছিল। তথায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ প্রস্তরসমূহের ব্যবহার হইয়াছিল। এ স্থানে আনিয়া মস্‌জিদের উপযোগী করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা যথাযথস্থানে সংবদ্ধ করা হয় নাই।

চন্দ্রসেন রাজার নামাঙ্কিত শিলাফলক

মস্‌জিদের সম্মুখভাগের অভ্যন্তরদিকে, মধ্য প্রবেশদ্বারের বামদিকে স্তম্ভের পাদদেশের প্রস্তরখণ্ডে "শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতি"র নাম প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। এইরূপ অক্ষরমালা-খোদিত আর চারিখানি প্রস্তর উক্ত মস্‌জিদ্-অভ্যন্তরের দেওয়ালস্থিত প্রস্তরে দেখা গিয়াছে।

বোধ হয় একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তরে শ্রীচন্দ্রসেন রাজার একটি খোদিত লিপি পূর্ববর্ত্তী কোন দেবালয়ের কোন প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ ছিল। মোসলমানগণ তাহা ভাঙিয়া, কয়েকখণ্ডে বিভাগ করিয়া বর্তমান মস্‌জিদ্ নির্মাণ কালে ব্যবহার করিয়াছিল। এই অক্ষরমালাখোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি মস্‌জিদের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য শিল্পীগণ পল তুলিতে গিয়া অক্ষরমালার অধিকাংশ কর্তন করিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। যাহা সামান্য অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতেই শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতির নাম উদ্ধার হইয়াছে।

মিহ্‌রাব

পশ্চাদ্ভাগের দেওয়ালের ভিতরদিকে তিনটি মিহ্‌রাব আছে। মিহ্‌রাবের কতক অংশ প্রস্তরে ও কতক অংশ ইষ্টকে নির্মিত। ইহা একার্ধ কর্তিত গম্বুজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং ইষ্টকময় প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প দ্বারা সুশোভিত। নীচে এক সারি কল্‌কা ও তন্নিম্নে দুই সারি চৌখুপী কাজকরা আছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকের মিহ্‌রাব দুইটি সম্পূর্ণভাবে ইষ্টকদ্বারা নির্মিত এবং পূর্ববৎ কারুকার্যেশোভিত।

গাড়ার গাঁথুনি

মস্‌জিদের দেওয়ালের মধ্যভাগ ভাঙা ভাঙা ইষ্টকরাশি দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল এবং উক্ত অংশের গাঁথুনির জন্য 'খোলামকুচি' -বিশিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবহার হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে উক্ত অংশে চিত্রবিচিত্র করা পূর্ণ ও সমস্থূল ইষ্টকও দেখা যায়।

এই মস্‌জিদে আরবী ও পারসী ভাষায় লিখিত কোন লিপি দৃষ্ট হয় না। মঙ্গলকোটের বৃদ্ধ মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল সাহেব বলেন যে, এই মস্‌জিদের শিলালিপিটি সাজাহানের সময়ে নির্মিত মস্‌জিদে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। পূর্বেই উক্ত শিলালিপির কথা বলা হইয়াছে। উহা সুলতান্‌ আলাউদ্দীন্‌ হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯১৬ হিজরিতে নির্মিত হইয়াছিল। এই মস্‌জিদ্‌টির নির্মাণপ্রণালী দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, উহা বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান্‌গণের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। সম্ভবত ইহা হোসেনশাহ বা নসরৎ শাহ এতদুভয়ের রাজত্বকালে নির্মিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় দেখা যায় যে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক ব্লকম্যান কর্তৃক মঙ্গলকোট হইতে একটি শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে লিখিত আছে যে, ৯৩০ হিজিরিতে মহম্মদ নসরৎ শাহের রাজত্বসময়ে মিঞা মুয়জ্জম কর্তৃক একটি মস্‌জিদ্‌ নির্মিত হইয়াছিল।

খোদিত লিপি

মঙ্গলকোটের প্রান্তস্থিত বড়বাজার বা নূতন হাটের মস্‌জিদের বিষয় পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদ্‌ মধ্যে চন্দ্রসেন নামক জনৈক রাজার নামাঙ্কিত খোদিত লিপিযুক্ত কয়েকখণ্ড প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মস্‌জিদের প্রত্যেক খিলানের পার্শ্বে যে দুইটি স্তম্ভ আছে, তাহা ইষ্টকনির্মিত, তবে যে স্থানে খিলানের ইষ্টক শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে এক এক খণ্ড প্রস্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রস্তরগুলিতে স্থানে স্থানে খোদিত লিপি আছে। খোদিত লিপিগুলির অধিকাংশই অস্পষ্ট; অনুমান হয়, যে স্থানে মস্‌জিদ্‌টি নির্মিত হইয়াছে, সেই স্থানে পূর্বে কোন দেবালয় ছিল, তাহারই খোদিত শিলাফলকখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া মস্‌জিদ-নির্মাণকালে ব্যবহার হইয়াছে। নূতন হাট বা বড়বাজারের মস্‌জিদ্‌টি একটি উচ্চ মৃৎপিণ্ডের উপরে নির্ম্মিত, চতুঃপার্শ্বস্থিত সমতল হইতে বিংশতি হস্ত উচ্চে ইহার ভিত্তি অবস্থিত। ইহার সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে অনেকগুলি উচ্চ মৃৎপিণ্ড ও বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তিন খণ্ড প্রস্তরের খোদিত লিপি এখনও পাঠ করা যায়

(ক) ১। ... শ্রীচন্দ্রসেন নৃপত (?) রণ সেন্ নাম্না
২। ... ... শ্রীি... ....

বাঙ্গালার ইতিহাসে চন্দসেন রাজার নাম নূতন। ইতিপূর্বে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা খোদিত লিপি হইতে চন্দ্রসেনের নাম পাওয়া যায় নাই। নূতন হাটের মস্‌জিদের খোদিত লিপি হইতে তাঁহার অস্তিত্বমাত্র প্রমাণিত হইতেছে, তাঁহার বংশ-পরিচয় ও তারিখ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই। ভরতমল্লিক-প্রণীত "চন্দ্রপ্রভা" নামক বৈদ্যকুলগ্রন্থে চন্দ্রসেন নামক একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়,--

"ধন্বন্তরিকুলে বীজী রাজা বিমলসেনকঃ।
তস্য বংশাবলী বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাসিনঃ॥
একো বিমলসেনস্য পুত্রোইভূৎ পরমেশ্বরঃ।
পরমেশ্বরতো জজ্ঞে যাসুদেবো গুণিপ্রিয়ঃ॥
চিকিৎসাকার্য্যনৈপুণ্যাৎ শিখরেশাশ্রয়ং গতঃ।
সম্মানপূর্ব্বকং তেন স্থাপিতোয়ং মহীভুজা॥
বাসুদেবস্য তনয়ো লুপ্ত 'অ' নন্তসেন ইতি স্মৃতঃ।
উভাভ্যাং শস্ত্রশাস্ত্রাভ্যাং পণ্ডিতো রাজপূজিতঃ॥
তস্যৈবানন্তসেনস্য নাথসেনঃ সুতোইজনি।
বাঙ্গকুমারসংসর্গাদস্ত্রবিদ্যা বিশারদঃ।
তস্যাস্ত্রবিদ্যামালোক্য প্রীতোইভূৎ শিখরেশ্বরঃ।
হরিশ্চন্দ্রো দদৌ তস্যৈ তদ্দেশস্যৈকরাজতাম্॥
ততঃ পূর্ব্বার্জ্জিতং দেশং বিহায় খণ্ডসাধিতম্।
পাহাড়দেশখণ্ডে চ নাথসেনোহই (লুপ্ত অ) ভবন্ন পঃ॥
তদীয়াঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ রাজানস্তত্র চ স্থিতাঃ।
ইতি মত্বাভবদ্রাজা নাথসেনোই (লুপ্ত অ) তিষত্নতঃ॥
নৃপতের্নাথসেনস্য পুত্রো বিজয়সেনকঃ।
স এব সর্ব্বসংগ্রামে মহারাজোই (লুপ্ত অ) ভবদ্বলী॥
রাজ্ঞো বিজয়সেনস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভুবতুঃ।
চন্দ্রবচ্চন্দ্রসেনোই (লুপ্ত অ) ভূদবুধসেনো বুধোপমঃ॥"

বাঙ্গালা বিশ্বকোষে তিন জন চন্দ্রসেনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন হোমাচার্য সুরির শিষ্য, দ্বিতীয় অশ্বত্থমার হস্তে নিহত হন এবং তৃতীয় পরশুরামের সমসাময়িক।

খোদিত লিপির অক্ষরগুলির খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরমালার অনুরূপ।

(খ) ১। ... গ ... ন্যারসঃ (?) ি... বাগ ... ... তে ম...
২। ... সু ... ম্যান্তিথৌ যাব
৩। শ্রী ... করকে ৷ঠী

খোদিত লিপির এই অংশে তারিখ ছিল,প্রস্তরখণ্ডকর্তনকালে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(গ) ১। ... য্য নি ...
২। ... যাং পমি ...
৩। ... চর্য্য সহি ...

(ঘ) ১। ... মণ্ডলপদ্ধতি ...
২। ... মায়াব (?) হেতুম ...

নূতন হাটের মস্‌জিদের সম্মুখে যে দীঘি আছে, তাহার অপর পার্শ্বে একটি দর্‌গা আছে। এই দর্‌গার সোপানে খোদিত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(ঙ) ১। ... দ আ
২। ... নী

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির সম্মুখে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহের রাজ্যকালে হিজরী ৯১৬ অব্দের খোদিত লিপির অনুবাদ;--

"ঈশ্বর বলিয়াছেন ... ... সৎ ...

মাননীয় আলাউদ্দুনিয়া ও অদ্দিন আবুল মজফ্‌ফর হুসেন শাহ সুলতান,হুসেনবংশীয় সৈয়দ আসরফের পুত্র, ভগবান্ তাঁহার রাজত্ব ও গৌরব চিরস্থায়ী করুন। ৯১৬ সালে নির্মিত হইল।"

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির পার্শ্বে একটি পুরাতন মস্‌জিদের ভিত্তির উপরে মৌলবি মহম্মদ ইস্‌মাইলের যত্নে যে নূতন মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে,তাহার দ্বারের উপরে পুরাতন মস্‌জিদের খোদিত লিপিটি গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

খোদিত লিপির অনুবাদ,--

"ঈশ্বরের প্রেরিত (তাঁহার উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হউক) বলিয়াছেন -- যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মস্‌জিদ্ (উপাসনাস্থান) নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। এই মস্‌জিদ্ দ্বিতীয় সাহেব করাণ সম্রাট সাহেব-উদ্দীন মহম্মদ শাহ্‌জাহান বাদশাহ গাজির রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি ইহার নির্ম্মাণের তারিখ তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়,তাহা হইলে উহাকে বয়তুল আতিক বলিবে বলিয়া সম্বোধন করিবে, হিঃ ১০৬।"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুরাতন মস্‌জিদ্‌টি ১০৬ হিজরি অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার এইচ্ ব্লকম্যান মঙ্গলকোটে আর একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।* আমরা অনেক সন্ধান করিয়াও এই খোদিত লিপির সন্ধান পাই নাই।

J.A.S.B. 1896. Pt - 1, P. 296

খোদিত লিপির অনুবাদ,--

ঈশ্বরের প্রেরিত (তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হউন) বলিয়াছেন,-- যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মস্‌জিদ্ (উপাসনাস্থান) নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার নিমিত্ত সেই প্রকারের একটি গৃহ স্বর্গে নির্ম্মাণ করিবেন। এই জামেমস্‌জিদ্ হুসেনসাহেব পুত্র প্রশংসিত সুলতান্, সুলতানের পুত্র সুলতান্ নাসের উদ্দুনিয়া ও অদ্দিন আবুল মজফ্ফর নসরৎ শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত। ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব ও প্রাধান্য চিরস্থায়ী করুন। ইহার নির্ম্মাণকারী খান্ মিয়া মুয়জ্জম,মোরাদ হায়দর খানের পুত্র, তাঁহার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হউক, নয় শত ত্রিশ সালে নির্ম্মিত।" বন্ধুবর মৌলবী শ্রীযুক্ত আবুল মজফ্ফর জামালুদ্দিন মহম্মদ অনুগ্রহ করিয়া আরবীতে খোদিত লিপিগুলির অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

□ অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বর্ধমান ১৩২১ 'স্মরণিকা' □

বাবলাডিহি গ্রামে নেংটেশ্বর শিব বা জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর

প্রত্নক্ষেত্র মঙ্গলকোট

রঙ্গনকান্তি জানা

কথামুখ

পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রায় সবপর্বই আবিষ্কৃত হয়েছে। আদি প্রস্তর যুগ থেকে আরম্ভ করে নব্যপ্রস্তর যুগের অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন, তাম্রপ্রস্তর যুগের অধিবসতির নানা পুরাবস্তু, আদি ঐতিহাসিক যুগের ও তৎপরবর্তী যুগসমূহের অধিবসতির চিহ্ন ও পুরাবস্তু আজ আলোর মুখ দেখেছে। এইসব বিগত যুগের মানুষের জীবন ও সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে আজ আমরা একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে পেরেছি। পাণ্ডুরাজার ঢিবি, তমলুক, শোর্খনা, বাণগড়, চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর, আটঘরা, কর্ণ-সুবর্ণ, পান্না, ভরতপুর, মঙ্গলকোট, বীরভানপুর, ফারাক্কা, ডিহর, জগজ্জীবনপুর ইত্যাদি স্থান থেকে সুপরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত উৎখননের ফলে এবং অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা রকমের পুরাবস্তু, যেমন প্রাণীর জীবাশ্ম, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির মূর্তি ও খেলনা, পোড়ামাটির ফলক, শীলমোহরের ছাপযুক্ত পোড়ামাটির টুকরো, বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন রকম পাথরের পুঁতি, লোহার তৈরি কিছু জিনিসপত্র, ধাতুমদ্রা (বিভিন্ন সময়ের, পাথরের দেব-দেবীর পৌরাণিক শ্রীমূর্তি। এই পুরাবস্তুগুলির বেশির ভাগটাই প্রাক্ মৌর্যযুগ থেকে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর, এবং পাল-সেন যুগ পর্যন্ত সময়সীমায় পরিব্যাপ্ত। চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র) বহু মন্দির, স্তূপ, চৈত্য সংঘারামের অস্তিত্বের কথা জানতে পারা যায়। পাল-যুগের গৌড়-মগধ শিল্প (মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য শিল্পের পূর্বভারতীয় শৈলী) ভারতীয় ভাস্কর্যে এক অভিনব ভাবধারার প্রবর্তন করেছিল (ধ্যানস্থির দেব-দেবীর মূর্তির অপরূপ ভাবশুদ্ধ বিলাস যা ভারতের অন্যত্র একান্ত দুর্লভ)। ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকে এক নতুন ভাবধারায় সিক্ত করে বাংলার শিল্পীরা এক নতুন শিল্পধারার প্রবর্তন করে। তবে প্রাক্-মুসলমান আমলে বাংলাদেশের মূলত পশ্চিমবঙ্গের গৌড়-মগধ শিল্পরীতির মধ্যে বাস্তুশিল্পের পর্যাপ্ত আলোচনা এখনও সম্পূর্ণ নয়। মন্দির বাস্তুশিল্পের এখনও যে স্বল্পসংখ্যক নিদর্শন টিকে আছে সেগুলির ব্যাপক অনুসন্ধান ও সঠিক বিবরণী প্রকাশ করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন এগুলির যথাযথ সংরক্ষণের।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা। যার প্রধান স্মৃতিচিহ্নগুলি এখনও মালদহ, বর্ধমান, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বিদ্যমান। ভারতীয় মুসলমানি স্থাপত্যের যে-কয়টি বিশিষ্ট রীতি প্রচলিত ছিল, তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পাঠান রীতিটির অনুসরণ করা হয়েছিল। এছাড়া মুঘল শাসনকালীন কিছু স্থাপত্যকীর্তিও পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যমান। মুসলমান স্থাপত্য কীর্তি থেকে সমসাময়িক কালের হিন্দু স্থপতিরা অনেক কিছু নতুন পদ্ধতি শিখেছিলেন। মধ্যযুগের শেষের দিকে পোড়ামাটির ভাস্কর্যশিল্পের একমাত্র কেন্দ্র ছিল এই বাংলা (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে রাষ্ট্র)।

প্রত্নসমৃদ্ধ জেলা বর্ধমান

রাঢ় বাংলার প্রায় মাঝখানে বর্ধমান জেলার অবস্থান। নদীমাতৃক বর্ধমান জেলায় প্রাচীন সভ্যতার প্রধানত বিকাশ দেখা যায় নদ নদীকে কেন্দ্র করে। জেলার প্রায় সব অঞ্চলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রত্নস্থল ও পুরাকীর্তি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে যার মধ্যে খুব সামান্যরই উৎখনন হয়েছে বা তা আলোচিত হয়েছে। উৎখনন হওয়া প্রত্নস্থলের মধ্যে আছে বীরভানপুর[১], পাণ্ডুরাজার ঢিবি[২], ভরতপুর[৩], বাণেশ্বর ডাঙা[৪], মঙ্গলকোট[৫]। থেকে গিয়েছে আরও বেশ কিছু। যার সুপরিকল্পিত পর্যবেক্ষণের কাজ আজও অসম্পূর্ণ (প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা নিবিড় অনুসন্ধানের কাজে হাত দিয়েছে)।

যতটুকু বিজ্ঞানসম্মত তথা সুপরিকল্পিত উৎখননের কাজ হয়েছে, তার ফলস্বরূপ আমরা জানতে পেরেছি এই জেলার বিভিন্ন যুগে মানুষের জীবন ও সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য। এছাড়া প্রায় সর্বত্র বর্ধমান জেলা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মধ্যযুগের বহু পুরকীর্তি, তার মধ্যে যেমন আছে মুসলমান ধর্মীয় স্থাপত্য, তেমনি আছে হিন্দুধর্মীয় স্থাপত্য। এই জেলার পুরাতত্ত্ব নিম্ন দামোদর উপত্যকায় রাঢ় জনপদের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। প্রাক্-ঐতিহাসিক, অতিপ্রাচীন, প্রাচীন, প্রাক্-মধ্যযুগ, আদি মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে এইসব প্রত্নবস্তুর এবং পুরাকীর্তির গুরুত্ব যে অপরিসীম সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করতে এইসব প্রত্নবস্তুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও অনুসন্ধানের ফলে যেসব পুরাবস্তু বিভিন্ন স্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে, তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই জেলার বিভিন্ন স্থানে মানুষের বসতির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারা যায়। এইসব বসতির আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটেছিল বিভিন্ন স্তরে— নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে আদি ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত (কোথাও বা আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত, আবার কোথাও কোথাও মধ্যযুগ পর্যন্ত)। যেমন, অজয় নদের দক্ষিণতীরে ভেদিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত 'পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে' তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগের সূচনাপর্ব পর্যন্ত; পাণ্ডুরাজার ঢিবির পশ্চিমে 'গোস্বামীখণ্ডে', খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত; দামোদর নদের উত্তরে 'ভরতপুরে', তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত; বড়বেলুনে অবস্থিত 'বাণেশ্বরডাঙাতে' তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে লৌহযুগের সূচনা পর্যন্ত। কেবলমাত্র তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষের বসতির অস্তিত্ব জানা গিয়েছে কাটোয়ার পশ্চিমে 'গঙ্গাডাঙা'তে, কুনুর নদীর উত্তরে 'বসন্তপুরে', পাণ্ডুরাজার ঢিবির দক্ষিণে 'রাজারডাঙা'-তে, খড়্গেশ্বরী নদীর তীরে 'সাঁওতাল-ডাঙা'-তে, গুসকরার কাছে 'ধনটিকারী ডাঙা'তে, এবং এরুয়ার গ্রামের 'যক্ষেরডাঙা'তে,। বর্ধমান জেলায় একমাত্র মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্রে সেই প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল থেকে মধ্যযুগের মুসলমান আমলের পুরাবস্তু ও পুরাকীর্তির সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়।

প্রত্নক্ষেত্র মঙ্গলকোট

বর্ধমান সদর থেকে আনুমানিক ৩৫ কি.মি. উত্তরে অজয় নদ ও কুনুর নদীর অববাহিকায় (কুনুর নদীর দক্ষিণ তীরে) বাদশাহিসড়কের ধারে, কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার অধীন, মঙ্গলকোট গ্রামটির অবস্থান (অক্ষাংশ ২৩৩২´ উত্তর, দ্রাঘিমাংশ ৮৭৫৪´পূর্ব)। প্রায় চার বর্গ কি.মি. বিস্তীর্ণ অনেকগুলি ঢিবি সমন্বিত এই প্রত্নক্ষেত্রটি। নতুন হাট থেকে মঙ্গলকোট গ্রামে যাবার পথে গ্রামের বহির্ভাগে অবস্থিত। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে মৌর্য-সুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালীন বহু প্রত্নবস্তু উৎখননের ফলে বিভিন্ন স্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে।[৫ক]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে পাঁচবার এই অঞ্চলে উৎখনন চালানো হয়।[৬] উৎখননের প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় প্রাপ্ত পুরাবস্তুর ভিত্তিতে এই অঞ্চলের জনবসতি ছয়টি সময়-স্তরকে নির্দেশ করেছে। এই ছয়টি সময়-স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয়টি প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের মানুষের জীবনকালীন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০-৩০০ শতক); তৃতীয় স্তরটি মৌর্য ও সুঙ্গকালীন জনবসতির চিহ্ন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-১০০ শতক); চতুর্থ স্তরটি কুষাণ সময়কালীন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ৪০০ শতক); পঞ্চম স্তরটি গুপ্ত সময়ের (খ্রিস্টীয় ৪০০ শতক থেকে ৬০০ শতক) এবং ষষ্ঠ বা শেষ স্তরটি গুপ্তোত্তর কালকে নির্দেশ করছে (যদিও এই সময় খুব সম্ভবত স্তরটি খুবই বিশৃঙ্খল্য। মধ্যযুগে এই স্থানটি মুসলমানদের কবর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত। তবে মধ্যযুগীয় জনবসতির বিভিন্ন সময়-স্তরের বিন্যাস জানতে পারা যায় নিকটবর্তী কাছারিডাঙার ঢিবি উৎখননের তথ্য থেকে।

তবে শুধুমাত্র প্রাক্-মুসলমান সময়ের নয়, মধ্যযুগের বেশ কয়েকটি পুরাকীর্তি এই অঞ্চলে আজও অবহেলায় টিকে আছে। যেমন নতুনহাট বাসস্ট্যান্ডের কাছে 'হুসেনশাহী মসজিদ্'। এই মসজিদে পোড়ামাটির বেশ কিছু অলঙ্করণ আজও চোখে পড়ার মতো। এই মসজিদে কয়েকটি প্রস্তরখণ্ডে খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের লিপিধারায় লেখা দেখতে পাওয়া যায়। একটি খণ্ডিত লেখাতে জনৈক 'চন্দ্র সেন' এর নাম উৎকীর্ণ আছে। এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান হোসেনশাহ্ ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে।[৭] এই মসজিদটি যে ঢিবিটির ওপর অবস্থান করছে, তা পুরাবস্তু-সমৃদ্ধ। এখন এই জায়গাটি মুসলমান কবরস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই মসজিদটির সামনে যে বড় পুকুরটি আছে তার কাছে আরও একটি মসজিদ ছিল (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন)। শিলালিপি থেকে জানা যায় দ্বিতীয় মসজিদটির নির্মাণ হয় সুলতান হোসেন শাহর জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ শাহের আমলে, ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে।[৮] এছাড়া মঙ্গলকোট গ্রামের ভিতরে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের অর্থানুকূল্যে মৌলানা হামিদ দানেশমন্দ ১৬৫৫-৫৫ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে দানেশমন্দের সমাধির অংশে নতুন নির্মিত মসজিদে পুরাতন মসজিদের শিলালিপিটি প্রোথিত আছে।[৯] মঙ্গলকোট 'আঠারো আওলিয়া'র স্থান বলে মুসলমানদের কাছে সমাদৃত হয়। এই আঠারোজন আওলিয়ার সকলের নাম জানা যায় না। [৯ক] যাঁদের নাম জানা যায়, তাঁরা হলেন -- (১) মকুদম শাহ মহম্মদ (২)

হাজি ফিরোজ (৩) সোলাম পঞ্জতন (৪) সৈয়দশা তাজউদ্দীন (৫) আবদুল্লা গুজরাটি (৬) খাজাইদ্দীন চিস্তি (৭) শাহ হাজী আলী (৮) শাহ সিরাজউদ্দীন (৯) পীর গোরা। যাঁদের সমাধি আজও টিকে আছে --হামিদ দানেশমন্দ, আবদুল্লা গুজরাটী, শাহ জকের আলী। আজও এই অঞ্চলে পীর পঞ্জতনের মেলা, হামিদ দানেশমন্দের তিরোধান উৎসব, শাহ জকের আলির মৃত্যুবার্ষিকী, মকদুম শাহ ও আবদুল্লা গুজরাটীর মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব হয়।[১০] মধ্যযুগে মঙ্গলকোট যে রাঢ় অঞ্চলে মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পীঠস্থান ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রত্নবস্তু এবং পুরাকীর্তির ভিত্তিতে বলা যায় প্রাক্-ঐতিহাসিক হিন্দু, জৈন[১১] বৌদ্ধ[১২] ও মুসলমান আমলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ একমাত্র এই অঞ্চলে ঘটেছিল।

নৃসিংহ মূর্তি খ্রিস্টীয় একাদশ শতক। প্রাপ্তিস্থান কোগ্রাম, মঙ্গলকোট, বর্ধমান

প্রত্নক্ষেত্রে মঙ্গলকোট, প্রাচীন ঢিবি

সুরক্ষার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বর্তমানে পুরাবস্তু ও পুরাকীর্তি সমন্বিত এই মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্র সর্বস্তরের অবহেলায় অবক্ষয়ের পথে হাঁটতে শুরু করেছে। প্রাকৃতিক এবং অন্য বেশ কিছু কারণে এই অঞ্চলের পুরাবস্তু ও পুরাকীর্তি প্রায় অবলুপ্ত। প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ (ঢিবি) সমন্বিত এই প্রত্নক্ষেত্র এখন স্থানীয় মানুষ তার বাসস্থান তৈরির তাগিদে সমতল করে ফেলেছে বা ফেলছে (অদূর ভবিষ্যতে সরকারি খাসজমির ঢিবিগুলি আদৌ থাকবে কিনা সন্দেহ)। এই গ্রামের মানুষদের ভাবনায় আসে না-- একবার প্রাচীন প্রত্নস্থলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে তাকে আর পুনরুদ্ধার করা যাবে না। প্রাচীন মানব সভ্যতার একটি অমূল্য নিদর্শন চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। শুধুমাত্র সুপরিকল্পিত বিজ্ঞানসম্মত উৎখনন নয়, অমূল্য (দামের দিক থেকে নয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে) পুরাবস্তু পাওয়া যায় জমি চাষ করবার সময়, ঢিবি কাটতে, বাড়ির ভিত কাটতে গিয়ে, মজা পুকুর সংস্কারের সময় এবং নদীর খাত থেকে। সাধারণ গ্রাম্য মানুষ জানে না কীভাবে এইসব পুরাবস্তু সংরক্ষণ করতে হয় এইসব পুরাবস্তুর সঠিক সংরক্ষণে সংগ্রহশালার গুরুত্ব কতটা। তাঁরা মনে করেন, শহরের শিক্ষিত মানুষ গ্রাম থেকে পাওয়া প্রাচীন সামগ্রী জোর করে নিয়ে চলে গেল। ফলে অবিশ্বাস দানা বাঁধে, স্থানীয় আবেগে বাধাদানের চেষ্টাও হয় (এই অভিজ্ঞতা লেখকের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালার পক্ষে পুরাবস্তু সংগ্রহের সময় কয়েকবার হয়েছে)। এছাড়া পুরাবস্তুর একটা বড় অংশ অসামাজিক চক্রের মাধ্যমে অঞ্চলের তথা জেলার বাইরে চলে যায়। অজ্ঞতার জন্য ও অর্থের তাগিদে অনেক পুরাবস্তু (যেমন -- মুদ্রা, তাম্রপাত্র ইত্যাদি) গালিয়ে ফেলা হয়। সাধারণ গ্রামবাসীর মনে পুরাবস্তুর মূল্য সম্পর্কে একটা মনগড়া ভাবনা দানা বাঁধে। সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে অনেকে পুরাবস্তু বিক্রি করেছেন। প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের ইট বাসস্থান তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। গ্রামবাসীরা নিজেদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে মাটি খোঁড়ার

সময় বা বহুকালের প্রাচীন মজা জলাশয় সংস্কার করবার সময়, বা নদীখাত থেকে (মূলত কুনুর নদী এবং কুনুর ও অজয়ের সঙ্গমস্থল) হঠাৎই পাওয়া দেব-দেবীর মূর্তি গ্রামেরই একশ্রেণীর মানুষের হাতে পড়ে সাড়ম্বরে গ্রামের মধ্যেই (ঘি-সিঁদুর লেপে) পুজো পায়। এই পুজো-আচ্চা কতটা গ্রামবাসীর তথা গ্রামের মঙ্গল কামনায় তা বলা কঠিন। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও আবেগ যেখানে, তাতে হাত দেবার কোনও উপায় নেই। তবে এক্ষেত্রে ঐ মূর্তিটির সংরক্ষণ কতটা হচ্ছে সেটাই প্রশ্ন। বেশিরভাগ মূর্তির হাল হয় শোচনীয়। গতবছর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা এক মূর্তি সংগ্রহের অভিযানে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। স্থানীয় মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে এই কাজে বাধাদান করেন। তবে পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারায়, তাঁরা মূর্তিটি সংগ্রহশালাকে দিয়ে দেন। এই কাজে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় পঞ্চায়েত বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। আর সহায়তা করেছিল গ্রামের কিছু অত্যুৎসাহী মানুষ নিঃস্বার্থভাবে। তাঁদের কেতাবি ইতিহাসজ্ঞান নেই ঠিকই, তবে তাঁরা গ্রামকে ভালবাসেন, আর গ্রামের প্রত্নক্ষেত্রটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। এঁদেরই একজন--কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তু সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র আইন দিয়ে সুরক্ষা সম্ভব নয়। গ্রাম্য জনগণের সর্বাত্মক সক্রিয় সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন-- প্রথমত, এই প্রত্নস্থলের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশাসনিক স্তরের সাহায্য নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা। দ্বিতীয়ত, মূর্তি বা অন্যান্য পুরাবস্তু যা এই অঞ্চল থেকে পাওয়া যাবে, তা নিকটবর্তী সরকারি বা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায় (মুখ্যত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায়) রাখার ব্যবস্থা করা; এক্ষেত্রে সংগ্রহশালার ভূমিকা কতটা প্রয়োজনীয় তা সুস্পষ্টভাবে তাঁদেরকে বোঝানো। সরকারি সংগ্রহশালাই একমাত্র স্থান যেখানে সঠিক সুরক্ষায় এবং সঠিক সংরক্ষণপ্রথার প্রয়োগে সুপরিকল্পিতভাবে পুরাবস্তু রাখা সম্ভব। সরকারি সংগ্রহশালা (এক্ষেত্রে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা) কোনো অবিশ্বাসের জায়গা নয় এবং তার কোনো বিকল্প নেই। তৃতীয়ত, এই অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির সব ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষিত মানুষদের তাঁদের অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষিত করা, মঙ্গলকোটের পুরাকীর্তি ও প্রাচীন টিবিগুলির সুরক্ষায় তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধের সঞ্চার করা। এই কাজ প্রশাসনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে হওয়া উচিৎ। চতুর্থত, এই প্রত্নস্থলের পাশাপাশি গ্রামগুলির ও নদীখাতে (কুনুর নদী) নিবিড় পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকাজ চালানো। তবে এই কাজে এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের নিঃস্বার্থ সহযোগিতার একান্ত দরকার।

পরিশেষে বলি, এই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনগুলির সুরক্ষার দায়িত্ব, এই অঞ্চলের মানুষদের নিতে হবে। কারণ এটা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। আজও টিকে -থাকা অবহেলায় জরাজীর্ণ স্মৃতিচিহ্নগুলিকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য টিকিয়ে রাখতে সবাই মিলে উদ্যোগী হতে হবে।

সূত্র নির্দেশ

(১) এ. ঘোষ (সম্পাদক), অ্যান্ এন্সাইক্লোপিডিয়া অব ইন্ডিয়ান আরকিওলজি, ভল্যুম-২, ১৯৮৯, নিউদিল্লি, পৃ. ৭৮।

(২) ঐ, পৃ. ৩৩০।

(৩) ঐ, পৃ. ৬৬ - ৬৭।

(৪) ঐ, পৃ. ৪৬।

(৫) **প্রত্নসমীক্ষা**, ভল্যুম-১, ১৯৯২, কলকাতা, পৃ. ১০৭-১৩৪।

(৫ক) সমগ্র অঞ্চলটিকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে প্রাচীন মঙ্গলকোটের ব্যাপ্তি ছিল--- উজানি কোগ্রাম, নতুন হাট, বক্সীনগর, বড়বাজার, পদিমপুর, বাবলাডিহি, দেবপুর- শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে।

(৬) প্রত্নসমীক্ষা পৃ. ১০৭-১৩৪।

(৭) জার্নাল অব্ দ্য বিহার অ্যাণ্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, ১৯১৭, পাটনা, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫।

(৮) সামসুদ্দীন আহমেদ (সম্পাদক) ইন্স্ক্রিপ্শন্স অব্ বেঙ্গল, ভল্যুম-৪, ১৯৬০, রাজশাহী, পৃ. ২১১-২১২; জার্নাল অব্ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, ১৮৭২, পৃ. ৩৩২।

(৯) সামসুদ্দীন আহমেদ (সম্পাদক), ইন্সক্রিপ্সন্স অব্ বেঙ্গল, ভল্যুম-৪, ১৯৬০, রাজশাহী, পৃ. ২৭৯-২৮০; জার্নাল অব্ দা বিহার অ্যাণ্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি। ১৯১৭, পাটনা, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭।

(৯ক) মহম্মদ এনামুল হক্ , এ হিস্ট্রি অব্ সুফীজম্ ইন্ বেঙ্গল, ১৯৭৫ , ঢাকা, পৃ. ১৮৬।

(১০) বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১৯৫৭, কলকাতা, পৃ. ২৭৯-২৮৮; যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বর্ধমান - ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২-য় খণ্ড, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ৭৬, ৭৮, ৯৬।

(১১) বাবলাডিহি গ্রামে ন্যাংটেশ্বর শিব বলে পূজিত মূর্তিটি জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের।

(১২) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা সম্প্রতি এই অঞ্চলে অনুসন্ধানের সময়, মঙ্গলকোট থানার সহযোগিতায় একটি বৌদ্ধ 'জম্ভল' (ঐশ্বর্যের দেবতা) মূর্তি উদ্ধার করেছে। এই মূর্তিটির পশ্চাৎ অংশে খ্রিস্টীয় ১১ /১২-শ শতকের লিপিতে একটি লেখ উৎকীর্ণ আছে।

□ 'নতুন চিঠি' শারদ সংখ্যা ২০০১ □

অজয় সভ্যতা

ড. কালীচরণ দাস

অবিভক্ত ভারতে সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীনতম সভ্যতার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে জন মার্শালের তত্ত্বাবধানে পাঞ্জাবের মন্টগোমেরি জেলার হরপ্পায় ও সিন্ধের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদড়োতে প্রায় আড়াই-তিন হাজার খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের সভ্যতার নমুনা মেলে[১]। এই সভ্যতা আবিষ্কারের পিছনে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও জড়িয়ে আছে। পাঁচ হাজার বছর আগে যে সুসভ্য মানবজাতি এক সুবৃহৎ নগরের পরিকল্পনা করতে পারে, তারা যে আরও কয়েক সহস্র বছর আগে সভ্যতার আলোক পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বাধীন ভারতের ভৌগলিক সীমায় সে সভ্যতা বাঁধা পড়বে না। অবশ্য এই শতাব্দীরই পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকের উৎখননের ফলে স্বাধীন ভারতেই কয়েক জায়গায় প্রাচীন সভ্যতার নির্দশন পাওয়া গেছে। সেগুলি মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক তো বটেই, উপরন্তু, তৎকালীন সভ্য মানুষদের কর্মদক্ষতার ছাপ সেগুলিতে আরও সুস্পষ্ট। রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলার রূপার আলমগীরপুর এবং কালিবঙ্গা হল সেগুলির অন্যতম[২]। আবার গুজরাটের আমেদাবাদ জেলার লোথালে[৩] মহেঞ্জোদড়োর অনুরূপ সীল ছাড়াও আবিষ্কৃত হয়েছে বিরাট এক জাহাজ ঘাঁটির ধ্বংসাবশেষ। যার দৈর্ঘ্য দুশো আঠারো মিটার, প্রস্থ সাঁইত্রিশ মিটার। এবং যা সাত মিটার চওড়া নালার সাহায্যে নিকটস্থ ভোগাভো নদীর সঙ্গে যুক্ত। মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পায় আমরা যে খবর পাইনি লোথালে তাও পেলাম। জানা গেল, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সংযোগ ছিল, আর জাহাজই ছিল তার অন্যতম মাধ্যম। কাজেই অবিভক্ত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের কথা বলতে গেলে শুধু মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা নয় তার সঙ্গে রূপার বা কালিবঙ্গার নাম অবশ্যই করতে হবে।

এই প্রাচীন সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে সিন্ধু নদের যে সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অজয়ের সম্পর্ক তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অজয়ের কূলে কূলে প্রাচীন সভ্যতার অমূল্য নজির এখনও ভূগর্ভে চাপা পড়ে রয়েছে। কোথাও রয়েছে অতল গভীরে আবার কোথাও বা উন্মুক্ত ভূস্তরে উঁকি দিচ্ছে। অজয়তীরেই বোলপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছরের প্রাচীন সুসভ্য নগর বিন্যাসের প্রথম প্রত্ন নিদর্শন[৪]। পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলেই ইতিহাসের তাম্রাশ্মীয় পর্বের বাঙালীরা বসতি স্থাপন করে এবং শস্যোৎপাদনে, পশুপালনে ও সমাজ গঠনে প্রথম অভ্যস্ত হয়েছিল[৫]। উনিশশো বাষট্টির এই আবিষ্কারের ফলে অজয়ের তীরে তীরে প্রত্নবিদদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি পড়েছে। সদর কাটোয়ায় অজয়-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল থেকে শুরু করে সুদূর মুঙ্গেরের জামুই মহকুমার পাহাড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে তাদের অনুসন্ধানস্থল।

পরবর্তীকালে কোথাও কোথাও আবিষ্কৃত হয়েছে পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিককাল পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন জনবসতির সুসভ্য ইতিহাস। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের সমকালীন সিন্ধু সভ্যতা যেমন পৃথিবীর পুরাতাত্ত্বিক মানচিত্রে ভারতকে যথাযোগ্য জায়গা করে দিয়েছে ঠিক তেমনই এই অজয় সভ্যতা উজ্জ্বল করেছে পশ্চিমবাংলাকে। এই ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রে অজয় সভ্যতা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আজকের অজয়ের উৎপত্তিস্থল হাজারিবাগের উত্তর-পূর্বাংশে, জসিডির পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার জামুই থানার চাকাই পাহাড়ে[৬]। মুঙ্গের জেলায় অজয় সৃষ্ট হয়ে সাঁওতাল পরগণার দেওঘর মহকুমার কেন্দ্র দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত। পথে পড়েছে ক্রমান্বয়ে জসিডি, দেওঘর (দশ ও ছ-মাইল দূরত্বে), সরাথ, জামতারা ও জামুড়িয়া। সরাথের কাছে হাজারিবাগ জেলা থেকে উদ্ভূত পথেরো ও আরও দক্ষিণে জয়ন্তী এসে মিশেছে অজয়ে। তারপর চিত্তরঞ্জনের কাছে অজয় প্রবেশ করছে বর্ধমান জেলায়, গতি তখন পূর্বাভিমুখী। বাম তীরে রইল বীরভূম আর ডান তীরে বর্ধমান। কেতুগ্রাম থানার প্রান্তে অজয় ধরা দিল কাটোয়া মহকুমাকে, আর লীন হয়ে গেল ভাগীরথীতে, কাটোয়া শহরের ঠিক উত্তরে। পাড়ে পড়ল বর্ধমান জেলার পুরাসমৃদ্ধস্থল পাণ্ডুরাজার ঢিবি, গোস্বামী ডাঙ্গা, রাজার ডাঙ্গা, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, গঙ্গাডাঙ্গা, আর বীরভূম জেলার পোতাগুা, যশপুর, ভীমগড়, কেন্দুলী, মুন্দিরা, ইলামবাজার, রায়পুর, সুপুর, বেলুটি, সুরথরাজার ঢিবি ইত্যাদি। বীরভূমের মধ্য দিয়ে হিংলো এসে অজয়ে আছড়ে পড়েছে পাঁচরার দক্ষিণ-পূর্বে ভোফলাই-এর কাছেই। তারপর মঙ্গলকোটে পশ্চিম থেকে কুনুর এসে অজয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। উৎপত্তিস্থল থেকে কাটোয়ায় সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অজয়ে পাখি ওড়ার দূরত্ব মোটামুটি তিনশ কিলোমিটার।
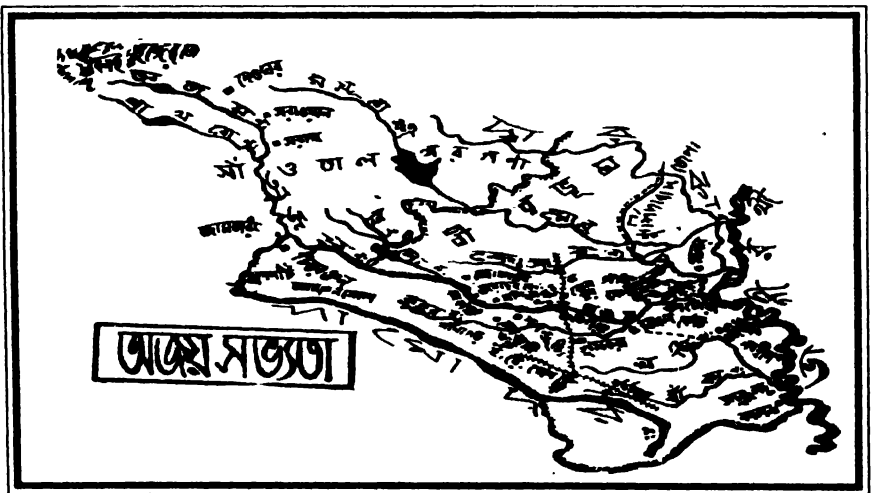
আর আবহক্ষেত্র ছ-হাজার বর্গ কিলোমিটার। অজয় ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল থেকে শুরু করে মুঙ্গেরের চাকাই পাহাড় পর্যন্ত অজয় সভ্যতার বিস্তৃতি, আর তার কূলে কূলে প্রাচীন সভ্যতার নজির রয়েছে সঞ্চিত। কোন জায়গায় প্রাথমিকভাবে আবার কোন কোন জায়গায় পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক উৎখননের ফলে পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে আরম্ভ করে তাম্রাশ্মীয় যুগ (খ্রিস্টপূর্ব দু-হাজার) পর্যন্ত প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলি এখন প্রত্নবিদদের গবেষণাগারে পূর্ণ বিশ্লেষণের অপেক্ষায় রয়েছে। এগুলির মধ্যে পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে আবিষ্কৃত প্রাচীন নগর-সভ্যতা ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু নিঃসন্দেহে খ্রিস্ট পূর্ব দু-হাজার বছর আগেও এই পশ্চিমবঙ্গে এক সুসভ্য জাতির বসবাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, আর তা থেকেই একদা অজ্ঞাত এই পশ্চিমবাংলা ভারতের পুরাতাত্ত্বিক মানচিত্রে সসম্মানে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছে।

অজয় এক প্রাচীন নদী। ঐতিহাসিককালে রচিত পুস্তকাদিতেও অজয়ের উল্লেখ আছে — কোথাও অজয় নামে আবার কোথাও অজাবতী অথবা অজমতী[৭] নামে। মেগাস্থিনিস অজয়কে বলেছেন অ্যাসিস্‌টিস (খ্রি.পূ. ৩০২-২৯৮), আরিয়ান লিখেছেন, এই নদী কাটাদুপা শহরের কাছে ভাগীরথীতে মিলিত হচ্ছে।[৭ক] গলিভতন্ত্রে অজয়ের নাম অজয়া, অজয়ী, অজসা ইত্যাদি। অজয় অর্থে--নাহি পরাজয় যার। কিন্তু একটি নদীর জয় পরাজয় বলতে কি বোঝায় বলা কঠিন; তাই মনে হয় এই উক্তি অজয়ের দেশে অজয়বাসী সম্পর্কে বেশী প্রযোজ্য। এই নদীর পবিত্র জলে স্নান করলে অজেয় হওয়া যায় এরকমের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই অজয় নামের উৎপত্তি। হয়তো তথাকথিত সর্বজয়ী আর্যজাতি অজয় সভ্যতার আদিম মানুষদের পুরোপুরি জয় করতে পারেননি বলেই এ সভ্য অঞ্চল রয়ে গেল অজেয়। অতীত ইতিহাসের অজ্ঞাত এই অস্পষ্ট সত্য হয়তো বা অজয় নামের অন্তরালে এখনও লুকিয়ে আছে। ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড পুঁথিতে রাঢ়ীখণ্ড জাঙ্গল নামে এক দেশের মধ্যে অজয় নদী, বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, বীরভূমি ইত্যাদি সহ বিভিন্ন নদী ও গ্রামের নাম আছে। তাছাড়া জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত 'আয়বঙ্গ' হাট অজয় তীরেই বর্তমান ছিল বলে অনেকের ধারণা[৮]। মহেশ্বরের ফুল পঞ্জিকায়[৯] গঙ্গার সঙ্গে অজয়ের নামও লেখা রয়েছে যেমন —

বীরাভুঃ কামকোটী-স্যাৎ প্রাচ্যাং গঙ্গাজয়ান্বিতা
আরণ্যক প্রতীচ্যন্তু দেশোদার্ষদ উত্তরে
বিন্ধ পাদোদ্ভবা নদ্যঃ দক্ষিণে বহ্বাঃ সংস্থিতাঃ।

বনমালী দাস তাঁর 'জয়দেব চরিতে' অজয়ের নাম উল্লেখ করেছেন[১০]। তিনি মনে করতেন অজয় তীরে কেন্দুলী ছিল কবি জয়দেবের লীলাক্ষেত্র।

অজয় তরঙ্গ বহে অতি সুশোভন
কিনারে পুষ্পের শোভা গন্ধে ভরে মন।
কৃত্তিবাসী রামায়ণেও অজয়ের নাম আছে (খ্রী. ১৩৮৫)
অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন।
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ।

চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে অজয়ের নাম রয়েছে বহু জায়গায়। এমন কি মঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট চরিত্রগুলির অনেকে অজয় বেয়ে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন দেশান্তরে—

লহনা খুল্লনা স্থানে করিয়া মেলানি।
বহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী।।

বিপ্রদাসের মনসা বিজয়ের (খ্রী. ১৪৯৫) কয়েক জায়গাতেই অজয় প্রসঙ্গ টানা হয়েছে, যেমন --

রাজঘাট রামেশ্বর বাহিয়া এড়ায়।
ধর্ম্মখান বাহিয়া অজয় নদী পায়।।

অন্যত্র প্রথমে বাহিনু জান রামেশ্বর ধর্ম্মখানি
অজয় বিজয় সুরেশ্বরী।।

এমন কি দু-আড়াইশো বছর আগে রচিত এ অঞ্চলের প্রায় সবকটি উপাখ্যানে, কাব্যে, কবিতায় বা ইতিহাসে অজয়ের নাম আছেই। গঙ্গারাম দত্তের মহারাষ্ট্র পুরাণে আছে বর্গী আক্রমণের বর্বর ইতিহাস; অজয়ের ভূমিকা সেখানেও লক্ষণীয়[১১] —

আষাঢ় মাসের দেওয়া ঘন বরিষণ।
অজএ ভাসিয়া গঙ্গা ভরিল তখন।।

অজয়ের প্রেম ডোরে বাঁধা পড়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকও। অজয়তীরে কোগ্রামে ছিল কবির কুটির। কখনও তিনি অজয়ের রূপে মুগ্ধ হয়েছেন, কখনও আবার অজয়ের নির্দয় আষাঢ়ে রূপে হয়েছেন আতঙ্কিত। অজয় তাঁর কাছে ছিল একটি পূর্ণ জীবন্ত সত্তা, তাই এক এক সময়ে কবি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আত্ম নিবেদন করেছেন অজয়ের কোলে, আবার পরক্ষণেই আক্রোশে, অভিমানে কবি অজয়কে কটুকথা শোনাতেও কার্পণ্য করেন নি —

তোমার এ বারি নয়তো অজয়--এ বারি গরল ভরা,
তোমার স্নেহের কণা নাই এতে এ শুধু বিষের ছড়া।
কবির এ অভিমান চিরস্থায়ী হয়নি, তাই পরক্ষণেই -
অজয়ে তো জানো দুর্দমতার গতি
যত ভালবাস তত বেশী তার রাগ,
বরষ বরষ করে সে আমার ক্ষতি
তবু ভালবাসি তার সে সোহাগ।

অথবা-

আমি বসে দেখি অজয় নদীর চর
নব নব রূপ ধরে সে নিরন্তর।

অথবা - সোহাগ-জড়ানো কণ্ঠে কবি যেন দামাল অজয়কে কোলে তুলে নিলেন —

ভুলে গিয়েছে সে উদ্দাম নর্তন,
দুকূল ভাসানো তুফানের আলোড়ন।

সত্যি বলতে কি, কবি অজয় নামে কাব্যগ্রন্থ লিখেও নীরব থাকতে পারেন নি। তাই পরবর্তী সব কটি কবিতাতেই বার বার তিনি অজয়কে টেনে এনেছেন। কিম্বদন্তীর পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে যে দু-হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের সভ্যতার নমুনা পাওয়া গেছে সেখানেও হয়তো কুমুদরঞ্জনের মত কোন অজ্ঞাত কবি অজয়ের গুণগান করেছিলেন, আবার অভিশাপও দিয়েছিলেন দুর্দমনীয় সেই অজয়কে, যখন খ্রীষ্টপূর্ব তেরো শতাব্দীর ভয়ঙ্কর বন্যায় সেই কবিকে বাস্তু ভিটে ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছিল। উনিশশো আটাত্তরের বন্যাই শুধু অজয়বাসীদের ক্ষতি করেনি, সর্বনাশের বান ডেকেছে যুগে যুগে। প্রাচীনতম প্রত্ন নিদর্শন হল তিন হাজার তিনশো বছর আগেকার অজয়ের সেই প্রলয়ঙ্করী বন্যা[১২]। যুগে যুগে মানুষের অভিশাপ কুড়িয়েও অজয় কিন্তু রয়ে গেল অজেয়, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন উপত্যকা পরিকল্পনা আজও হয়নি ফলপ্রসু, যেমনটা হয়েছে আর এক দামাল নদী দামোদরের বেলায়। সার্থক হয়েছে অজেয় নাম অজয়ের।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা শহরের উত্তরে অজয় ভাগীরথীকে স্পর্শ করছে। কাটোয়া এক প্রাচীন জনপদ, আরিয়াণের মতানুসারে কাটোয়ার প্রাচীন নাম কাটাদুপা। কাটোয়া ছাড়াও ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে আরও কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে ইন্দ্রাণী ভূভাগ গঠিত হয়েছিল সুদূর অতীতে। চারশো পাঁচশো বছর আগে রচিত বিভিন্ন পুঁথিতে ইন্দ্রাণী নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই নাম পরগণা হিসাবে এখনও বহাল আছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতে, কত্তিবাসী রামায়ণে ও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ইন্দ্রাণীর উল্লেখ দেখা যায়[১৩]। যত্রতত্র মূর্তি খচিত বিশাল বশিল প্রস্তর দেখে ও কিংবদন্তীর সূত্র ধরে অনুমান করা হয় অতীতে এই অঞ্চলে উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরের অনুরূপ একটি বিরাট মন্দির বর্তমান ছিল ও ভাগীরথীর তীরে তীরে প্রশস্ত ঘাটগুলি ছিল বৈভবের প্রতীক। কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতের শেষ অধ্যায়ে লিখেছেন (ইং ১৯০২-৪)।

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থে যথা বৈসে ভাগীরথী॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণে (জন্ম - ইং ১৩৮৫) পাই —

অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন।
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ।।
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।
পলকেতে উপস্থিত হন ইন্দ্রেশ্বর।।

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল (চৈতন্য পূর্ব) এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কয়েক জায়গাতেই ইন্দ্রাণী প্রসঙ্গ এসেছে।

শৃঙ্খফণীর ঘাট সাধু উত্তরিল গিয়া
ইন্দ্রাণীর ঘাট সাধু পদ্দ করিআ। (মাণিক দত্ত)
সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি
দৈব নাশে যাহার সদন॥ (কবি কঙ্কণ) ইত্যাদি।

চৈতন্যদেব নবদ্বীপ থেকে সোজা কাটোয়া (কণ্টক নগর) এসে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস নেন ১৪৩১ শকের ২৯ শে মাঘ[১৪]। চৈতন্য ভাগবতে লেখা আছে (ইং ১৫৬০)।

গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌর সুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক নগর॥

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানটিকে বৈষ্ণব সমাজ চিরস্মরণীয় করে রাখবার অভিপ্রায়ে পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গ মূর্তি নির্মাণ করে পূজাচনার ব্যবস্থা করেন; আজ পর্যন্ত সেই মনোহর দারুমূর্তি কাটোয়ায় সেবিত হচ্ছে।

কাটোয়ায় বাদশাহ ফারুকশিয়ারের সময় নির্মিত মসজিদ যথোপযুক্ত সংস্কারের পর এখনও বর্তমান আছে ও মসজিদে রক্ষিত আরবী শিলালিপি থেকে জানা যায় জনৈক শাহ আলম খান ঐ মসজিদ নির্মাণ করেন ১৭১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে[১৫]। কাটোয়ায় অন্যান্য পুরাকীর্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় কাটোয়া শুধু অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল নয়, কাটোয়া হল হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র।

অবশ্য আগামী দিনে অজয় ভাগীরথীকে কাটোয়াতেই যে স্পর্শ করবে তা জোর দিয়ে বলা যায় না। নদী বিশেষজ্ঞরা বলেন অজয়ের গতিপথ অস্বাভাবিক রকমের বক্রতা পাওয়ায় কাটোয়ার উত্তরে গঙ্গাবক্ষে প্রায় লম্বভাবে মিলিত হওয়ায় ভাগীরথীর মূল প্রবাহগতি ব্যাহত হচ্ছে, অজয়ের গতি ভাগীরথীতে মোটেই সঞ্চারিত হচ্ছে না, ফলে ভাগীরথী বক্ষ গভীরতা হারাচ্ছে। প্রস্তাব রয়েছে, মঙ্গলকোট থেকে দক্ষিণমুখী পনেরো মাইল খাল কেটে অজয়কে খড়ি নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে শ্রীবাটী গ্রামের কাছে। এতে অজয়ের যাত্রাপথ কমবে প্রায় কুড়ি মাইল ও অজয়-খড়ির সম্মিলিত ধারা যখন সমুদ্রগড়ের কাছে ভাগীরথীতে এসে মিলবে তখন অবশ্যই বর্ধিত গতি সঞ্চারিত হবে ভাগীরথীর স্রোতে। ভাগীরথীর বক্ষ পলিতে আর মজে যাবে না; বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়া শহরও বন্যার আতঙ্ক থেকে মুক্ত হবে। অবশ্যই এই প্রস্তাব আগেই কার্যকরী হলে বন্যা নিয়ন্ত্রণে পঁয়ত্রিশ লক্ষ আট হাজার টাকা ব্যয়ে চার মাইল দীর্ঘ পনেরো ফুট চওড়া ও গড়-উচ্চতা এগারো ফুটের নবনির্মিত কাটোয়া বাঁধের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকতো না।

কাটোয়ায় মাত্র কয়েক মাইল উত্তর পশ্চিমে কেতুগ্রাম থানার গঙ্গাডাঙ্গা এক প্রাচীন ঢিবি। পাশেই শুষ্ক কাঁদর; অতীতে এই নালা বেয়েই অজয় ভাগীরথীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হত[১৬]। ক্ষয়প্রাপ্ত প্রাচীন ঢিবি থেকে পাওয়া গেছে লাল-কালো, কালো-উজ্জ্বল মৃৎপাত্র ও ক্ষুদ্রাশ্মের আয়ুধ (পাথরের অস্ত্র)। এই ঢিবি খনন করলে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করবে বলে পূর্বাঞ্চলীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত আশা প্রকাশ করেছিলেন। গঙ্গাডাঙ্গার দক্ষিণে পাশেই কেতুগ্রাম, প্রাচীন নাম বহুলা। বহুলা দেবীর মূর্তি কষ্টি পাথরের। নিকটেই আর একটি প্রাচীন গ্রাম অট্টহাস, দেবীর নাম ফুল্লরা। মূর্তিটি বর্তমানে অন্তর্হিত। মহা অষ্টমীর দিন দেবীর পূজা হয় শূন্য মন্দিরেই। উজান বেয়ে মাইল পনেরো এগোলেই বাম পাশে মঙ্গলকোট। মঙ্গলকোটের সঙ্গে শ্রীমন্ত সওদাগরের

মঙ্গল- চণ্ডীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলেই স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা। মঙ্গলকোটের পুরাকীর্তিগুলির পূর্ণ বিবরণ দিতে হলে স্বতন্ত্র জায়গা দরকার। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মাটির ঢিবি, লোকে বলে বিক্রমাদিত্যের রাজবাড়ি।

উজানী নগর অতি মনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা। (কবি-কঙ্কণ চণ্ডী)

এই বিক্রমকেশরী বা বিক্রমাদিত্য রাজা চন্দ্রসেনের বংশধর বলেই অনেকের ধারণা। চন্দ্রসেন নামখচিত একটি প্রস্তরখণ্ড ভগ্ন মন্দিরে এখনও রক্ষিত আছে। প্রাকৃতিক মৃত্তিকা ক্ষয়ে মঙ্গলকোটের ঢিবি থেকে দেব-দেবীর মূর্তি প্রকট হচ্ছে প্রতি বছর। অতীতে এখান থেকেই জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ ও মঙ্গলচণ্ডীর প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। প্রকাশ্য ঢিবির উপর থেকে খ্রিস্টপূর্ব তিনশো বছর আগেকার মুদ্রা এখনও পাওয়া যায়, পাওয়া যায় স্বর্ণ কণাও[১৭]। মঙ্গলকোটেই কুনুর এসে অজয়ে মিশেছে। মঙ্গলকোটে দুটি পুকুর খোঁড়ার সময় মৃত্তিকার তিনটি স্তর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ও তার দ্বিতীয় স্তর থেকে শুঙ্গ-কুষাণ যুগের মৃৎশিল্প প্রাচীনতার সাক্ষ্য দেয়। মঙ্গলকোট নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পন্থায় আজ পর্যন্ত সেখানে কোন উৎখনন হয়নি।
অজয়-কুনুরের সঙ্গমস্থলের কাছেই কোগ্রাম, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বসত বাড়ি —

বাড়ি আমার ভাঙ্গন-ধরা অজয় নদীর বাঁকে
জল সেখানে আদর করে স্থলকে ঘিরে রাখে।

কোগ্রামকে অনেকে উজানীর অংশবিশেষ মনে করেন। উজানীর সওদাগর ধনপতি ও তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত এখান থেকেই সিংহল যাত্রা করেলিন বলে লোক-বিশ্বাস।

শ্রীমন্তে যে মধুকর ডিঙা লয়ে গেল সিংহলে।
রাজৈশ্বর্য দিলে তুমি তারে নানাবিধ কৌশলে॥ (কুমুদ)

চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচন দাসের ভিটেও এই কোগ্রামে। তাঁর গুরু ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর। লোচন দাস লিখেছিলেন ----

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস।

নরহরি প্রসঙ্গে --- নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাতা।।

প্রায় সব কটি মঙ্গলকাব্যেই উজানী নগরের উল্লেখ আছে। নারায়ণদেবের 'পদ্মপুরাণের' পুঁথিতে আছে ----

মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
কি কথা কহিব আমি উজানী নগর।

উজানীর পুরাবৃত্ত মঙ্গলকোটের অনুরূপ, দু'জায়গাতেই রয়েছে সম্ভবনাপূর্ণ প্রত্ন-নজিব, যা পুঙ্খানুপুঙ্খ খননের অপেক্ষা রাখে।

কুনুরের পথ বেয়ে মাইল কুড়ি এগোলেই পড়বে বসন্তপুর ও তার পরেই "গোস্বামী গঙ্গা"। এসব জায়গা থেকে খ্রিস্টপূর্ব কালের পুরাবস্তু ছাড়াও নগর-সভ্যতার নজির পাওয়া গেছে। ফসিল কাষ্ঠখণ্ড প্রাচীনতার আরও একটি নিদর্শন।

নবম-দশম শতাব্দীর কার্তিকেয় বা সূর্যমূর্তি প্রায় সমতল স্তরেই প্রোথিত ছিল, বসন্তপুর থেকে চার মাইল উত্তর পূর্বে 'রাজার ডাঙ্গা' ও দু-মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইতিহাস বিখ্যাত 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি'। এই দুই স্থলই অজয়ের দক্ষিণ তীরে উত্তর পাড়ে 'সুরথ রাজার ঢিবি' পাণ্ডু রাজার ঢিবি থেকে প্রাথমিক চেষ্টাতেই লাল-কালো মৃৎপাত্র ও অন্যান্য তাম্রাশ্মীয় যুগের পুরাবস্তু সংগ্রহ করা হয়েছিল উনিশশো বাষট্টি সালেই। সুরথ রাজার ঢিবি পুরাণে বর্ণিত সুরথ রাজার নামের সঙ্গে জড়িত। তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন ছাড়াও বারো ফুট উঁচু মাটির ঢিবি থেকে প্রাচীন শিবমন্দিরের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। পুরাণে কথিত আছে সুরথ রাজাই নাকি মেধস্ মুনির পরামর্শে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দুর্গা পূজার প্রবর্তন করেন। অজয় তীরে কাঁকসা থানায় অরণ্যাবৃত শ্যামরূপার গড় ইছাই ঘোষের দুর্গ নামে খ্যাত[১৮]। ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায় ইছাই ঘোষের পিতা গৌড়ে পাল রাজাদের কর্মচারী ছিলেন। গৌড়রাজ অজয় তীরে চৈকুরে তাঁকে ভূ-সম্পত্তি দান করেন। আবার শ্যাম রূপার গড়কে সেন পাহাড়ীও বলা হয়। কথিত আছে--বল্লাল সেন তান্ত্রিক সাধনার জন্য পদ্মিনী নাম্নী এক নীচ জাতীয়া রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করলে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ বাধে। লক্ষণ সেন পিতার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে কিছুদিনের জন্য সেন পাহাড়ীতে বাস করেছিলেন এবং তার নামানুসারেই নাকি সেই পাহাড়হাটির নাম হয় সেন পাহাড়ী। ইতিহাসের পাল ও সেন বংশের কালক্রমানুযায়ী বিন্যাস কিংবদন্তীটিতে অবশ্যই অব্যাহত আছে।

উল্লিখিত স্থানগুলির মধ্যে কেবলমাত্র গোস্বামী ডাঙ্গা ও পাণ্ডুরাজার ঢিবিতেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য হয় উনিশশো বাষট্টি সালে ও তার পরেও। খনন স্থানে পৌঁছবার সহজতম উপায় হচ্ছে ভেদিয়া স্টেশনে নেমে মাইল ছয়েক গরুর গাড়ির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে; অবশ্য নিজের মোটর গাড়ি থাকলে অন্য কথা। পাণ্ডুরাজার ঢিবির আদিতম বা প্রথম স্তর হচ্ছে বালিময় পলিমাটির স্তর; খ্রিস্টপূর্ব তেরো শতাব্দী বা তারও আগে এই স্তরে মানুষেরা বসতি স্থাপন করেছিল, তাই সেই স্তরেই কালো-লাল মৃৎপাত্রের টুকরোসহ পাওয়া গেছে আরও নানা আকারের মৃৎপাত্র। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হচ্ছে পূর্বশিরে শায়িত নর-কঙ্কালের অর্ধাংশ। এই স্তরটি ঢাকা পড়েছে শ্বেত-হরিদ্রাভ পাতলা বালির আস্তরণে, অজয়ের বিধ্বংসী বন্যাই হচ্ছে এর অনুমিত কারণ। প্লাবনের পলিমাটির উপরেই আবার পাওয়া গেল কয়েকটি ক্ষুদ্রাশ্মের তৈরী কারুযন্ত্র এবং শ্বেতাভ চিত্ররেখাঙ্কিত ঘন ধূসর রং-এর মৃৎপাত্রের কয়েকটি টুকরো।

দ্বিতীয় স্তরের প্রত্নবস্তু ও প্রত্নতথ্য সাময়িক অর্থবহ। প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে আছে নানা আকৃতির ক্ষুদ্রাশ্মীয় কারুযন্ত্র, চিত্রিত এবং ছিদ্রকৃত লাল ও কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, জলনালীযুক্ত মৃৎ জল-পাত্র, তামার তৈরী নানা অলংকার, তামার মাছ ধরার বঁড়শী ইত্যাদি। অলংকারের মধ্যে পেঁচানো তামার বালা, আংটি ও কাজল লাগাবার কাঠি উল্লেখযোগ্য। প্রাপ্ত বস্তুগুলি নিঃসন্দেহে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার প্রত্ন নজির। তাছাড়া এই স্তরেই গেরুয়া কাঁকর মাটি দিয়ে তৈরী গৃহতল এক সরল রেখায় সুবিন্যস্ত। তার উপর খুঁটি পোতার গর্তের চিহ্ন সুস্পষ্ট। একটি সরু বাঁধানো গলির কিছুটা চিহ্ন এখনও আছে, আর

আছে একটি বিস্তৃত শব সমাধি স্থান, যেখানে পূর্ব-পশ্চিম সারি করে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এই স্তরেই মাটির বড় বড় তাল পাওয়া গেছে। তার উপর আছে নল-খাগড়ার ছাপ, পোড়ামাটির টালির ভাঙা অংশ দেখে অনুমান করা যায় এই স্তরের মানুষ যে ঘরে বাস করতো তার বেড়া ছিল নলখাগড়ার, যার উপরে থাকতো মাটির আস্তরণ, আর চাল পোড়ামাটির টালির। উত্তর ভারতের অন্যত্র তাম্রাশ্মীয় যুগের যেসব লক্ষণ দেখা যায়, এ স্তরের লক্ষণ তার সঙ্গে অভিন্ন। সমাধিস্থল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একখণ্ড কাঠ কয়লার "তেজষ্ক্রিয় অঙ্গারক" পরীক্ষা করে কাল নির্মিত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব বারোশো দশ বৎসর। কাজেই পাণ্ডুরাজার ঢিবির আদিস্তরের তারিখ অন্তত আরও দুশো বছর আগের। এসব প্রমাণ থেকে অনুমান করা চলে এই অঞ্চলেই বাঙলার মানুষের প্রথম সমাজ রচনার সুষ্ঠু প্রকাশ এবং সুসংস্কৃতির পথে প্রথম পদক্ষেপ প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো।

তৃতীয় স্তরের প্রত্নবস্তু মোটামুটি দ্বিতীয় স্তরের মতই। পশুর হাড় বা শিং-এর তৈরী কিছু যন্ত্র ছাড়াও পাওয়া গেছে সূঁচ নির্মাণের একটি কারখানা। রান্নার উনুনের নিদর্শনও আছে এই স্তরে। ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতি, তামার অলঙ্কারাদি, লোহার যন্ত্রপাতি, যেমন ফলা ইত্যাদি একই সঙ্গে ব্যবহৃত হত এই স্তরের যুগে, পটুতার নজির হল বাঁটসহ তীক্ষ্মমুখ একটি লোহার তলোয়ার ও নাতিক্ষুদ্র তীরের শিরাগ্র, অসংখ্য সূঁচ তো আছেই। এই স্তরের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছাই-এর স্তর, মনে হয় কোন অগ্নিদাহের নজির। এই ছাই-এর স্তরের উপরেই যেসব পুরাবস্তু পাওয়া গেছে তা নূতন ধরনেব ও পরবর্তীকালের। তাই মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে অগ্নিদাহের পরে পরেই এই স্থান পরিত্যক্ত হয়েছিল ও খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-২৫০ সালের মধ্যে নতুন আগন্তুকেরা এখানে বসবাস শুরু করে।

তারপর চতুর্থ স্তর, এই স্তরে লৌহের আধিক্য নেই বললেই চলে, এটিই বড় আশ্চর্যের বিষয়; প্রত্নবিদ্‌রা তাই বিস্মিত। লৌহ ব্যবহারের এই ছেদের কোন ব্যাখ্যাই নেই। তৃতীয় স্তরেই পাওয়া গেছে ত্রিকোণাকৃতি পোড়া মাটির বাটি, সাধারণ ও লাল রং-এর মৃৎপাত্র, মুদ্রিত বা খোদিত নানা নকশাযুক্ত মৃৎভাণ্ড, জলের ঝাঁঝরি, কয়েকটি পোড়া মাটির পশু ও স্ফীতবক্ষা নারীমূর্তি, সুবিন্যস্ত এক সারি মাছ ও একটি অপরিচিত চিত্রযুক্ত পাথরের শীল। প্রাপ্ত পুরানিদর্শনগুলি থেকে বোঝা যায় পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রাচীন অধিবাসীরা সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন দীর্ঘকাল আগে। পশুপালন ও কৃষিব্যবস্থা তাদের জানা ছিল। ধান চালের অঙ্গারের তেজষ্ক্রিয় কার্বন পরীক্ষায় জানা গেছে খ্রিস্টপূর্ব ১৩৮০ সালেও পাণ্ডুরাজার ঢিবির অধিবাসীরা ধান উৎপন্ন করতে অভ্যস্ত ছিল।

প্রাচীনতা বিচারে অনুমিত হয় চীন দেশে ধানের চাষ সম্ভবত বাঙলা দেশ থেকেই অনুপ্রবেশ করেছিল[১৯]। অবশ্য পাণ্ডুরাজার ঢিবির সভ্যতা কোন কেন্দ্রীভূত সভ্যতা নয়, গোটা অজয়-কুনুর ও কোপাই নদীর কূলে-কূলে এর সভ্যতা বিকশিত; অজয়ের উৎপত্তিস্থলও বাদ পড়েনি। অজয়-কুনুর ও কোপাই ব্যতীত অন্যান্য নদ-নদীর তীরে-তীরেও নানা জায়গায় তাম্রাশ্মীয় নবাশ্মীয় পর্বের নানা প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে সত্যিই। কিন্তু পাণ্ডুরাজার ঢিবির উৎখননই এসব আবিষ্কারের সূচনায়। বস্তুত, এই ঢিবিই বাঙালীর আদি ইতিহাসের কুঞ্চিকা, আর সেই কারণেই অজয় সভ্যতা এতটা অর্থবহ।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি, সুরথ রাজার ঢিবি ও বসন্তপুর ছাড়িয়ে উজানে এগোলে পড়বে মুন্দিরা ও কেন্দুলী। মুন্দিরা গাঁয়েও তাম্রপ্রস্তরযুগের প্রতীক লাল-কালো রঙে চিত্রিত মৃৎপাত্র, নলপাত্র বা ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ পাওয়া যায়। কেন্দুলী কবি জয়দেবের লীলাক্ষেত্র নামেই খ্যাত। অন্যদিকে আবার পুরী জেলার বালিয়ানতা থানার কেন্দুলীতেও জয়দেরের ভিটে স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত হচ্ছে[২০]। ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুরী জেলার পক্ষেই ভারী।

বীরভূম কেন্দুলীতে এখন রাধাগোবিন্দ মূর্তি পূজিত হচ্ছে বর্ধমানের মহারাণী নৈরালীদেবী নির্মিত মন্দিরে (১৩১৪ খ্রী.)। কথিত আছে--এই বিগ্রহটি আগে শ্যামরূপার গড়ে বিরাজ করতেন, কিন্তু কালক্রমে শ্যাম রাজার গড় অরণ্যাবৃত হলে পুরোহিতরা সেখানে যেতে অস্বীকৃত হন; তাই এই ব্যবস্থা। নিকটের সুগড়ে কোন প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও পরিখা এখনও রয়েছে। দেউলি, সুপুর, খুরিষা, বারুইপুর ইত্যাদি গ্রাম খুব প্রাচীন। তাম্র-প্রস্তরযুগের মৃৎপাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত প্রকাশ্য সমতলেই অনেক সময় কুড়িয়ে পাওয়া যায়। প্রত্নবিদ্-দের মতেও গ্রাম কয়টি প্রত্নসমৃদ্ধ। সুপুরকে আবার অনেকে বলেন সিংহপুর। বিজয় সিংহ নাকি এখান থেকেই পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সিংহল যাত্রা করেছিলেন খ্রিস্ট জন্মের আগেই[১৮গ]।

বারুইপুরে ধর্মমঙ্গল বর্ণিত লাউসেনের ধর্মঠাকুর বর্তমান আছেন। খয়রাসোল থানার পড়রা গ্রামকে শতবর্ষ আগেও পাণ্ড্রা বলা হত। এই গ্রামটি নাকি পাণ্ডু-পুত্রদের স্মৃতি বিজড়িত। ভীমগড় অঞ্চলেও পাণ্ডবদের বসবাসের প্রবাদ আছে। আবার পঞ্চপাণ্ডব যখন অজ্ঞাতবাসে দেশে দেশে ঘুড়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন পাণ্ডবেশ্বর গ্রামেও তাঁরা নাকি কিছুদিন বাস করেছিলেন[২১]। সেইসময় তাঁরা পাঁচটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও তৃতীয় পাণ্ডব দেবাদিদেব মহাদেবকে কিরাত বেশে এখানেই দেখেন এবং পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। সুপুর, রাইপুর, ইলামবাজার, পার্শণ্ডী, বড়রা প্রভৃতি গ্রামে অজয়ের বড় বড় বন্দর ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অজয় বেয়ে বাণিজ্যের উল্লেখ মেলে। ঐ শতাব্দীর শেষভাবে নিউ বীরভূম কোল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার কুঠি ছিল অজয় তীরে ইলামবাজারে। সেখান থেকে নীল, কয়লা ও অন্যান্য মালপত্র কলকাতা পাঠানো হত অজয় বেয়ে[১৮ঘ]। যশোহরের গিরিদদলে ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ নির্মাণের কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে, বনকাটিতেও তাই। যশোহরেই আবার রয়েছেন ঢেকুরেশ্বর শিবলিঙ্গ। কাজেই জেলার অজয়ের তীরে তীরে আদিম সভ্য মানুষের কর্মতৎপরতার নিদর্শন এখন অনেকটাই অনাবৃত।

বর্ধমান জেলা পেরিয়ে উজানী গতিতে সাঁওতাল পরগণা ঢুকছে অজয়। তীরে পড়লো ক্রমান্বয়ে জামুরিয়া, জামতারা, সুরথ, দেওঘর ও জসিডি। অবশ্য শেষোক্ত দুটি অজয় থেকে কিছুটা দূরে। তারপর উৎপত্তিস্থল মুঙ্গের জেলার চাকাই পাহাড়। চাকাই পাহাড় ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলের অংশ বিশেষ। পাহাড়ের যত্র তত্র পড়ে আছে ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ। প্রাচীন যুগের সংস্কারস্বরূপ লৌহ নিষ্কাশনের আদিম পদ্ধতি এখনও পাহাড়ীরা আঁকড়ে রেখেছে। দেওঘর বাঙালীদের কাছে অতি পরিচিত স্থান, স্বাস্থ্য নিবাস। বাবা

বৈদ্যনাথের কথা বাদ দিলেও ওখানে রয়েছে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিলালিপি। একটির রচনা কাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী। জনৈক আদিত্য সেন ও তস্য পত্নী কোশা দেবী চোল দেশ থেকে এসে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ঐ লিপি রেখে যান। বুদ্ধের তিনটি শিলামূর্তি দেওঘরে আছে, তার মধ্যেই দুটিই প্রাচীন লিপি সম্বলিত। তাছাড়া মহীপাল দেবের সংবৎ নয় সালের ও ময়ূরধ্বজ যোগীর সপ্তম শতাব্দীর প্রতিষ্ঠাফলকে রয়েছে উল্লেখযোগ্য প্রত্নলিপি। অন্যদিকে দেওঘরে প্রস্তরনির্মিত কুড়ি ফুট বর্গের দশফুট উঁচু একটি মঞ্চবেদী প্রত্নবিদদের বিস্ময়ের বস্তু, কারণ কারও কারও মতে বেদীটি অত্যধিক প্রাচীন আবার কারও মতে প্রাচীনতা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়; কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত কোন মতেই টানা যাচ্ছে না। মোটামুটি ভাবে অনেকের মত হল দেওঘরের পুরাকীর্তির অনেককটিই প্রারম্ভিক বৌদ্ধযুগের[২২]।

বাবা বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গের অবস্থান সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীগুলিতে আদিবাসীদের ভূমিকা আছে এবং সেজন্যই এগুলি অর্থবহ। কথিত হয়--ত্রেতাযুগে রাবণ মহাদেবকে তাঁর রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন। মহাদেব স্বয়ং না গিয়ে জ্যোতির্লিঙ্গের একটিকে দিতে স্বীকৃত হলেন এই শর্তে যে লিঙ্গটি একনাগাড়ে রাবণরাজ্যে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, পথে কোথাও মাটিতে নামানো চলবে না।

রাবণ যথারীতি শর্ত পালন করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত গণ্ডগোল হয়ে গেল বরুণ যখন রাবণের উদরে প্রবেশ করলেন তখন। রাবণ উপায়ান্তর না দেখে এক ব্রাহ্মণের হাতে লিঙ্গটি তড়িঘড়ি সমর্পণ করে অলক্ষ্যে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণ লিঙ্গটি মাটিতে নামিয়েই দিলেন একছুট। ক্রোধোন্মত্ত রাবণ শত চেষ্টা করেও লিঙ্গটি যখন আর মাটি থেকে ওঠাতে পারলেন না তখন বার বার আঘাত হেনে লিঙ্গশীর্ষ দিলেন চূর্ণ করে। রাবণের রাগ কমলে সর্বতীর্থ জল দিয়ে লিঙ্গ পূজিত হল। সেই উদ্দেশ্যেই এক কুয়ো খনন করতে হয়েছিল রাবণকে। এখনও একটি কুয়ো স্থানীয় অধিবাসীরা দর্শকদের দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু পদ্মপুরাণ অনুসারে ব্রাহ্মণ নাকি স্থান ত্যাগের পূর্বে এক ভীলকে পুজো পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে যান। ভীল কোন পাত্র ব্যবহার না করেই মুখে করে আনেন সলিল, মাথায় পড়তেই তা হয়ে যায় অপবিত্র।

ধর্মগ্রন্থ বহির্ভূত কিম্বদন্তী অনুসারে রাবণের মৃত্যুর পর লিঙ্গপূজা উপেক্ষিত হতে থাকে ও কালক্রমে লিঙ্গটি গভীর অরণ্যে হারিয়ে যায়। বৈজু নামে এক ব্যাধের চেষ্টায় লিঙ্গ-টির পূজা পুনঃপ্রবর্তন হয় ও সেকারণেই নাম হয় বৈদ্যনাথ। বৈজু থেকে বৈদ্যনাথ। আগে নাকি লিঙ্গটির নাম ছিল জ্যোতির্লিঙ্গ বা রাবণেশ্বর। এছাড়াও বহুলপ্রচারিত আরও কয়েকটি কিম্বদন্তীতে ব্রাহ্মণ ও আদিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের প্রসঙ্গ আছে। আছে দুর্ধর্ষ আদিবাসী রাজার কাহিনী ও পৃথক তিনটি বংশানুক্রমিক আদিবাসী লিঙ্গের পূজা প্রসঙ্গ। এই কিম্বদন্তীগুলিতে প্রাক্ আর্য যুগে এদেশীয় অধিবাসীদের শৌর্যবীর্যের ইঙ্গিত আছে। আছে তথাকথিত আর্য--অনার্যের সংঘর্ষের আভাসও।

বিশেষজ্ঞজনের অনেকের ধারণা অজয় প্লাবিত অঞ্চল থেকে অজয়ের উৎসমুখ পর্যন্ত ছিল আমাদের আদি পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থল, আর্য জাতির আগমনের পূর্বেও এঁরা ছিলেন

সুসভ্য জাতি[২৩]। কাঠ আর বাঁশের উপর মাটির লেপন দিয়ে তৈরী হত আবাসগৃহ, মেঝেতে থাকত চুনের প্লাস্টার। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ষাঁড় ও শূকর, খাদ্যদ্রব্যের অন্যতম ছিল অন্ন। গোষ্ঠী হিসাবে এঁরা ছিলেন প্রোটেঅস্টেলয়েড। বলা হয় -- শবর বা নিষাদদের মত কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠী নবাশ্মীয় সভ্যতার বাহক।

নবাশ্মীয় সভ্যতার পরেই তাম্রাশ্মীয় যুগ। তাহলে হয়তো ঐ আদিবাসী কোন কোন দল প্রাক্-আর্য অথবা প্রথম কোন আর্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ছোটনাগপুরের গভীর অরণ্যে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। বাঙলাদেশে আর্য-আগমনের পথ হচ্ছে গঙ্গা-ভাগীরথীর পথ এরকমই অনেকের ধারণা। কাজেই এই আর্যগোষ্ঠীর সঙ্গে এদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের সংঘর্ষ হয়ে থাকলে সে সংঘর্ষ প্রথমে অজয় ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল থেকেই শুরু হয়। তারপর প্রাচীনপন্থীদের ধীরে ধীরে ঠেলে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছিল ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলে, সেখান থেকে মনে হয় অতি প্রাচীনকালে এ দেশীয় সভ্যতা প্রসার ও বিকাশ লাভ করেছিল।

আর্য ও আদিবাসী এই মানবগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে অজয়ের তীরে তীরে। কারণ অজয়ের উৎপত্তিও নিরাপদ অরণ্য কেন্দ্রেই। মন্তব্যে বলা যেতে পারে, নবাশ্মীয় সভ্যতা উচ্চভূমি পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিবর্তনের গতি-অনুশাসন মেনেই অজয়ের কূলে কূলে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারপর জন্ম নিল তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা। মন্তব্যগুলি নির্ভুল প্রমাণ করতে হলে আরও উৎখনন ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিশেষত প্রাপ্ত নরকঙ্কালগুলির নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা।

নরকঙ্কাল সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা যে একেবারেই হয়নি তা নয়[২৩ক] কিন্তু বিশ্লেষণযোগ্য কয়েকটির সংখ্যা অত্যন্ত কম, মাত্র চারটি। যদিও পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে মোট চোদ্দটি নরকঙ্কাল সংগ্রহ করা হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে বেশীর ভাগই ভগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত, বিশেষত নাসিকা অঞ্চল প্রায় সবকটিরই বিকৃত। উল্লিখিত চারটি সংখ্যা হিসাবে এতই নগণ্য যে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা কোন মতেই সমীচীন নয়। মোটামুটি ভাবে বলা যায়--পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরের অধিবাসীরা ছিলেন দীর্ঘমুণ্ডি ও প্রশস্ত নাসা। বর্ধমান জেলার বর্ত্মান অধিবাসীদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় ঐ অধিবাসীদের নাক বর্ত্তমান কালের সাঁওতালদের মত ছিল কিন্তু উচ্চতায় ছিল সাঁওতালদের চেয়ে দীর্ঘ, এমনকি তাঁদের মাথাও ছিল লম্বায় অনেক বড়। বরং সে হিসাবে বর্ধমান জেলাবাসী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদের মত দীর্ঘ ও দীর্ঘমুণ্ডি ছিলেন পাণ্ডুরাজার ঢিবির অধিবাসীরা। কিন্তু তাদের মুণ্ড-প্রস্থ বা নাসিকা-উচ্চতা অবশ্যই উল্লিখিত কায়স্থদের মত নয়, অনেকটাই খর্ব।

কবরস্থ করার পদ্ধতি দক্ষিণ ভারতে তাম্রাশ্মীয় অঞ্চলের বা নেভাসা ও চাণ্ডোলীর অনুরূপ। এই প্রাথমিক আলোচনা অবশ্যই পর্যাপ্ত নয়, কাজেই বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে অন্যান্য পুরাবস্তুর প্রতি যেমনটা সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়, কবরগুলি অনাবৃত করার সময় দৃষ্টিটা আরও প্রখর করতে হবে তাহলে অতীতে বসবাসকারী নরগোষ্ঠীর সঠিক পরিচয় আমরা সঠিকভাবেই পাব।

অজয় সভ্যতা হরপ্পার পরবর্তী সভ্যতা। মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে আর্যদের সংযোগ কতটুকু সেটা আজও পরিষ্কার হয়নি, অজয় সভ্যতার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। এক মহলের ধারণা আর্যদের আসার আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে এক সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। তাদের জীবনযাত্রা নগরবিন্যাস পদ্ধতি ইত্যাদি ছিল বিশেষ ভাবেই উন্নত [২৪]। মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পার সমসাময়িক সভ্যতা অজয়তীরে এখনও আত্মপ্রকাশ করেনি সত্যিই কিন্তু সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। গঙ্গাডাঙ্গা বা বিশেষ করে মঙ্গলকোটের মত পুরাসমৃদ্ধ স্থানগুলি এখনও অনাবৃত হয়নি। কে বলতে পারে এসব জায়গায় ঐতিহাসিক মহাবিস্ময় এখনও লুকিয়ে আছে কিনা।

জনশ্রুতির উপর যেমন পূর্ণ আস্থা রাখতে দ্বিধা আছে, ঠিক তেমনি তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে বাধা আছে। মহেঞ্জোদড়ো বা লোথাল জনশ্রুতিতেই তো ছিল মৃতের রাজ্য। শুধু এ দুটিই বা বলি কেন, অজয় সভ্যতার অধুনা আবিষ্কৃত প্রত্নসমৃদ্ধ স্থানগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কেই তো প্রাচীন কিম্বদন্তী ও লোকভয়ের অভাব ছিল না। পাণ্ডুরাজার ঢিবি বা মঙ্গলকোট সম্পর্কে লোকগাথার আজও শেষ নেই। অজয়ের তীরে প্রতিটি গ্রাম সম্পর্কেই রয়েছে প্রাচীন সব কিম্বদন্তী। মহাভারত, রামায়ণ, আর্য-অনার্যের ইতিহাসপুষ্ট কাহিনীগুলি সেগুলির উপজীব্য। কাজেই আশা করা যায়, অজয় সভ্যতা পূর্ণরূপে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হলে আমরা হয়তো মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, লোথাল, রূপার বা কালিগঙ্গার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাব।

এই পশ্চিমবঙ্গেরই ফরাক্কা বা শুশুনিয়া থেকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি এখনই আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করেছে সুদুর অতীতে[২৫]। লোথাল, রূপারের কাল এখন আর বেশী দূরে নয়। পূর্ণ প্রকটের অপেক্ষায় কালাতিপাত না করেই আমরা এখনই নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি-- লোথাল-রূপার আমাদের ভারতের গৌরবের ইতিহাস আর অজয়ের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস, বাঙালীদের ইতিহাস। আমরা অজেয়, অজয়ের কূলে কূলে আমাদের শান্তির নীড়।

নির্দেশিকা

১. A Century of Indian Archaeology – A. Ghosh, Cultural Forum, Dec, 1961, pp 10

২. Indian Archaeology – A Review : 1958-59 pp 50-55, 1953-54 pp 6-7 1954-55 pp 9, 1957-58 pp 14-15, 1960-61 pp 31-32

৩. The Indus Civilization – S. Noah. : Expedition India, Pakistan, Ceylon 1964 p 51

৪. The Excavation at Pandu Rajar Dhibi – Paresh Ch. Dasgupta : pp 6

৫. বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) : নীহার রঞ্জন রায় ১৯৮০ পৃ. ৯২৩

৬. Santal Pargana District Gazetteer – P. C. Roychoudhury. 1965 p 10

৭. On Ancient Geography of India – Asiatic Researches : XIV, 1822 Lt. Col. Wilford.

৭ (ক). Ancient India as described by Megasthenes : p 191.
৮. বাংলাদেশের নদ নদী ও পরিকল্পনা: কপিল ভট্টাচার্য, ২৬৪
৯. কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ : শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পৃ. ১১
১০. কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ : শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প. ২৫
১১. বাঙ্গালার ইতিহাস /নবাবী আমল : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৫৫৩ - ৫৭৬
১২. নির্দেশিকা ৪ : পৃ. ১৭
১৩. বিস্তারিত তথ্য 'কাটোয়া দর্শন': সম্পাদক - ড. কালীচরণ দাস।
১৪. শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান : শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার ১৯৩৯: পৃ. ১৭
১৫. Indian Archaeology : 1977 - 78 p 72.
১৬. National Atlas of India, Calcutta Plate - 33
১৭. একটি প্রাচীন মুদ্রা : বিজ্ঞান সংস্কৃতি : মে জুন ১৯৭৮, পৃ. ১১২-১১৪ ড. কালীচরণ দাস।
১৮. বর্দ্ধমান পরিচিতি : অনুকুল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী। পৃ. ১৭
১৯. নির্দ্দেশিকা (৪) : পৃ. - ১৪
২০. Indian Archaeology – A Review 1964-65, pp 32-33
২১. বর্দ্ধমানের ইতিহাস ঃ সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ঃ পৃ. - ৩৯
২২. নির্দ্দেশিকা (৬) : পৃ. ৭১০-৭১৫
২৩. Indian Museum Bulletin, July – 1967, pp. 36-42
২৩. (ক). Indian Museum Bulletin, July – 1974, 56-59
২৪. জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ ১৯৭৯ পৃ. - ১৩৭
২৫. প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া : শ্রী পরেশ দাশগুপ্ত, ১৯৬৮।
The buried treasures of Farakka : P. C. Dasgupta, Souvenir, Farakka Barrage Project 1975, p 28.
পশ্চিমবাঙলার সাম্প্রতিক প্রত্নানুসন্ধান ঃ দেবকুমার চক্রবর্তী, কৌশিকী, শারদীয়, ১৩৮৩।

□ 'অজয়' কাটোয়া ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৮ □

ইন্দ্রাণীর বিলুপ্ত মন্দির

ড. কালীচরণ দাস

হাজার বছর আগে বর্তমান বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় দাঁইহাট পৌরসভার অন্তর্গত বেরা গ্রামে পরিত্যক্ত ভাগীরথী তীরের বিলুপ্ত তেঁতুলতলায় উড়িষ্যার বিখ্যাত মন্দিরগুলির আদলে ইন্দ্রেশ্বরের এক বিশাল পাথরের মন্দির ছিল। মহাপ্রভুর কাটোয়া আগমনের বহু পূর্বেই ওই মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি/দ্বাদশ তীর্থে যথা দেবী (বৈসে?) ভাগীরথী। কাশীরাম দাসের মহাভারতের পুঁথিতে এই লাইন দুটি আছে স্বর্গারোহণ পর্বে, তাঁর আত্মপরিচয়ে। পূর্বাপর স্থিতি কথাটি প্রাচীনতা বোঝায় ঠিকই কিন্তু কত প্রাচীন তা জানা যায় না, জানতে হলে কাশীরাম দাসের মহাভারত কবে লেখা হয়েছিল তা অন্তত জানতে হয়। সে বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, সেখানে লেখা আছে — মহাভারত লেখা হয়েছিল সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে (১৬০২ - ৪ ইং?) আর রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাসের জন্ম ইংরেজি ১৩৮৫?। কৃত্তিবাস লিখেছেন - গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর / পলকেতে উপস্থিত হন ইন্দ্রেশ্বর। আদিকাণ্ডে আছে - গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান / ইন্দ্রেশ্বর নাম তার হল সে স্থান॥ ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা নর স্নান করে/সর্বপাপ মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে। ইন্দ্রাণী তীর্থে ইন্দ্রেশ্বরের নামে একটি ঘাট ছিল কৃত্তিবাসের কালে, মোটামুটি এটা বোঝা গেল। কিন্তু জানা গেল না ওই ঘাটের পাড়ে কোনও দেবতার মন্দির ও মূর্তি ছিল কিনা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল থেকে বোঝা যায় ষোড়শ শতকের শেষেও ইন্দ্রাণীর অধিষ্ঠিত দেবতা ছিলেন ইন্দ্রেশ্বর ও তাঁর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। ডাহিনে ললিতপুর পাইল ইন্দ্রানী/ইন্দ্রেশ্বর পূজা করে দিয়া পুষ্প পাণী॥ ষোড়শ শতকে দেবতা ছিলেন ইন্দ্রেশ্বর, কিন্তু দেবমন্দির? দেব মন্দির কি আদৌ ছিল তখন? মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসীদের ফাঁকি দিয়ে গোপনে কাটোয়া এসে কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। বিকিহাট কাটোয়া থেকে এক দেড় কিলোমিটার মাত্র পথ। সেখানে আজও ইন্দ্রেশ্বর ঘাটের স্মৃতি রয়েছে মানুষের মুখে মুখে। হয়ত মন্দিরও ছিল, কিন্তু সে কথা কেউ বলে না। চৈতন্য বিষয়ক কোনও পুঁথিতে সে মন্দিরের বা দেবতার উল্লেখ নেই। জয়ানন্দ লিখেছেন—গোধুলি সমএ ইন্দ্রেশ্বর ঘাট গিয়া/বিকীঘাট প্রবেশিলা নিত্যানন্দ গিয়া। ঘাট আছে অথচ মন্দির নেই। তাহলে সে মন্দির কি তখনই গঙ্গাগর্ভে, না সেখানে আদৌ কোনও মন্দির ছিল না? পরিত্যক্ত ভাগীরথীর তীর বরাবর কাটোয়া দাঁইহাট সড়কের বামদিকে রয়েছে ইন্দ্রেশ্বর ঘাটের ধ্বংসাবশেষ, বেরায় বা বিকীহাটে। সেখানকার অধিবাসীদের সিংহভাগই স্বাধীনতার পরে এসে এখানে বাস করছেন। বর্গী আক্রমণ ও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরে একসময়ে ও জায়গা শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। তবু স্থানীয় লোকই ভরসা, তারাই

ঘাটের জায়গাটা চিনিয়ে দেন। মহাভারতে বাচস্পতি মিশ্রের টীকায় বলা হয়েছে - ইন্দ্রাণী নাম তীর্থং স্যাৎ ইন্দ্রাণী যত্র বাসবম/তপস্তত্বা পতিংলেভে সৈব শাক্তা প্রয়াগবৎ। অর্থাৎ ইন্দ্রাণী তপস্যা করে বাসবকে যেখানে পতিরূপে পেয়েছিলেন, সেই ইন্দ্রণী তীর্থ প্রয়াগের মত পবিত্র।

বেরা ও বিকীহাটের পূর্বদিকে রয়েছে কাটোয়া-দাঁইহাট সড়ক, সড়কের গা ছুঁয়ে পরিত্যক্ত ভাগীরথীর বিস্তীর্ণ খাত। গ্রীষ্মকালে ওই খাতে নেমে দিনের পর দিন হেঁটেছি, খুঁজেছি ওই পবিত্র ঘাট ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ঘাটটি চিহ্নিত করতে বেগ পেতে হয়নি, স্থানীয় অধিবাসীরা সাহায্য করেছেন। সেই পবিত্র তীর্থের পাশেই পড়ে রয়েছে শত শত বিশালকায় পাথরের চাঙ। মন্দিরের প্রতিকৃতি ও দেবদেবীর মূর্তি খচিত রয়েছে ওগুলির অনেক কটিতেই। কালক্রমে ধুলোমাটি জমে তৈরী হয়েছে সমতল এক ঢিবি, পাশেই পরিত্যক্ত

বিলুপ্ত মন্দিরের ভিতের উপরে চাতালে বড় বড় খাঁজ কাটা পাথর পড়ে রয়েছে আনুঃ ১৯৮০ খ্রি.

ভাগীরথী, এখন সমতল কৃষিভূমি। ওখানে নামলে স্পষ্ট বোঝা যেত (ইং ১৯৮০) যে ওই ঢিবি আসলে কোনও বিলুপ্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছু নয়। জায়গাটাকে বলে তেঁতুলতলা। ওই আশি সালে, সেখানে ভিতর-ফাঁপা তেঁতুল গাছ ছিল অনেকগুলো। এখন নেই। অথচ ধ্বংসাবশেষ বলছে সেখানে মন্দির ছিল। আশ্চর্য কথা, চৈতন্য সমকালিক কিংবা চৈতন্যোত্তর কোনও গ্রন্থে তার কোনও উল্লেখ নেই। অনুমান করতে বাধা নেই, আমাদের চিহ্নিত জায়গাতেই ওই মন্দির ছিল, সে অনেক কাল আগের কথা। চৈতন্যদেবের কাটোয়া আসার অনেক আগেই তাকে কীর্তিনাশা গঙ্গা গ্রাস করেছে, ঘটনাচক্রে ফেলে গেছে তার কিয়দংশ অবশেষ। তা থেকেই বেছে বেছে কৃষ্ণনগরের মহারাজা মসৃণ পাথরগুলি নিয়েগেছেন তাঁর রাজবাড়ি সাজাতে। জনশ্রুতি গৌড়ের প্রাসাদেও নাকি ওই মন্দিরের পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। আরও অনেকেই নিয়ে গেছেন নানা উদ্দেশ্যে। যেটুকু বেঁচে আছে এখানে সেখানে, তাই বা কম কী। তা থেকেই অনুমান করা কঠিন নয় যে অতীতে কী বিশাল মন্দিরই না ছিল ভাগীরথী তীরে, ইন্দ্রেশ্বরের মন্দির। আর তার কাছাকাছি ইন্দ্রেশ্বরের

ঘাট, পুণ্য তীর্থ এবং রাজার ডাঙ্গা/রাজাপোতা, রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন এখনও মানুষেরা ভক্তিভরে ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে স্নান করেন এবং ইন্দ্রেশ্বরের ভজনা করেন। গঙ্গা নেই, আছে একটা ডোবা। ইন্দ্রেশ্বরও নেই। তবু ঘাট বেঁচে আছে মানুষের মুখে মুখে, ওই ডোবাই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী।

সম্মুখেতে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি - মুকুন্দরাম

ইন্দ্রাণী পরগণা ও ইন্দ্রাণী নামটা যে কী করে হল আজ তা জানার সুনির্দিষ্ট কোনও উপায় নেই। সম্ভবত ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ইন্দ্রাণী পত্তনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। নামটা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে, সরকার সুলেমানাবাদের অন্তর্গত পরগণা হিসেবে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে ও বাংলা মহাকাব্যে ইন্দ্রাণী নামের ছড়াছড়ি। মুরশিদ কুলীখাঁ, সুজাউদ্দিনের কালেও ইন্দ্রাণী ছিল। সুজাউদ্দিনের ছেলে সরফরাজখাঁ এক ফরমান জারি করে বর্ধমানরাজ চিত্রসেনকে ইন্দ্রাণীর জমিদারী দান করেন। ইন্দ্রাণী আছে রেভিনিউ সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র মানচিত্রে (১৮৬৪-৬৫) এবং ইরফান হাবিবের অ্যাটলাস অব মুঘল এম্পায়ার গ্রন্থে। অষ্টাদশ শতকে বিজয়রামের তীর্থমঙ্গলে রয়েছে ইন্দ্রাণীর গুণগান-অপূর্ব শহরখান কতেক বাজারে, ইহার সমান স্থান নাহি এথাকারে॥ সময়ের ব্যবধানে ইন্দ্রাণীর সীমানা ও বিস্তৃতি ওলট পালট হয়েছে, কবে ও কী নিয়ে হদিশ আজ পাওয়ার কোনও উপায় নেই। মোটামুটি তবু বলা যায় শাঁখাই-কাটোয়া সহ কাটোয়ার দক্ষিণ-পূর্বে ভাউসিংহ পর্যন্ত অঞ্চল চিরদিনই ইন্দ্রাণীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে কাটোয়া দাঁইহাট পৌরসভা ইন্দ্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এখন ইন্দ্রাণী নাম শুধু কাগজে কলমে বেঁচে আছে। কিন্তু অতীতে কাটোয়া বা দাঁইহাটের পরিচয় দিতে গিয়ে ইন্দ্রাণীর উল্লেখ আগেই করতে হত। বৃন্দাবন দাস বলছেন—ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম। অর্থাৎ ইন্দ্রাণী শুধু পরগণার নামই ছিল না, হয়ত ইন্দ্রাণী নামে একটি শহরও ছিল। কাশীরাম দাসের ভাই গদাধর দাসের আত্মপরিচয়ে সে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। লিখেছেন—ভাগীরথী তটে বাটী/বাস (?) ইন্দ্রায়নী নাম/তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিদ্ধি (সিঙ্গি) গ্রাম...। সিদ্ধি, সিঙ্গি, না সিংহগ্রাম, তা নিয়ে সমস্যা আছে। স্বভাবতই কাশীরাম দাসের ভদ্রাসন নিয়েও। গদাধর দাসের মতে ভাগীরথী তটে বাটী/বাস ধরলে, সিঙ্গি এক কথায় নাকচের তালিকায় চলে যায়। ইন্দ্রাণীর সীমানা অদল বদল নিয়ে মাথা ঘামানোর আর দরকার থাকে না। সে অন্য প্রসঙ্গ, এখন থাক।

অথচ দু-হাজার বছর আগে কাটাদুপা আরিয়নের লেখাতে পরিচিতি পেয়েছে। পঞ্চম শতকে ফাহিয়ানে, সপ্তম শতকে হিউ এন চোয়াঙে, বিপ্রদাসের মনসা বিজয়ে (ইং ১৪৯৫)- উজানি কাটোয়া বাহি রহে ইন্দ্রঘাটে, মনোহর দাসের অনুরাগবল্লীতে (ইং ১৬৯৬) —কাটোয়া নিকট বাগ্যণকোলা পাটবাড়ী, কাটোয়া আছে। কৃত্তিবাসে কাটোয়া নেই, গঙ্গালয়ে ভাগীরথ চলিল সত্বর, পলকেতে উপস্থিত হন ইন্দ্রেশ্বর। ফানড্রেক ব্রোকের মানচিত্রে কাটোয়া অঞ্চলকে বিকিহাট বলা হয়েছে। তাভেনিয়র (ইং ১৬৬৭) তার ভ্রমণবৃত্তান্তে নবদ্বীপ উল্লেখ করলেও কাটোয়ার কথা লেখেননি। চিত্রকর উইলিয়ম হজ কলকাতা থেকে যাত্রা করে (ইং ১৭৮০) গঙ্গাতীর ধরে বেনারস গিয়েছিলেন। তিনি কাটোয়ার উল্লেখ করলেও

কাটোয়াকে বড় শহর বলতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অষ্টম শতক থেকে দীর্ঘকালের কোনও পুরাতন নথি হাতে নেই যা দেখে বোঝা যাবে সেসময়, কার গৌরব ছিল বেশি--কাটোয়া না ইন্দ্রাণীর তথা বেরা বা বিকীহাটের। বিলুপ্ত মন্দির প্রসঙ্গে সেসময়টা কোনও লেখাজোখায় ধরা থাকলে ভাল হত। কারণ পারিপার্শ্বিক নজির থেকে যদিও অনুমান করা যায় যে ওইকালে কোনও অজ্ঞাতনামা রাজা বা ধনবান ব্যক্তি একটি বিশালাকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গঙ্গাতীরে, বেরায় এবং সে মন্দিরের গঠন পুরীর মন্দিরের অনুলিপি বা প্রতিলিপি ছিল, তবুও অনুমান অনুমানই। একটা উল্লেখ পেলে প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত সহজ হত। তা আর হল না। সেজন্য ইন্দ্রাণী, বিকিহাট, বেরা ইত্যাদির বৈভব ও বিখ্যাতির নজির তুলে সেখানে প্রাচীন ওই মন্দির প্রতিষ্ঠার যথার্থতা তুলে ধরতে হচ্ছে। হয়ত কিছুটা প্রসঙ্গহীনও মনে হতে পারে।

বারো ঘাট তেরো হাট তিন চণ্ডী তিনেশ্বর

বেশ গর্বের সঙ্গেই এ-অঞ্চলের লোক-মুখে একটি ছড়া ঘোরাফেরা করত। বারো ঘাট তেরো হাট তিনচণ্ডী তিনেশ্বর, এ কথা যে বলে/জানে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর। প্রাচীনকালে এক ছোট্ট জনপদের মধ্যে রয়েছে, কমপক্ষে বারোটা ঘাট, হাট তেরো, জাগ্রত দেবদেবী তিন। সোজা কথা নয়। একটানে এতগুলি উল্লেখ্য এই বাংলায় আর ক'জায়গাতেই বা দেখতে পাওয়া যায়? তাই এত গর্ব ইন্দ্রাণীর নাগরিকদের। শাঁখাই-কাটোয়া থেকে দাঁইহাট ভাউসিং মোটামুটি মাইল আট, ইন্দ্রাণীর স্বর্গ। গঙ্গার তীর বরাবর সড়ক, বামে ভাগীরথী, ডানে শহর। ধন, মান ব্যবসা, এক রকমের ব্যাপার, তীর বরাবর ছোটখাটো মন্দির অনেকগুলি, বিশালাকার মন্দির হল ইন্দ্রেশ্বর। বড় বড় ঘাট, সংখ্যায় অনেক, অন্তত বারোটি ঘাটের নাম তো সকলেরই মুখে মুখে। সময়ের তাণ্ডবে সেগুলি ভাঙতে শুরু করে, আবার কোনও ধর্মাত্মা তা মেরামত করে দেন। কখনও কখনও সংস্কারকের নামটাও গেঁথে যায় ওই ঘাটের ইট কিংবা পাথরের সঙ্গে। আজও লোকমুখে সেই ঘাটের নামগুলি শোনা যায়। যেমন— মনোহারী ঘাট, শঙ্খেশ্বরী ঘাট, ইন্দ্রেশ্বর ঘাট, কালুর ঘাট, স্বরূপপানের ঘাট, কতমতলার ঘাট, বক্সীর ঘাট, গণেশমাতার ঘাট, দেওয়ানের ঘাট, শিবের ঘাট, কান্তবাবুর ঘাট, বারদুয়ারী ঘাট (বুড়োরাণীর)। কান্তবাবু মানে কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী, কাশিমবাজার রাজ পরিবারের বংশধর। তিনি ১২০০ বঙ্গাব্দে মারা যান। কান্তবাবুর ঘাটের পূর্বনাম ছিল মানের ঘাট। মনোহর যদি কোনও ব্যক্তির নাম হয় তাহলে কোন্ মনোহর চিহ্নিত করা কঠিন। এ প্রসঙ্গে আলোচনা অন্যত্র আছে (কাটোয়া দর্শন)। আবার অন্য উল্লেখে শিবের ঘাট ও মনোহারীর ঘাটকে পীরের ঘাট ও ভাউসিং-এর ঘাটও বলা হয়। দেওয়ান বলতে মাণিকচাঁদ, বর্ধমানের দেওয়ান, অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন তিনি। বর্ধমানের রাজা ও রাণীর নামেও ঘাট ছিল, দু-একটির ধ্বংসাবশেষ এখনও তার সাক্ষী। বছর কুড়ি আগে সবগুলি না হোক অন্তত পাঁচছটি ঘাট অনায়াসে চিহ্নিত করা যেত ক্রমশ ঘাটের বাঁধানো চাতালে মানুষেরা চালাঘর তৈরী করতে থাকে, ঘাটের ইঁট ও পাথর ব্যবহার করে দেওয়াল দিতে। আজ তাই দু-একটি বাদে প্রাচীন ঘাট চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। দু-একটি যা বেঁচে আছে তা ওই দাঁইহাটের লাগোয়া।

বারোটা ঘাট পুণ্যার্থীর ভিড়ে ঠাসা রাখতে হলে তাদের ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য ব্যবস্থাও থাকতে হয়। তীরে তীরে রয়েছে হাট, রকমারি জিনিসের সম্ভার, বেচো অথবা কেনো। অষ্টাদশ শতকের কবি বিজয়রামের বর্ণনা তুলনাহীন, তাঁর ভাষাতে-অপূর্ব শহর খান, কতেক বাজার, ইহার সমান স্থান নাহি এথাকার॥ পাথর কিনিলা সবে কোশাকুশি আর, বাজার করিলা হৈলা নৌকাতে সওয়ার॥ হাটও তাই কম নেই--দেওয়ান হাট (দণ্ডী, ধান্য, দাঁই), অকাইহাট, পাতাই হাট, পানুহাট, বিকিহাট, মণ্ডলহাট, গুড়েরহাট (খাঁর), আতুহাট,

প্রাচীন ঘাটের একটি, গঙ্গা অনেক দূরে।

ঘোষহাট, বীরহাট (বেড়া), গঞ্জ মুর্শিদপুর (কাটোয়া), নসরৎপুর ও কৃষ্ণচন্দ্রপুর ইত্যাদি। শেষের তিনটিতে প্রাচীন নামের বদলে আধুনিক নাম এসেছে, সেগুলিও এখন বছর শদুয়েকের প্রাচীন। চন্ডী ছিলেন কমপক্ষে তিন-মঙ্গলচণ্ডী, একাইচণ্ডী আর পাতাইচণ্ডী। মঙ্গলচণ্ডীর জায়গায় কোথাও আবার কুলাই চণ্ডীর নামও আছে। বর্তমানে কুলাই চণ্ডীর বেদী লোকবিস্মৃতিরও অতল গহ্বরে। কোনও চণ্ডী-মূর্তির কথা শোনা যায় না, নেইও, কেউ কেউ কোনও গাছতলাকে চণ্ডীদেবীদের বেদীর জায়গা দেখিয়ে থাকেন। আসলে সেকালে এঁরা জাগ্রত লৌকিক দেবী হিসেবেই বোধহয় পূজিত হতেন। ঈশ্বরী থাকলে ঈশ্বর থাকবেন, খুব স্বাভাবিক। তাই তিনেশ্বর-ঘোষেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর। চন্দ্রেশ্বরের জায়গায় শঙ্খেশ্বরের নামও শোনা যায়, শাঁখাই-এর নামে শঙ্খেশ্বর। চন্দ্রেশ্বর নেই, ইন্দ্রেশ্বর ভাগীরথী গর্ভে, একা বাবা ঘোষেশ্বর ঘোষহাটে অতীত ইন্দ্রাণীর গৌরব রক্ষা করে চলেছেন। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা ছিল অতীতের ইন্দ্রাণী, কেন্দ্রে ছিল পাথরের বিশাল মন্দির, দেওয়ালে দেওয়ালে বন্দিত পশুপাখির মূর্তি, শাস্ত্রকীর্তিত দেবদেবী, সামনে গরুড়ধ্বজ কিংবা সিংহমূর্তি। আর ছিলেন মহাত্যাগী ইন্দ্রেশ্বর। আজ তিনি কোথায়? সিংহভাগ গঙ্গাগর্ভে, কে দেবে তাঁর সঠিক ঠিকানা?

পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ

ইন্দ্রেশ্বর মন্দির ছিল গঙ্গার কোল ঘেঁষে। কীর্তিনাশা আগ্রাসী ভাগীরথী ক্রমশ ধেয়ে আসে

মন্দিরের দিকে। এই বুঝি ইন্দ্রেশ্বর হারিয়ে গেলেন গঙ্গাবক্ষে, ভেঙে পড়ল মন্দির। হতচকিত ভক্তবৃন্দ, সাধ্যে যতটুকু কুলোয় সেমত তুলে নেন তারা দেব ও দেবমন্দিররে স্মৃতিখণ্ড। কেউ পায় গরুড়মূর্তি, কার ভাগে পড়ে সিংহ। পুণ্যঘাটের পাথরখণ্ড কেউ তুলে রাখেন তুলসীতলায়, ফুল বেলপাতা পড়ে তাতে। খণ্ডবিখণ্ড দেবস্মৃতি ছড়িয়ে পড়ে ইন্দ্রাণীর বাড়িতে বাড়িতে, পথে ঘাটে, ক্ষেতে খামারে। একদিন সত্যি সত্যিই মন্দিরটি তলিয়ে গেল গঙ্গার রোষে। তারপর গঙ্গা বুঝি অনুতপ্ত হলেন, সরে যেতে থাকলেন দূর থেকে দূরান্তরে। বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ক্রমশ মাথা তুলে জেগে উঠল, বিশালাকার খচিত প্রস্তর খণ্ডের ছোট্ট একটি পাহাড় যেন। বছরের পর বছর কাটে, সুদর্শন পাথরগুলি রাজা মহারাজার দৃষ্টিতে পড়ে, তৈরী হয় প্রাসাদের দেওয়াল, পূর্ণ হয় রাজপ্রদর্শনশালা। সাধারণ দরিদ্র মানুষেরও কাজে লাগে কিছু কিছু। প্রস্তর শিল্পীরা বাড়ির কাছেই পেয়ে যান ব্যবহারোপযোগী পাথর, নতুন নতুন শিল্পআসবাব তৈরী হয় তা থেকে, তৈরী হয় নানা মূর্তি, সময়ের তাগিদে। মন্দিরের দেহাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে, আর যা বেঁচে থাকে, তার উপর ধুলোবালি জমে গড়ে উঠে এক চটি, মালিকহীন। পাঁচশো বছর আগের এই হল কল্পিত এক করুণ চিত্র, ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের নির্বাণ আলেখ্য।

হাজার বছর পরে সেই ধর্মস্থানের নাম হয় বেরার তেঁতুল তলা, বছর কুড়ি আগে ভেতর ফোঁফরা কয়েকটা তেঁতুল গাছ ছিল সেখানে। পরিত্যক্ত ভাগীরথীর গা ছুঁয়ে ছিল একখণ্ড সমতল ভুমি, তখনও ভেতরের পাথরগুলি উঁকি দিত আকাশে। আজ তেঁতুল গাছের অস্তিত্ব নেই, সমতল ভূমিতে গড়ে উঠেছে ছোট্ট পাকা এক সৌধ, কয়েক খণ্ড বিশাল পাথর অযত্নে গড়িয়ে পড়ে আছে, পাশে পুকুর পাড়ে। হাজার বছর আগের বাস্তব ওই বৈভব ও জনকলরব সত্যিই আজ কষ্টকল্পিত স্বপ্ন। অতীতের ওই বাস্তবকে এখনও বোঝা যায়, চেনা যায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুরাপ্রস্তরের সম্ভার দেখে। এ কাজ নিষ্ঠাবান গবেষকের। বড় অভাব।

(১) কাটোয়া দাঁইহাট সড়ক থেকে বেরা গ্রামে ঢোকার মুখে মাটিতে উলম্ব পোঁতা বিশাল পাথরের স্তম্ভ, লোকে বলে হনুমান লাঠি। কে যেন ইচ্ছে করেই উলম্ব পুঁতে রেখেছে

তেতুলতলায় প্রাচীন মন্দিরের ভিতের উপর বর্তমান সৌধ দাঁড়িয়ে

ওটি, রাজবাড়ির সীমানার ইঙ্গিত বুঝি। মাটির উপরে লম্বায় পাঁচ ফুট রয়েছে জেগে, মাথাটা চৌকোণ, বাকিটা গোল, ব্যাস এক ফুট। চারদিকে চারটি ফুলের মালা খচিত রয়েছে। শোনা যায় স্থানীয় লোকেরা কৌতূহলবশত স্তম্ভটিকে তোলার চেষ্টা করেন, আট দশ ফুট খুঁড়েও পাথরটিকে নড়ানো যায় না। মনে হয় কোন কালে কোনও এক ভবিষ্যদর্শী মহাত্মা, মন্দির কিংবা রাজবাড়ির একটি থাম উলম্ব পুঁতে রেখেছেন কৌতূহলী উত্তরসূরীদের প্রত্যাশায়, প্রত্নস্থল চিনিয়ে দিতে। মোটামুটি এরকমের একটি স্তম্ভ রাখা আছে কলকাতার

হনুমান লাঠি,
ঢিবির কিয়দংশ
ও হরগৌরী মন্দির

জাদুঘরে, শুঙ্গ কুষাণ যুগের দ্যোতক হিসেবে। রাস্তার ওপাশে ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট। পাশে রাজার পোতা বা রাজার ডাঙ্গা, এখন মাটির ঢিবি। পূর্ববঙ্গের লোকেরা তার উপরে বাড়ি তৈরী করেছে। ভিত খুঁড়তে গিয়ে পাকা দেওয়ালের হদিশ এখনও মেলে, অনেকেই একথা গোপনে বলে থাকেন। পাওয়া যায় বিচিত্র খেলনা, মাটির পুতুল, মাটির পাত্রে চুনের মত কোনও উপাদান ইত্যাদি। ঢিবির উপর চৌকোণ সমতল ছাদের একটি ছোট্ট মন্দিন। ওই মন্দিরে পাথরের স্লাবে ক্ষতবিক্ষত হরগৌরী মূর্তি ।

(২) বেরা গ্রামের ষষ্ঠীতলায় খাঁজকাটা একটি পাথর। এরকমের পাথর গ্রামের অনেক জায়গায় ও ক্ষেতখামারে পড়ে আছে। মাঝখানে কীলক পোঁতার গর্ত, সেযুগে সিমেন্ট ছিল না, পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে মাঝখানে লোহার কীলক দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা হত। গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শিব মন্দির, জোড়-শিব মন্দির তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দেওয়ালে টেরাকোটার কাজ, ত্রিকোণ দেব-পতাকা উড্ডীয়মান। পঙ্খের কাজ বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরকে মনে করিয়ে দেয়। ইন্দ্রাণীর স্বর্ণযুগের তুলনায় মন্দিরগুলি নিঃসন্দেহে আধুনিক।

(৩) দাঁইহাটের দিকে বেশ কয়েক পা এগোলে পবিত্র তেঁতুল তলা। এ বিষয়ে আলোচনা আগে রয়েছে। স্থানীয় লোকেদের বক্তব্য বছর পঁচিশ আগেও ট্রাকের পর ট্রাক ভর্তি করে বিরাট বিরাট পাথর কেউ বা কারা তুলে নিয়ে যেত প্রতি বছর, কোথায়, কেউ জানে না। এ অঞ্চল থেকেই একটি সিংহমূর্তি ও একটি বিষ্ণুমূর্তি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের
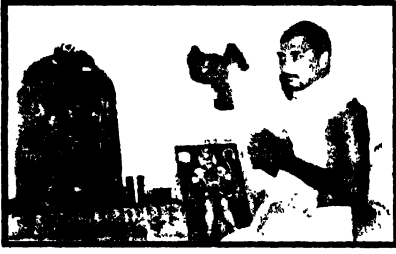
ক্ষত-বিক্ষত হরগৌরী মূর্তি ও বর্তমান পুরোহিত
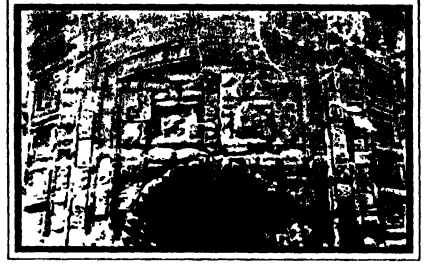
বেরাগ্রামে জোড়া শিবমন্দিরের অন্যতম একটি

বেরার ষষ্ঠীতলায় একটি খাঁজকাটা পাথর, এরকমের অনেকগুলি যেখানে সেখানে পড়ে আছে

প্রদর্শনশালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দাঁইহাটের কোনও গৃহস্থবাড়িতে পূজিত হচ্ছে গরুড়মূর্তি। কাটোয়ায় অবস্থিত বর্তমান দি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রবেশ পথে বিশাল পাথরের লিন্টল, মাঝখানে গণেশ মূর্তি। কাটোয়া জেলখানার অশ্বত্থ তলায় ছোট্ট কুঠুরিতে অর্ধভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি। এগুলি বেরা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য-গুপ্তযুগের নাচনা মন্দিরের লিনটলে সিংহমূর্তি আছে। বিশালাকার পাথর, গণেশ, সিংহ, গরুড় ইত্যাদি গুপ্তযুগের প্রতীক।

(৪) দাঁইহাটের পথে আরও কিছুদূর। বামপাশে পীর বদরের মাজার, জাগ্রত পীর, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পীর সাহেব পুজো পান এখনও। বছর কুড়ি আগে ছোট্ট দরজাবিশিষ্ট সমতল ছাদের ছোট্ট ঘরে পীরসাহেব শায়িত ছিলেন। দরজার বাজুগুলি ছিল পাথরের, তাতে আজানু পৈতে বা মালা পরিহিত পুরুষমূর্তি স্পষ্ট বোঝা যেত। দক্ষিণের দেওয়ালের প্লাস্টার খসে উঁকি দিত গোঁফওয়ালা দ্বারপাল। আশেপাশে স্তূপাকার মূর্তিলাঞ্ছিত পাথর। একটির ছবি এঁকে রাখা হয়েছে। তাতে রয়েছে নৃত্যরতা স্ত্রীমূর্তি ও বাদনরত উষ্ণীষধারী এক পুরুষ। এ পাথরগুলিও বেরা থেকে আনা হয়েছিল একসময়। স্থানীয় লোকেরা বলত এখানে পাতাল ঘর আছে, রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করলে গুর্ গুর্ আওয়াজ হয়। এ জায়গাটার
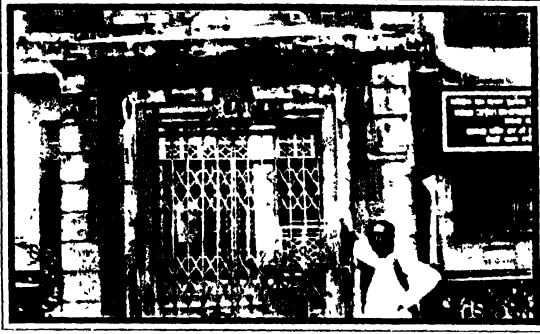
বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রবেশ তোরণের লিনটন, মাঝে গণেশ মূর্তি

বদরসাহেবের মাজারের দরজার ফ্রেম ১৯৮০ খ্রি.
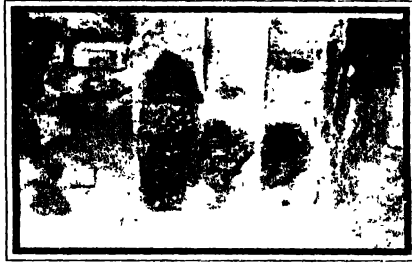
বদরসাহেবের মাজারের দেওয়ালের প্লাস্টার খসে দ্বারপালের মূর্তি ১৯৮০ খ্রি.

নাম দেওয়ানগঞ্জ, মাণিকচাঁদ দেওয়ানের নাম। দেওয়ানজী পীর সাহেবকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন। তিনি পীরের সেবার ব্যয় মেটাতে বেশ কিছু স্থায়ী সম্পত্তি দান করে যান। দণ্ডহাতে গোঁফওয়ালা দ্বারপালের মূর্তি বাংলাদেশের পাহাড়পুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। পাহাড়পুরের মূর্তিগুলি গুপ্তযুগের, অনেকের মতে পঞ্চম শতকের। বদরসাহেবের সে ঘরের বদলে এখন পাকা বাড়ি, আশে পাশে পড়ে থাকা পুরা প্রস্তর উধাও। এমনি করে অতীত নজির হারিয়ে যাচ্ছে, মাত্র কুড়ি বছরে এই পরিবর্তন নিজের চোখে দেখলাম।

(৫) শহর কাটোয়া, বর্তমান পৌরসভা-ভবন, সামনে রাস্তা, দক্ষিণে নর্দমা। পাশে উঁচু ঢিবি, গুণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ-মূর্তি, লাগোয়া দি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। প্রায় নর্দমার উপরেই দুটি, দুই গুণিত দেড় ফুটের কালো ভারি পাথর। প্রত্যেকটির মাঝে কীলক বসানোর জন্য গর্ত। শুধু এই পাথর খণ্ডদুটির প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক সুবিচার করলেই বোঝা যায়, এগুলি যে মন্দিরের অংশ, সে মন্দির আকারে ও প্রকারে কী বিশালই না ছিল, ওই ইন্দ্রেশ্বর মন্দির, বেরার তেঁতুলতলায়। গণেশমূর্তি লাঞ্ছিত লিনটল ব্যাঙ্কের প্রবেশ তোরণে। প্রায় ওই মাপের পাথর সংগ্রহ করেছিলেন কাটোয়ার অনাদি মুখোপাধ্যায়। তাঁর কুঁয়ো তলায় সেটি এখনও রয়েছে। মাঝখানে পুরুষমূর্তি (?), সম্ভবত
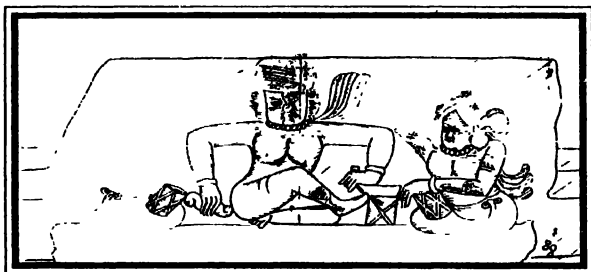
বাদনরত
স্ত্রী পুরুষের
মূর্তি ১৯৮০ খ্রি.
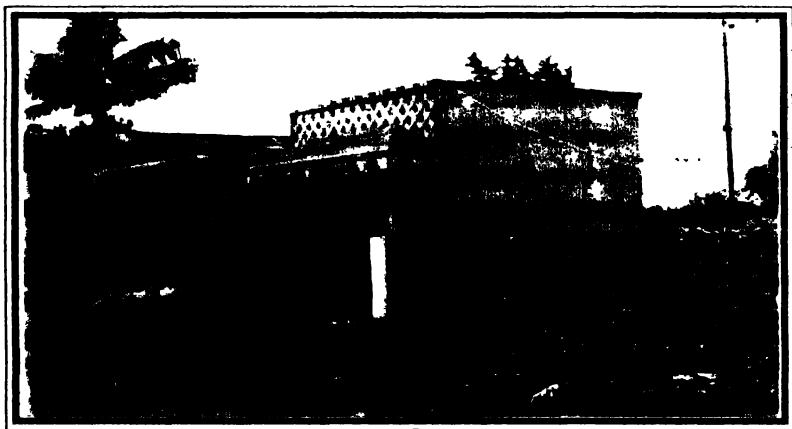
বদরসাহেবের মাজারের বর্তমান রূপ

কাটোয়া পৌরসভার সামনে নর্দমার ওপরে পরে থাকা পাথর এটি ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ,

বেড়ার বিলুপ্ত মন্দিরের অংশ, পৌরসভার সামনে নর্দমার উপরে পড়ে আছে

ইন্দ্রেশ্বর। আবার সখীর আখড়ায় সংরক্ষণ করা হয়েছে আড়াই বাই দেড় বাই এক ফুট কালো পাথর, মহাপ্রভুর পদচিহ্ন লাঞ্ছিত। ওপিঠে বীণাবাদিনী সরস্বতীর অপূর্ব মূর্তি, ওপিঠ এখন গেঁথে ফেলা হয়েছে, দেখা যায় না। এগুলির শিল্পশৈলীর প্রতি বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টি দিলে বুঝতে কষ্ট হয় না ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের শিল্পশৈলী উড়িষ্যার বিখ্যাত মন্দিরগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট না হোক অন্তত তার সমতুল ছিল। তাহলে কেমন ছিল সে মন্দির?

(৬) ইন্দ্রাণীর মন্দির কেমন ছিল, কথাটা অবাস্তব মনে হতে পারে। সৌভাগ্যবশত কিছু লাঞ্ছিত পাথর রয়েছে এখনও, যেগুলিতে বেশ কয়েকটা মন্দিরের নক্সা রয়েছে, মনে হবে একটি যেন অন্যটির প্রতিলিপি। লিনটনগুলির দেবমূর্তিও মন্দিরের মধ্যে যেন বসে আছেন। খোদিত সবকটি মন্দিরের নক্সার মধ্যে কোথায় যেন একটা সাধারণ যোগসূত্র

অনাদি মুখোপাধ্যায় কুঁয়োতলায় একটি পাথরের লিনটন, মাঝে ইন্দ্রেশ্বরের মূর্তি। (?)
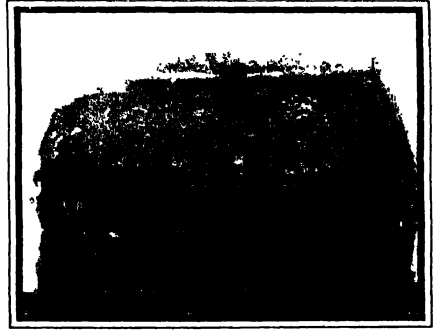
কাটোয়ার সখীর আখরায় সংগৃহীত প্রস্তর খন্ড, মহাপ্রভুর পদচিহ্ন, উল্টোপিঠে বীণাপাণীর মূর্তি।

রয়েছে, কল্পলোকে ওই সূত্রটিকে সঠিকভাবে চিনতে পারলে মুল ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের ছবি সঠিক আঁকতে বেগ পেতে হয় না। কাটোয়ার নিচুবাজারে সৈয়দ শাহ আলমের স্মৃতিতে তৈরী হয়েছিল এক প্রবেশতোরণ, ইংরেজ আমলে। তোরণের দরজার বাজুগুলি ও লিনটল বেরা থেকে সংগ্রহ করা পাথরের। দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া মূল্যবান দলিল হিসেবে বেঁচে রয়েছে মন্দিরের নক্সা (চিত্র-১৯)। প্রাপ্ত সবকটি নক্সা থেকে আমাদের মত সাধারণ মানুষেরও বুঝতে কষ্ট হয় না যে ওই মন্দিরগুলি আসলে উড়িষ্যার পুরীর মন্দিরের মতই। হয়ত তাই, ইন্দ্রাণীর মন্দির উড়িষ্যার মন্দিরের আদলেই হয়ত তৈরী হয়েছিল। পুরীর মন্দির বারবার সংস্কৃত হয়েছে, ইন্দ্রেশ্বরের মন্দির চলে গেছে গঙ্গাগর্ভে, কে করে পুনর্নির্মাণ?

অনাদি অতীত কথা কও

ইতিহাসের কথা ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা যোগসূত্র আছে। অনাদি বহমান সময়ের কোনও এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে কোন কিছুকে যদি যুক্তি দিয়ে, পর্যবেক্ষণ করে কিংবা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে তাকে সিদ্ধান্ত বলা যায়। তার বাইরে আরও কিছু থাকতে পারে কিন্তু সে ব্যাপারে নীরব থাকাটাই সমীচীন। হাজার বছর পর ইন্দ্রাণীর মন্দিরের অবস্থিতি প্রমাণ করতে হলে ওই পদ্ধতিতে পুরো আস্থা রাখলে তা আর করা সম্ভব হয় না। আইন শাস্ত্রে আছে—সেক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে যুক্তিজালিকা অবশ্যই থাকতে হবে আর তার সঙ্গে থাকতে হবে পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি, তা যতই নগণ্য হোক না কেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দৃশ্যমান পুরা নিদর্শনগুলির উল্লেখ রাখা হয়েছে, জন সচেতনতা থাকলে, ভবিষ্যতে আরও নজির হয়ত ধরা পড়বে। সব কিছু মিলিয়ে মোটামুটি এখনই বিশ্বাস করা যায়—মহাপ্রভুর কাটোয়া আগমনের অনেক আগেই ইন্দ্রেশ্বর মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ওরকমের মন্দির নির্মাণ করা সাধারণের কাজ নয়, প্রতক্ষ্যভাবে কোনও এক রাজা ছিলেন তার পিছনে অথবা কার্যকর উদার রাজানুগ্রহ। কোন্ সে রাজা, যিনি ওই মন্দির নির্মাণ করান? ইতিহাস এখানে নীরব! জনশ্রুতি, লোককথা কিংবা কিংবদন্তীর উপর আস্থা রাখা নিরাপদ নয় জানি, কিন্তু আপাতত যখন কোনও সূত্র হাতে নেই তখন একবার শুনে রাখতে আপত্তি কোথায়। কিম্বদন্তী অনুসারে ইন্দ্রাণীর মন্দির নির্মাণের ইতিহাস জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের অনুরূপ। ওটাও কিংবদন্তী। ইতিহাস আজও ওই মন্দির নির্মাতার নাম সঠিকভাবে বলেনি। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাণী গুণ্ডিচার অনুরোধে মন্দির নির্মাণ করান। জগন্নাথ দেব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি তৈরীর প্রাক্কালে কৌতূহলবশত অসময়ে দরজা খুলে দেওয়া হয়, তাই নাকি মূর্তিগুলি অর্ধসমাপ্ত। ইন্দ্রাণীর মন্দির সম্পর্কে জনশ্রুতিও তাই। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় মহারাণীর নাম গুণ্ডিচা নয়, অহল্যা। কিংবদন্তী প্রচারকরা জগন্নাথ মূর্তি নির্মাণের লোককথা ঠিকঠাক জানতেন, তাহলে রাণীর নামটা বদলে দিলেন কেন? আধিভৌতিক অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে কিছুও সত্যতা থাকে ওই কিংবদন্তীতে, তাহলে তা রয়েছে ওই ধাঁধাতেই। রাণীর নতুন নামে। হতে পারে এই রাণী দ্বিতীয়া অথবা প্রথমা, সমুদ্রের চেয়ে গঙ্গাই তাঁর কাছে অধিক পবিত্র, অতএব কাম্য। এক জনের জন্য গঙ্গাতীরে মন্দির, অন্যের সমুদ্রতীরে। মহারাজা এভাবে দুজনেরই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

ইতিহাস কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে পাথুরে প্রমাণে। এ কথা ঠিক ইন্দ্রাণীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে সাল তারিখ ও নির্মাতার নাম লেখা কোনও ফলক পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে অন্য একটি। কে জোর দিয়ে বলবেন যে ওটি ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের কোনও স্মৃতি নয়? ক্যাপ্টেন লঙ দাঁইহাট আর বেরার মাঝামাঝি, গঙ্গাগর্ভে বিলীয়মান একটি মন্দির থেকে একটি ফলক এশিয়াটিক সোসাইটিতে জমা দেন। তেঁতুলতলার অবস্থিতি সঠিক ভাবে বেরা দাঁইহাটের মাঝখানে হয়ত নয় কিন্তু মধ্যে তো বটে। লঙসাহেব ফিতে ধরে প্রবন্ধ লেখেননি নিশ্চয়। তাছাড়া কোনও এক সময় হয়ত কোনও সহৃদয় সজ্জন বিলুপ্ত মন্দির থেকে ওই ফলকটি কুড়িয়ে পেয়ে আপাত নবীন মন্দিরে গেঁথে রেখেছিলেন -এটাও সম্ভব। কিংবা গঙ্গাগর্ভ শব্দটির উপর জোর দিলে, ওই মন্দিরটিই তো ইন্দ্রেশ্বর মন্দির বোঝায়, তার ধ্বংশাবশেষ, সে তো গঙ্গাগর্ভেই। ওই ফলকের লিপি বলছে-মন্দিরটি শংকরাচার্যের সমসাময়িক অর্থাৎ ৭৮৮-৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। পাথুরে প্রমাণ এক। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীবাটি তথা কাটোয়ার প্রাচীন পরিবারের সন্তান রামরাম চন্দ্র বেরার কাছে গোঁসাই ভাঙায় মাটি খোঁড়াচ্ছিলেন। পেলেন একটি পিতলের ফলক, দিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে। ওই ফলকটি জৈনদের নৌপজ্জী অর্থাৎ নবপদ প্রতিমা। লেখার কিয়দংশ — শ্রী ইন্দ্রেশ্বরে জৈনক্ষেত্রে স্বর্গস্থানে...। দুজায়গায় লেখা আছে সম্বৎ ১৯২৩। যজ্ঞেশ্বরবাবু সুন্দরভাবে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ফলকটির কাল নূন্যতম ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দ ধার্য করেছেন। লক্ষ রাখার বিষয়, ইন্দ্রেশ্বর চতুর্দশ শতকে খ্যাতির চূড়ায়। ইন্দ্রাণী জৈন তীর্থও বটে। পাথুরে পিতল প্রমাণ দুই।

ইতিহাস বলে ইন্দ্রদ্যুম্ন কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নয়। ইন্দ্রদ্যুম্ন কিংবদন্তীর রাজা। সুবল চন্দ্র মিত্রের বাঙ্গালা অভিধান লিখছে—ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ দেবের মন্দির পুনঃসংস্কার করান। সাল পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, ওটা নয় অভিধান। ভিনসেন স্মিথ ইন্ডিয়ান অ্যানটিকুয়ারি, ভলুম-৩৮ (১৯০৯) বই-এ অন্য এক প্রসঙ্গে রাজা মদন পালকে ইন্দ্রদ্যুম্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিংবদন্তীর রাজা চড়ে বসলেন ইতিহাসে। নিট ফল পাথুরে ঐতিহাসিক প্রমাণ তিন।

ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি-এ রিভিউ, ১৯৬৬-৬৭, পৃষ্ঠা ৪৪ বলছেঃ— Exploration at indrani pargun brought to light a ruined foundation of a pala temple stylistically ascribed to Circa eleventh century A.D. কোন্ পাল? মদন পাল? সুদৃঢ় পাথুরে প্রমাণ চার। আর কোনও কথা নয়, কাজ শেষ, এবার শেষ কথা।

শেষ কথা

এত কথা বলার পর শেষ কথা সংক্ষিপ্ত হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। হাজার বছর আগে বর্তমান বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় দাঁইহাট পৌরসভার অন্তর্গত বেরা গ্রামে পরিত্যক্ত ভাগীরথী তীরের বিলুপ্ত তেঁতুল তলায় উড়িষ্যার বিখ্যাত মন্দিরগুলির আদলে ইন্দ্রেশ্বরের এক বিশাল পাথরের মন্দির ছিল। মহাপ্রভুর কাটোয়া আগমনের বহু পূর্বেই ওই মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ঘাট থাকল, হাট থাকল, চণ্ডী থাকলেন তিন, ঈশ্বর কমে দুই,

আল্লা নিশ্চয়ই তার জন্য স্বর্গে
বাসস্থান তৈরী করবেন। সর্বোন্নত
শক্তিমান ও মহিমান্বিত সুলতান
মুহম্মদ ফারুকশিয়ার বাদশাহ গাজীর
আমলে এই মসজিদ নির্মিত হল।
সর্বশক্তিমান আল্লা তাঁর রাজত্ব ও
সার্বভৌমত্ব চিরস্থায়ী করুন।"
একহাজার একশত সাতাশ হিজরি সালে।

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে শিলালিপিটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন আব্দুল ওয়ালী এবং ১১২৭ হিজরিকে দেখিয়েছেন ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ মসজিদটি প্রায় ৩০০ বছরের পুরানো এবং বর্গী আমলে লুণ্ঠিত ও ধর্ষিত কাটোয়ার নীরব সাক্ষী।
মসজিদটির নির্মাণ ইতিহাস মোটামুটি এইরকম :

তখন ভারত সম্রাট ফারুকশিয়ার। বাংলার নবাব প্রবল প্রতাপান্বিত মুর্শিদকুলী খাঁ। মুর্শিদকুলী কাটোয়ায় মসজিদ সংলগ্ন এলাকাতেই একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন ও কাটোয়ার এক অংশের নাম দিয়েছিলেন গঞ্জ-মুর্শিদপুর। সে সময় দিল্লী তথা ভারতবর্ষ রক্তস্নাত। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর থেকে ফারুকশিয়ারের সিংহাসন প্রাপ্তি (১৭১২-১৩) পর্যন্ত দিল্লীতে ঘন ঘন গৃহযুদ্ধ। ঔরঙ্গজেব পুত্র শাহ আলম প্রবল সংগ্রামের পর বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তাঁর মৃত্যুর (১৭১২) পর সিংহাসনে বসলেন পুত্র আজিম-উস্-সান যিনি পূর্বে বাংলাদেশে (ঢাকায়) থাকতেন। কিন্তু আবার প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ শুরু হল। জাহান্দর শাহর সিংহাসন প্রাপ্তি এবং বাংলায় থেকে যাওয়া ও পরবর্তী সময়ে পাটনায় বাসরত আজিম-উস্-সান পুত্র ফারুক শিয়ারের সসৈন্যে দিল্লী আক্রমণ এবং সিংহাসন দখল—দেশের এমনি ঘন ঘন পট পরিবর্তন। আর কিংবদন্তী ঠিক সে সময় নিহত জাহান্দর শাহর উজির সৈয়দ শাহ আলম খান ফারুকশিয়ারের ভয়ে বেশ কিছু ধনরত্নসহ সুদূর বাংলায় পালিয়ে এসে ভাগীরথী ও অজয়ের মনোরম সঙ্গমস্থলটি পছন্দ হওয়ায় ১৭১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই মসজিদটি নির্মাণ করান; সঙ্গে হুজরা (সাধন-ভজনের জন্য গোপন কক্ষ), ভাগীরথী পর্যন্ত সুড়ঙ্গপথ (যা বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে), ভাগীরথীতে বাঁধান ঘাট (এখন নেই) ও মসজিদের তিনদিকে গড়খাত (যেগুলির মজে যাওয়া অংশগুলি এখনও বর্তমান বলে মনে হয়) এবং আলম শাহর মৃত্যুর পর মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে তাঁর মাজার নির্মিত হয় (আজও বর্তমান)। তাছাড়া উত্তরমুখী নীচুবাজার রাস্তার উপর সিংহদরজা। গেটের উপর লেখা রয়েছে, The gate first erected by Syed Shah Alam Khan Bahadur in 1637 Sakabda is reconstructed on 1-1-1935 by the Mutwalli Syed Shah Md. Khoda Hafiz under the Patronage of M. M. Stewart I. C. S. District Magistrate, Burdwan. বর্তমানে গেটস্থ ফাঁকা জায়গায় কাটোয়ার বিখ্যাত উৎসব কার্তিক লড়াই-এর থাকা সাজান এবং ঝুলন যাত্রার বিভিন্ন দৃশ্যনাট্য প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

মসজিদটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বর্তমানে একটি কমিটি (১৫ জনের) দ্বারা পরিচালিত (বৎসর অন্তর নবীকরণ হয়) এবং দেবোত্তর সম্পত্তি। ওয়াকফ অফ স্টেটের আয়ত্তাধীন। কমিটির প্রধান পদ মোতোয়াল্লী-বর্তমানে রয়েছেন বাগানেপাড়া নিবাসী জনাব লাল মহম্মদ। এই পদে পূর্বে বহুদিন যাবৎ আসীন ছিলেন বাগানেপাড়ার স্বনামধন্য ঠাণ্ডু মিঁয়া। একজন এনামতী (নামাজ ইত্যাদি পরিচালনা) করার জন্য সর্বক্ষণের হাফেজ (হাফেজ মোতাহার হোসেন) আছেন। কমিটি তাঁকে মাসিক ২৫০ টাকা ভাতা দেন এবং মসজিদ এলাকাস্থিত স্বচ্ছল ত্রিশ ঘর মুসলিম পরিবার পালাক্রমে তাঁর সমস্ত খাবারের দায়িত্ব নেন। মসজিদের নিজস্ব কিছু জমিজিরেত রয়েছে (ভক্ত মুসলিমগণ প্রদত্ত) মহকুমাস্থিত কাটোয়া, রাজুয়া ও গাঙ্গুলীডাঙ্গার মাঠে। জমির সামান্য আয় ও স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থানুকূল্যে মসজিদের ব্যয় নির্বাহ হয়। মসজিদের ধর্মাধীন কাটোয়া বাগানেপাড়া ও সরাই পাড়ার মুসলিম অধিবাসীবৃন্দ। এছাড়া কাটোয়া পৌরসভা এলাকায় ছোট ও মাঝারি আরও ৫টি মসজিদ রয়েছে--মণ্ডলপাড়া, কাছারীপাড়া, কাটোয়া পাড়া, স্টেশন বাজার ও কেশিয়াতে। তবে শাহী মসজিদই এলাকাস্থিত বড়, প্রাচীন, জাগ্রত ও বিশ্বস্ত মসজিদ। অনেকে সে কারণে মসজিদটিকে বড় মসজিদও বলে থাকেন।

মসজিদকে কেন্দ্র করে কোন বিশেষ উৎসব (পরব) বিশেষ ভাবে হয় না, তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় যাবতীয় উৎসবই সাদামাটা ভাবে পালিত হয়। পূর্বে ১লা বৈশাখ (সম্ভবত শাহ আলমের জন্ম অথবা মৃত্যু দিন) একটি বিশেষ উৎসব হত। এখন হয় না। দৈনন্দিন বেশ কয়েকশো ভক্তিপ্রাণ মুসলিম নামাজ পড়েন। শুক্রবার দুপুরের ভিড় লক্ষণীয়-নির্দিষ্ট মানুষ ছাড়াও মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ-শহরের ভক্তিপ্রাণ মুসলিমগণ বিশেষ মোহবশত এখানে নামাজ পড়তে আসেন। ঐদিন সংখ্যা দাঁড়ায় দেড় থেকে দু'হাজার। এছাড়া এলাকাস্থিত হিন্দু মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারী-পুরুষগণ (নারীর সংখ্যা বেশি) শুভ যাত্রাকালে এ মসজিদ দর্শন করে যান এবং সন্ধ্যাকালে হাফেজের নিকট দোয়া নিতে আসেন।

সম্প্রতি সংলগ্ন এলাকায় একটি ছোট্ট মুসলিম ছাত্রাবাস চালু হয়েছে। কাটোয়া, গাঙ্গুলীডাঙ্গা, রাজুয়ার জমিগুলি বিক্রি করে ছাত্রাবাসটিকে বড় করার প্রচেষ্টা চলছে। শোনা গেল এ বিষয়ে ওয়াকফ অফ স্টেটের সবুজ সংকেতও পাওয়া গেছে।

□ 'অজয়' কাটোয়া, ৮ম বর্ষ, ১৩৯৫ □

শাহী মসজিদ, কাটোয়া

গোপভূমের বিশিষ্ট গ্রাম সুয়াতা

শিবশংকর ঘোষ

সুয়াতা, বর্ধমান জেলার প্রাচীন গোপভূম পরগণার একদা প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সুয়াতা গ্রাম। বর্তমানে যা আউশগ্রাম ২ নং ব্লকের অন্তর্গত এবং গুসকরা-বুদবুদ পাকা রাস্তার উত্তর গায়ে অবস্থিত।

গ্রামের নামকরণ নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েই একাধিক কিংবদন্তীর বেড়াজালে জড়িয়ে পড়তে হয়। যেমন অনেকেই বলে থাকেন ভগবান বুদ্ধের জাতক কাহিনীর 'জনপদ কল্যাণী' সূত্রে উল্লেখিত 'শ্বেতক নগরীই পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে সুয়াতা হয়েছে।[১] কিন্তু এর পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকায় 'বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের প্রণেতা শ্রদ্ধেয় যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী এই মতকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নাই।[২] অন্যদিকে কিংবদন্তীর মায়াজালে এই গ্রামের সঙ্গে যে ব্যক্তির নাম নিবিড় ও গভীরভাবে জড়িত সেই ব্যক্তিটি হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় হজরত পীর সৈয়দ শাহ্ মহম্মদ বাহমনী। এই নামের সঙ্গে এই গ্রাম নামের সম্পর্ক জানতে গেলে একটু পিছিয়ে যাবার প্রয়োজন আছে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগের কিছু পরে আরব উপদেশের ইয়েমেন দেশ থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচার-মানসে কয়েকজন সাধু ফকির আসেন দিল্লী শহরে। তাঁদের দলনেতা শাহ্ জালাল। আর তাঁরই অন্যতম সঙ্গী ছিলেন বহমানী বংশের প্রখ্যাত সাধক বাহমানী সাহেব। দিল্লী আসার পূর্বে শাহ্ জালালের পিতা তাঁকে কিছু লাল মাটি দিয়ে বলেছিলেন, এই মাটি যেখানে মিলবে সেখান থেকেই তুমি ধর্মপ্রচার শুরু করবে। তাই তাঁরা বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে ঘুরতে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেটে সেই লাল মাটির দর্শন পেয়ে সেখান থেকেই প্রথম ধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানেই তারা ছড়িয়ে পড়েন এবং কর্মান্তে এই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সমাহিত হয়ে যান। যেমন বারকেল্লার খোন্দল শাহ্, হাড়োয়ার শাহ আব্বাস, বেলগাছিয়ার ছকু দেওয়ান, সুয়াতা ভাস্কীর এই হজরত শাহ্ মহম্মদ বাহমানী, কালুতাক গ্রামের (বর্ধমানের ভাতাড় থানায়) কালু শাহ ইত্যাদি। এই কালু শাহকে তার গুরু ইসমাইল গাজী গড় মান্দারণ যাবার পথে কালুত্তাকে এসে বলেছিলেন 'কালু তুই থাক'। এই কালু তুই থাক, কালু থাক বা কালুত্তাক গ্রাম নামের উৎপত্তি।[৩]

এখন মহম্মদ বাহমানী সাহেব এই সুয়াতা গ্রামে স্থিতু হয়ে ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তিনি একজন নিষ্ঠাবান ধর্ম সাধক হলেও মূলত ছিলেন একজন মানবদরদী ব্যক্তি। সেই সময় এই সুয়াতা গ্রামে সদগোপ রাজারা রাজত্ব করতেন এবং তারা খুবই পরাক্রমশালী ছিলেন।

---

(১) ড. পঞ্চানন মণ্ডলের "রাঢ়ভূমির ঐতিহাসিক ভূগোল ও মহাবীরের চারিকা" প্রবন্ধ অবলম্বনে বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুদ্ধেশ্বর শিব ও সুয়াতা গ্রাম' শারদীয়া বর্ধমান ১৩৮৪ সাল।

(২) বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি — যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী। পৃ. ৩৩৫

(৩) 'মৃগাবতী' কাব্যের সম্পাদনায় মাহম্মদ আয়ুব হোসেনের বক্তব্য। পৃ. ৪৯ শারদীয় বর্ধমান ১৩৯১সাল

তাঁদের গোপভূম রাজ্য ছিল সুবিশাল--পশ্চিমে পঞ্চকোট এবং পূর্বে কাটোয়া (প্রাচীন নাম ইন্দ্রাণী) পর্যন্ত এই রাজ্যের বিস্তার ছিল।[১] এই সুবিশাল রাজ্যের রাজা মহেন্দ্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ইন্দ্রানী পরগণার অন্তর্গত খেজুরডিহির জগৎ সিংহের বাড়ী হতে শিবাক্ষামূর্তি গোপভূমের রাজকার্যালয় ভাল্কীতে এনেছিলেন।[২] সেই ভাল্কীতে তাদের গৃহ দেবতা শিবাক্ষা দেবী পূজিতা হতেন নরবলিসহ। কিন্তু মানবতাবাদী সাধক বাহমানী সাহেব সেই নরবলির বিরোধিতা করলে রাজাদের সঙ্গে তার সংঘাত দেখা দেয় এবং সেই সংঘাতে তিনি দলবল সহ শহীদ হয়েছিলেন।

আবার গ্রাম নাম প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ধর্ম যুদ্ধে কেউ একক ভাবে মারা গেলে আরবী ভাষায় তাকে শহীদ বলা হয় আর সেই শহীদের সংখ্যা বেশি হলে অর্থাৎ বাহুবলে হলে তাকে বলা হয় 'শুহাদাহ্'। সদগোপ রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে বাহমানী সাহেব একা মরেন নাই, তাঁর সঙ্গে তাঁর সহযোগী অনেকেই মারা গিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই গ্রাম নিবাসী তথ্য সমৃদ্ধ ব্যক্তি তথা শিক্ষক ফজলুল কাদের চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শোনা যে ঐ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সুয়াতা থেকে ৪/৫ মাইল উত্তরে প্রতাপপুর ডাঙ্গায়। আর যেহেতু বাহমানী সাহেব এখানেই থাকতেন তাই মৃত্যুর পর শহীদদের দেহগুলিকে নিয়ে এসে এই সুয়াতাতেই সমাহিত করা হয়েছিল। তাই এই গ্রামকে বহু শহীদের সমাধিস্থল বলেই শুহাদাহ বলা হত। দীর্ঘ ছয় শত বছরের ব্যবধানে এটি রূপান্তরিত হয়েছে শুহাদ/শুহাদা/সুয়াতায়।[৩]

গ্রামের প্রাচীনত্ব গ্রামটি প্রাচীন, কারণ গ্রামে অবস্থিত হজরত পীর সৈয়দ শাহ মহম্মদ বাহমানী সাহেবের মাজার নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন পুরাকীর্তি, তদুপরি মাজারে অবস্থিত তিনটি লিপি যা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বিবেচিত, তাদের অবস্থানও প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

এই গ্রামের একটু উত্তর পূর্ব কোণে মঙ্গলকোটের মসজিদের আদলে একটি মসজিদ ছিল। কিন্তু বহুদিন হল তা ধ্বংসে পরিণত হয়েছে। তবুও তারই স্মৃতিবাহক তিনটি প্রস্তর টুকরা বা পিলার ইতস্তত পড়ে থাকতে দেখা যায়। যেহেতু এক কালে সেখানে মসজিদ ছিল বলে এখনও ঐ জায়গাটি মসজেদডাঙ্গা/মসিদডাঙ্গা নামে খ্যাত হয়েছে। এখন এই মসজিদটি ভেঙে যাওয়ায় তার প্রতিষ্ঠা লিপিটিও বাহমানী সাহেবের মাজারে রক্ষিত আছে। এটি ছাড়াও মাজারে আরও ২টি শিলালিপি রয়েছে -- তার মধ্যে প্রথমটি রয়েছে শহীদ বাহমানী শাহের সমাধি বা মাজারের প্রবেশদ্বারের উপরেই। আর একটি সমাধি-গৃহের ভিতরে উত্তর দিকের দেওয়ালে গাঁথা আছে। সর্বসাকুল্যে মোট তিনটি আরবীতুখরা হরফে লেখা লিপি একই স্থানে বর্তমান। বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকটেই পূর্ব দিকে অবস্থিত শ্রীপাট মুলুক

(১) 'মৃগাবতী' কাব্যের সম্পাদনায় মাহম্মদ আয়ুব হোসেনের বক্তব্য। পৃ. ৪৭

(২) মৃগাবতী কাব্যের সম্পাদনায় মহম্মদ আয়ুর হোসেনের বক্তব্য, পৃষ্ঠা - ৪৮

(৩) তিনটি উপেক্ষিত শিলালিপি -- আব্দুল হালিম, স্মারক গ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির ৩য় বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন ১৩৮৩ সাল।

নিবাসী প্রখ্যাত গবেষক শ্রদ্ধেয় সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় উক্ত তিনটি লিপি ১৯৭৭ খ্রি. ভারত সরকারের নাগপুরস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান (শিলালিপি) বিভাগের অধিকর্তা জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক পঠিত হয়ে ভাষান্তরিত হয়েছে। তাতে জানা যায় বর্তমান সমাধি ক্ষেত্রের প্রবেশ দ্বারের লিপিটিও সমাধি গৃহের উত্তর দেওয়ালে গ্রথিত লিপি দুটি একই বছর হিজরী ৯০২ অর্থাৎ ১৪৯৬-৯৭ খ্রি. তদানীন্তন ধর্ম-পরায়ন বঙ্গ সুলতান আবুল মুজাফর হুসাইন শাহ এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণকালে স্মৃতিসৌধে একটি ও এই স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে শিল্প সৌন্দর্যে মণ্ডিত তোরণে একটি লিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন - যাদের লেখক ছিলেন সুলতানের রাজকর্মচারী কাজী মিনাহী। পরবর্তীকালে সেই তোরণ ধ্বংস হলে তা সমাধি গৃহের উত্তর দেওয়ালে গ্রথিত হয়েছে। আর ৩য় লিপিটি ধ্বংস-প্রাপ্ত মসজিদে উৎকীর্ণ ছিল, উক্ত সুলতান হুসাইন শাহ কর্তৃক হিজরী ৯০৮ অর্থাৎ ১৫০২/১৫০৩ খ্রি. নির্মিত হয়েছিল। যার লেখক ছিলেন সম্ভবত মনসুর। ঐ লিপিগুলিতে প্রতিষ্ঠাতার নামসহ দুটিতে পবিত্র কোরাণ-এর বাণীও উৎকীর্ণ আছে।

বাংলার নবাব হুসেন শাহ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃতি-মনস্ক ও পরমতসহিষ্ণু উদার ব্যক্তি। তাই তাঁর সম্পর্কে একটি চলতি প্রবাদেও ঐ উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়-

বাদশা ছিলেন হুসেন শাহ জাতিতে পাঠান।
হিন্দু তাঁর পাত্র মিত্র উজির দেওয়ান॥

এহেন উদার সুলতান ১৪৯৩ খ্রি. সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন এবং তিনিই পরবর্তীকালে এই স্মৃতিসৌধ ও মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু কালের ভ্রূকুটিতে আজ তা বিলীন। সেদিক থেকে বিচার করলে গ্রামটি যে পাঁচশ বছরের অধিক প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহ নাই। আজ থেকে তিনশ বছর আগে ১৬৯৯ খ্রি. বাঁকুড়ার সুখ সায়রের সীতারাম দাস তার মনসামঙ্গল কাব্যে পীর পয়গম্বরদের বন্দনা প্রসঙ্গে এখানকার বাহমানী শাহের উল্লেখ করেছেন।

"সংহতি বম্বানী বন্দো ভাল্কীর পীর
বদর আলম বন্দো সাগরে জাহির।"

- এখানে উল্লেখ্য বাহমনী শাহই উচ্চারণ ভেদে বাহমান/বোম্মান/বোম্বান নামেও পরিচিত।

দর্শনীয় স্থান গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে বৃক্ষাচ্ছাদিত মনোরম পরিবেশে গ্রামের প্রাচীনতম স্থান ও প্রাচীন পুরাকীর্তির ঐতিহাসিক দলিলস্বরূপ মসজিদের প্রতিষ্ঠা লিপি সঙ্গে নিয়ে বাহমানী সাহেবের মাজার বর্তমান। এটি যদিও আজ জীর্ণদশায় এসে গেছে, অচিরাৎ সংস্কার হওয়ার প্রয়োজন, তবুও এখানে উপস্থিত হলেই এটি যে একটি প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র তা সহজেই বোঝা যায়। মাজারটি কূর্মাকৃতি উঁচুডাঙায় অবস্থিত বলে অনেকেই অনুমান করেন যে, এটি একটি বৌদ্ধ স্তূপ। কিন্তু তার পিছনে তেমন কোন জোরালো যুক্তি নাই। বরং এই মাজারে যিনি শায়িত আছেন তার সঙ্গে বুদ্ধের যে একটা সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণস্বরূপ এখনও সকাল সন্ধ্যায় দামামা নির্ঘোষে যুদ্ধের সূচনা ও অবসানের ইঙ্গিত সূচিত হয়।

এই মাজারের উত্তরে শ্যাওলাদিঘী -- যা গোপ রাজকন্যা শৈবলিনীর স্মৃতিবাহক। অর্থাৎ শৈবলিনী থেকে শ্যাওলায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেই শ্যাওলার কাছে যেখানে ডি. ভি. সি. ক্যানেলের সাইফোন রয়েছে সেখানেই পূর্বে গোপ রাজাদের আরাধ্যা দেবী শিবাক্ষার আটন ছিল, যার জন্য ঐ জায়গা এখনও শিবাখ্যার ঢিপি নামে খ্যাত। পরে সেই জায়গায় আব্দুল কাদের চৌধুরী মহাশয় জমি তৈরী করার জন্য কাটাতে গিয়ে এক বিরাট ওজনের খড়গ পেয়েছিলেন, সেটি এ অঞ্চলের বয়স্ক লোক মাত্রেই অবলোকন করেছেন। পরে সেটি জামতারার ডা. এ. মার্টিন-এর কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল।

গ্রামের মধ্যে হিন্দুপাড়ায় ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু শিবমন্দির, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির দেখা যাবে। তাছাড়া গ্রামে দুর্গা, ধর্মরাজ, বড় ঠাকুর, পঞ্চানন ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে ও তাদের আটনাদিও আছে। হিন্দুদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে চৈত্র মাসের শিবের গাজন, শ্রাবণ মাসে মা মনসার পূজা বেশ ধুমধামেই পালিত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের উৎসবাদি যথা নিয়মে পালিত হয়। তাছাড়াও পৌষ সংক্রান্তি ও ১লা মাঘ শহীদ বাহমানী পীরের উরস উৎসব উপলক্ষ্যে বড় মেলা বসে। কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে পুণ্যার্থী মানুষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে এখানে উপস্থিত হয়ে তারা পীরের পুকুরে অবগাহন স্নান সেরে দরগায় সিন্নী ও মানত দিয়ে থাকে। কয়েকদিন ধরে মানুষের মিলন মেলায় গ্রামটি মুখরিত হয়ে থাকে। হুগলীর ফুরফুরা শরীফের পর বাহমানী পীরের মেলায় জমায়েত সব চাইতে বড়।

দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখ করতে হয়—গ্রামের আমবাগান, যা নাকি তৈরী হয়েছিল মালদহ থেকে আঁটি এনে। আর পশ্চিমে আছে তুলাক্ষেত্র, যদিও এখানে তুলার চিহ্ন দেখা যাবে না। একদা এখানে তুলা চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু সফলতা না আসায় তা বন্ধ করে সেখানে নানা সমবায় ক্ষেত্র ও বিদ্যালয় ইত্যাদি তৈরী করা হলেও স্থানটি এখনও তুলাক্ষেত্র নামেই খ্যাত।

গ্রামের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পাড়া গ্রামে একটি পাড়ার নাম খাদিমপাড়া। কোন পীরস্থানে আলোদানকারী ব্যক্তিকে খাদিম বলা হয়। হয়ত সেইরকম কোন খাদিমের বসবাস ছিল এই পাড়ায় তাই পাড়াটি এখনও খাদিমপাড়া নামে খ্যাত। গ্রামে আর একটি পাড়ার নাম দরগাপাড়া। আমরা জানি মুসলমানদের সমাধিক্ষেত্রকেই দরগা বলা হয়। সেই দরগার অবস্থিতির জন্যই সেই পাড়ার নাম দরগাপাড়া হয়েছে। এছাড়াও আছে মল্লিকপাড়া, কায়স্থপাড়া, সদগোপপাড়া ও বাবুপাড়া। বাবুপাড়ায় বহু প্রাচীন সৌধের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। এককালে তাদের খুব বোলবোলা ছিল তাই শুনি -

ইহাদেরই কোন পূর্বপুরুষে গড়েছে চিড়িয়াখানা
গ্রহ-বিগ্রহে মুড়িয়া দিয়েছে সের-সের দিয়া সোনা।
কুকুরের নাকে ঝুলিত নোলক, পুকুরের মাছে নথ
পাল্কীতে ছাড়া চলিত না কেহ একটু খানিও পথ।[১]

(১) যাবে তুমি কোমর গাঁয়ে - আব্দুল কাদের চৌধুরী সুকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত শারদীয় ভেদিয়া বার্তা, ১৩৮১

গ্রামে মুসলমান ছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুর বাস থাকলেও পল্লব গোপ মাত্র একঘর আর বেশ কিছু নিম্ন ও তপশিলী সম্প্রদায়ের বাস।

লোক সংস্কৃতি গ্রামে মনসা পূজা উপলক্ষ্যে মনসার গান, ভাদ্র মাসে ভাদুর গান। পৌষ মাসে তসলা ইত্যাদি লোকগান গাওয়া হয়। তাছাড়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দরদী মরমিয়া সুরে মরছিয়া গান, দরবেশ ও ফকিরী গান এবং মেয়েদের মধ্যে ঢোল বাজিয়ে বিয়ের গান গাওয়ার রেওয়াজ আছে। এছাড়াও আলকাপ, লেটো ইত্যাদি গানের চল এখানে আছে।

শিক্ষা ও সাহিত্য গ্রামে রয়েছে একটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, পোস্ট অফিস এবং লাইব্রেরীও আছে। গ্রামে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনস্ক বহু ব্যক্তির আর্বিভাব পূর্বেও ঘটেছে এবং এখনও সেই ধারা অব্যাহত আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী জননেতা ও কবি মরহুম আব্দুল কাদের চৌধুরী এই গ্রামেই জন্মেছিলেন। এই গ্রামে আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে সুলতান হোসেন শাহের সময়কালেই জন্মেছিলেন এক কবি। কবির নাম আব্দুল আলিম। সেই কবি সুলতান হোসেন শাহের নির্দেশেই 'মৃগাবতী' নামে এক সুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন যার ভূমিকায় কবি উল্লেখ করেছেন ---

সুয়াতা গাঁয়েতে আছে পীর বাহমান
মাজার বাঁধাল রাজা জমি দিল দান।
মৃগাবতীর কথা হেথা শুনেন সুলতান
আদেশ দিলেন মোরে রচিবারে গান।
মহা বিদগ্ধ রাজা অতি সুপণ্ডিত
তার আদেশে রচি গান হরষিত।[১]

এই গ্রামে যে হজরত পীর বাহমানী শাহের মাজার ছিল তিনি তার উল্লেখ করে বলেছেন—

(১) যাবে তুমি মোর গাঁয়ে - আব্দুল কাদের চৌধুরী, সুকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত শারদীয় ভেদিয়া বার্তা -- ১৩৮১.

(২) 'মৃগাবতী' কাব্য -- আব্দুল আলিম নারায়ণ চৌধুরী প্রকাশিত শারদীয়া বর্ধমানে মুহম্মদ আয়ুব হোসেন সম্পাদিত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ফকির জন্মের আগেও মাজারের অস্তিত্ব ছিল। এই তৎকালীন বাংলার অনেক কিছু জানা যায়। যেমন—

গৌড় হতে মান্দারণ ছিল এক পথ
সেই পথ হোসেন শা করে মেরামত।

(১) 'মৃগাবতী' কাব্য শারদীয় বর্ধমান, ১৩৯১ — আব্দুল আলিম নারায়ণ চৌধুরী প্রকাশিত ও মহম্মদ আয়ুব হোসেন কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা - ৬১

সেই পথ যে বাদশাহী সড়ক যা কালুত্তাক বামশোড়ের ভিতর দিয়ে চলে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। পরিশেষে কবির কথাতেই তার কাব্য রচনার সময়কাল ও বংশ পরিচয় প্রদান করে এই গ্রাম সমীক্ষা শেষ করছি -

সুয়াতা মোকাম পীর বাহামান
শা মাহমুদ নাম।
আব্দুর রকিব মোর প্রিয় পিতা
করে নকিবের কাম।
পীরের মাজারে দেয় সাঁঝ বাতি
ডঙ্কা বাজায় আর
হাঁকে সে আজান মিনারে চড়িয়া
দিনে রাতে পাঁচ বার।
সুয়াতা ভালকী মাঝে মসজিদ
সে যে আল্লার ঘর
আবুল মজঃফর আলাউদ্দিন হোসেন
বানালেন সেই ঘর।
বছর ধরিয়া রচি মৃগাবতী
আলিমা শুনিতে মন
হিজরী সনের ন'শ কুড়ি হলো
মৃগাবতী সমাপণ। [১]

সাহায্য নিয়েছি —

১। ড. পঞ্চানন মণ্ডলের 'রাঢ়ভূমির ঐতিহাসিক ভূগোল ও মহাবীরের চারিকা' অবলম্বনে বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'শারদীয় বর্ধমান' ১৩৮৪ সাল।

২। বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি -- যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।

৩। তিনটি উপেক্ষিত শিলালিপি -- আব্দুল হালিম, স্মারক গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির ৩য় বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন ১৩৮৩ সাল।

৪। 'যাবে তুমি মোর গাঁয়ে' আব্দুল কাদের চৌধুরীর কবিতা সুকুমার চক্রবর্তীর শারদীয় ভেদিয়া ১৩৮১ সাল।

□ শারদীয় মুক্তবাংলা, ১৪০৭ □

(১) 'মৃগাবতী' কাব্য শারদীয় 'বর্ধমান' আব্দুল জালিম নারায়ণ চৌধুরী প্রকাশিত ও মহম্মদ আয়ুব হোসেন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা - ৭৮

ইছাই ঘোষের দেউল ও শ্যামারূপার মন্দির

ড. সুজিত বিশ্বাস

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ইছাই ঘোষের শৌর্য বীর্যের তুলনা নেই। এই কাব্যের কবিগণ ইছাই ঘোষের বীরত্বের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর রাজ্যের রাজধানী ছিল 'ঢেকুড় গড়'। এই 'ঢেকুড় গড়' বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর শহরের নিকটবর্তী কাঁকসা থানার অন্তর্গত গড় জঙ্গলে অবস্থিত। গড় জঙ্গলের উত্তরপ্রান্তে অজয় নদের তীরে গৌরাঙ্গপুর বা গৌরাণ্ডি গ্রাম। এখানে কর্ণ সেনের আবাস 'কর্ণগড়' ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই গৌরাঙ্গপুর গ্রামের শেষপ্রান্তে অজয় নদের তীরে ইছাই ঘোষের বিখ্যাত দেউলটি অবস্থিত।

এই সু-উচ্চ বিস্ময় উদ্রেককারী দেউলটি গড় জঙ্গলের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইছাই ঘোষ গোপভূমের সামন্তরাজা। তিনি গৌড়াধিপতি মহীপালের সম-সাময়িক কালের অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর সামন্তরাজা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেউলটির প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ না থাকলেও সঠিক কাল নিরূপণ করা কঠিন। অনেকে মনে করেন দেউলটি একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। (১)কিন্তু ইছাই ঘোষ দেবপালের সামন্তরাজা হওয়ায় মন্দিরটির নির্মাণকাল অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে হতে পারে না। কেউ কেউ আবার মন্দির নির্মাণের কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কথা বলেছেন। (২) মন্দির গাত্রে কোন ফলক না থাকায় মন্দির নির্মাণের কাল নিয়ে এরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মনে করি যে, মন্দিরটি অবশ্যই প্রাচীন, তবে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরের নির্মাণ কৌশল অবশ্যই প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে।

ইছাই ঘোষের দেউলটি রেখ-দেউল রীতির মন্দির। ছোট ছোট পাতলা ইটের তৈরী এই মন্দির বা দেউলের উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুটের মত। মন্দির চত্বরটি প্রশস্ত ও সমতল। দেউলের সম্মুখভাগে দুটি স্তম্ভ আছে। গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে একটি শিবলিঙ্গ মূর্তি থাকলেও এটি যে অর্বাচীন কালের তাতে সন্দেহ নেই। মন্দির বা দেউলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১৫ × ১৫ ফুটের মত। বর্গাকারের এই দেউলটি ক্রমহ্রাসমান হতে হতে গম্বুজাকৃতি চূড়ায় মিশে গেছে। এজন্য কেউ কেউ একে দেউল না বলে বিজয়স্তম্ভ বলতে চেয়েছেন। এটা যে মন্দির তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মন্দিরগাত্রে টেরাকোটার বড় বড় দেব দেবীর মূর্তি ও অলংকরণ শোভা পাচ্ছে। দেউলের সম্মুখভাগে একটি ১৮ ইঞ্চির গণেশের টেরাকোটার মূর্তি এবং তার উপরে একটি পদ্মের টেরাকোটা রয়েছে। এর উপরে টেরাকোটার পার্বতী ও একটি সিংহমুখ বর্তমান। এই মূর্তির দৈর্ঘ্য ও প্রায় ১৫ ইঞ্চির মত। দেউলের পশ্চাৎদিকে সম উচ্চস্থানে রয়েছে সরস্বতী, নারায়ণ ও সিংহমূর্তি। দক্ষিণ ও উত্তরদিকেও টেরাকোটার (দেবীমূর্তি— সম্ভবত এই মূর্তিটি পার্বতী দেবীর) ফুল, সিংহ, সরস্বতী ও পদ্মফুল আছে। এর উপরে রয়েছে একটি সিংহমূর্তি। মন্দিরটির গাত্র ৬টি স্তরে বিভক্ত। এ স্তরগুলি ১ ইঞ্চির মত মন্দির গাত্র থেকে উচ্চ হয়ে মধ্যস্থল থেকে উভয় পার্শ্বে যথাক্রমে ২২″, ৩০″ ও ৩২″ প্রস্থের স্তরগুলি চূড়া পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান অবস্থায় উঠে গেছে। উভয় পার্শ্বের

স্তরের মাঝে ৬০ ইঞ্চির মত মন্দির গাত্র সমতল অবস্থায় উপরের চূড়ায় গিয়ে মিশেছে। চারদিকেই এই স্তরগুলি বর্তমান। মন্দিরের ভিতরে একটি কুলঙ্গী আছে, হয়ত এখানে মন্দিরের প্রাচীন মূর্তিটি তুলে রাখা হত। পরবর্তী কোন একসময়ে মূল্যবান মূর্তিটি চুরি হয়ে গেছে। বর্তমানে শিবলিঙ্গ মূর্তি স্থাপন করে দৈনিক পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ ইছাই ঘোষের উপাসক দেবী ছিলেন ভবানী। তাই বর্তমানের শিবলিঙ্গ এই মন্দিরের প্রাচীন মূর্তি যে নয়, সে কথা সহজেই অনুমেয়। ভবানী দেবী বা দেবীদুর্গার নিমিত্ত যে ইছাই ঘোষ এই দেউল নির্মাণ করিয়েছিলেন তার প্রমাণ ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া এই গড় জঙ্গলে ইছাই ঘোষের শ্যামারূপার মন্দিরও অবস্থিত। ইছাই ঘোষের গৌরাঙ্গপুরের দেউল থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরবর্তী জঙ্গলের মধ্যে গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়; এখানেই শ্যামারূপার মন্দির অবস্থিত । এই মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন ইছাই ঘোষ। এই মন্দির তথা গড়ের দু'পাশে আছে বিষ্ণুপুর ও খেরওয়াড়ি গ্রাম দুটি। দিনাজপুর জেলার তাম্র শাসনে বলা হয়েছে -- চন্দ্রের দ্যুতিকেও ইছাই ঘোষের শৌর্য হার মানায়। তাঁর শৌর্যের তুলনা হয় না।

রামগঞ্জ তাম্র শাসনে বলা হয়েছে -

তস্যা ঈশ্বর ঘোষ এষ তনয়ঃ হে --
ধামা জয়ত্যেকো দুর্ধর সাহসঃ কিম
পরং কান্ত্যা জিতেন্দু দুর্গতঃ
যস্য প্রোর্জ্জিত শৌর্যনির্জিতরিপোঃ—

ইছাই ঘোষ শক্তির উপাসক ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, এই মন্দিরে পূর্বে নরবলি হত। কবি জয়দেবের প্রচেষ্টায় সেই নরবলি বন্ধ হয়। জয়দেব শ্যামার মধ্যে শ্যামরূপ দর্শন করেছিলেন। তিনি ঐ সময় নিকটবর্তী কেঁদুলী থেকে শ্যামারূপার মন্দিরে প্রায়ই আসতেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের কাহিনী সর্বজনবিদিত। সেদিক থেকে শ্যামারূপার লোক কাহিনীর একটি ভিত্তি যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। বীর লাউসেন ছিলেন কর্ণসেনের পুত্র। তিনি রাঢ় বাংলার মেদিনীপুর অঞ্চলের সামন্তরাজা ছিলেন। অজয় নদের তীরে বীরভূম জেলার মধ্যে গড় জঙ্গলের কাছাকাছি লাউসেনতলা নামে একটি ভাঙা গৃহ দেখা যায়। এটা নাকি লোউসেনের রাজবাড়ী ছিল।

তিনি কয়েকবার ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দুঃখে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যান। সেই সময় তিনি ধর্মের দৈববাণী শুনতে পান--ইছাই ঘোষ তাঁর উপাস্য দেবতাকে যেদিন উপেক্ষা করে যুদ্ধে যাবে সেইদিন তার পরাজয় ঘটবে। লাউসেন আত্মহত্যা স্থগিত রেখে ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে এবং শনিবার সপ্তমীর বারবেলা মাতৃআজ্ঞা অমান্য করে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করেন। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে--"শনিবার সপ্তমীর সম্মুখে বারবেলা। আজি রণে যেওনারে ইছাই গোয়ালা।" তারপর অজয় নদের তীরে "কাঁদুনে ডাঙ্গায়" উভয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় এবং ইছাই-এর পরাজয় ঘটে। লাউসেন গড় জঙ্গল অধিকার করেন।

ইছাই ঘোষের পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তাঁর পালিতা কন্যা, কাশীপুর রাজার পুত্রবধূ, শ্যামারূপার বিগ্রহ নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে আসেন। তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে তৎকালীন পুরোহিত মায়ের মূর্তিটি দীপসায়রের জলে নিক্ষেপ করেন এবং একটি নকল মূর্তি তৈরী করিয়ে মন্দিরে রেখে বৃন্দাবন গমন করেন।

অতঃপর ইছাই ঘোষের পালিত কন্যা আসল মূর্তি না পেয়ে, নকল মূর্তিটি নিয়েই ঘোড়ায় চেপে কাশীপুর অভিমুখে চললেন। বরাকরের নিকট নদী পার হওয়ার সময় মূর্তিটি নদীর জলে পড়ে যায়। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই মূর্তি উদ্ধার করা গেল না দেখে তিনি মনোদুঃখে কাশীপুর ফিরে গেলেন। তারপর দেবী স্বপ্নে কাশীপুর রাজবধূকে বলেন- আমি এখানেই আছি--এখানেই কল্যাণেশ্বরী নামে পূজা গ্রহণ করব। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত শ্যামারূপার মন্দিরে পূজা গ্রহণ করব এবং তারপর কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পূজা নেবো।

এই কিংবদন্তীর সত্যাসত্য নির্ণয় করার চেষ্টা নিরর্থক। কারণ, লৌকিক কাহিনীর একটা ভিত্তি অবশ্যই থাকে এবং তার ঐতিহাসিত মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। যদিও এই কাহিনীর ব্যাপকতা ও তৎকালীন ভৌগোলিক পরিবেশের একটা স্পষ্টরূপ এখনও বর্তমান থাকায় কল্পকাহিনী বলে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গড়জঙ্গল বর্ধমান মহারাজার অধিকার-ভুক্ত হয় ইংরেজ আমলে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ইছাই ঘোষের সৈন্য বাহিনীর বীরত্বের বর্ণনা আছে। এই কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আচার্য দীনেশ সেন বলেছেন — "The Dharma Mangal Poems give us a fairly accurate pictures of the Hindu soldiers"

বর্ধমান মহারাজ বিষ্ণুপুর (গড়জঙ্গলের) গ্রামবাসী হরিপদ রায়কে পুরোহিতের দায়িত্ব দিয়ে-মায়ের নিত্য পূজার ব্যবস্থাস্বরূপ জমিদান করেন; তখন থেকেই তাঁর বংশধরগণ 'শ্যামারূপা'র পূজা করে আসছেন।

শ্যামারূপার প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের উপরই আধুনিক দালান মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই মন্দির নির্মাণের ব্যয়ভার 'দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট'-এর পক্ষে এম. ডি. করুণাকেতন সেন গ্রহণ করেছিলেন। এই মন্দিরটি সমতল থেকে প্রায় ৫০ ফুটের মত উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত। এই মন্দিরসংলগ্ন ইছাই ঘোষের গড়ের চিহ্ন বর্তমান। এছাড়া ইছাই ঘোষের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ জঙ্গলের মধ্যে এখনও দেখা যায়। পঙ্খের কারুকার্যবিশিষ্ট ভগ্নাবশেষ দেখে অনুমিত হয় যে, এখানে কারুকার্য বিশিষ্ট অট্টালিকা ছিল এবং যা রাজবাড়ি হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বলে স্বীকার করে নেওয়ার কোন বাধা নেই। বর্তমান লেখকের নিকট একটুকরো কারুকার্যবিশিষ্ট ইট সযত্নে রক্ষিত আছে। চারদিক ঘন জঙ্গলে পরিকীর্ণ হওয়ায় এখানে পৌঁছাতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হয়। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের বর্ণনার সঙ্গে হুবাহু মিল আমাদের বিস্মিত করে --

চৌদিকে পাহাড় বেড়িবাড়ী
দুর্গম গহণ কাটি
করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসতবাটী।

শ্যামারূপার প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, এটা প্রাচীন মন্দির ছিল। মন্দির চত্বরে কয়েকটি বৃক্ষ আছে এবং একটি নবনির্মিত গৃহও আছে। বৃক্ষের শাখায় ও গুড়িতে অজস্র মানত স্বরূপ ঢিল বাঁধা আছে। দেবী শ্যামারূপার পাথরের দশভুজা মূর্তিটি ১২ ইঞ্চির মত উচ্চ। দুর্গামন্ত্রে দেবীর পূজা হয়। বিভিন্ন গ্রাম ও শহর থেকে দেবীর পূজা দিতে অনেকেই এখানে আসেন।

ঐতিহাসিক মন্দিরটি গোপভূমে শ্রেষ্ঠ নরপতি ইছাই ঘোষকে স্মরণীয় করে রেখেছে; সঙ্গে সঙ্গে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য-কাহিনীর বাস্তব ভিত্তিকেও চিহ্নিত করেছে।

তথাপি ঈশ্বরঘোষ বা ইছাইঘোষ সম্পর্কে একটা রহস্য থেকে যায়; বিশেষ করে বংশ পরিচয় নিয়ে। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' আছে :

"সোমের পরমবন্ধু বাঁধে বীরপনা
তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা॥
নাকড়া নিশান দিল লিখি পরওয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা॥
কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুলচাঁদ॥"

সোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষ। কিন্তু রামগঞ্জ তাম্রশাসনে ঈশ্বরঘোষের যে সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় তাতে দেখা যায়; ধূর্ত ঘোষের পুত্র বাল ঘোষ একজন বীরযোদ্ধা। ধবল ঘোষ নামে তার এক পুত্র ছিল। ধবল ঘোষের পুত্র হলেন ঈশ্বর ঘোষ। তাম্রশাসন ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের বংশ পরিচয়ে মিল নেই। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ প্রাচীন রাজকাহিনীকে মঙ্গল কবিরা কুলপঞ্জি মিলিয়ে কাব্যে রূপায়িত করেন নি। বিনয় ঘোষের এই বক্তব্য আমরা অস্বীকার করি কী করে?

বিনয় ঘোষ আরও মনে করেছেন যে, মহীপালের রাজত্বকালে চোল ও কলচুর জাতির আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে; আর সেই সুযোগে হয়ত গোপভূমের বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করে ইছাই ঘোষ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এ থেকেই আমরা ইছাই ঘোষের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই।

সূত্র

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি — বিনয় ঘোষ
ক্ষেত্র সমীক্ষা — সুজিত বিশ্বাস
ধর্মমঙ্গল কাব্য — ঘনরাম চক্রবর্তী

□ 'ঝিল্লি' বর্ষা সংকলন, এপ্রিল-জুন, ২০০০ □

ইছাই ঘোষের দেউল

মন্তেশ্বর কাহিনী

বিশ্বেশ্বর ঘোষাল

কবি মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন—'বঙ্গ ইতিহাস হায়, মণি পূর্ণ খনি।' কিন্তু খনির মধ্যে প্রবেশ করার পথ রুদ্ধপ্রায়। এই মন্তেশ্বর থানারও যে ইতিবৃত্ত, তাহাও সত্যিই মণিতুল্য মূল্যবান। কিন্তু এই মণি আহরণের পথও যেন বন্ধ। মন্তেশ্বর নিবাসী মাননীয় ধরণীধর চৌধুরী মহাশয়ের আনুকূল্যে ও প্রচেষ্টায়, পেলাম সেই বন্ধ দ্বারের চাবিকাঠি। কালস্রোতে ভেসে যায় অনেক কিছুই, কিছু বা নিমজ্জিত হয়ে যায় কালের অতীত গর্ভে। শুনুরী ডুবুরীরাই পারে ঐ সব নিমজ্জমান বহুমূল্য দ্রব্য সম্ভারের কিছু কিছু উদ্ধার করতে। আমরাও সেই ডুবুরীর মতো ডুবছি -- চেষ্টা করছি, হাতে যা পেয়েছি -- তাই তুলে ধরেছি , জানি না এর কতটুকু সত্য বা প্রক্ষিপ্ত।

মোগল যুগ। দিল্লী মসনদে দোর্দণ্ড ও প্রতাপশালী ভারত সম্রাট আকবর। দিকে দিকে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ফিরছে, তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী মোগল বাহিনী, যাদের নেতৃত্ব করছেন আকবরের পরম আত্মীয় রাজপুত বীর মানসিংহ। তিনি এসেছিলেন বাংলার বিদ্রোহ দমন করতে! অদ্ভুতস্বভাব এই বাঙালী জাতটার। এরা জানে না কারু কাছে মাথা নত করতে।

তাই চিরকাল এরা বিদ্রোহ দমন করে এসেছে। 'চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।' সে কারণ, পুনঃ মানসিংহ এলেন বিদ্রোহ দমন করতে, তাঁর বিশাল বাহিনীর কাছে হার মানতে হল বিদ্রোহীদের -- প্রতাপাদিত্য হলেন বন্দী। অতঃপর দিল্লী ফেরার পালা। ফেরার পথে বর্তমান রাইগ্রামের কাছে খড়ি নদীর ধারে সুবিস্তীর্ণ এক ময়দানে শিবির স্থাপন করলেন, মানসিংহের দশ হাজারী মনসবদারের একজন। চলার পথে রণক্লান্ত সৈন্যদের বিশ্রাম ও আনন্দ দেওয়ার জন্যে এটাই ছিল রীতি। আর এই রীতি বজায় রাখতে গিয়ে নিরীহ প্রজাদের গরু, জরু, ধান ও জান লুণ্ঠিত হত।

ঐ মনসবদারের নাম রাও সিংহ। তাঁর অধীনে ছিল ৫০০০ হিন্দু ও ৫০০০ মুসলমান সৈন্য। মানসিংহের নির্দেশে রাও সিংহ ঐ স্থানের জায়গীরদার হয়ে জেঁকে বসলেন। বাংলাকে সুরক্ষিত করার ও ভাবী বিদ্রোহের বীজ বিনষ্ট করার এটাই ছিল একটা প্রকৃষ্ট উপায়। উক্ত রাও সিংহ নিজ নাম অনুসারে রায়গড় নামে একটি গড় খনন করে তার মধ্যে রাজধানী স্থাপন করেন এবং নিজ বসতবাটীর সম্মুখে শ্রীশ্রী গোপাল জিউ ও মাতা সর্বমঙ্গলার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং খনন করেন একটি বিরাট দীঘি। উক্ত রায়গড়ই এখন রাইগ্রাম। এখন ওই গোরাচাঁদ সাহেবের আস্তানার পশ্চিমে, গোপাল জিউর ঢিপি ও বহু ভগ্নস্তূপ পড়ে আছে। আর পূর্বদিকে আছে পূর্বেকার সেই মজা দীঘি। উক্ত রাও সিংহের একমাত্র পুত্রের নাম পূরণ সিংহ এবং কন্যার নাম সুবর্ণবাঈ। রায়গড়ের তিন দিক ছিল নদী বেষ্টিত। তাই রাজধানী সুরক্ষিত করার জন্য রাও সিংহ নিজ কন্যার নাম অনুসারে 'সুবর্ণরেখা খাল' খনন করান। ওই খাল মন্তেশ্বরের দক্ষিণে খড়ি নদী হতে কূলে-যামনার পাশ দিয়ে, রাইগ্রামের পূর্ব সীমা বেষ্টন করেছিল। সেই খালের কিয়দংশ এখনও দেখা যায়। এই খাল পথে যাতায়াত

ও ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। অতঃপর রাওসিংহ তার জায়গীর সুরক্ষিত করার জন্যে বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন দু'হাজারী মনসবদারকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এদের অন্যতম হল মহম্মদ খাঁ।

রায়গড়ের পশ্চিমে জায়গীর পেয়ে মহম্মদ খাঁ নিজ নাম বরাবর মহম্মদপুর (বর্তমান-মামুদপুর) মৌজা প্রতিষ্ঠা করেন। রাওসিংহ তার জায়গীরের উত্তর সীমার শক্তিবৃদ্ধি কল্পে, সোমেশ্বর নামক এক দুর্ধর্ষ গোপকে কিছু জমি জমা দিয়ে, সেখানে বসবাস করান। উক্ত স্থানই সোমেশ্বরপুর বা সোমশপুর।

পূর্বদিকে 'সুবর্ণরেখা খালের' পূর্ব ধারে দু'হাজারী মনসবদার কামালউদ্দিনকে জায়গীর দেওয়া হয়। ওই স্থানের নাম হয় কামালপুর। অদ্যাপি সেই নামই বহাল আছে।
রাওসিংহ আপন জায়গীরের শাসনকার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্যে, স্থানীয় কায়স্থ বংশীয় এক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে তাঁর মন্ত্রণা দিতে নিযুক্ত করেন। তাঁর নাম ব্রহ্মদত্ত বসু। ইনিই কাইগ্রামের প্রখ্যাত বসু পরিবারের আদি পুরুষ। তাঁর নাম হতেই ওই স্থানের নাম হয় ব্রহ্মপুর।

রাও সিংহ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি ঘোষণা করেন তাঁর গোপাল জিউর পুজোর শঙ্খধ্বনি যতদূর যাবে ততদূর গোহত্যা করা চলবে না। তার আমলে স্থানীয় মুসলমানগণ এই নির্দেশ মেনে চলেছিল। তার মৃত্যুর পর পুত্র পূরণ সিংহ জায়গীরদার হন। এই পূরণ সিংহের নাম থেকেই পুরুনীয়া গ্রামের উৎপত্তি।

পূরণ সিংহ একদিন বেড়াতে বেড়াতে মহম্মদপুর এসে দেখেন যে, কয়েকজন মুসলমান প্রকাশ্যে গোহত্যা করেছে। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে সেই গোহত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে আনতে পাইকদের হুকুম দেন। অতঃপর তার আদেশে গোহত্যাকারীদের জীবন্ত "শির গারা" অর্থাৎ উর্ধ্বপদে হেঁট মুণ্ডে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। যে-স্থানে এই নৃশংস ঘটনা ঘটেছিল, সেই স্থানকে 'শির গারার ডাঙ্গা' বলা হত। যার বর্তমান নাম মীরগাহার। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ এলাকার মুসলমানগণ যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হল। কিন্তু আকবর বাদশা জীবিত থাকায় কোন অশান্তির সৃষ্টি হল না।

আকবরের পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলে রায়গড় অঞ্চলের মুসলমানদের পুঞ্জীভূত ক্রোধের আগুন ধূমায়িত হওয়ায়, পূরণ সিংহ তাঁর মন্ত্রী ব্রহ্মদত্তকে দিল্লী পাঠালেন। জাহাঙ্গীর ব্রহ্মদত্তের কাছে সমস্ত শুনে, এই বিরোধিতার নিরসনের জন্যে, পাণ্ডুয়ার এক পীরসাহেবকে রায়গড় পাঠালেন। তিনি সমস্ত ঘটনা জেনে, পূরণ সিংকে অন্তত কোরবানীর দিন কোরবানী করার অনুমতি দিতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু পূরণ সিংহ তাতে স্বীকৃত হলেন না। তখন পীরসাহেব গোপনে মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষের বীজ বপন করে চলে গেলেন।

দূরদর্শী মন্ত্রী ব্রহ্মদত্ত একটা অশুভ ঝড়ের পূর্বাভাষ পেয়ে খুব তৎপরতার সঙ্গে দুই বিগ্রহের সেবাইতদ্বয়কে বিগ্রহসহ স্থানান্তরে পাঠালেন। গোপাল জিউ-এর সেবাইত ব্রহ্মচারীকে কাইগ্রামে এবং দেবী সর্বমঙ্গলার সেবাইত রায় বংশীয় জনৈক সেবাইতকে পাঠালেন খাউতগ্রামে। উভয় সেবাইতই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোপাল জিউ-এর সেবাইত চিরকুমার

ছিলেন। কাইগ্রামে এখনও যে ব্রহ্মচারী বংশের অস্তিত্ব রয়েছে তা গোপাল জিউ-এর 'সেবাইত ব্রহ্মচারী' ভ্রাতৃবংশ। দেবী সর্বমঙ্গলার সেবাইতের বংশধরগণ রাউতগ্রামে আজও বিদ্যমান।

পীরসাহেবের সযত্ন রোপিত বিষবৃক্ষের ফল এবার ফলতে শুরু হল। ব্রহ্মাদত্ত এক বিশেষ মুসলমান গুপ্তচরের মুখে রাজবংশের বিরুদ্ধে এক গোপন চক্রান্তের সংবাদ পান। বৃদ্ধ মন্ত্রী বার্ধক্যের জড়তাকে উপেক্ষা করে রাজবংশকে আসন্ন বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য, চড়লেন এক দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে—ছুটলেন দিল্লীর পথে। বাদশার দরবারে। শাহানশাহ জাহাঙ্গীর ব্রহ্মাদত্তের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে, এই অশান্তির আগুন নির্বাপণের জন্যে, তাঁর পিতৃগুরু (মুর্শিদ) গোরাচাঁদ সাহেবকে রাজসভায় পদার্পণের আহ্বান জানান।

গোরাচাঁদ সাহেব, তসবির জপতে জপতে এসে হাজির হলেন দরবারে। তারপর বললেন, 'যা হবার হয়ে গেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কিছু করার নেই'। ব্রহ্মাদত্ত চমকিত হয়ে গোরাচাঁদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে প্রভু'?

তিনি উত্তর দিলেন, 'রায়গড়ের রাজবংশ নিশ্চিহ্ন।' শুনেই ব্রহ্মাদত্ত মর্মাহিত হলেন। তিনি গালে হাত দিয়ে, নীরব নিথর হয়ে বসে রইলেন। যেন 'কুরুক্ষেত্রের' সেই পুত্র শোকাতুর মহারথী দ্রোণাচার্যের দ্বিতীয় সংস্করণ।

গোরাচাঁদ সাহেব তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন এবং শোক পরিহার করে কর্তব্য কর্মে এগিয়ে যেতে উপদেশ দিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের একান্ত অনুরোধে, হিন্দু-মুসলমানের পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাদত্তের সঙ্গে গোরাচাঁদ সাহেব রায়গড়ের পথে পা বাড়ালেন।

সেদিন ছিল হোলীর দিন। তামাম হিন্দুস্থান লালে লাল। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নেই। বসন্তের অমলিন আকাশের এককোণে কেন যেন একটুকরো সিঁদুর মেঘের আভাস।

হিন্দু সেনারা হোলী খেলায় মত্ত। রাজবাড়ী উৎসবে মুখর। প্রমত্ত রজনী অবসান হতে না হতেই কেঁপে উঠলো রায়গড়ের মাটি। নহবতের প্রভাতী সুরের পরিবর্তে বেজে উঠলো রণ-দামামা।

সুখ শয্যায় শায়িত পূরণ সিংহ চমকে উঠলেন। দূত এসে বিষাদ-মলিন মুখে রাজাকে জানালেন রাজপুরী আক্রান্ত-অস্ত্রাগার শত্রু সৈন্যের করায়ত্ত। কেবলমাত্র রাজপুরীর চারদিকের চার তোরণরক্ষী তাদের তোপের মুখে বিপক্ষ বাহিনীর সহস্রাধিক সৈন্যকে উড়িয়ে দিল। কিন্তু মসলা ছিল সীমিত তাই তারা ও অন্যান্য সৈন্যগণ এই অতর্কিত আক্রমণে, বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও প্রাণ দিল। ভাগ্যবিধাতা রায়গড়ের ইতিহাসের একটি অনুচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটালেন।

মহম্মদ খাঁ তোরণদ্বার অতিক্রম করে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে খাস মহলের দিকে। পূরণ সিংহ সিংহ বিক্রমে এগিয়ে এলেন। লক্ষ্য শত্রুর মাথার দিকে — নিজের মাথার দিকে নাই। এ যে ক্ষত্রিয় জাতির বৈশিষ্ট্য। হাতে তাঁর বর্শা। যেন কালান্তক যম। রুদ্র তেজে না ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু সৈন্যের মাঝে, ভেদ করলেন শত্রুর বক্ষ পঞ্জর। কিন্তু প্রবল

জলোচ্ছ্বাসের মুখে বালির বাঁধ কতক্ষণ? রায়গড়ের শেষ দেউটি নির্বাপিত হল। আর সুবর্ণরেখা? তাঁর শিয়রে রক্ষিত মুক্তাখচিত সোনার হাতল দেওয়া সাধের তরবারিখানি নিয়ে, একবার জন্মভূমিকে প্রণাম জানালো। মুক্ত কেশে দাঁড়ালো মহম্মদ খাঁর পথ অবরোধ করে। খাস মহলের দরজায়। এ-কি! শিউরে উঠলেন মহম্মদ খাঁ। স্তব্ধ হলেন। শিথিল হল তাঁর বজ্র মুষ্ঠি - এই বীরাচারিণীর সংহারিণী মূর্তি দেখে। পলকে মহম্মদ খাঁর বিশাল বক্ষ ভেদ করলো এই রাজবালার তরবারী। কিন্তু সহসা শত্রুপক্ষের গুলির আঘাত, রায়গড়ের মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সুবর্ণ রেখার রক্তাপ্লুত দেহ। যেন ঝরে পড়া একটি রাঙা জবা। বীরাঙ্গনা নারীর রক্তে ধন্য হল রায়গড়ের গড়! ধন্য হোল রায়গড়ের মাটি !!

ব্রহ্মদত্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরে এলেন রায়গড়ে। হতবাক্ হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন রাজ বাড়ীর খাস মহল, নাচমহল, রোশনী মহল সবই ধূলিসাৎ। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, একটা স্নায়বিক অবসাদে। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য, মনে পড়লো গীতার বাণী —

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তো তিষ্ঠ পরন্তপ। উঠে দাঁড়ালেন। হৃদয়ে এল এক জীবন রসের জোয়ার। একবার গড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কী তাজ্জব! গড়ের অনতিদূরে ধূম্রজাল ভেদ করে এগিয়ে আসছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। ইনিই সেই সিদ্ধ পুরুষ গোরাচাঁদ। একজন সর্ব ধর্ম সমদর্শী মহা সাধক। জনশ্রুতি ইনি ব্যাঘ্র, পক্ষী, এমন কি অনড় বৃক্ষ ও প্রস্তর খণ্ডকে বাহন রূপে ব্যবহার করতেন।

এই তাপস অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব-বিস্তার করতে সমর্থ হন। তিনি বোঝালেন যিনি রাম তিনিই রহিম। ভেদজ্ঞান, মানুষের চিত্তবিকার ছাড়া কিছু নয়। তাঁর উপদেশে, উভয় সম্প্রদায়ের মনের মালিন্য দূর হল।

ব্রহ্মদত্ত বসু মহাশয়, গোরাচাঁদ সাহেবকে কিছুকাল রায়গড়ে অবস্থান করার কাতর আবেদন জানান, উদ্দেশ্য—এই মিলন সেতুকে আরও দৃঢ় করা। গোরাচাঁদের সেবার জন্য, মন্ত্রী ব্রহ্মদত্ত স্বর্গীয় রাজা পূরণ সিংহের পক্ষে আমমোক্তাবনামার বলে, ৩৬০ বিঘা জমি দানপত্র করে দেন। তখন স্থানীয় মুসলমানগণ তাঁকে কিছু দান গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু তিনি একটি শর্তসাপেক্ষে দান গ্রহণে রাজী হন। শর্তটি এই, তাঁর রায়গড়ে আর্বিভাবের এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ অঞ্চলের হিন্দু মহিলারা এখানে একটি বার ব্রতের অনুষ্ঠান করবে এবং মুসলমানেরা মাতৃজ্ঞানে ঐ সব মহিলা যাত্রীদের তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

মুসলমানেরা এই বিরাট পুরুষের পদপ্রান্তে বসে শপথ করলে, তাঁর এই দাবী অক্ষরে-অক্ষরে তারা পালন করবে। তখন তিনি (গোরাচাঁদ) তাঁর আস্তানা নির্মাণের ভার মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করেন। অদ্যাবধি (ষোড়শ শতাব্দী হতে) হিন্দু রমণীগণ সেই বার-ব্রতের অনুষ্ঠান করে আসছেন এবং মুসলমান ভাইরাও তাঁদের পূর্ণ মর্যাদা দান করে সেই অতিমানবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চলেছেন।

রাও সিংহের অন্য একজন বিশিষ্ট দু'হাজারী মনসবদার ছিলেন সামন্ত রাও। (বর্তমান মন্তেশ্বর গ্রামের জোফাড়ী পাড়ার রায় বংশের আদি পুরুষ।) ইনি মন্তেশ্বরে খড়ি নদীর

ধারে নিজ বাসস্থান নির্মাণ করে, "মন্তেশ্বর শিবলিঙ্গ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'শিবকুণ্ডু' নামে একটি পুষ্করিণী খনন করান। রায়গড়ের যুদ্ধে দামামা বেজে উঠল, তাঁর বীর হৃদয় স্থির থাকতে পারলো না। তিনি সসৈন্যে যাত্রা করলেন রায়গড়ে। যখন তিনি পৌঁছোলেন, তখন শত্রুসৈন্য বিজয় উল্লাসে প্রত্যাবর্তনের পথে। সামন্ত রাও বীরবিক্রমে শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হলেন রাজবাড়ী হতে কিছু দূরে। তাঁর রণ কৌশলে শত্রু সেনা পশ্চাপসরণ করলো ও অকস্মাৎ বিপক্ষ সৈন্য নতুন ছাঁদে ব্যূহ রচনা করে তাঁকে ত্রিভুজ আকারে ঘিরে ফেল্‌লো। তিনি শ্রান্ত দেহে আর প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেন না। এক সঙ্গে অজস্র তরবারির আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হলেন। সেই যুদ্ধ যাত্রাই হল তাঁর মহাযাত্রা। এইখানেই রায়গড়ের যুদ্ধ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেলে সামন্ত রাও এর সৈন্যগণ তাঁর মৃতদেহটি মন্তেশ্বরে আনেন।

তারপর খড়ী নদীর তীরে সামন্ত রায়ের নশ্বর দেহ দাহ করা হয় এবং তাঁর বিধবা পত্নী সেই চিতায় সহমৃতা হন। অদ্যাবধি সেই ঘাট, 'সতীঘাট' নামে পরিচিত। আজও সেখানে সতীর আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে, কুলবধূরা পুজো দিয়ে থাকেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, সামন্ত রাও তাঁর জায়গীর মন্তেশ্বরে, 'মন্তেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। কালের প্রভাবে জগতের সকল অনিত্য বস্তুরই একদিন অবলুপ্তি ঘটে। তাই 'মন্তেশ্বর শিবলিঙ্গের' ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। শিব মন্দিরটিও অবলুপ্তির পথে। সেই শিবলিঙ্গের নাম অনুসারে, জন্ম হয়েছিল যে মন্তেশ্বর গ্রামের—সে আজ পূর্বনাম ও পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে, অগ্রগতির নিশান হাতে "মন্তেশ্বর" নাম নিয়ে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। সে আজ রূপে অপরূপ গুণে অনন্যা।

□ মন্তেশ্বর ব্লক যুব মেলা, নভেম্বর, ১৯৭৫ 'স্মরণিকা' □

সিজনা, মন্তেশ্বর গ্রামে বিষ্ণুমূর্তি

দক্ষিণ দামোদর গতশতাব্দীর অগ্রগতি এই শতাব্দীর সম্ভাবনা

জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী

বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দিকের একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল "দক্ষিণ দামোদর"। বিভিন্ন দিক থেকে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য অঞ্চলটি জেলা কিংবা রাজ্যের একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে উন্নত ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল দিয়ে ঘেরা থাকা সত্ত্বেও একটি অঞ্চল যে উন্নতির ক্ষেত্রে এতটা পিছিয়ে থাকতে পারে তা "দক্ষিণ দামোদর"কে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী থের্কে অঞ্চলটির গত শতাব্দীর অগ্রগতি এবং আগামী শতকের সম্ভাবনার দিকগুলো সংক্ষেপে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছি। দক্ষিণ দামোদরের গত শতাব্দীর অগ্রগতি ও এই শতাব্দীর সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনাটিকে প্রাথমিকভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে দক্ষিণ দামোদরের সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক পরিচয়। দ্বিতীয় পর্বে দক্ষিণ দামোদরের গত শতাব্দীর অগ্রগতি এবং তৃতীয় পর্বে এই অঞ্চলের বর্তমান সমস্যা, সমাধান ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা।

প্রথম পর্ব- দক্ষিণ দামোদরের সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক রূপরেখা

এই পর্বে দক্ষিণ দামোদরের প্রধান ভৌগোলিক উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করবো। এই অংশে শুধুমাত্র কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যাতে অঞ্চলটি সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরী হয় এবং পরবর্তী পর্বের আলোচনায় এই তথ্যগুলোর সূত্র ব্যবহার করা যায়।

অবস্থান, চতুঃসীমা ও আয়তন

বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দিকে খন্ডঘোষ, রায়না-১ এবং রায়না -২নং ব্লক নিয়ে গঠিত দক্ষিণ দামোদর। (জামালপুর এবং মেমারি ১নং ব্লকের কিছু অংশ ঐ অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত হলেও বর্তমান আলোচনায় পরিসংখ্যান পর্যালোচনার সুবিধার জন্য এই অংশটিকে গ্রহণ করিনি) এই অঞ্চলের উত্তর ও পশ্চিম দিকে সংকীর্ণ অংশে রয়েছে দ্বারকেশ্বর নদ।

১৯১১ সালের লোকগণনার প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আলোচ্য অঞ্চলটির মোট আয়তন ৭৪৪.৯৭ বর্গ কিলোমিটার। এরমধ্যে খন্ডঘোষ ২৫৬.১৩ বর্গকিলোমিটার, রায়না ১নং ব্লক ২৬৬.৪৪ কিলোমিটার এবং রায়না ২নং ব্লক ২২২.৪০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে রয়েছে।

উত্তর-দক্ষিণে অঞ্চলটির সর্বাধিক বিস্তার প্রায় ৩২.৫ কি. মি অন্য দিকে পূর্ব-পশ্চিমে সর্বাধিক বিস্তার প্রায় ৩৭.৫ কি. মি.।

ভূ-প্রকৃতি

সমগ্র অঞ্চলটি এক ঘেয়ে পলি-গঠিত সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত। মূলত দামোদর বাহিত পলি দ্বারা অঞ্চলটি গঠিত হয়েছে। সমুদ্র থেকে উচ্চতার বিচারে অঞ্চলটি কমবেশি ১০থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত। এই অংশে প্রবাহিত নদীগুলোর গতিপথ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে ভূমির ঢাল মূলত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। পূর্ব সীমায় দামোদর অবশ্য সরাসরি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। অঞ্চলটির ভূমির ঢাল সব ক্ষেত্রেই প্রতি কিলোমিটারে ১০ মিটারের কম।

নদ-নদী

দক্ষিণ দামোদরের অর্থনীতি এবং সামাজিক জীবন যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে অঞ্চলের উত্তর এবং পূর্ব সীমা নির্দেশ করে প্রবাহিত হচ্ছে দামোদর। দামোদর নদ বর্ধমান জেলার দক্ষিণ সীমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গলসী ২নং খন্ডঘোষ ব্লকের সীমানা নির্দেশ করে জেলার মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে হঠাৎ দক্ষিণ দিয়ে বাঁক নিয়ে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। এইভাবে প্রায় সমকোণে কনুইয়ের মত বাঁক নেওয়াতে দামোদরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সৃষ্টি হয়েছে একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল-"দক্ষিণ দামোদর"।

অঞ্চলটির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে দ্বারকেশ্বর নদ হুগলী জেলার সাথে অঞ্চলটির সীমানা নির্দেশ করেছে। এছাড়া অঞ্চলটিতে আরও কিছু ছোট ছোট নদী আছে। সেগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে মজে গেছে।

জলবায়ু

অঞ্চলটিতে সমগ্র জেলার মতই "উষ্ণ আদ্র মৌসুমী জলবায়ু" লক্ষ্য করা যায়। অঞ্চলটির বিস্তার খুব বেশী অঞ্চল জুড়ে না হওয়াতে স্থান ভেদে জলবায়ুগত বৈচিত্র্য খুব বেশী লক্ষ্য করা যায় না।

মোটামুটিভাবে এপ্রিল-জুন এই তিন মাস গ্রীষ্মকাল থাকে। গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অবশ্য খুব বেশী হয় না। ৩০° সে. থেকে ৩২° সে.-এর মধ্যেই থাকে। এই সময় বঙ্গোপসাগরে স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণ দামোদরে প্রায়ই বিকেলের দিকে ব্রজ-বিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টি (কালবৈশাখী) হতে দেখা যায়।

জুনের শেষ দিকে মৌসুমী বায়ুর অনুপ্রবেশ ঘটে। অঞ্চলটির বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাতের ৯০ শতাংশই জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে হয়ে থাকে। প্রতিবছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০০ মিলিমিটার থেকে ২০০০ মিলিমিটার এর মধ্যে থাকে।

সমগ্র বর্ধমান জেলার মত দক্ষিণ দামোদরেও শীত স্বল্প স্থায়ী। নভেম্বরের শেষ থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অঞ্চলটিতে শীত থাকে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সাধারণত ডিসেম্বরের শেষে অথবা জানুয়ারীর প্রথমে লক্ষ্য করা যায়। তবে তাপমাত্রা সাধারণত ১১° - ১২° সে.-এর নীচে নামে না। শীতকালে অঞ্চলটিতে সাধারণত বৃষ্টিপাত হয় না।

মাটি

আলোচ্য তিনটি ব্লকের মৃত্তিকার বন্টন নিম্নরূপ

ব্লকের নাম	প্রধান মৃত্তিকা	মোট ভূমির %	অন্যান্য মৃত্তিকা	মোট ভূমির %
খন্ডঘোষ	দোঁয়াশ	৫২	কাদা মিশ্রিত দোঁয়াশ	৪৮
			বালি মিশ্রিত দোঁয়াশ	
রায়না -১	দোঁয়াশ	৫৮	কাদা মিশ্রিত দোঁয়াশ	৪২
			বালি মিশ্রিত দোঁয়াশ কাদা মৃত্তিকা	
রায়না-২	কাদা মিশ্রিত দোঁয়াশ	৫৮	বালি মিশ্রিত দোঁয়াশ কাদা মৃত্তিকা	৪২

ওপরের সারণী থেকে বোঝা যায় সমগ্র অঞ্চলটিতে পলি গঠিত দোঁয়াশ মাটির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মোটামুটিভাবে দামোদর বাহিত পলি দ্বারা অঞ্চলটি গঠিত। এই মাটি বেশ উর্বর এবং জল ধারণ ক্ষমতাও ভাল।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ

এক সময় ঘন জঙ্গলে আবৃত থাকলেও বর্তমানে জনসংখ্যার চাপে কৃষির অত্যন্ত দ্রুত প্রসার বনভূমিকে পুরোপুরি বিনষ্ট করেছে। তবে বনভূমির আকারে গাছপালা না থাকলেও গ্রামগুলোতে বিচ্ছিন্নভাবে বট, অশ্বত্থ, আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর, বাবলা, সুপারী, নারকেল প্রভৃতি গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমানে সামাজিক বন সৃজন প্রকল্পে সরকারী উদ্যোগে রাস্তার ধারে সেচ খাল ও নদীর পাড়ে কৃষি অথবা অন্যান্য কাজে অব্যবহৃত জমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। অঞ্চলটিতে এ ধরণের প্রকল্পগুলো ভালই সাফল্য অর্জন করেছে।

কৃষিকাজ

১৯৯৭-৯৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী অঞ্চলটির মোট ৭৪৪৯৭ হেক্টর জমির মধ্যে ৬৩৭৯০ হেক্টর জমি কৃষিকার্যের অধীন রয়েছে। অর্থাৎ মোট ভূমির ৮৫.৬৩ শতাংশ অংশেই কৃষিকাজ হয়। এই তথ্য থেকেই জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে অঞ্চলটিতে কৃষির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। কৃষিকাজ হওয়া ভূমির মধ্যে আবার ৩৫০০০ হেক্টর জমিতে (৪৬.৯৮%) এক বছরে একাধিক ফসল উৎপাদিত হয়।

অঞ্চলটির প্রধান কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান, আলু, তৈলবীজ, ডাল জাতীয় শস্য, গম প্রধান। আউশ, আমন, বোরো তিন ধরণের ধানের চাষ হলেও সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় আমন ধান। মোট কৃষি জমির ৯৭.৪৩% ভূমিতে আমন ধানের চাষ হয়। মোট কৃষি জমির ৩৫.৬৮% ভূমিতে চাষ হয় বোরো ধানের। মোট চাষের জমির হিসাব ধানের পরেই আলুর স্থান। মোট ৫৫৮০ হেক্টর জমিতে (৮.৭৫%) আলু চাষ হয়।

ডাল জাতীয় শস্যের মধ্যে অঞ্চলটিতে মসুর ও মাসকলাইয়ের চাষ হয়। তৈলবীজের মধ্যে চাষ হয় তিল এবং সরষের। সামান্য কিছু জমিতে গমের চাষও হয়।

জলসেচ

অঞ্চলটির ৪৫৪৬৬.১৭ হেক্টর জমি খরিফ মরসুমে জলসেচের আওতাধীন থাকে। অর্থাৎ এই মরশুমে মোট কৃষি ভূমির ৭১.২৭% অংশ জলসেচ সেবিত।

অঞ্চলটির জলসেচ সেবিত ভূমির বিস্তারিত বিবরণ নীচের পরিসংখ্যানে দেখানো হ'ল। পরিসংখ্যানটি ১৯৯৭-৯৮ সালের।

জলসেচের মাধ্যমে	সংখ্যা	মোট সেচ সেবিত ভূমি (হেক্টর)
সেচখাল	২৯	৪২৪৮২
RLI	১০	৩০১.২৫
DTW	১০৬	২৬৭৬.৯২

শিল্প

দক্ষিণ দামোদরে কোন বড় ধরণের শিল্প গড়ে ওঠেনি। শিল্প বলতে এখানে কিছু ধানকল গড়ে উঠেছে। এইসব কলগুলোতে স্থানীয় ধান কিনে চাল তৈরী করে জেলা, রাজ্য, অন্য রাজ্য কিংবা অন্য দেশের বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়।

অঞ্চলটির যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্তমানে পুরোপুরি সড়ক পথ নির্ভর। অঞ্চলটিকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় দুটি সমান ভাগে ভাগ করে বিস্তৃত রয়েছে ৭নং রাজ্য সড়ক। এই সড়ক পথটি বর্ধমান থেকে আরামবাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলত এই সড়কটি থেকেই বিভিন্ন দিকে অন্যান্য সড়ক পথগুলো বিস্তৃত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে মোগলমারী-তোড়কোনা-আকুই (সংযোগ বোঁয়াইচন্ডী, রায়না-জামালপুর, রায়না-দামিন্যা (ভায়া-গোতান) সংযোগ-আরামবাগ-পহলানপুর সড়ক; একলখী - উচালন, উচালন-কাইতি প্রভৃতি সড়কের বেশিরভাগ অংশ এই অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত। এছাড়া বাঁকুড়া থেকে খন্ডঘোষ হয়ে একটি সড়ক চক পুরোহিত (বাঁকুড়া মোড়) পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। অঞ্চলটিতে মোট ২০৪ কিলোমিটার পাকা রাস্তা এবং ২২টি বাস রুট চালু রয়েছে।

অঞ্চলটির একমাত্র রেলপথ হিসাবে বাঁকুড়া-দামোদর নদ রেলপথ (Bankura - Damodar River Railway - B. D. R) ১৯১৭ সালে চালু হয়। রেলপথটি বাঁকুড়া জেলা থেকে খন্ডঘোষ ব্লকের বোঁয়াইচন্ডীর কাছে অঞ্চলটিতে প্রবেশ করে রায়না পর্যন্ত দক্ষিণ দামোদরের মধ্যে প্রায় ২২ কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে অবশ্য রেলপথটি বন্ধ আছে।

অঞ্চলটির সীমান্তবর্তী অংশে দামোদর নদ কিছু কিছু স্থানে স্থানীয় যোগযোগ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। কিন্তু বছরের বেশীরভাগ সময় দামোদর নদে জল না থাকায় নৌ চলাচল সম্ভব হয় না। বর্ষাকালে অঞ্চলটির ৯টি জায়গাতে নদী পারাপারের জন্য ফেরী চালু থাকে।

১৯৯৭-৯৮ সালের হিসাব অনুসারে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে মোট ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ৬২টি।

জনবসতি

আলোচ্য অঞ্চলটির মোট জনসংখ্যা ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে ৪,১৩,৮০২ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্গ কিলোমিটারে ৫৫৫ জন।

অঞ্চলটিতে মোট ২৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি, ৩১৮ টি মৌজা, ৩০৩ টি বসতি যুক্ত গ্রাম রয়েছে। দক্ষিণ দামোদরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এখানে কোন শহর নেই।

অঞ্চলটিতে মোট ১,৪৮,৯৪৭ জন (মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ) তপসিলী জাতি এবং ১৫,২৮৪ জন (মোট জনসংখ্যার ৩.৬৯ শতাংশ) তপসিলী উপজাতিভুক্ত লোক বসবাস করেন।

দক্ষিণ দামোদরের এই তিনটি ব্লকে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে ৭৯.২৪ শতাংশ হিন্দু ২০.৬৭ শতাংশ মুসলমান এবং বাকি মাত্র ০.০৯শতাংশ মানুষ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

এই অঞ্চলে বসবাসকারী পুরুষদের মধ্যে ৭৪.৯৭ শতাংশ স্বাক্ষর, মহিলাদের মধ্যে ৫৩.৪২ শতাংশ স্বাক্ষর এবং সামগ্রিকভাবে অঞ্চলটির ৬৪.৫৮ শতাংশ মানুষ স্বাক্ষর। এই পরিসংখ্যান ১৯৯১ সালের জনগণনার।

দ্বিতীয় পর্ব দক্ষিণ দামোদর গত শতাব্দীর অগ্রগতি

উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম এলাকা। ১৯১০-এ প্রকাশিত জে.সি.কে পিটারসনের "বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেয়িয়ার - বর্ধমান"এ দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের রায়নাকে একটি বিপদসংকুল জঙ্গলাকীর্ণ ডাকাতদের গ্রাম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানকার মানুষ ছিল ভয়ঙ্কর এবং কলহপ্রিয়। উনবিংশ শতাব্দীর দুর্ধর্ষ ঠগীদের দমন করার পর এই শ্রেণীর মানুষেরা জীবিকা অর্জনের পথ হিসাবে চুরি ডাকাতিকে গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে লোক মুখে প্রচলিত গল্পে ডাকাত দলের সর্দারের একাই একটি আস্ত পাঁঠা ও তিনবোতল মদ একেবারে খেয়ে নেওয়া কিংবা ইংরেজ সিপাহীদের মত ঘোড়ায় চড়তে ওস্তাদ মহিলাদের কথা শুনতে পাওয়া যেত। এই সময় এই অঞ্চলের মেয়েরা বেশ শক্তিশালী ছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ একাই মাত্র কয়েকজন সহচরের সাহায্যে অস্ত্র সজ্জিত জমিদারের বাড়ীতে ডাকাতি করার সাহস দেখাতেন। একজন স্ত্রীলোক ও তাঁর বৃদ্ধ বাবাকে অপমান করার শাস্তি দিতে স্ত্রীলোকটি দশ জন সশস্ত্র লোককে হত্যা করেন এরকম গল্পও শোনা যেত।

দক্ষিণ দামোদরের এই লোক মুখে প্রচলিত গল্পগুলো সবটাই গল্প নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ দামোদরের প্রকৃত অর্থেই ছিল জঙ্গলে ঢাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত, দুর্গম ও ভয়ের জায়গা। অঞ্চলটির এরূপ পশ্চাদবর্তীতার পেছনে কিছু আর্থ-সামাজিক কারণ নিশ্চয়ই ছিল।

দামোদরের দক্ষিণ দিকের অংশ উনবিংশ শতাব্দীতে ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। বর্ধমান শহরের সাথে সরাসরি যোগযোগের পথ ছিল না। বর্ষার সময় ভয়ঙ্কর দামোদর অঞ্চলটিকে প্রায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দিত।

দামোদরের দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত জনবিরল জঙ্গলাকীর্ণ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন অঞ্চলে এখানকার আদিবাসীরা ডাকাতি রাহাজানি লুঠতরাজ করে সহজে আত্মগোপন করার সুযোগ পেত।

পূর্বে ডাকাতি পেশা ছিল এরূপ মানুষের উত্তর-পুরুষেরা অধিকাংশই বর্তমানে কৃষিকে তাঁদের জীবিকা রূপে গ্রহণ করেছেন। তবে এই অঞ্চলের গোতান গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্ন্তভূক্ত কয়েকটি গ্রামে গিয়ে দেখেছি সেই সব গ্রামকে এখনও স্থানীয় মানুষেরা "ডাকাতের গাঁ" বলে অভিহিত করেন। এই সব গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলে দেখেছি তাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষেরা দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন একথা গর্বের সাথে স্বীকার করেন। সরকারী হিসেবে অবশ্য এখন এইসব গ্রামের প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। তবে এখনও আশেপাশে বড় চুরি-ডাকাতি হলে এইসব গ্রামের বিশেষ কিছু লোকজনকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। আর পুলিশের সন্দেহ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক প্রমাণিত হয় সেকথা বলাই বাহুল্য।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাই দক্ষিণ দামোদর একটি অনুন্নত জঙ্গলাকীর্ণও এলাকা। এই দক্ষিণ দামোদর যে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চল এবং এই পশ্চাদবর্তীতার পেছনে রয়েছে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সেকথা অবশ্য তৎকালীন সরকার কর্তৃপক্ষের অজানা ছিল না। অঞ্চলটির যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল ১৯১৭ সালে বাঁকুড়া-রায়না রেলপথ বা B. D. R. এর উদ্বোধন।

২ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া লাইন বিশিষ্ট M/s Mc Leod & Co. Calcutta দ্বারা পরিচালিত বাঁকুড়া দামোদর রেলপথ ১৯১৪ সালে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। তিনটি পর্বে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয় -

ক) বাঁকুড়া থেকে ইন্দাস ৬৮.১৬ কি. মি., ১৯১৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর উদ্বোধন হয়।

খ) ইন্দাস থেকে সেহারাবাজার ১৮.৭৭ কি. মি. ১৯১৭ সালের ১লা এপ্রিল চালু হয়।

গ) সেহারাবাজার থেকে রায়নগর ৯.১৭ কি.মি. ১৯১৭ সালের ৬ই জুন প্রথম রেল চলাচল করে।

এই অঞ্চলের মুষ্টিমেয় কয়েকজন অতি বৃদ্ধ মানুষ যাঁরা শুরুর সময় B. D. R.দেখেছিলেন এবং বেশ কিছু প্রবীণ মানুষ যাঁরা পরবর্তীতে B. D. R.চলাচল করতে দেখেছেন তাঁদের সাথে কথা বলে বুঝেছি যে সেই সময়ে স্থানীয় মানুষ এই রেলপথকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন বাঁকুড়ার সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে অঞ্চলটির সামগ্রিক উন্নতি ঘটবে। মানুষের যাতায়াতের সাথে সাথে উৎপন্ন কৃষিজাত পণ্যের বিক্রী এবং গ্রামের অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে আসার সুবিধা হবে।

বস্তুতপক্ষে বাঁকুড়া দামোদর রেলপথ দক্ষিণ দামোদরের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে প্রকল্পটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। বাঁকুড়া-দামোদর রেলপথ প্রকল্পের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বলা যায়-

ক) একটি অনুন্নত অঞ্চলকে আরেকটি অনুন্নত অঞ্চলের সাথে এই রেলপথটি যুক্ত করেছিল। ফলে কোন অঞ্চলই প্রকৃত লাভবান হয়নি।

খ) ২ ফুট ৬ ইঞ্চির ন্যারো গেজের এই রেলপথের বহন ক্ষমতা ছিল সামান্য।

গ) রেলপথে ট্রেন চলাচল ছিল খুবই কম। সঠিক সময়েও ট্রেন চলত না।

ঘ) ট্রেনের গতি ছিল খুব কম। ট্রেনের হর্ন শুনে বাড়ি থেকে বের হওয়া কিংবা এক স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে কাজকর্ম করে পরের স্টেশনে গিয়ে আবার ঐ ট্রেনই ধরার গল্প এখনও স্থানীয় মানুষের মুখে শোনা যায়।

ঙ) স্থানীয় মানুষের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা, সচেতনতার অভাব এবং রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য অধিকাংশ যাত্রীই ছিলেন বিনা টিকিটের।

কাজেই দেখা যাচ্ছে অনেক স্বপ্ন নিয়ে তৈরী B. D. R. দক্ষিণ দামোদরের মানুষকে প্রত্যাশিত অগ্রগতির ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করতে গিয়ে এখানকার প্রধান অর্থনৈতিক উপজীবিকা কৃষির বিবর্তনের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

বস্তুতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অঞ্চলটির চাষীদের সামগ্রিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্মে চাষীরা ছিল অস্থির। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হলেও তা কৃষকদের প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে পারেনি। কে.সি. এস.হিল. এর তত্ত্বাবধানে ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করা হয় এবং প্রকৃত প্রজা, মধ্যস্বত্বভোগী ও জমিদার-পত্তনিদারের সম্পর্ক নির্ণয় করে খতিয়ান নথীভুক্ত করা হয়। এই সময় জেলার সমস্ত কৃষি ও অ-কৃষি জমি জরিপ করে জমির মালিক এবং স্বত্বাধিকারীর নাম বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৯৩৪ সালের মধ্যে সর্বপ্রথম জমাবন্ধী খতিয়ান প্রস্তুত করে রায়ত ও প্রজাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। একথা স্বীকৃত হয় যে কৃষির প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে গেলে কৃষকের নিজের মালিকানায় জমি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১৯৪০ এ "ফ্লাউড কমিশন" ঘোষণা করে জমিদারি প্রথা ও সমস্ত প্রকার মধ্যস্বত্ব তুলে দেওয়া প্রয়োজন। কৃষক ও প্রজাকে সরাসরি সরকারের অধীনে আনা এবং প্রত্যেকটি চাষী পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে কৃষিযোগ্য ভূমির সর্বোচ্চ সীমা ১০ কের পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া উচিত। এই কমিশনের রিপোর্টে আরও বলা হয় জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত না হলে কৃষি সংস্কার বা কৃষি উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়াতে এই সব সুপারিশ বাস্তবায়িত করা যায়নি।

প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অবস্থায় সামগ্রিকভাবে একটি পিছিয়ে থাকা ভৌগলিক অঞ্চলরূপে দক্ষিণ দামোদর স্বাধীনতা লাভ করে।

এরপর স্বাধীনতা লাভ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পর বাংলা ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ "পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইন ১৯৫৫" কার্যকরী হয়। চারটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে এই আইন প্রণয়ন করা হয়। এগুলো হল -

ক) পারিবারিক ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ।

খ) উত্তরাধিকার সূত্রে বর্গা করার অধিকার দান।

গ) বর্গাদার প্রথা উচ্ছেদ বন্ধ করা।

ঘ) রাজস্বের পুনর্বিন্যাস।

১৯৫৫ সালের "পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের" গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো হল -

ক) জমিদারি অধিগ্রহণ করে ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারি স্বত্ব ও মধ্যস্বত্বের বিলোপ।

খ) মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাস জমি দিয়ে বাকী অংশের মালিককে সরকারি প্রজারূপে ঘোষণা।

গ) প্রতিটি চাষী পরিবারের জন্য কৃষিযোগ্য ভূমির সর্বোচ্চ সীমা ২৫ একর করা। (১৯৭১ - এ এই সর্বোচ্চ সীমা সেচ যুক্ত এলাকায় ১২.৩৬ একর এবং অসেচ যুক্ত এলাকায় ২৪.২২ একর করা হয়)।

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৭৮-এর ৫ই জুলাই রেভিনিউ বোর্ডের আদেশে ''অপারেশন বর্গা'' বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে কাজ শুরু হওয়া। এই সময় থেকে স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ পঞ্চায়েতের সাহায্যে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র অপারেশন বর্গার কাজ জোর কদমে শুরু হয়। এই কাজ এখনও চলছে।

স্বাধীনতা লাভ অঞ্চলের মানুষের মনে খুশীর ছোঁয়া লাগালেও উন্নতির হাওয়া বইতে দিতে পারেনি। নিঃসন্দেহে বলা যায় অঞ্চলটির সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মূলত কৃষির উন্নতি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হওয়া দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ শুরু হওয়া।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা চালু হওয়ার আগে অঞ্চলের কৃষিকাজে জলসেচের ভূমিকা ছিল নগণ্য। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে অবশ্য নিজস্ব পুকুর ছিল এবং এগুলিকে বিশেষ করে আলু এ শাকসব্জী চাষে ব্যবহার করা হত। এছাড়া নদী থেকে সরাসরি খাল কেটে জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এতে একদিকে যেমন বছর বছর নতুন পলি সঞ্চিত হয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেত অন্যদিকে তেমন বন্যার সময় কৃষি জমি প্লাবিত হয়ে বহু ফসল নষ্টও হত।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (D.V.C.) ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের রাজ্য সরকারের মিলিত উদ্যোগে গঠিত হয়। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভয়ঙ্কর অশান্ত দামোদরের প্লাবন এবং ক্ষয়ক্ষতি থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষকে রক্ষা করা। উপত্যকা এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলের ব্যাপক গবেষণা ও পর্যালোচনার পর ১৯৪৮ সালে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালী প্রকল্পের অনুকরণে ভারতে সর্বপ্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা রূপে (D.V.C.) প্রকল্পের জন্ম হয়। মূলত জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বনভূমির প্রসারকে সামনে রেখে প্রকল্পটি গঠন করা হয়।

দক্ষিণ দামোদরের অগ্রগতির পথে ১৯৫৯-৬০ সাল একটি উল্লেখযোগ্য সময়। এই বছর দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচের সুবিধা প্রথম পায় এই অঞ্চলটি। এই ঘটনা অঞ্চলটির কৃষি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৫৯-৬০ সালে দক্ষিণ দামোদরের (D.V.C.)-র সেচ সেবিত অঞ্চলের পরিমাণ ছিল ১৩৭১১ হেক্টর। এই পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ৫৯-৬০ থেকে ৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত এই সাত বছরে অঞ্চলটির (D.V.C.) সেচ সেবিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ১৫ নং সারণীতে দেখানো হয়েছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচের সম্প্রসারণ অঞ্চলটির কৃষিক্ষেত্রে যেসব প্রাথমিক পরিবর্তন ঘটায় সেগুলি হল -

ক) জলসেচ কৃষি ফসলের উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করে। প্রাথমিক পর্বে অবশ্য শুধুমাত্র খরিফ মরসুমেই এই সেচের সুবিধা পৌঁছায়।

খ) বন্যা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

গ) কৃষিজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ঘ) যেসব উচ্চ ফলনশীল শস্য সঠিক সময়ে জলসেচ ছাড়া চাষ করা যায় না সেসব ফসল উৎপাদন করতে চাষীরা আগ্রহী হয়।

দক্ষিণ দামোদরের সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যেসব বাধা বারে বারে এসেছে সেগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অন্যতম প্রধান। বস্তুত দক্ষিণ দামোদরের অনগ্রসরতার পেছনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। "বাংলার হোয়াং হো" দামোদরের বন্যা জেলার অন্যান্য অংশের মত এই অঞ্চলের জীবন যাত্রাকেও যারপরনাই বিপর্যস্ত করেছিল। এছাড়া মৌসুমী বায়ুর গমন - প্রত্যাগমনের অনিশ্চয়তায় বর্ধমান জেলা কয়েক বছর পর পরই অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হয়। এতে ব্যাপক শস্যহানি অঞ্চলের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। গত একশ বছরে বর্ধমান জেলা তথা দক্ষিণ দামোদরের উপরে প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তালিকা বছর সহ উল্লেখ করা হল—

১৯০৪ -	অনাবৃষ্টি	১৯৩৩ -	প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা
১৯০৫ -	দামোদরের বন্যা	১৯৩৪ -	ভূমিকম্প
১৯১৩ -	দামোদরের বন্যা	১৯৩৫ -	অনাবৃষ্টির ফলে খরা
১৯১৪ -	দামোদরের বন্যা	১৯৩৬ -	খরা
১৯১৬ -	দামোদরের বন্যা	১৯৪০ -	খরা
১৯১৭ -	দামোদরের বন্যা	১৯৪২ -	ঘূর্ণিঝড়
১৯১৮ -	প্রথম দিকে খরা এবং শেষের দিকে বন্যা	১৯৪৩ -	দামোদরের বন্যা
১৯১৯ -	দামোদরের বন্যা	১৯৫০ -	টর্নোডো ঝড়ের ফলে খন্ডঘোষ থানার ক্ষতি
১৯২০ -	প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা	১৯৫৬ -	দামোদরের বন্যা
১৯২৮ -	বন্যা	১৯৭৮ -	বন্যা
১৯৩২ -	অনাবৃষ্টি	২০০০ -	প্রবল বন্যা

জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি, ভূমি সংস্কার কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ডি ভি সি প্রকল্প রূপায়ণের ফলে বন্যার প্রাদুর্ভাব কমে যাওয়ায় দক্ষিণ দামোদরের কৃষি ব্যবস্থাকে অনেকটা এগিয়ে দিলেও সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর সাতের দশক পর্যন্ত অঞ্চলটির প্রধান বাধা ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা।

দক্ষিণ দামোদরের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা মূলত ছিল সড়ক পথ নির্ভর। জেলা শহর বর্ধমানের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অভাবে অঞ্চলটি কার্যত একটি দ্বীপের আকারেই অবস্থান করত। দামোদর নদের উপরে গ্রীষ্মের সময় অস্থায়ী "কাঠের পুল" তৈরী করা হত। এই "পুল" বর্ষার শুরু থেকে হয় ভেসে যেত কিংবা অত্যধিক জলস্ফীতির সম্ভাবনায় খুলে রাখা হত। কাজেই মানুষের দুর্দশা পৌঁছে যেত চরমে। জেলার শিল্প সমৃদ্ধ পশ্চিমাঞ্চল এবং রাজ্যের রাজধানী কলকাতার সাথে যোগাযোগ ছিল প্রায় অসম্ভব। স্থানীয় প্রবীণ মানুষের অভিজ্ঞতায় শোনা বর্ধমান শহরে আসা যাওয়ার কথা এখন কাহিনী বলে

মনে হয়। মাত্র ২৬/২৭ কি.মি. দুরে অবস্থিত জায়গা থেকে বর্ধমানে এসে কাজকর্ম করে বাড়ি যেতে সারাদিন লেগে যেত। বর্ষার সময় ভয়ঙ্কর দামোদর মাঝে মাঝে নৌকা পারাপারেও অযোগ্য হয়ে যেত। একদিকে খেয়া নৌকার স্বল্পতা অন্য দিকে যাত্রী সংখ্যার আধিক্য সংকটকে চরমে নিয়ে যেত। শুধুমাত্র দামোদর অতিক্রমেই বর্ষার সময় তিন চার ঘণ্টা সময় লাগত। কাজেই অঞ্চলের মানুষের সার্বিক বিকাশের জন্য বর্ধমান শহরের সাথে সরাসরি যোগাযোগের একটি সেতু অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

দক্ষিণ দামোদরবাসীর দীর্ঘকালীন এই দাবীর সমাধান হয় কৃষক সেতুর উদ্বোধনের ফলে। কৃষি সমৃদ্ধ একটি অঞ্চলে যুক্ত হয়ে যায় জেলার সমৃদ্ধ পশ্চিমাঞ্চল, বর্ধমান শহরের বাজার তথা সারা দেশের সাথে। এই সেতু অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানকে অনেক উন্নত করে দেয়। কৃষক সেতুর উদ্বোধন দক্ষিণ দামোদরের জীবন যাত্রায় যেসব পরিবর্তন নিয়ে আসে সেগুলো হল —

ক) এই অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য বিক্রির উপযুক্ত বাজার পাওয়া গেল।

খ) অঞ্চলের মানুষের সঠিক মুল্যে নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্র লাভ সহজ হল।

গ) কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ সহজে ও সঠিক মুল্যে পাওয়াতে কৃষি উৎপাদনে পদ্ধতি ও উপকরণাদি ব্যবহার বাড়ল, এর সাথে সঙ্গতি রেখে বেড়ে গেল কৃষি ফসলের উৎপাদনও।

ঘ) অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থান সরাসরি সড়ক পথে যুক্ত হয়ে অঞ্চলটির যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বদলে দিল। নতুন চালু হওয়া বাসরুটগুলির মধ্যে বর্ধমান-বাঁকুড়া, বর্ধমান-আরামবাগ, বর্ধমান-পহলানপুর, বর্ধমান-একলক্ষ্মী, বর্ধমান-রায়না, বর্ধমান-কাইতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কাজেই দেখা যাচ্ছে গত একশ বছরে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে জঙ্গলাকীর্ণ অনুন্নত গ্রাম নিয়ে গঠিত দক্ষিণ দামোদরকে আমরা দেখেছিলাম, ২০০০ সালের ডিশ অ্যাণ্টেনা শোভিত উন্নত গ্রামগুলোর সাথে তার কোন মিল নেই। তবে একশ বছর সময়ও বড় কম না, এই সময়ে পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের সামগ্রিক চিত্র পর্যালোচনা করলে এই অগ্রগতিকে বিস্ময়কর বলে মনে হয় না।

অগ্রগতির পথে অগ্রসর হলেও বর্তমানের দক্ষিণ দামোদর স্বাভাবিকভাবেই সমস্যা মুক্ত নয়। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা এই অঞ্চলের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থা কিংবা অন্য কোন কারণের ফলশ্রুতি। আমরা আমাদের আলোচনার পরবর্তী পর্বে দক্ষিণ দামোদরের বর্তমান সমস্যা, এগুলোর সমাধান এবং অঞ্চলটির ভবিষ্যত সম্ভবনার কথা আলোচনা করবো।

তৃতীয় পর্ব - দক্ষিণ দামোদর বর্তমান সমস্যা, সমাধান এবং সম্ভাবনা

দক্ষিণ দামোদরের বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে মূল সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানগুলোকে আমরা কতকগুলো প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করব। এই ক্ষেত্রগুলো হল - কৃষি, শিল্প, জলসেচ, স্বাস্থ্য, পশুপালন ও মৎস্যচাষ, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

কৃষি

যে অঞ্চলের মোট জমির ৮৫ শতাংশেরও বেশি অংশে কৃষিকার্য হয়, যে অঞ্চলে প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষের জীবন জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল সেই অঞ্চলের প্রধান সমস্যাগুলোও যে কৃষিকেন্দ্রিক হবে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দক্ষিণ দামোদরের প্রধান কৃষিজ ফসল ধান। প্রধানত আউশ, আমন, বোরো এই তিন রকম ধানই অঞ্চলটিতে উৎপাদিত হয়। আমন ধান সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জমিতে (৬২১৫০ হেক্টর) চাষ হয়। এই পরিমাণ অঞ্চলের মোট চাষযুক্ত জমির ৯৭.৪৩ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় সব জমিতেই আমন ধানের চাষ হয়। প্রায় ৩৫.৬৮ শতাংশ জমিতে বোরো ধান এবং সামান্য কিছু আউশ ধানের চাষও হয়। তিন প্রকার ধানের উৎপাদন আউশ, আমন এবং বোরোর ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ২৭৩৫ কেজি, ২৮৬৪ কেজি এবং ৪০১১ কেজি।

অঞ্চলটিতে কৃষিকার্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অতিমাত্রায় ধানের চাষ। এর পিছনে প্রধানত তিনটি কারণ আছে—

ক) এই অঞ্চলের মাটি ধান চাষের পক্ষে আদর্শ।

খ) এই অঞ্চলে জলসেচের প্রসার মোটামুটি ভালই ঘটেছে এবং ধান একটি এমন ফসল যা চাষ করতে গেলে সঠিক সময়ে জলের যোগান অবশ্য প্রয়োজনীয়।

গ) বর্ধমান শহর ও আরও পশ্চিমে দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল এবং কলকাতা কেন্দ্রিক বিশাল জনগোষ্ঠীর বিপুল চাহিদা অঞ্চলটির চাষীদের ধান চাষে উৎসাহিত করে।

ভূমি সংস্কার অঞ্চলটির কৃষিকে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। ১৯৯৭-৯৮ সালে অঞ্চলটির মোট বর্গাদারের সংখ্যা ছিল ১৬,৫০৮ জন এবং পাট্টাদারের সংখ্যা ছিল ২৫,২৮২ জন।

দক্ষিণ দামোদরের সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি তাঁদের প্রায় সকলেই ভূমি সংস্কার কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে একথা স্বীকার করেছেন।

ক) বর্গাদারদের অধিকার স্বীকৃত হওয়াতে নিজস্ব জমির বোধ মানুষের মনে তৈরী হয়েছে এবং চাষের ক্ষেত্রে কৃষক অনেক বেশী আন্তরিক হয়েছেন।

খ) ভূমিসংস্কারের পরোক্ষ ফল হিসাবে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে তপসিলী জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভূক্ত মানুষের সামগ্রিক অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। জমিতে ''বেগার খাটানো''র মতো সামাজিক ব্যধি থেকে অঞ্চলটি প্রায় মুক্ত হয়ে গেছে বলা যেতে পারে।

গ) সরকারি জমি যাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে অর্থাৎ পাট্টাদারদের অবস্থান দেখতে গিয়ে দেখেছি এঁদের অধিকাংশই প্রথম প্রজন্মের পাট্টাদার। সামান্য কয়েকজন উত্তরাধিকার সূত্রে পাট্টা লাভ করেছেন।

ঘ) পাট্টাদারদের অধিকাংশ ছিলেন আবার ভূমিহীন। নিঃসন্দেহে পাট্টাপ্রদানের ক্ষেত্রে ভূমিহীনদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ঙ) পাট্টাদার বা বর্গাদারর়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জমি নিজেদের দখলে রেখেছেন এবং তাদের জীবন যাত্রার মানের সামগ্রিক উন্নতি ঘটেছে। উন্নতি ঘটেছে তাঁদের সামাজিক অবস্থানেরও।

অবশ্য কিছু মানুষের কাছে ভূমি সংস্কারের ফলে পরোক্ষভাবে উদ্ভূত কিছু সমস্যার কথাও শুনেছি। যেমন -

ভূমি সংস্কারের ফলে মধ্যবিত্তের জমির পরিমাণ হ্রাস এবং শ্রমিক শ্রেণীর মজুরি বেড়ে যাওয়াতে মধ্যবিত্ত চাষী কৃষি থেকে লাভের মুখ দেখতে পারছে না এবং তারা ধীরে ধীরে কৃষি বিমুখ হয়ে পড়ছে।

এই অভিযোগ পুরোপুরি সত্যি বলে মনে হয় না, কারণ ভূমি সংস্কার মধ্যবিত্তের জমির পরিমাণ সত্যিই কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে এ নিয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও তা কৃষিকে অলাভজনক করে দেওয়ার মত নয়। বর্গাদারদের কাছ থেকেও এই সব চাষীরা ফসলের বেশ কিছু অংশ পেয়ে থাকেন। তবে অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সংখ্যায় কম হলেও বর্গাদারদের মধ্যে সঠিক ভাগ না দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা দিচ্ছে।

অন্যদিকে কৃষি শ্রমিকের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যকে পর্যালোচনা করলে একথা বোঝা যায় গত তিরিশ বছরের শ্রমিকের মূল্য মোটামুটি দ্রুত হারে বেড়েছে। কৃষি শ্রমিকের মূল্য বৃদ্ধির এই ক্রম পর্যবেক্ষণ করতে গেলে দেখা যাচ্ছে ১৯৭০-৭২ সালে এই মূল্য ছিল দৈনিক ৬ থেকে ৭ টাকা। ১৯৮০-৮২ তে তা দাঁড়ায় ২২/২৩ টাকায়, নব্বুইয়ের দশকের প্রথমে তা বেড়ে ৩০/৩২ টাকা হয়, দৈনিক এই মূল্য বর্তমান-এ ৪৪/৪৫ টাকা।

কৃষি শ্রমিকের মূল্য প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পেলেও এই বৃদ্ধি শুধুমাত্র শ্রমিকেরই বৃদ্ধি পেয়েছে তা ঠিক নয়; এই বৃদ্ধি অন্যান্য পেশা এবং সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কৃষিতে মধ্যবিত্ত সমাজের আগ্রহহীনতার কারণ হিসাবে তাই শ্রমিকেরই মূল্য বৃদ্ধিকে দায়ী করা যায় না। গ্রামের উন্নতি বা অগ্রগতি বলতে যদি প্রতিটি মানুষের উন্নতিকে বোঝান হয় তাহলে এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই শ্রমিকের মূল্য বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে গ্রামের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর দৈনন্দির জীবনযাত্রার মানের অনেক উন্নতি হয়েছে একথা তাঁরা নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন।

অনেক মধ্যবিত্ত কৃষকেরা অভিযোগ করেছেন যে শ্রমিকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁদের কাজ করার মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে মনে হয়েছে অভিযোগটি আংশিক অর্থে সত্য। তবে কর্মসংস্কৃতির এই অভাব শুধুমাত্র কৃষি শ্রমিকদের পক্ষেই কার্যকর একথা বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে সব স্তরেই কর্ম সংস্কৃতির অভাব দেখা যাচ্ছে, তার জন্য আলাদা করে কৃষি শ্রমিকদের দায়ী করা যায় না।

তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই চাষের খরচ বেড়েই চলেছে, এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি সামগ্রিক বাজার দর বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়। শস্যের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতির দাম/ভাড়া, গভীর/অগভীর নলকূপ থেকে

প্রাপ্ত জলের জন্য দেয় মূল্য প্রভৃতি প্রতি বছরই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সে তুলনায় কৃষকরা উৎপাদিত শস্যের সঠিক দাম পাচ্ছে না। গত দু'তিন বছর দক্ষিণ দামোদরের চাষীদের একটি অন্যতম সমস্যা প্রধান উৎপাদিত শস্য ধান বিক্রি করতে না পারা। পরপর দু'বছর ধান বিক্রি করতে না পেরে তৃতীয় বছর ধান চাষ বন্ধ করে দিয়েছেন বা কমিয়ে দিয়েছেন এমন উদাহরণ প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দেখেছি।

২০০০ সালের প্রথম দিকে দক্ষিণ দামোদরের চাষীরা বহু কষ্টে ক্রেতা জোগাড় করে প্রতি কুইন্টাল ৩৫০ টাকা দামে ধান বিক্রিতে বাধ্য হন, যেখানে এ রাজ্যের ধানের বাজারে সরকারি সহায়ক মূল্য ছিল ৪৪০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। বর্তমানে অঞ্চলটিতে ধান চাষে বিঘা প্রতি খরচ কম বেশি প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা এবং বিঘা প্রতি ফলন সাত কুইন্টালের মত। এই পরিমাণ ধান বিক্রি করে চাষী পাচ্ছেন দু'হাজার চারশ পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ প্রতি কুইন্টাল ধান বিক্রিতে চাষীর ৫৫০ থেকে ১০৫০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতি হয়েছে। পরবর্তীতে বৈশাখ মাসে নতুন ধান ওঠার পর কুইন্টাল প্রতি ধানের দাম তিনশ টাকাতেও নেমে যায়। অর্থাৎ চাষীরা আরও ক্ষতির সম্মুখীন হন।

স্থানীয় বাজারে ধানের এই অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাস এর প্রধান কারণ এই সময় থাইল্যান্ড-ইন্দোনেশিয়া সহ বেশ কিছু বাইরের দেশ এবং পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ভাল গুণমানের ও কম দামের চাল গোটা বর্ধমানের চালের বাজার দখল করে নেয়।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে ঐসব দেশ বা রাজ্য "পশ্চিমবঙ্গের ধান ভান্ডার" রূপে পরিচিত বর্ধমান জেলার তুলনায় কম দামে কিভাবে ধান উৎপাদন ও বিক্রি করছে। উন্নত মানের বীজের অভাব, কৃষকদের কৃষি-সচেতনতার অভাব, কৃষির খরচ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি এবং ত্রুটিপূর্ণ সরকারি আমদানী রপ্তানী নীতিকে এরজন্য দায়ী করা যায়।

কৃষি ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল রোগ ও পোকার আক্রমণে শস্যহানি। গত বছর দক্ষিণ দামোদরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণে ব্যপক শস্যাহাণি হয়। এই সব রোগ পোকার আক্রমণ দমনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা হল মাঠের সব চাষী আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন না হওয়ায় সকলে কীটনাশক ঔষুধ ব্যবহার করতে পারেন না। ফলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে শস্যকে বাঁচানো যায় না।

ধান ছাড়া দক্ষিণ দামোদরের অন্যান্য কৃষিজ ফসলগুলি হল আলু, গম, সরষে, তিল, মাসকলাই, মসুর প্রভৃতি। মোট কৃষি ভূমির হিসাবে ধানের পর সর্বাধিক পরিমাণ ভূমিতে আলুর চাষ হয়। মোট চাষযোগ্য জমির ৮.৭৫ শতাংশে আলুচাষ হয়। আলু চাষের উপযুক্ত মৃত্তিকা ও ভূমির অবস্থা অঞ্চলটির আরও অনেক অংশে থাকলেও চাষীরা তেমনভাবে আলু চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এর কারণ হিসাবে বলা যায়—

ক) অত্যধিক ফলনের জন্য বিগত কয়েক বছর আলু চাষীরা আলুর কল্পনাতীত কম দাম পেয়েছেন।

খ) দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষনের জন্য আবশ্যক হিম ঘরের (কোল্ড স্টোর) সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে বেশ কম।

গ) আলু যেহেতু চাষীর বাড়িতে বেশি দিন সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব নয় সে কারণ সময়োপযোগী চাহিদার অভাবে বহু আলু চাষীকে গত কয়েক বছর আলু মাটিতে পুঁতে দিতে কিংবা রাস্তার ধারে ফেলে দিতে দেখা গেছে। এর ফলে পরবর্তী বছরগুলোতে আলু চাষে চাষীরা আগ্রহ হারিয়েছেন।

গম ভারতের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য শস্য হলেও এখনও পশ্চিমবঙ্গে খুব একটা জনপ্রিয় নয়। গম চাষের প্রসার অঞ্চলটিতে খুব বেশি দেখা যায় না। তিনটি ব্লকেই সামান্য কিছু পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হয়ে থাকে। মূলত যাঁরা একটু বড় চাষী তাদের পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে গমের চাষ করা হয়। বাণিজ্যিক ভাবে গম চাষ দক্ষিণ দামোদরে জনপ্রিয় নয়। মূলত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে উৎপাদিত গমের তুলনায় এখানকার গমের উৎপাদনে খরচ অন্যান্য বেশি এবং ফলন কম হওয়াই গমের এই জনপ্রিয়তা হারানোর কারণ।

কৃষি সমস্যার সমাধান —

দক্ষিণ দামোদরের কৃষির সমস্যাগুলো দূর করে ভবিষ্যতে অঞ্চলটির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে নিচের ব্যবস্থাগুলো নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়—

ক) ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বাকী কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমাগুলো যত শীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে ফেলা প্রয়োজন।

খ) কৃষিপণ্য সঠিক দামে বিক্রির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে চাষীদের কৃষির প্রতি হারিয়ে যাওয়া আগ্রহ ফিরে আসবে। সরকারি উদ্যোগে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে ফসল কেনা ও সেগুলো বাজারজাত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ) ধানের অতি উৎপাদন দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের কৃষির একটি বিশেষ সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে খাদ্য নিরাপত্তাকে বিপন্ন না করে বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ ও তা বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে। অঞ্চলটিতে গম, তৈলবীজ, ভুট্টা ও আখের চাষ বাড়ানো যেতে পারে।

ঘ) কীটপতঙ্গ বা রোগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। একটি বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের সব জমিতেই যাতে কীটনাশক প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে আর্থিক দিক দিয়ে অনগ্রসর কৃষকদের কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কেননা একটা বিস্তীর্ণ কৃষি জমির সব জায়গাতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে না পারলে প্রকৃত সুফল পাওয়া যায় না।

ঙ) কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। এরজন্য দরকার কৃষকদের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান। অঞ্চলের প্রধান কৃষকদের কাছে শুনেছি অতীতে অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মাঝে মাঝে কৃষকদের চাষের বিভিন্ন নতুন পদ্ধতি ও কলাকৌশল শেখানো হতো। বর্তমানে এ ধরনের কর্মশালাগুলো হতে দেখা যায় না বা কম হয়। এগুলো আরও বেশি সংখ্যায় করলে কৃষকদের কৃষি কাজে অনেক সুবিধা হবে এবং সচেতনতাও বাড়বে।

শিল্প

খনিজ সম্পদের অভাবে বৃহৎ শিল্পের বিকাশ না হলেও প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কৃষিকে

কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্পের বিকাশ যেভাবে অঞ্চলটিতে হওয়া উচিত ছিল সেভাবে হয়নি। স্থানীয় মানুষদের অনেকেই বলেছেন কৃষক সেতু স্থাপনের পূর্বে তাঁরা ভেবেছিলেন দক্ষিণ দামোদরে "কল-কারখানা" স্থাপিত হবে। কিন্তু সেতু স্থাপনের পর দেখা গেল অঞ্চলটিতে শুধুমাত্র 'কল'ই স্থাপিত হয়েছে, কারখানা হয়নি। "কল" বলতে তাঁরা চালের কলগুলোকে বোঝাতে চেয়েছেন। রাস্তার ধারে ছোট, বড়, মাঝারি মাপের চালকল দক্ষিণ দামোদরের একটি অতি স্বাভাবিক দৃশ্য। প্রধান সড়কগুলোর ধারে প্রতি কিলোমিটারে তিন থেকে চারটি চালের কল দেখতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় ধানের উপর ভিত্তি করে এই সব চালকলগুলো গড়ে উঠেছে এবং প্রতি বছরই নতুন নতুন চালকল তৈরী হচ্ছে।

বহু সংখ্যক চালকল তৈরী হওয়াতে স্থানীয়ভাবে কৃষকরা ধানের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছেন এবং তাদের ধান বিক্রির জন্য গ্রামের বাইরে যেতে হচ্ছে না। বহু সংখ্যক শিক্ষিত বেকার তরুণ এই সব চালকল সরকারি ঋণের টাকায় তৈরী করে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করছেন। তবে গত কয়েক বছর ধরে বর্ধমানের বাজারে বাইরের (রাজ্য/দেশ) চাল এসে যাওয়াতে এই সব চালকলগুলোর ব্যবসা বহুলাংশে মার খাচ্ছে। ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে বর্ধমানের চালকল শিল্প প্রায় বিপন্ন হয়। বহু বেকার যুবক যারা প্রায় ৫০/৬০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে "মিনি" চালকল স্থাপন করেন তাঁদের অনেকে ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে চালকল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন।

চালকল শিল্পের পরিকাঠামোকে সুসংগঠিত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুসারে চালকলের সংখ্যা বেশি বা কম হওয়া কোনটাই সঙ্গত নয়। নতুন নতুন চালকল স্থাপনের আগে অঞ্চলটির উৎপাদনের সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে ধানের কথা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। কারণ ধান এখানকার স্বাভাবিক ফসল এবং ধানের উৎপাদন খুব ভাল। ধানের ওপর ভিত্তি করে ধানের খোসা থেকে তেল তৈরী, কিংবা চাল থেকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় তৈরী করার শিল্প গড়ে তোলার কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।

আলু থেকে "চিপস্" তৈরী করে প্যাকেট জাত করার শিল্প বর্তমানে সাফল্য লাভ করতে পারে। বেশ কিছু বহুজাতিক সংস্থা এই ধরনের চিপস্ তৈরী করে বহু টাকার ব্যবসা করছে। এই ধরনের একটি চিপস্ তৈরীর কেন্দ্র দক্ষিণ দামোদরে স্থাপন করা যেতে পারে।

দক্ষিণ দামোদরে ছোটবৈনান, কাইতি-শ্রীরামপুর, দামিন্যা প্রভৃতি গ্রামে প্রাচীনকাল থেকেই কুটীর শিল্পরূপে তাঁতের সাহায্যে কাপড় তৈরী হত। বর্তমানে এই শিল্পের অবস্থা খুব খারাপ। তাঁতিদের সমবায় বা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

জলসেচ

জলসেচ ব্যবস্থা অঞ্চলটির উন্নতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অঞ্চলটির জলসেচ ব্যবস্থায় দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার বিশেষ অবদান আছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত এখানকার খুব সামান্য অংশই ছিল সেচ সেবিত। দামোদর উপত্যকা

পরিকল্পনা অঞ্চলের উন্নতিতে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক অনেক দিনের। গত বছরের (২০০০) বন্যা এই বিতর্কে ইন্ধন যুগিয়েছে।

এ বিষয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছি। প্রায় সকলেই একথা প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছেন যে D V C হওয়াতে সেচের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে D V C-র ভূমিকা নিয়ে অবশ্য সকলে খুশী নন। প্রায় সকলেই এমনকি সম্পূর্ণ নিরক্ষর গ্রামবাসী দেখেছি জানেন যে D V C প্রকল্পের সবটা রূপায়িত হয়নি। বিশেষ করে "নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা" যে রূপায়িত হয়নি সে বিষয়ে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

সেচের ক্ষেত্রে খন্ডঘোষ ব্লকের কিছু অংশ ছাড়া অঞ্চলের আর কোন জায়গাতেই D V C-র জলে বছরে দু'বার চাষ হয় না। বোরো চাষের সময় মূল ও শাখা ক্যানেলগুলো দিয়ে বেশি দূর পর্যন্ত জল আসে না। প্রসঙ্গত বলা যায় অঞ্চলটির উপর দিয়ে বিস্তৃত D V C -র ক্যানেলগুলোর অধিকাংশই নিকাশী খাল, মূল সেচ খাল নয়।

দক্ষিণ দামোদরের গ্রামগুলোতে গভীর ও অগভীর নলকূপ খনন করে বোরো মরসুমে চাষের প্রবণতা বেড়ে গেছে। বেহিসাবী জলের উত্তোলনে একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিচ্ছে। গ্রীষ্মের সময় গ্রামের ভৌম জলস্তর দ্রুত হারে নেমে যাচ্ছে। ফলে অধিকাংশ গ্রামেই গ্রীষ্মকালে প্রবল জলকষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রথম স্তরের প্রায় সব নলকূপই গ্রীষ্মের সময় অকেজো হয়ে যায়। জলস্তরের অবনমন এই হারে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ দামোদরের জলে মারাত্মক ক্ষতিকারক আর্সেনিকের সন্ধান মেলা অসম্ভব নয়।

বোরো চাষে সাধারণ বা নিম্নবিত্ত চাষীদের একটি প্রধান সমস্যা হল জল না পাওয়া। নিজস্ব গভীর অথবা অগভীর নলকূপ না থাকায় প্রচুর অর্থের বিনিময়ে জল কিনতে হয়। বর্তমানে একটি মরসুমে চাষের জন্য দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। শুধু জলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে না পেরে অনেক চাষী গ্রীষ্মকালীন চাষ বন্ধ রাখেন।

প্রাচীনকাল থেকে এই অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া জলাশয় বা পুস্করিণীগুলোর অবস্থা সংস্কারের অভাবে শোচনীয়। এগুলো থেকে বিশেষ করে গ্রীষ্মের বা শীতের সময় স্থানীয়ভাবে চাষাবাদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা হত।

এই অবস্থায় অঞ্চলটির সেচ ব্যবস্থায় সৃষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া যেতে পারে সেগুলো হল—

ক) "নিম্ন দামোদর প্রকল্প" কে যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করা।

খ) D V C-র সেচ খালগুলোকে পুনঃ সংস্কার করা।

গ) সেচখালগুলোতে আসা জলের নিয়ন্ত্রণ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রামে না করে প্রয়োজন অনুসারে বিচার বিবেচনা করে সামগ্রিকভাবে পরিচালনা করা দরকার।

ঘ) অঞ্চলটির প্রায় সত্তর শতাংশ ভূমি সেচের আওতাধীন হলেও বাকী অংশকেও দ্রুত সেচের আওতায় আনা প্রয়োজন।

ঙ) স্থানীয়ভাবে গভীর, অগভীর নলকূপের যথেচ্ছ তৈরী বন্ধ করা প্রয়োজন। সেচের উদ্দেশ্যে তৈরী নতুন নলকূপগুলোর ব্যাপারটিকে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে স্থানীয় পঞ্চায়েতগুলো যথেষ্ট সচেতন আছে এবং তাদের সাধ্যমত চেষ্টা চালাচ্ছে। নতুন সৃষ্ট নলকূপকে বিদ্যুৎ সরবরাহ না দিয়ে পঞ্চায়েত এগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করছে। তবে এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ছাড়া অন্য শক্তির সাহায্যে (যেমন - পেট্রোল, ডিজেল) পাম্প চালানো হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের কের পাম্প চালানো হচ্ছে। বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এই বিষয়ে পঞ্চায়েতকে আরও ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন।

চ) কৃষি জমি এবং গ্রামের আশেপাশে থাকা মজে যাওয়া পুকুরগুলোকে সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য

দক্ষিণ দামোদরের বর্তমান (১৯৯৭-৯৮) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্র এই রকম মোট সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১৬ টি, শর্যা ৯৯ টি, চিকিৎসকের সংখ্যা ১৮ জন, মোট চিকিৎসার সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষ ১,৩৮,৭১৩ জন, অঞ্চলের পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৭৪ টি।

এই পরিসংখ্যান অঞ্চলটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্রকে প্রতিফলিত করে না। বস্তুত পক্ষে সমগ্র অঞ্চলে গত একশো বছরের অগ্রগতির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মনে হয়েছে এই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেই অঞ্চলটি সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে আছে। দক্ষিণ দামোদরের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে যে করুণ অবস্থা দেখেছি তা সরকারি পরিসংখ্যানকে সমর্থন করে না। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং ঔষুধ পত্রেরও। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে অঞ্চলটির প্রায় সবকটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই সুন্দর এবং পর্যাপ্ত ঘর রয়েছে। অবশ্য দীর্ঘদিনের অব্যবহার ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই ঘরগুলির অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপের দিকে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই শোচনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অঞ্চলের প্রায় সব মানুষকেই একটু জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য জেলা শহর বর্ধমানে ছুটতে হয়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে নিযুক্ত চিকিৎসকদের সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের সমস্যাগুলো বোঝার চেষ্টা করেছি। তাঁরা মূলত আধুনিক চিকিৎসা উপকরণের অভাব এবং গ্রামে থাকার অসুবিধার কথা বলেছেন। শহরে শিক্ষিত, আধুনিক উপকরণ সমৃদ্ধ কলেজগুলোতে পড়াশোনা করে তথাকথিত অজ-পাড়া গাঁয়ের পিছিয়ে পড়া জীবনযাত্রার সাথে তাঁরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না।

স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাগুলোর সমাধান ও পরিষেবার উন্নতিতে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেগুলো হল—

ক) স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়ানো।

খ) চলতি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে সঠিকভাবে কার্যকরী করা। এই কাজে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের সহযোগিতা আবশ্যক। চিকিৎসকদের সঙ্গত দাবী অনুসারে তাঁদেরকেও

যেমন আধুনিক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি দিতে হবে তেমনি চিকিৎসকদের সেবা মূলক মানসিকতার পরিচয় দিয়ে কিছু অসুবিধা সহ্য করেই গ্রামে থাকার মানসিকতা বজায় রাখতে হবে।

গ) চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়বদ্ধতাকে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না।

ঘ) আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

পশুপালন

পশুপালনের ক্ষেত্রে অঞ্চলটি সম্ভাবনা পূর্ণ। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতেই রয়েছে গৃহপালিত পশু। কিন্তু এই সব পশুদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হয়। এদের দুধ বা মাংস বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয় না।

দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গোচারণ ক্ষেত্র নষ্ট করে কৃষি জমিতে পরিণত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পশুপালনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

প্রত্যেক গ্রামের গরু, মোষ, ছাগলের দুধ এবং মাংসকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য সমবায়-এর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরীর কথা ভাবা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় গ্রামে পশু খাদ্যের অর্থাৎ খড়, কুঁড়ো প্রভৃতির অভাব নেই। গ্রামে গ্রামে গরুর দুধ সংগ্রহ করে সমবায়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভাবে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা সম্প্রতি শুরু হয়েছে। এই প্রচেষ্টার সাফল্য আংশিক ভাবে সীমাবদ্ধ আছে মূলত সার্বিক ভাবে অংশগ্রহণ না করার জন্য। তবে দক্ষিণ দামোদরের কয়েকটি গ্রামে সমবায়ের মাধ্যমে দুধ সংগ্রহ করে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা বেশ সফল হয়েছে।

গোচারণ ক্ষেত্রকে কৃষি জমিতে পরিণত না করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করে গোচারণ ক্ষেত্র বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবো।

পোলট্রি তৈরী করে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুয়োগ বেশ কিছু গ্রামে কাজে লাগানো হলেও এখনও এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

মৎসচাষ

মৎসচাষে দক্ষিণ দামোদরের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে অঞ্চলটির প্রধানতম সমস্যা হলো গ্রামের পুকুরগুলোর যথাযথ সংস্কার না হওয়া। এর ফলে একদিকে যেমন জলসেচের অসুবিধা হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি মৎস্যচাষও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পুকুর এবং মজে চাওয়া বিল বা খালগুলোর আশু সংস্কার প্রয়োজন।

গ্রামের পুকুরগুলোতে মৎস্যচাষের আরেকটি সমস্যা গ্রাম্য দলাদলি কিংবা ব্যক্তিগত শত্রুতা বশত পুকুরে বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগে মাছ মেরে ফেলা। সামাজিক সচতনতা ও শুভবুদ্ধি ছাড়া এই সমস্যা মেটার নয়।

সংরক্ষণ এবং শহরের বাজারে সঠিক সময়ে উৎপাদিত মাছের সরবরাহ মৎস্যচাষে সাফল্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। এ ব্যাপারেও অঞ্চলটিতে সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার।

শিক্ষা

সমগ্র দক্ষিণ দামোদরে ১৯৯৭-৯৮ সালের হিসাবে মোট ৩৭১ টি প্রাথমিক ২৪ টি জুনিয়ার হাই, ৪০ টি মাধ্যমিক, ১০টি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একটি মহাবিদ্যালয় রয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অঞ্চলটির সমস্যাগুলির মধ্যে ছাত্রের তুলনায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম, ছাত্র শিক্ষক অনুপাতের অসমতা, বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষের অপ্রতুলতা প্রভৃতি সমস্যাগুলো রয়েছে। এই সমস্যা গুলো অবশ্য কম বেশি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই দেখা যায়। তবে অঞ্চলটির প্রায় সব গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা অঞ্চলের যেকোন গ্রাম থেকেই করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অঞ্চলটির প্রধানতম সমস্যা নিঃসন্দেহে উচ্চ শিক্ষা। চার লক্ষ মানুষের বসতিযুক্ত অঞ্চলে একটি মাত্র মহাবিদ্যালয় থাকার পরিসংখ্যানটি সত্যিই বেদনাদায়ক। এই কারণে অঞ্চলটি থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বর্ধমানে যেতে হয়। অবিলম্বে অঞ্চলটিতে আরও অন্তত একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন প্রয়োজন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষিণ দামোদরের আরেকটি দীর্ঘকালীন দাবী অঞ্চলে একটি কারিগরি মহাবিদ্যালয় স্থাপন। বর্তমান যুগে প্রথাগত শিক্ষর তুলনায় প্রায়োগিক শিক্ষার মূল্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেক্ষেত্রে একটি কারিগরি মহাবিদ্যালয় অঞ্চলটির ছাত্র-ছাত্রীদের কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রে অনেকটা অর্থবহ ভূমিকা নিতে পারবে বলে মনে হয়।

সাক্ষরতা কেন্দ্রের সংখ্যা অঞ্চলটিতে ১৭৬ টি। এ প্রসঙ্গে প্রায় সব গ্রামের মানুষই জানিয়েছেন যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে স্বাক্ষরতার কাজ শুরু হয়েছিল এখন তাতে সামান্য হলেও ভাঁটা পড়েছে। এরফলে বেশ কিছু সাক্ষর আবার নিরক্ষরে পরিণত হয়েছেন এরকম উদাহরণ রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে সাক্ষরতার হার কোথায় গিয়ে পৌছেছে তা অবশ্য ২০০১ সালের জনগণনার ফলাফল প্রকাশের আগে জানা সম্ভব নয়। তবে একথাবলা যায় সাক্ষর ব্যক্তিদের পড়াশোনার চর্চার ব্যাপারটি আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে ভাবা দরকার।

বিদ্যুৎ - সংযোগ

দক্ষিণ দামোদরের প্রায় সবকটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌথে গেছে। সরকারী হিসাবে মোট ৩০৩ টি বসতিযুক্ত গ্রামের মধ্যে ২৯৮ টিই বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত। কিছু নতুন গড়ে ওঠা বিচ্ছিন্ন গ্রাম কিংবা তার বারবার চুরি যাওয়াতে কয়েকটি গ্রাম এখনও বিদ্যুৎ বিহীন হয়ে রয়েছে।

বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত হলেও বিদ্যুতের সরবরাহ কোন মানুষকেই প্রায় সন্তুষ্ট করতে পারছে না। সারাদিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকে এমন দিন বোধহয় সারা বছরে একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। সামগ্রিক বিদ্যুতের অভাব ছাড়া এ বিষয়ে স্থানীয় কারণ হিসেবে বহু বে-আইনী বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়াকে দায়ী করা হয়। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন, পঞ্চায়েতকে আরও কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সচেতন হতে হবে গ্রামবাসীদেরও।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

কৃষকসেতু চালু হওয়া এবং অঞ্চলে বাস সড়ক পথগুলোর সম্প্রসারণের ফলে অঞ্চলটির যোগাযোগ ব্যবস্থার গত একশ বছরে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবু যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অঞ্চলটিতে কয়েকটি গুরুতর সমস্যা রয়েছে।

ক) দক্ষিণ দামোদরের যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এই অঞ্চলে এক ইঞ্চিও রেলপথ নেই। মৃতপ্রায় বাঁকুড়া-দামোদর রেলপথ বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কয়েক বছর আগেই। বর্তমানে "ন্যারো গেজ" রেলপথটি "ব্রড গেজ" এ পরিণত করা এবং রেলপথটিকে রায়না থেকে "হাওড়া-বর্ধমান কর্ড" লাইনের চাঁচাই স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব রয়েছে। এ বিষয়ে বাঁকুড়া জেলায় কাজ শুরু হয়েছে এবং দক্ষিণ দামোদর অঞ্চল থেকেও পুরানো রেল লাইন তুলে ফেলা হয়েছে। ২০০১-০২-এর রেল বাজেটে আরেকটি প্রস্তাব অনুসারে দক্ষিণ দামোদরের বোঁয়াইচন্ডী থেকে খানা জংশন পর্যন্ত একটি নতুন রেল পথের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বাঁকুড়া-দামোদর রেলপথে বোঁয়াইচন্ডী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ছিল এবং এখানে এখনও রেলের প্রায় ৮০ বিঘা জমি রয়েছে।

স্বভাবতই এই নতুন দুটি পরিকল্পনাকে ঘিরে অঞ্চলের মানুষের মনে অনেক আশা রয়েছে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলে কৃষি সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটি একদিকে যেমন শিল্প সমৃদ্ধ জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং অন্যদিকে তেমনি বিপুল জনগোষ্ঠীর বাজার সমৃদ্ধ কলকাতার সাথে সরাসরি রেলপথে যুক্ত হয়ে যাবে। এই ঘটনা দুটি অঞ্চলটির সামগ্রিক উন্নতিকে এক লাফে বহুদূর এগিয়ে দিতে পারে। দক্ষিণ দামোদরের চার লক্ষাধিক মানুষ অধীর আগ্রহে এই পরিবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন।

খ) যোগাযোগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ দামোদরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল গ্রামগুলোর অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। গ্রামের ভিতরে রাস্তাগুলির অবস্থা অঞ্চলটিতে খুব একটা ভাল নয়। অধিকাংশ গ্রামে মোরাম রাস্তা থাকলেও সেগুলো সঠিক সময়ে সংস্কার না হওয়াতে বর্ষার সময় চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। পঞ্চায়েতগুলো তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে চেষ্টা করলেও এ কাজে আরও অনেক অর্থের প্রয়োজন।

গ) গোটা দক্ষিণ দামোদরে ১৯৯৭-৯৮ সালের হিসাবে মোট ডাকঘরের সংখ্যা মাত্র ৬২টি। অর্থাৎ অঞ্চলটিতে ৬৬৭৪ জন মানুষ প্রতি একটি করে ডাকঘর রয়েছে। যেসব গ্রাম একটু বিচ্ছিন্ন, মূল সড়ক পথ থেকে দুরে সেগুলোতে ডাক পৌঁছানো কষ্টকর। ডাকঘরের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার।

ঘ) অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে গত কয়েক বছরে সারা দেশের মত এই অঞ্চলের টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে। গ্রামের আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ মানুষের কাছে টেলিফোন ধীরে ধীরে একটি নিত্য ব্যবহার্য উপকরণের স্থান গ্রহণ করছে।

ব্যাঙ্ক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান

১৯৯৭-৯৮ সালে দক্ষিণ দামোদরে মোট ২৫টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ৭টি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছিল।

অঞ্চলটিতে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৯৩টি, সদস্য সংখ্যা ৫২,০৫০ জন এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগ কৃত মূলধনের পরিমাণ ৭৭,২৮,০০০ টাকা।

এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পর যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে উঠে আসে সেগুলো হল—

ক) ব্যাঙ্ক ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো অঞ্চলটির উন্নতির ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য যথেষ্ট নয়।

খ) গ্রামবাসীদের সকলকে এখনও সব দিক থেকে সমবায় বা ব্যাঙ্কের সুবিধা সম্বন্ধে সচেতন করা যায় নি।

গ) ব্যাঙ্ক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার পর সঠিক সময়ে টাকা ফেরৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই গ্রামের মানুষের অবহেলার মানসিকতা রয়েছে। গ্রামের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে দেখেছি ব্যাঙ্ক কর্মীদের অধিকাংশ সময় দেয় ঋণের টাকা ফেরৎ পাওয়ার জন্য গ্রামের মানুষকে তাড়া দিতেই চলে যায়। এতে একদিকে যেমন ব্যাঙ্কের পরিকাঠানো দুর্বল হয়ে যায় অন্য দিকে তেমনি পরবর্তী পর্যায়ে ঋণ পাওয়ার সুযোগ কমে যায়। এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা দরকার।

ঘ) সামগ্রিকভাবে দেশব্যাপী ব্যাঙ্কের পরিকাঠামো দুর্বল হওয়া এবং ব্যাঙ্ক ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুদের হার কমে যাওয়ার কিছু বিরূপ প্রভাব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যান্য

অঞ্চলটিতে হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত কমবেশি ৮০ : ২০ হলেও সাম্প্রতিক কালে কখনও সাম্প্রদায়িকতার মত গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। বাবরি মসজিদ ভাঙার মত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতেও অঞ্চলটি মোটামুটি শান্তই ছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরস্পরের মধ্যে মত বিরোধ থাকলেও তা খুব বড় আকার ধারন করেনি। অঞ্চলটিতে ঘুরে মনে হয়েছে এখানকার মানুষ যিনি যে রাজনৈতিক মতাদর্শেই বিশ্বাসী হন না কেন সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্নে মোটামুটি একমত।

পরিশেষে দক্ষিণ দামোদরের গত শতাব্দীর অগ্রগতির ধারা পর্যালোচনা এবং বর্তমান সমস্যাগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার পর আমরা একথা বলতে পারি বিংশ শতাব্দীর প্রথমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর তুলনায় দক্ষিণ দামোদর যতটা পিছিয়ে ছিল এক বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ততটা পিছিয়ে নেই। তবে একথা অনস্বীকার্য উন্নতির সবকটি ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় অঞ্চলটি বেশ পিছিয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে দক্ষিণ দামোদর অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে পরিবেষ্টিত একটি সম্ভাবনাপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল রূপে পরিগণিত হতো। নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভেও কিন্তু অঞ্চলটির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। অগ্রগতির সব ক্ষেত্রগুলোতে যথাযথভাবে উন্নতি ঘটলে অঞ্চলটির অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেকদুর এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পরিশিষ্ঠ

প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান

সারণী - ১ (পরিসংখ্যান ১৯৯১-এর)

ব্লক	আয়তন বর্গ কি.মি.	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি)	পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা	গ্রাম পঞ্চায়েত	বসতিযুক্ত গ্রাম	শহর
রায়না - ১	২৬৬.৪৪	১৪৩২৮২	৫৩৮	১	৮	১১১	-
রায়না - ২	২২২.৪০	১২২৪৬৮	৫৫১	১	৮	১৮৬	-
খন্ডঘোষ	২৫৬.১৩	১৪৮০৫২	৫৭৮	১	১০	১০৬	-

সারণী - ২ (পরিসংখ্যান ১৯৯১-এর) জনসংখ্যার বণ্টন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা

ব্লক	হিন্দু ধর্মাবলম্বী	মুসলমান	খ্রিস্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য
রায়না - ১	২২৬৬৬৯	৩৮৭৭০	২	-	৩০৯
রায়না - ২					
খন্ডঘোষ	১০১২৪১	৪৬৭৭২	১৮	৪	১৭

সারণী - ৩ (পরিসংখ্যান ১৯৯১-এর) তপসিলী জাতি ও উপজাতি ভুক্ত মানুষের সংখ্যা

	তপশিলী জাতি			তপসিলী উপজাতি		
ব্লক	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
রায়না - ১	২৪২৩৬	২৩১৭৯	৪৭৪১৫	৩৫৮৮	৩৫০৩	৭০৯১
রায়না - ২	২৪০৫০	২২৭৮৬	৪৬৮৩৬	২৩৬৭	২২৯২	৪৬৫৯
খন্ডঘোষ	২৮০৪৯	২৬৬৪৭	৫৪৬৯৬	১৮০০	১৭৩৪	৩৫৩৪

সারণী - ৪ (পরিসংখ্যান ১৯৯৭-৯৮ এর) বর্গাদার ও পাট্টাদারদের সংখ্যা

ব্লক	বর্গাদার	পাট্টাদার
রায়না - ১	৪৮৩৪	৭১৩৬
রায়না - ২	৪১৫৬	৮১৭৮
খন্ডঘোষ	৭৫১৮	৯৯৬৮

সারণী - ৫ (পরিসংখ্যান ১৯৯১-এর) সাক্ষর মানুষের শতকরা হিসাবে

ব্লক	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
রায়না - ১	৭৮.৫৭	৫৮.৪৮	৬৮.৮৭
রায়না - ২	৭৬.৯৭	৫৪.৬০	৬৬.১৯
খন্ডঘোষ	৬৯.৩৮	৪৭.২০	৫৮.৬৮

সারণী - ৬ (পরিসংখ্যান ১৯৯৭-৯৮ এর) জমির বণ্টন (হেক্টরে)

ব্লক	কৃষি ভূমি	গোচারণ ভূমি ও ফলের বাগান	চাষযোগ্য পতিত জমি	খাসজমি	একের বেশি ফসল জন্মায় এরূপ জমি
রায়না - ১	২৪৫২০	১২০	২১০	১৩১৫	১২২০০
রায়না - ২	১৮০০০	১২০	১৩০	১৪০৮	১০৫০০
খন্ডঘোষ	২১২৭০	২৫০	২০	১৮৩৭	১২৩০০

সারণী - ৭ (পরিসংখ্যান ১৯৯৭-৯৮ এর)
দক্ষিণ দামোদরের প্রধান কৃষিজ ফসল, কৃষি ভূমির পরিমাণ ও উৎপাদন

ফসল	কৃষিভূমি (হেক্টর)	উৎপাদন (টন)	উৎপাদন হার - কেজি/হেক্টর
আউশ	৯০	২২০	২৭৩৫
আমন	৬২১৫০	১৭২৫৭০	২৮৬৪
বোরো	২২৭৬০	৮৭৪৮০	৪০১১
গম	১৪০	২৬০	১৮২৩
আলু	৫৫৮০	১২৬২২০	২২৫১০
সরষে	২৮২০	১৮৬০	৬৪৭
তিল	১৫০	৯০০	৪৮৯
মসুর	৩০	১০	২৭৭
মাসকলাই	১৪৪০	১০২০	৭০৭

সারণী - ৮ (পরিসংখ্যান ১৯৯৭-৯৮ এর)
দক্ষিণ দামোদরের মৎস্য - চাষ কয়েকটি প্রাথমিক পরিসংখ্যান

কার্যকরী মৎস্যচাষে নিয়োজিত মোট ভূমি (হেক্টর)	২০১২
মৎস্য চাষে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা	২২৭০
আনুমানিক বাৎসরিক উৎপাদন (কুইন্টাল)	৫১৩২০

সারণী - ৯ (পরিসংখ্যান ১৯৯৭-৯৮ এর)
দক্ষিণ দামোদরের স্বাস্থ্য পরিষেবা

ব্লক	চিকিৎসা কেন্দ্র			শয্যা সংখ্যা	চিকিৎসদের সংখ্যা	রোগী সংখ্যা		
	স্বাস্থ্যকেন্দ্র	ডিসপেনসারী	মোট			অর্ন্তবিভাগ	বর্হিবিভাগ	মোট
রায়না - ১	৪	১	৫	৩১	৬	৩২৮২	৩২১৪১	৩৫৪২৩
রায়না - ২	৬	-	৬	৩৯	৬	২৮৬৩	৫৮৭০৭	৬১৫৭০
খন্ডঘোষ	৩	২	৫	২৯	৬	১৬৯৭	৪০০২৩	৪১৭২০

সারণী - ১০ (পরিসংখ্যান ১৯৯৭-৯৮ এর)
দক্ষিণ দামোদরের প্রাণী সম্পদ

ব্লক	পশুর সংখ্যা				পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	পশু চিকিৎসক
	গরু	মোষ	ছাগল	হাঁস/মুরগী		
খন্ডঘোষ	৭৩৪৮৬	৩৩৯৬	৪২৭১৭	১৫৩৭৯১	২	২০
রায়না-১	৬৭৭২৬	৪৭৪৭	২৯৬৭৭	১১৯০৪৭	৩	২৩
রায়না-২	৬৫০৭৪	৩৫১৫	৪১১২৪	১৪৮৫১৫	২	১৮

সারণী - ১১ (পরিসংখ্যান ১৯৯৭-৯৮ এর)
দক্ষিণ দামোদরের ব্যাঙ্ক পরিষেবা

ব্লক	বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (সংখ্যা)	গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (সংখ্যা)
খন্ডঘোষ	১০	৩
রায়না - ১	৮	১
রায়না - ২	৭	৩

সারণী - ১২ (পরিসংখ্যান ১৯৯৭-৯৮ এর)
দক্ষিণ দামোদরের সমবায় পরিষেবা

ব্লক	সমবায় প্রতিষ্ঠানের (সংখ্যা)	সদস্য (সংখ্যা)	বিনিয়োগকৃত মূলধন (০০০ টাকায়)
খন্ডঘোষ	৬৩	১৭০৫০	২০১২
রায়না - ১	৭৫	১৩২০০	৪৮০১
রায়না - ২	৫৫	২১৮০০	৯১৫

সারণী - ১৩ (পরিসংখ্যান ১৯৯৭-৯৮ এর)
দক্ষিণ দামোদরের শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

ব্লক	প্রাথমিক বিদ্যালয়			জুনিয়ার হাইস্কুল			মাধ্যমিক বিদ্যালয়			উচ্চমাধ্যমিক			মহাবিদ্যালয়			সাক্ষরতা কেন্দ্র		
	সংখ্যা	ছাত্র	শিক্ষক	সংখ্যা	ছাত্র	শিক্ষক	সংখ্যা	ছাত্র	শিক্ষক	সংখ্যা	ছাত্র	শিক্ষক	সংখ্যা	ছাত্র	শিক্ষক	সংখ্যা	ছাত্র	শিক্ষক
খন্ডঘোষ	১৩৭	১৮০৩৬	৩৮৪	৬	১১৮৬	৩৬	১৫	৮১৩৬	১৮১	২	১১০৮	৩৮	-	-	-	৫৮	-	১১৬
রায়না-১	১২৪	১৬৬৫৯	৩৯১	৫	১৪২৭	৩০	১৫	৯৬২৩	২২৬	৩	৩৬২৬	৯২	১	২২১১	৪১	৬১	-	১২২
রায়না-২	১১০	১৪৮৩০	৩৫৮	১৩	৩৩৭৮	১০৩	১০	৫৭২৭	১৩৩	৫	৪০৪৪	১১৪	-	-	-	৫৭	-	১১৪

সারণী - ১৪ (পরিসংখ্যান ১৯৯৭-৯৮ এর)
দক্ষিণ দামোদরের সড়ক পথের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)

ব্লক	PWD-র তত্ত্বাবধানে		স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে	
	কাঁচা	পাকা	কাঁচা	পাকা
খন্ডঘোষ	-	৬৫	৬২	২৩
রায়না-১	৩	৪৯	৫৬	২০
রায়না-২	-	৪৩	৩৩	৪

সারণী - ১৫
(পরিসংখ্যান ১৯৫৯-৬০ — ১৯৬৫-৬৬ এর)দক্ষিণ দামোদরের DVC দ্বারা সেচসেবিত ভূমির পরিমাণ

সাল	সেচ সেবিত জমি (হেক্টর)
১৯৫৯ - ৬০	১৩,৭১১
১৯৬০ - ৬১	৯,৭০৯
১৯৬১ - ৬২	২৮,৫৯১
১৯৬২ - ৬৩	৩১,২৪১
১৯৬৩ - ৬৪	৩২,৪৫৯
১৯৬৪ - ৬৫	৩৫,৬৯৯
১৯৬৫ - ৬৬	৩৫,৩৭১

তথ্য সহায়তা

১. পশ্চিমবঙ্গ ঃ বর্ধমান জেলা সংখ্যা - ১৪০৩ বঙ্গাব্দ - প. ব. সরকার।

২. বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম, ২য়, ৩য় খন্ড) - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৯৫।

৩. বর্ধমান পরিক্রমা ঃ সুধীরচন্দ্র দাঁ, বুক সিন্ডিকেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯২

৪. বর্ধিষ্ণু বর্ধমান ঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৮

৫. District Statistical Hand Book - Burdwan - 1998, Breau of Applied Economics an Statistics. Government of West Bengal.

৫. Bengal District Gazetteers - Burdwan. J.C.K. Peterson. 1910

৫. West Bengal District Gazetteers. Barddhaman, 1994, Ed. by S. B. choudhuri

৭. বর্ধমান সমগ্র : সম্পাদনা - ড. গোপীকান্ত কোঙার, দে বুক স্টোর, কোলকাতা ২০০০

ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা

সর্বশ্রী জয়দেব ভট্টাচার্য (পলাশন), অমলেন্দু হাজরা (উচালন), জগৎ কুমার দাস (কামারহাটি), সুশান্ত কুমার নন্দী (বুলচন্দ্রপুর), প্রাণবল্লভ বারিক (খাঁহার), দেবকুমার ঘোষ (কামারহাটি), দেবনারায়ণ ভট্টাচার্য (রায়না) , তোজামুল হক (ওঁয়াড়ি), শ্যামাপদ রায় (বোয়াইচন্ডী), নির্মলকুমার হাজরা (পলাশন), গৌরীপ্রসন্ন রায় (রামবাটী), কানাইলাল কোঙার (বাঁশা)।

□ অভিযান সাময়িকী, বর্ষ - ২৩, সংখ্যা - ২, (জুন, জুলাই, ২০০১) □
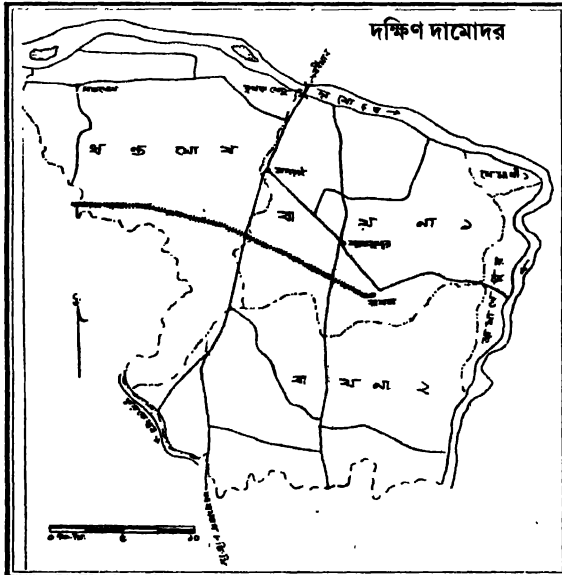
বর্ধমান জেলায় নিম্ন দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের ইতিহাসচর্চা ও পুরাবৃত্ত প্রসঙ্গে

ড. গোপীকান্ত কোঙার

পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতাই জন্ম নিয়েছে নদীতীরে। নদীতীরেই শুরু হয়েছে কৃষিকাজ, গড়ে উঠেছে বাণিজ্যকেন্দ্র, শিল্পনগরী। বর্ধমান জেলার ভাগীরথীর তীরে কালনা, কাটোয়া, নাদনঘাট, দাঁইহাট প্রভৃতি এবং দামোদরের তীরে বর্ধমান, পানাগড়, দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বরাকর প্রভৃতি এবং দামোদরের তীরে বর্ধমান, পানাগড়, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, আসানসোল, বরাকর প্রভৃতি কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ নগরগুলি তারই প্রমাণ দেয়। অতি প্রাচীন নদ দামোদর বিহারের পালামৌ জেলায় জন্ম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বরাকরে প্রবেশ করেছে বর্ধমান জেলায়। এখান থেকে বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া পরিক্রমা করে ভাগীরথী নদীতে মিশেছে। দামোদরের নিম্নভাগ রাঢ় অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশে প্রবাহিত হয়ে রাঢ়ের মধ্যমণি বর্ধমান জেলার এক বৃহদংশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। এই দামোদর নদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল কিরাত, নিষাদ, বোড়ো, ডোম, দ্রাবিড়, মুণ্ডা, অস্ট্রিক প্রভৃতি আদিম জনজাতির সভ্যতা। এ অঞ্চলের ইতিহাস দামোদর নদের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

পাঁচশত একচল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ দামোদর সভ্যতার সামগ্রিক আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র বর্ধমান জেলার নিম্ন দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম বা স্থানের ইতিহাস বা পুরাবৃত্তের ইঙ্গিত আঞ্চলিকভাবে দেওয়া যেতে পারে। বর্ধমান জেলায় দামোদর পশ্চিম থেকে পূর্বমুখী হলেও শহর থেকে প্রায় ২৪-২৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে চাঁচাই গ্রামের কাছে প্রায় সমকোণে বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এতে বর্ধমান জেলার অনেক বেশি অংশকে দামোদর ঘিরে রেখেছে। অবশ্য দক্ষিণ দিকে বাঁক নেওয়ার পূর্বে দামোদরের প্রাচীন প্রবাহ ছিল মেমারি বা কুলীনগ্রামের পাশ দিয়ে ত্রিবেণীর দিকে ভাগীরথী নদীতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস পেতে হলে আঞ্চলিক ইতিহাসকে খুঁজে বের করতেই হবে। বাংলার ইতিহাস রচনায় বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করতে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষায় আহ্বান জানিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য : "বাংলার ইতিহাস চাই নইলে বাংলার ভরসা নেই। কে লিখবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে, যে বাঙালি তাহাকেই লিখিতে হইবে। আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান করি।" গ্রামীণ বা আঞ্চলিক ইতিহাস বা সমাজ ও ধর্মতন্ত্রমূলক ইতিহাস, সংস্কার ও কুসংস্কারের ইতিহাস চর্চা আমাদের খুব প্রাচীন নয়। সুখের বিষয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বা খ্যাতনামা ব্যক্তিদের দ্বারা এধরনের ইতিহাস চর্চা শুরু হলেও বর্তমানকালে গ্রাম-শহরে বহু নামী-অনামী ব্যক্তি আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অঞ্চলপ্রীতি, অতিরঞ্জন বা পারিবারিক গৌরবের কথা থাকলেও ক্ষেত্রানুসন্ধান ও লোকশ্রুতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে

সমসাময়িক ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি তথ্য, যেগুলি বাংলার ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের অধ্যাত্মভাবনা ও ধর্মানুষ্ঠান, লোকাচার, বিশ্বাস, লোক-সাহিত্য, প্রবাদ প্রভৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকে পরম্পরাবাহী ধারার জের। মানুষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির লক্ষণগুলি প্রতিফলিত হয় উক্ত উপাদানগুলির মধ্যে। আবার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় পরিবর্তন, সংমিশ্রণ, বিশেষীকরণ প্রভৃতির ফলে আজ কোনও একটি জাতি বা এলাকার মানুষের সভ্যতাকে সীমানা-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আলোচনায় অসুবিধা থাকলেও এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। আদিম মানুষ শিকার, পশুচারণ, কৃষি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই প্রাথমিক অজ্ঞতা, ভীতি, কুসংস্কার, আত্মরক্ষার তাগিদ প্রভৃতি থেকে দেবতার কল্পনা করেছিল এবং সুপ্রাচীনকাল থেকে ধর্মপ্রাণ বাঙালির সমাজ, শিক্ষা, শিল্পকলা, সাহিত্য, আনন্দ-উৎসব ইত্যাদি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে অনেকাংশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। তাই ড. সুধীর করণ উল্লেখ করেছেন লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও প্রকারভেদ নিরূপণ করা প্রায় সাধ্যাতীত। কিন্তু এ-ধরনের সমস্যা থাকলেও আগেই উল্লিখিত হয়েছে কেবলমাত্র আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধানই দিতে পারে বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস। এটিকে মনে রেখে রাঢ় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা নিম্ন দক্ষিণ দামোদর তীরবর্তী অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম বা স্থানের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রায়না

বর্ধমান থেকে বাসে সরাসরি রায়না যাওয়া যায়। এটি একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখানে ছড়িয়ে রয়েছে। ১৫ ফাল্গুন শ্মশানকালীর বাৎসরিক পূজা ও মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া যোগাদ্যা, শ্রীধর, শিব প্রভৃতি দেব-দেবীর স্থান বা মন্দির রয়েছে। এখানকার মন্দিরের টেরাকোটার কাজ বেশ উচ্চমানের। তাছাড়া 'শীতলরায়' ধর্মঠাকুর রয়েছেন। দলপত রায় ও রাজপত রায়-এর নামকে কেন্দ্র করে বহু কিংবদন্তী ছড়িয়ে রয়েছে। শোনা যায় বায়খাত দিঘি, ঘোড়ামারা দিঘি, রায়নার গড় প্রভৃতি তারাই নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও দক্ষিণ দামোদরের রায়না অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলপূর্ণ দুর্গম এলাকা। এখানকার জনগোষ্ঠীর প্রায় ত্রিশ শতাংশ ছিল ডোম, দুলে, কাহার, বাউরি, বাগদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের, যাদের পেশা ছিল মূলত লুটতরাজ ও ডাকাতি। এর প্রমাণ মিলছে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের জেলা গেজেটিয়ারে পিটারসনের লেখাতে। বর্তমানে অবশ্য এরা কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে আসুরি সম্প্রদায়ের লোক বেশি।

বোড়ো (বলরাম)

রায়না থানায় এই গ্রামটি বলরামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। নৃসিংহ কৃষ্ণ অবতার কৃষিদেবতা বলরাম প্রাগ্-বৈদিক, বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগের ধারণার সমন্বয় বলরাম। মাথায় সাপ বা মনসা, আকৃতিতে বলরাম বিষ্ণু, আবার গাজনে শিব পূজার ধারণা এই তিনের সমন্বয়।

আদিম বোড়ো, ডোম, শবর, কিরাত, নিষাদ প্রভৃতি জাতির লোকদের এখানে বসবাস ছিল। উঁচু স্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলরামের মন্দির, পূজা-পার্বণ ও উৎসবকে ঘিরে নানা প্রথা এবং গ্রামে মুসলমান, রজক, কামার, কুমার প্রভৃতি জাতির লোকদের বসবাস নিষিদ্ধ থাকার মতো রীতিনীতিগুলির মধ্যে ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। বোড়ো গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ধামাস, তিয়াগুল, আঁস্তাকুড় প্রভৃতি গ্রামে অনুসন্ধান চালালে প্রমাণ করতে বোধ হয় অসুবিধা হবে না যে এই অঞ্চলে ইন্দোমোঙ্গল অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ও আর্য জনগোষ্ঠীর ধারার মিলন-মিশ্রণে এখানকার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আবার বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সংস্কৃতিতে ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটেছে।

দামিন্যা

রায়না থানার দক্ষিণ-পূর্বে এবং হুগলী জেলার সীমান্তে দামিন্যা অতি প্রাচীন গ্রাম। ষোড়শ শতকে চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ স্থান। গ্রামে সিংহবাহিনী চণ্ডী, চক্রাদিত্য শিব প্রভৃতি প্রাচীন পূজাগুলি আজও রয়েছে। ধর্মঠাকুর 'ক্ষুদিরামের' গাজন বর্তমানে বন্ধ। গ্রামের উত্তরদিকে মানিকপীরের উরস উপলক্ষে ১২ ফাল্গুন এখনও প্রতি বৎসর মেলা বসে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল গ্রামের অদূরে রত্নানদীর তীরে জাহাজপোতা নামে একটি স্থান রয়েছে। প্রয়াত প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় জাহাজপোতায় উৎখনন চালিয়ে কাঠের পাটাতন, প্রাচীন মূর্তি ও মন্দিরের দরজার পাথরের ভাস্কর্য খোদিত বাজু আবিষ্কার করেছিলেন।

গোতান

রত্না নদীর বাঁদিকের তীরে দামিন্যার কিছুটা আগে প্রাচীন গ্রাম গোতান। গ্রামে প্রস্তর নির্মিত প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। বর্তমান বাসস্ট্যান্ডের পাশে টেরাকোটাযুক্ত প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন মন্দির রয়েছে। এখানকার দেউলপোতা স্থানটি প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গোতান গ্রামের শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় এখান থেকে কিছু প্রত্ন-বস্তু আবিষ্কার করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে উপহার দেন। এগুলি পরীক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের কার্যকরী অধ্যক্ষ ড. কল্যাণকুমার গাঙ্গুলি যা গুপ্ত ও কুষাণ যুগের বলে অভিমত প্রকাশ করেন। (দ্রঃ D. O. No. 151/60-61/A.M. dt. 9.2.1961 : (1) T. C. Moulded head of a female figures. C. 10th cent. A. D. (2) Torso of a T. C. male figure, Kushan. (3) Corroded head of a T. C. male figure with traces of frigged hair. Gupta Gotan, at Burdwan, New site) ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে ড. পঞ্চানন মণ্ডল উক্ত স্থান পরিদর্শনে যান এবং তিনি ঐ স্তূপের মধ্যে পাকা গাঁথনি সংলগ্ন জায়গায় অসংখ্য টুকরো নরকঙ্কাল দেখতে পান। পণ্ডিত ও ভাষাতত্ত্ববিদ আচার্য সুকুমার সেন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য সেন মহাশয়ের বংশের পূজিতা দ্বিহস্তা শ্রীশ্রীঅভয়া দুর্গা প্রায় চারশো বছরের বেশি পুরাতন এবং এটিকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম দামিন্যার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সমসাময়িক বলে অনুমান করা হয়। তাঁর মঙ্গলকাব্যে শ্রীশ্রীঅভয়া দুর্গাদেবীর উল্লেখ রয়েছে।

কাইতি

বর্ধমান-আরামবাগ রাস্তায় উচালন এবং সেখান থেকে পাঁচ কি.মি. পূর্বদিকে লুপ্তপ্রায় মুণ্ডেশ্বরী নদীর তীরে অতি প্রাচীন গ্রাম কাইতি। ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম তাঁর নিজ গ্রাম শ্রীরামপুরের পরিচয় দিতে গিয়ে দিগ্‌বন্দনায় কাইতির বাণ রাজার পাট, উষা বালিপোতা ও শ্বেতগঙ্গার ঘাটের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এগুলির উল্লেখ খুবই অর্থবহ বলে মনে করা যেতে পারে।

"কাইতি চাপিয়া বন্দ বাণ রাজার ঘাট।'
উষা বালিপোতা বন্দ শ্বেতগঙ্গার ঘাট।।"

উষা বালিপোতায় উষাপোতা দিঘির পাড়ে ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি এলাকায় ধ্বংসস্তূপের সন্ধান মিলবে বলে অনেকের স্থির বিশ্বাস রয়েছে। ধর্মপূজা বিশ্বাসে, ধর্মপুরাণ ও প্রাচীন মনসা বিজয় স্তম্ভে শ্বেতগঙ্গার উৎপত্তি কাহিনীর লৌকিক সূত্র মেলে; এখানেও শ্বেতগঙ্গার ঐতিহ্য সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী ও পুরাণ কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত আছে! কাইতি অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, ইসলামী প্রভাবে যৌগিক পরিবর্তন বা অবলুপ্তি ইত্যাদি আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া কাইতি গ্রামটি একটি প্রাচীন মৃত নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটির গর্ভে সমৃদ্ধ নগরীর সন্ধান মিলতে পারে বলে অনেকে অনুমান করেছেন। অনুমান করা হয় কিরাত বা ইন্দোমোঙ্গল গোষ্ঠীর মানুষ এবং পরবর্তীকালে দ্রাবিড়গণ উক্ত মুণ্ডেশ্বরী নদীর তীরে বসতি গড়ে তুলেছিল। কাইতি গ্রামের গ্রামদেবী সিদ্ধেশ্বরী কালিকার মূর্তি নিয়ে গ্রামে অনেক কিংবদন্তী আছে। কার্তিকী অমাবস্যায় দেবীর বাৎসরিক পূজায় মহিষ, মেষ, ছাগ বলি দেওয়ার রীতি রয়েছে।

শ্রীরামপুর

রায়না থানায় কাইতি গ্রামের সন্নিকটে মুণ্ডেশ্বরী নদীতীরে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি রূপরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান। ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত রূপরামের ধর্মমঙ্গল গ্রন্থে শ্রীরামপুর গ্রাম ও রূপরামের জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। গ্রামে জয়দুর্গা, রক্ষাকালী, শীতলা, সুবচনী, গঙ্গাধর শিব প্রভৃতি দেবদেবীর স্থান রয়েছে। পার্শ্ববর্তী এড়াল গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় যাত্রাসিদ্ধি ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজা ও গাজন উৎসব হয়।

কোটশিমূল

রায়না থানায় বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তের অতি প্রাচীন গ্রাম কোটশিমূল। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে রংবরাহ খাঁ দশঘরা অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তার পুত্র খানজাদ খাঁ কোটশিমূল গ্রামে গড়, প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করান। গড়ের মধ্যে খাঁ সাহেবের বাড়ি এবং গ্রাম্য সামাজিকতায় হিন্দু অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক আজও গভীর রয়েছে। শিবের ও ধর্মের গাজনে এরা পুষ্পমালা পেয়ে থাকেন। গড়ের নৈঋত কোণে রয়েছেন 'ঘোড়া সঈদ পীর'। এ প্রায় চারশো বছরের পুরাতন এই পীর এবং রূপরাম চক্রবর্তী এর বন্দনা করেছেন

"কোটশিমূল বন্দি গাইব ঘোড়া সইদ পীর।
যার নাম সঙরণে রণে হয় বীর।"

ড. পঞ্চানন মণ্ডল কোটশিমূলকে রাঢ়ের রাজধানী কোডাবরিম বলে একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন এবং এর সূত্র ধরে রাঢ়দেশে কিরাত বোড়ো গোষ্ঠীর ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন।

নাড়ুগ্রাম

রায়না থানার কাইতি-শ্রীরামপুর অঞ্চলের প্রাচীন গ্রাম নাড়ুগ্রাম। এখানকার প্রাচীন দেবতা নাড়েশ্বর শিব। এর নিত্যসেবা হয় এবং বৈশাখ মাসে বুদ্ধ-পূর্ণিমায় বাৎসরিক পূজা ও গাজন হয়। এতে সন্ন্যাসী হওয়া থেকে শুরু করে নানা অনুষ্ঠান পালন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আবার নাড়ুগ্রামে বাঁকুড়া রায় নামে ধর্মঠাকুরের গাজন ও উৎসব হয়। ডোম চণ্ডাল পণ্ডিতরা এর পূজা করেন। এই সমস্ত পূজা ও গাজনের মধ্যে অস্ট্রিক ও বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এগুলি বিশ্লেষণ করলে আমাদের সমাজ-ইতিহাসের অনেক প্রমাণ বেরিয়ে আসবে।

পাঁইটা

রায়না থানার দক্ষিণ প্রান্তে মুণ্ডেশ্বরী নদীর তীরে (বর্তমানে একটি খাল) অতি প্রাচীন গ্রাম পাঁইটা। এখানে প্রাচীন দেবী কালিকার বাৎসরিক উৎসবকে কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিপুল উৎসাহ দেখা যায় ও মেলা বসে। তাছাড়া হরিমোহন মণ্ডল ও তাঁর বংশধরদের বাড়িতে রয়েছেন স্বরূপনারায়ণ নামে ধর্মরাজ; রেণুপদ রজক পণ্ডিতের পরিবারে রয়েছে বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদিরায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, কালু রায় প্রভৃতি নামে কয়েকটি ধর্মঠাকুর। সনাতন ব্রাহ্মণদের দ্বারা আজ অনেকাংশে ধর্মঠাকুরের পূজা গৃহীত হলেও ইনি আসলে বাইতি, ডোম, মুচি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দেবতা সুপ্রাচীন কাল থেকে। ধর্মপূজার আধিক্য উক্ত জাতির লোকদের আদিতে এ অঞ্চলে বসবাসের ইঙ্গিত দেয়। অনতিদূরে ডোমমারা গ্রামটি ইতিহাসের সন্ধান কিছুটা হয়তো দিতে পারে।

উচালন

বর্ধমান থেকে আরামবাগ বাস রাস্তায় পড়ে সুপ্রাচীন এবং বর্ধিষ্ণু গ্রাম উচালন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের টীকায় যে সমস্ত সামন্ত রাজাদের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে সামন্ত রাজা ময়গল সিংহের রাজ্য 'উচ্ছাল'-এর রাজধানী উচালন বলে অনেকে অনুমান করেছেন। উচ্ছাল রাজ্যের পূর্বদিকে মুণ্ডেশ্বরী নদী (বর্তমানে খাল) এবং পশ্চিমদিকে দ্বারকেশ্বর নদী। রাজা ময়গল সিংহের দুর্গ ও প্রাসাদের কথা অনেকে অনুমান করেন, উচালন দিঘি, কানাদিঘি, শুরো দিঘি, বেনে দিঘি প্রভৃতি সরোবর আজও কৌতূহল জাগায়। উক্ত দিঘির পাড়ে শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, যোগাদ্যা এবং উচ্চৈশ্বরী পাড়ায় উচ্চৈশ্বরী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা পাওয়ার ঘটনাগুলি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বর্গী আক্রমণ এবং মুসলমান আমলে এই স্থানটির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। উচালনে ইসলামি

শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ইসলামি শিক্ষার শিক্ষক বা মৌলবী মকদুম পীরের মাজার বা দরগা আজও উচালনের কাজীপাড়ায় রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে উচালনের উল্লেখ ও ইতিহাসের কিছু সন্ধান মেলে। কয়েক বৎসর পূর্বে গ্রামের পোস্ট অফিস-এর বাড়ির ভিত খোঁড়ার সময় বহু নর ও অশ্বের কংকালের টুকরো (হাড়, দাঁত ইত্যাদি) পাওয়া গিয়াছিল। অনুমান করা হচ্ছে এখানে আরও অনেক সৈন্য ও ঘোড়ার কংকাল মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। এগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। এ তথ্য আমাকে জানালেন ঐ গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী অমলেন্দু হাজরা মহাশয়।

মুইধারা

উচালনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম মুইধারায় 'উচ্ছাল' রাজ্যের গড়-এর চিহ্ন আজও রয়েছে বলে অনেকে দেখান। রাঢ়ের আদি দেবতা 'ঝড়ো রায়' ধর্মঠাকুর এখানকার গ্রামদেবতা। এই দেবতাকে ঘিরে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে যেগুলি থেকে সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের সন্ধান মিলতে পারে।

গোপালবেরা

মুইধারায় প্রায় সংলগ্ন গ্রাম গোপালবেরা। এর পূর্বপ্রান্তে এবং উচালনের পশ্চিমে বিখ্যাত মকদম পীরের আস্তানা। এর ইতিহাস চারশো বছরের বেশি পুরাতন। পীরের তিরোধান দিবস উপলক্ষে ১ মাঘ উৎসব পালিত হয় এবং বিরাট মেলা বসে। বহু মৌলবী, ফকিরের সমাবেশ ঘটে এবং পীরের গান, লেটোগান প্রভৃতির আসর বসে।

একলক্ষ্মী

বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে একলক্ষ্মী গ্রাম। উচালন থেকে বাসে যাওয়া যায়। গ্রামের প্রবেশপথেই শা-চাঁদ পীরের দরগা। এখানে পড়ে রয়েছে অসংখ্য ইট, পাথরের ধ্বংসাবশেষ, পোড়া মাটির ঘোড়ার স্তূপ। অনেকে ঐ স্থানে বৌদ্ধস্তূপের কথাও অনুমান করেছেন। দ্বারকেশ্বর নদী-তীরবর্তী এই স্থানটিতে একদা গঞ্জ ছিল, নৌকা-জাহাজ চলাচল করতো বলে অনেকে অনুমান করেছেন। মাঘী-পূর্ণিমায় শা-চাঁদ পীরের বাৎসরিক উৎসব হয় এবং ঐ সময় বহু ফকির-মৌলবীদের সমাবেশ ঘটে, মেলা বসে।

বোঁয়াই

খণ্ডঘোষ থানায় বাঁকুড়া জেলায় সীমান্তবর্তী প্রাচীন গ্রাম বোঁয়াই। বর্ধমান থেকে সরাসরি বাসে যাওয়া যায়। গ্রাম্য দেবী বসন্তচণ্ডী বেশ প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন জেলার দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। নিম্ন দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের প্রায় সমস্ত গ্রামের জন্য পুরোহিত নির্দিষ্ট। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী তিথি ও শারদীয় নবমী তিথিতে বলি সহযোগে বিশেষ উৎসব হয়, মেলা বসে। দেবী চণ্ডী বেশ প্রাচীন এবং পার্শ্ববর্তী কুলে গ্রামের রায়দিঘি থেকে কিভাবে এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এবং দেবীর মূর্তি সম্পর্কে কিংবদন্তী রয়েছে। দেবীকে ঘিরে যে বিশ্বাস ও সংস্কার জনমানসে রয়েছে সেগুলি বিশ্লেষিত হলে উক্ত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস উন্মোচিত হতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধে নিম্ন দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের কয়েকটি মাত্র গ্রাম বা স্থানের কথা অতি সংক্ষেপে মাত্র উল্লেখ করা হল। এর থেকে ইতিহাসের সন্ধান মাত্র মিলতে পারে; ইতিহাসের পরিপূর্ণতা পায় না। আরও বহু গ্রাম বা স্থান রয়েছে যেগুলির গর্ভে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। উক্ত অঞ্চলে একদা আদিম দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, কিরাত গোষ্ঠীর বসবাস ছিল, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে, পাঠান ও মোগল আমলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে একথা আজ আর অস্বীকার করা যাবে না। এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য আছে। গভীরভাবে এর ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এবং প্রত্নবস্তুগুলির খুঁটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে এখানকার তথা বাংলার ইতিহাস জানা যাবে। সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যগত বিবর্তন, মিলন, মিশ্রণ, বিশেষীকরণের মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট ইতিহাস ও তার সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনীতিকে জানতে হবে। এগুলির ধারাবাহিক বিশ্লেষণও প্রয়োজন। ইতিহাস কখনও থেমে থাকে না। তাই আগামী দিনে এগুলির ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক আলোচনার দাবি জানিয়ে শেষ করছি।

সাহায্য নিয়েছি :

১। বঙ্গভূমিকা (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-১২৫০ খ্রিস্টাব্দ) সুকুমার সেন।
২। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল -- সুখময় মুখোপাধ্যায়।
৩। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম -- নলিনীনাথ দাশগুপ্ত।
৪। রামচরিত -- রাধাবিনোদ বসাক।
৫। পুরাবৃত্ত-১--প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৬। বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ৩য় খণ্ড -- যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।
৭। বর্ধিষ্ণু বর্ধমান -- হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য।
৮। History of Ancient Bengal -- R. C. Majumdar
৯। বর্ধমান পরিক্রমা -- সুধীরচন্দ্র দাঁ।
১০। ক্ষেত্রানুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।

□ লোকশ্রুতি -১৭, ডিসেম্বর ২০০০ □

বোড়র বলরাম

পানাগড়ে বৈদিক প্রাচীনত্বের নিদর্শন ?

প্রকাশ দাস

পানাগড় কত প্রাচীন সঠিক বলা যায় না। তেমনি বলা যায় না কেনই বা গড় শব্দটি যোগ করে দেওয়া হয়েছিল এর নামের সাথে। অতীতের কুয়াশার অন্ধকারে কোন গড় কি কোথাও এর শরীরের কোনখানে কোনদিন গড়ে উঠেছিল? কারা গড়েছিল? তারা কে? কখন? কোন উত্তর পাওয়া যায় না আজ। ধোঁয়া আর কুয়াশার অতীতের অন্ধকারে তাকিয়ে কিছু কিছু অনুমান বেজে ওঠে শুধু।

বাংলার নানা প্রান্তে গড় শব্দের সহযোগে আমরা পেয়ে যাই বেশ কিছু গ্রাম। যেমন (১) টিটেগড় (২) গড়বেতা (৩) বলাগড় ইত্যাদি ইত্যাদি। সুকুমার সেনের মতানুযায়ী এইসব গড়যুক্ত নামগুলির ব্যাখ্যা পেয়ে যাই এই রকম যেমন টিটেগড় টিট্টিভ + গড় অর্থাৎ
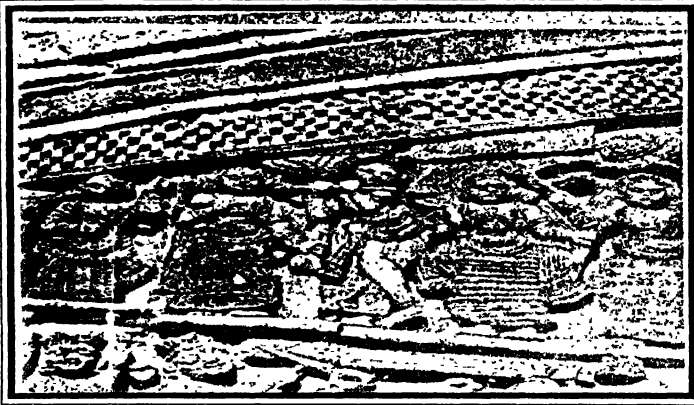
পানাগড়ে দামোদরের মন্দিরে পোড়ামাটির অনবদ্য স্থাপত্য নিদর্শন। ছবি ঃ প্রভাস দাস।

মাদারডাঙ্গায় বারুজীবী সম্প্রদায়ের প্রাচীন পিরামিডাকৃতি মন্দির এখন ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এখানে বিগ্রহ শিব। ছবি ঃ প্রভাস দাস।

যেখানে গড়ে টিট্টিভ পাখির গর্ত আছে। গড়বেতা অর্থাৎ যে গাঁয়ে বেতঝাড় ঘেরা গড় আছে অথবা যে গাঁ বেতঝাড় ঘেরা গড়। বলাগড় বলয় ঘেরা+গড় অথবা বলা গাছের গড়। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে যে কয়টি প্রাচীন স্থান নামের উল্লেখ পাওয়া গেছে তার মধ্যে বৃক্ষনাম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বেদের কালে বৃক্ষই ছিল শ্রেষ্ঠ দিশা (Land Mark)।.... বৈদিক সাহিত্য থেকে জানতে পারি যে কোন কোন বৃক্ষ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল বলে বিবেচিত হত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখিত এইসব গাছের নাম বাংলা দেশের স্থাননামে প্রচুর মেলে)। এইকথা পাঠকদের আর একবার জানিয়ে রাখছি যে পশ্চিমবঙ্গের পুরানো স্থান নামের বারো আনা ভাগই উদ্ভিদ নাম থেকে নেওয়া উদ্ভিদ নাম ঘটিত।

সুকুমার সেনের এই সিদ্ধান্ত সামনে রেখে তাহলে কি আমরা বলতে পারি সুদূর একসময়ে গুল্মলতা রূপে বৃক্ষের প্রাচুর্য্যতায় প্রাণবান হয়েছিল রাঢ়ের খণ্ড ভূমিকাটি? কিন্তু সেই প্রাণোচ্ছল সেইসব বৃক্ষগুল্ম বা লতাগুলি? কি কি নাম তাদের? একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ডাঃ সেনের মতানুযায়ী গড় শব্দটির অর্থ পাই নিভৃত স্থান, প্রাচীন অথবা ঘন ও দুর্ভেদ্য উদ্ভিদ প্রতিবেষ্টিত স্থান। পানাগড় বাংলা পানা, ফরাসী পানাহ্+গড়। অর্থাৎ পানাকে যদি জলজ উদ্ভিদ ধরা হয় তাহলে কি আমরা ধরে নেব -- পানাগড় ছিল একটি নিভৃত কিম্বা ঘন ও দুর্ভেদ্য উদ্ভিদ প্রতিবেষ্টিত স্থান। এবং এই প্রতিবেষ্টন রচনা করেছিল যে উদ্ভিদ সেগুলি ছিল অবশ্যই পানা বা ঐ জাতীয় কোন জলজ উদ্ভিদ। তাহলে কি সেই বৈদিক যুগে কিম্বা তার পরবর্তী সময়ে পুরাণের কালে গড়ে ওঠা পানাগড় ছিল কোন সুপ্রাচীন গড় বা পানায় ভর্তি এক অভিশপ্ত গণ্ডগ্রাম।

সারা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে চোখ সরিয়ে যদি শুধুমাত্র জেলা বর্ধমানের দিকে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে গড় শব্দের সহযোগ এখানে আজও রয়েগেছে অনেক-অনেকগুলি স্থান বা গ্রামে। আবার তাদের কিছু কিছুর অবস্থান পানাগড়ের খুব একটা নিকট না হলেও খুব একটা দূরে নয়। যেমন কাছাকাছি পেয়ে যাই--অমরাগড়, তালিতগড়, ডিসেরগড় ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'গড়বর্ণন' থেকে আমরা পেয়ে যাই আগেকার নগর বর্ধমানের সমস্ত বৈশিষ্ট্য। ভারতচন্দ্র গড়খাই প্রধান বর্ধমানের ছ'টি গড়ের বর্ণনা দিয়েছেন এই রকম

প্রথম গড়েতে কোলাপোষের
নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি
ফরাস॥
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত
মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক শেখ মোগল
পাঠান॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয়
সকল।

অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সমরে
অটল ॥
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত
রাজপুত।
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক
রাহুত ॥
ষষ্ঠ গড়েতে দেখে যত বোঁচ
দলার থান।
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে
মহাজন ॥

ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনা আমাদের স্পষ্ট করে দেয় আড়াইশ বছর আগেকার গড়খাই প্রধান এক দুর্ভেদ্য ভয়ঙ্কর বর্ধমানের কথা। এর থেকে আমাদের অনুমান করে নিতে কোনরকম কষ্ট হয় না যে বর্ধমান ছিল গড়খাই বেষ্টিত এক দুর্ভেদ্যাঞ্চল। পানাগড়ের উত্তর পশ্চিমে রয়েছে শ্যামারূপার গড়। এই শ্যামারূপার গড় ত্রিষষ্ঠী গড় বা ঢেকুর নামেও খ্যাত। ইতিহাসকারদের দ্বারা প্রমাণিত একাদশ শতাব্দীর, মহীপালের সমসাময়িক মহাপরাক্রান্ত বিক্রমশালী স্বাধীনচেতা সদগোপ সামন্তরাজ ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষের রাজধানী ছিল এই ঢেকুর বা শ্যামরূপার গড়। যার স্মৃতি চিহ্ন আজও বর্তমান। তেমনি পানাগড়ের উত্তর-পূর্বে রয়েছে অমরাগড়। অমরাগড়ও ছিল মধ্যযুগের মহাপরাক্রমশালী সদগোপ সামন্ত রাজা মহেন্দ্রনাথ বা মাহিন্দী রাজার রাজধানী। অমরাবতী ছিলেন রাজা মাহিন্দীর পত্নী। তাঁর নামেই এই দুর্গের বা গড়ের নামকরণ হয় অমরাগড়। বাংলার অধুনালুপ্ত সদগোপ সামন্তরাজের ভৌতিক সাক্ষী আছে ওখানে। প্রাচীন সদগোপ পরগণার অন্তর্গত গড় নামাঙ্কিত পানাগড়ের ভৌতিক ছায়ার অন্ধকারে কোথাও কি লুকিয়ে আছে পরাক্রমশালী সদগোপ সামন্তের এই রকম কোন লুপ্ত বা-লুপ্ত প্রায় কোন স্মৃতিচিহ্ন বিশেষ। অতীতের অন্ধকার থেকে খুব বেশি নয় আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগের যে পানাগড় চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা শুধু বিশাল জঙ্গল আর অরণ্যের অন্ধকারে ঢাকা এক দুর্ভেদ্য অঞ্চল যেখানে খেলা করে ওঠে বাঘ ভাল্লুক নেকড়ের হুঙ্কার সাপ আর বিষধর কত কি সরীসৃপের আঁকা বাঁকা গতির আনাগোনা। যার স্মৃতি রোমন্থনে আজ মেতে ওঠেন এখানের কোন কোন প্রবীন বৃদ্ধ মানুষ। গল্পের ফাঁকে বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে তাদের চোখ! অরণ্য আর শ্বাপদসঙ্কুল পানাগড় যেন বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে তাঁদের চোখে । তিনি বা তাঁরা, সেই বৃদ্ধেরা ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত আর শঙ্কিত হয়ে যান সেই পানাগড়ের কাছে। অরণ্য আর শ্বাপদসঙ্কুল তো ছিলই কিন্তু সেই অরণ্যের অন্ধকারে কোথায়--কোন্‌খানে ছিল সেই গড়? যাকে বেষ্টন করে গড়ে উঠেছিল কোন পরাক্রমশালী সামন্তের স্বপ্নের রাজধানী বা রাজ্য, এই পানাগড়। তার কোন সামান্যতম চিহ্ন বা পরিচয় পাওয়া যায় না আজ। পানাগড়ের বিস্তীর্ণ উত্তরাঞ্চল জুড়ে আজ শুধু দেখা যায় অরণ্যের আঁকা বাঁকা গতি। অতীতের অরণ্যের ভয়াল গভীর অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে আজ। সেই অরণ্যের চারিদিকে ক্ষতচিহ্নের মতো ইতিউতি

তাকিয়ে আছে সেনা ছাউনির নিবাস। দূরে দুর্গাপুরের চিমনির কালো বাতাস প্রতিদিন পানাগড়কে ডাকে আয় আয়। নগর সভ্যতা আর যন্ত্র সভ্যতার লোভে পানাগড় তাই প্রতিদিন বিলিয়ে দিচ্ছে তার অরণ্য পোশাক।

ভারতচন্দ্র বর্ধমানের পুরাতন গড়ের কথা বর্ণনা করেছেন কিন্তু করেননি তাদের নাম এবং অবস্থান; কিন্তু আজও বর্ধমান এবং বর্ধমান জেলার অনেক জায়গায় পাওয়া যায় সেই সমস্ত গড়ের স্মৃতিচিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ। পূর্বে কয়েকটি গড়ের উল্লেখ ছাড়াও আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন খাঁজাহান খাঁর গড়, সমুদ্র গড়, রাণীগঞ্জের কাছে শেরগড় ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে নামগুলির থেকে এইটুকুই অন্তত অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে এদের কতকগুলি হিন্দু যুগে এবং কতকগুলি মুসলমান যুগে নির্মিত। আবার এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রাচীন হিন্দুযুগে বা তারও আগের। আগেই বলেছি পানাগড় প্রাচীন গোপভূম পরগণার অন্তর্গত একটি অঞ্চল। বাঁকুড়া থেকে বীরভূম পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার যে উত্তরাঞ্চল তারই অন্তর্ভুক্ত এই পানাগড়। এই অঞ্চলের বৈশিষ্টই হল এর অরণ্য প্রাচুর্যতা আর পাথুরে রুক্ষ মাটি, এক সময় এই অঞ্চলেই বন্য ভয়ঙ্কর মানুষদের বাস ছিল, দুর্গাপুরে, পানাগড় থেকে অল্পদূরে মাটির কয়েকফুট নিচে পাওয়া গেছে তাদের ব্যবহৃত আয়ুধ সকল। অরণ্যের পশু আর ফলমূলই ছিল তাদের ব্যবহারের বা জীবনধরণের অবলম্বন। ক্রমশ তারা যাযাবর শিকারী বন্যজীবন পরিত্যাগ করে শিখেছে কৃষি কাজ আর পশুপালন। এরপর তারা আরও সভ্যতার আলোয় পোঁছে দলপতি, গোষ্ঠীপতি, কৌমপতি থেকে উন্নীত হয়েছিলেন রাজপদাধিকারে। আজও সেই অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে কাঁকসা, আমরারগড়, রাজগড়, গৌরাঙ্গপুর যেগুলির অবস্থান খুব একটা দূরবর্তী নয়। এবং এই অতীত ইতিহাসের গৌরবময় কর্তারা ছিলেন গোপ আর সদগোপদেরই পূর্বপুরুষ। তাই এই অঞ্চলের নামকরণ হয়েছিল গোপভূম পরগণা বা পরগণা গোপভূম। সেই গৌরব উজ্জ্বল পরগণা গোপভূমের অন্তর্গত এই পানাগড়। আজও এখানে এবং এর আশেপাশে সদ-গোপ-দের বসতির প্রাচুর্য্যতা লক্ষ্য করবার মতো। সুতরাং এই দৃঢ়মূল বিশ্বাসের অবকাশ নিশ্চয়ই থেকে যায় পানাগড়ও ছিল সেই প্রাচীন কোন সদগোপ সামন্তরাজার গড়খাই বেষ্টিত রাজধানী কিংবা তাদের একটি রাজ্যভুক্তাঞ্চল। আর সেই গড় কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা গড়খাই বেষ্টিত সেই রাজধানী কালক্রমে হাতছাড়া হয়ে যায় পরবর্তী কালে কোন শাসনকর্তার আক্রমণে যেমন ধ্বংস হয়ে যায় বর্ধমানের তথা জেলা বর্ধমানের অনেক পুরাকীর্তি সম্পদ পরবর্তী কালে শোভাসিং, রহিম খাঁর মতো বিদ্রোহীদের বারংবার বিদ্রোহে এবং বর্গীদের ঘনঘন অমানুষিক অত্যাচার আর লুণ্ঠন ক্রীড়ায়। কিন্তু পানাগড়ের কোথায় ছিল সামন্তরাজের গড়খাই বেষ্টিত সেই স্বপ্নের রাজধানী! ধ্বংসাবশেষগুলিও বা কোথায় অবস্থিত। তার উত্তর আপাতত পাওয়া যাবে না আজ। কিন্তু পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে একদিন, কোনদিন শ্রমসাধ্য প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ির পর। কিন্তু আপাতত সেই অর্থসাধ্য আর শ্রমসাধ্য খোঁড়াখুঁড়ি করবে কে?

□ পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ □

দুর্গাপুর নগর পরিকল্পনা
প্রফুল্ল গুপ্ত

'যোজনা', 'পাঁচসালা পরিকল্পনা' ইত্যাদির মতো 'নগর পরিকল্পনা' একটি বিশেষ আসন জুড়ে বসেছে আমাদের সমাজবিজ্ঞানে। নগর-পরিকল্পনা কথাটা অধুনা যেভাবে কর্ণগোচর হচ্ছে কিছুকাল আগে পর্যন্ত তা ছিল না। অমুক শহরটা সুপরিকল্পিত, ইংরাজীতে যাকে বলি ''প্লানড্ টাউন''। রাউরকেল্লা দেখে এলাম -- শহরটা বেশ প্লানড্ বুঝলে! কিংবা ভুবনেশ্বর গেলাম, বেশ লাগলো। প্লান করে নগরটা বানিয়েছে। দুর্গাপুর দেখে এসে আর কিছুকাল পরে তুমিও সেই কথাই বলবে।

প্লান শব্দটির বহুল ব্যবহারে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। যেন পূর্বে কোনদিন 'পরিকল্পনা' নামক বিষয়টি আদৌ ছিল না। অস্বাভাবিক কিছু নয়, কেননা কলকাতার মতো নগর দেখার অভ্যস্ত চোখে মাপাজোকা কিছু দেখলে এ-কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সুতানটি আর গোবিন্দপুর নিয়ে জনপদ কলকাতার সৃষ্টি হয়েছিল এ আমরা জানি। তারপর ধীরে ধীরে কলকাতা একটি নগরে রূপান্তরিত হল, আর নগর থেকে প্রধান নগরে (Metroplis)। এই শহর থেকে নগর, নগর থেকে প্রধান নগরে -- এর ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। আমাদের শরীরের মতো নগর গড়ার ক্ষেত্রেও একটি বিপাকীয় পদ্ধতি (Metabolism) কাজ করে চলে। যা ছিল তাকে সরে যেতে হবে নতুনকে পথ করে দিয়ে। এটাই নিয়ম। সর্বত্র। সঙ্গীতে বলো, স্থাপত্যে বলো, সব।

নগরবিন্যাস প্রণালী তথা নগর পরিকল্পনা স্থপতিশিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে। নগর পরিকল্পনা কথাটা নতুন ঠেকলেও স্থাপত্যশিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাসের পাতা ওল্টালে তখন কিন্তু মনে হবে না। কেননা নগর পরিকল্পনা বা নগর বিন্যাস প্রণালী আমাদের বহু দিনের পরিচিত শব্দ।

যা কিছু করি না কেন, যা কিছু গড়ি না কেন, কিছু গড়া আর করার আগে খানিক পূর্বচিন্তা কাজ করবেই। এবং এই পূর্বচিন্তা একটি ছকে বেঁধে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পুরাকালে আমরা জানি, নগর-বিন্যাস-প্রণালী একটি বিধি ছিল। যুগে যুগে কালে কালে তার আকৃতিগত পরিবর্তন অবশ্য ঘটেছে, কিন্তু 'প্লানিং' শব্দটি বা বস্তুটি তাতে বর্তমান ছিল। দেখা গেছে সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে নগরগঠন শৈলী একটি বিশেষ মানে উন্নত ছিল। তুলনামূলক বিচারে বলা চলে হরপ্পা, মহেঞ্জোদরোর কথা। হুইলার সাহেবের নকশাই তার নজীর। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদরোর ইতিহাস যাঁরা জানেন তারা একবাক্যে স্বীকার করেন বিগতকালে আমাদের নগর বিন্যাস-প্রণালী একটি সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ ছাড়া হওয়া সম্ভব ছিল না। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর যাঁরাই রাজত্ব করে থাকুন দুটি নগর যে একই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে নগর বিন্যাসের নকশা দেখে। নগর গঠন এবং তার স্থাপত্য দেখে। ম্যাকে সাহেবের নকশা দেখে বলা চলে মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পা এক

একটি চতুষ্কোণ নগর। পূর্ব-পশ্চিমে ৮০০ ফুট লম্বা, উত্তর -দক্ষিণে ১২০০ ফুট বিস্তৃতি এই চতুষ্কোণ মাপ। দুটি প্রধান সড়ক ৩০ ফুট চওড়া সমকোণে ছেদ করায় সম্পূর্ণ এলাকাটি মূলতঃ চারটি ভাগে বা ব্লকে বিভক্ত। এবং গৃহগুলির যোগাযোগের জন্যে অসংখ্য গলি ও উপগলি। এই ছিল মোটামুটি নকশা। খাস হরপ্পায় যতটুকু পাওয়া গেছে তা থেকেই প্রমাণিত হয়েছে একটি অপরটির অনুকৃতি। সুতরাং নগর পরিকল্পনা আগে ছিল, এখনও আছে এবং থাকবে।

দক্ষিণ ভারতের নগর মাদুরা ও কাঞ্চীপুর, একই মূল সূত্রে ও আদর্শে নির্মিত হয়েছিল। তার প্রমাণের অভাব নেই। নগরের গঠনাকৃতি,সমান্তরাল রাজপথ ও পল্লী সব একটি নকশারই অনুসরণ।

'মানসার গ্রন্থে' কিংবা শ্রীহেবেলের গ্রন্থে আদর্শ গ্রাম কিংবা নগরের নকশার যা বর্ণনা আছে তাতে পরস্পরের সঙ্গে একটি সাদৃশ্য বর্তমান। 'সর্বতোভদ্র', 'নন্দ্যাবর্ত' এদের মধ্যে একটি সাযুজ্য দেখা গেছে। 'নন্দ্যাবর্ত' নকশায় যে আদর্শ গ্রামের বর্ণনা আছে, তাতে দেখা যায় তিন ধরনের রাস্তার নাম ও আকৃতি। একটি চওড়া রাস্তা 'রাজপথ' সাধারণ পুব-পশ্চিমে লম্বা হত, এবং যে রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে রাজপথকে বিদীর্ণ করতে তার নাম 'মহাকাল'। আর নগর প্রাচীরের পাশে সমান্তরাল যে রাস্তাটি প্রদক্ষিণ করত তার নামকরণ হত 'মঙ্গলবীথি'। এবং এই রাস্তার পাশে সমান্তরাল গৃহাবাস ও এলাকা নির্ধারিত হতো। বিভিন্ন বর্ণের গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বাস করতো। নগর পত্তন, নগর-বিন্যাস-প্রণালী স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিভিন্ন ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে-বিশেষত, স্থাপত্যে নতুন ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

বিগত শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব এক নতুন যুগের প্রবর্তন করায় সমাজের চরিত্রগত পরিবর্তন দেখা দিল। এবং নতুন শিল্পের প্রয়োজনে নতুন নতুন শিল্প নগর পত্তন শুরু হল। এই যুগচেতনা সমগ্র বিশ্বে এক নতুন সমাজের সৃষ্টি করল। ফলে গড়ে উঠল শিল্পকেন্দ্রিক জনপদ।

দ্বিতীয় বিশ্বসমরোত্তর ভারতে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে, শিল্পায়নের প্রস্তুতিপর্বে পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। এই পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম হল 'দামোদর পরিকল্পনা'।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে দামোদর অন্য ভাষায় যাকে বলে -- 'রিভার অফ সরোস' লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবির জীবনে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। যদিও দামোদর পরিকল্পনায় খসড়া সেযুগেই গ্রহণ করা হয়েছিল। তথাপি নানা করণে তা দীর্ঘদিন ফলপ্রসূ হয়নি। তারপর প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় যেসব প্রকল্প শীর্ষস্থানীয় বলে বিবেচিত হল তার মধ্যে দামোদর পরিকল্পনা একটি। এই দামোদর পরিকল্পনার একটি সুষ্ঠু প্রসব হল দুর্গাপুর শিল্প সংগঠন। (Durgapur Industrial Complex).

বর্ধমান জেলার গোপীনাথপুর মৌজার একটি গ্রাম দুর্গাপুর। শোনা যায় মৌজা গোপীনাথপুর কোন বিত্তশালী জমিদারের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। এবং তদীয় তনয়

দুর্গাদাসের নামানুসারে দুর্গাপুর জনপদ। দক্ষিণে ভয়াবহ দামোদর আর উত্তরে বিস্তীর্ণ দুষ্প্রবেশ্য অরণ্য, দামোদরের পাড় থেকে অজয়ের কূল পর্যন্ত এই ছিল এই জনপদের মোটামুটি অঞ্চল।

গ্রাম দুর্গাপুর নগরে রূপান্তরিত হয়েছে আজ। কিছুকাল আগে পর্যন্ত বার্ন কোম্পানির ফায়ার ব্রিক্স-এর একটি মাত্র কারখানা ছিল আদিম যুগের শিল্পের নিরিখ হয়ে। জনপদ দুর্গাপুর নগরে বিবর্তিত হওয়ার ইতিহাসে দুর্গাপুর প্রকল্পের কোকচুল্লী কলোনীর প্রথম পদক্ষেপ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য পরিকল্পনার প্রথম প্রচেষ্টা কোকচুল্লী বা কোক ওভেন প্লান্ট। তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে নানান শিল্প। তারপর এসেছে ইস্পাত কারখানা, হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং, ভিকার্স ব্যাবকক্, রসায়ন প্রকল্প, ফিলিপস্ কারবোন ব্ল্যাক, সাঙ্কি হুইলস ইত্যাদি।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার দুর্গাপুর 'ব্যারেজ' শেষ হলে ওই সংস্থার অপ্রয়োজনীয় একটি ছোট সুপরিকল্পিত শহর রাজ্য সরকার ক্রয় করেন। তারপর কোক্‌চুল্লীর ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিত্যক্ত শহরের এক নতুন প্রাণ সঞ্চার ঘটলো। ডি ভি সি কলোনীর নাম হল কোক্ ওভেন কলোনী। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে স্টীল টাউন আর ব্যক্তিগত মালিকানায় ভিকার্স বাবকক্, ফিলিপস্ কারবোন ব্ল্যাক, সাঙ্কি হুইলস - যে যার নিজের কলোনী গঠন করে নিলে। কাজেই দুর্গাপুরের প্রথম অবস্থায় পরিকল্পনার চেহারাটি ছিল যার যার নিজের মতন।

ডি ভি সি কলোনী পরিত্যক্ত হওয়ার পর নবপর্যায়ে শহর গঠনের কাজে মন দিলেন রাজ্য সরকার। পুরনো গৃহবাসের সঙ্গে নতুন অল্প কিছু গৃহ নির্মাণের সূচনা হল। কোক্ ওভেন কলোনীর সৃষ্টির প্রাক্কালে কোন দক্ষ পরিকল্পনাকে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ফলে

হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং কলোনীর রাস্তা

যা নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনে স্ফীত হতে পারতো। কিন্তু (যতদূর জানা যায়) তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল কর্মচারীর বিশেষ যত্নে তা সম্ভব হয়নি।

জি টি রোডের উত্তরে এ ভি বি কলোনী, হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং কলোনী এবং ইস্পাত কলোনী পরবর্তী কালের সংযোজন। এইসব খণ্ড খণ্ড আধুনিক জনপদ দেখলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে একটি সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলাযুক্ত নগর গঠনের আধুনিক বিন্যাস-প্রণালী সর্বত্রই কার্যকর হয়েছে। আয়তনে কেউ ছোট কেউ বড়। কিন্তু এদের আকৃতিগত এমন একটি সাযুজ্য বর্তমান যে এগুলিকেএকক স্বরূপে (Integral whole) পরিণত করে রসাস্বাদন করাও অসম্ভব নয়।

আধুনিক নগর-বিন্যাস প্রণালীর ধারা আলোচনাকালে সর্বাগ্রে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, উত্তর স্বাধীনতা যুগে পাঞ্জাবে নতুন নগর চণ্ডীগড়ের পত্তন এক বিশেষ যুগের সূচনা করেছে। রি-ইনফোর্সড় সিমেন্ট কংক্রিট আধুনিক স্থপতি শিল্পে এক নতুন যুগের সংযোজন। সেই অবধি স্থাপত্য শিল্পে তথা নগর গঠন শৈলীতে এক নব্য মানের আবির্ভাব ঘটেছে। দুর্গাপুরে এই নতুন ধারার গতিরোধ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল।
চণ্ডীগড় বা তলওয়ারা কিংবা ভুবনেশ্বর নগরগুলির সঙ্গে দুর্গাপুর নগরের আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রভেদ লক্ষণীয়। দুর্গাপুরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল কোন বিশেষ একজন স্থপতির সৃষ্টি এটি নয়। বিভিন্ন স্থপতি এই খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলির স্রষ্টা।
দামোদর নদের সমান্তরাল হয়ে রেলপথ ও জি টি রোড। দামোদরের পাড় থেকে রেলপথ অবধি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কোক্ ওভেন কলোনী আর কেমিক্যাল কলোনী। শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ব্যারেজ প্রায় মাইল পাঁচেক দূর। রেলপথের উত্তরে এবং গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা মূলত কলকারখানার জন্যে বন্টন করা গেছে। আর জি টি রোডের উত্তর পাড় থেকে আরে উত্তরে অরণ্যাবৃত অঞ্চলে শহর বা টাউনশিপের এলাকা সরল রৈখিক (liner) ঊর্ধ্বাধ (vertical) বিস্তারের প্রয়োজন এখনো হয়নি। হয়তো কোনদিন হবে। এখনও পর্যন্ত বলা চলে এ নগরের বাড় সরলরেখায়।

বর্তমানে দু-নম্বর জাতীয় সড়ক অর্থাৎ জি. টি. রোড এবং রেলপথ নগরের প্রধান যাওয়া আসার পথ। দুর্গাপুর শিল্প সংঘঠনে কালান্তরে বিভিন্ন শিল্পের সংযোজন হলে, কিংবা বর্তমান শিল্প আরও বর্ধিত হলে রেলপথ, রাজপথ, এইসব উপাদান বা উপকরণ (equipment) সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তার অবকাশ থাকবে। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে যে একেবারে উদাসীন এ কথা অবশ্য বলি না, কেননা ইতিমধ্যে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোডের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। তখন অবশ্য শহরের বিস্তৃতি সরলরৈখিক রাখা সম্ভব হবে কি না তা বিবেচ্য।
আগেই বলেছি দক্ষ পরিকল্পনার অভাবে কোক্ ওভেন কলোনী সুশৃঙ্খল ও সংহত হতে পারেনি। প্রয়োজনের তাগিদে পরিকল্পনার ছকে অনেক কিছুই বেঁধে নিতে হয়েছে। তবু একথা অনস্বীকার্য, আধুনিক নগর গঠন প্রণালীর প্রকৃষ্ট প্রচেষ্টা সেখানে অবর্তমান। স্টীল টাউন, হেভী, ভিকার্স এদের কথা স্বতন্ত্র। বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে ওঠার এক

একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হতে পেরেছে। একথা স্বীকার্য সমগ্র দুর্গাপুরের নগর গঠনে গ্রাম ও নগরের সমন্বয়ের (Rural and urban synthesis) প্রচেষ্টা আছে। আধুনিক নগর-বিন্যাস প্রণালীর গোড়ার কথায় শিল্পী কারবুশিয়ের স্বীকার করেছেন আবহাওয়া চিরকালই পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত গুণনীয়ক। কারণ আবহাওয়াই দেশের কৃষি, আচার ও ধর্মে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের গভীরতম বাস্তব দিকগুলির সঙ্গে দুর্গাপুর স্থাপত্য শিল্পের একটি বোঝাপড়া আছে। ''দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'' থাকছে না। কারণ স্থাপত্য শিল্প অথবা নগর পরিকল্পনা এমনই একটি কলা-শিল্প যা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিত্রমানসকে বাস্তবে রূপ দেয়। নগর গঠনের দায়িত্ব মূলত যদিও স্থপতি শিল্পীর তবু নাগরিকের দায়িত্বও কিছুমাত্র কম নয়। স্থপতি এখানে শিল্পী, স্রষ্টা এবং নাগরিক অংশীদার। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যন্ত্রযুগের পূর্ব পর্যন্ত নগরগঠন কোন বিশেষ ব্যক্তির খেয়াল খুশির ওপর নির্ভরশীল ছিল। রাজনৈতিক কারণ যতটাই হোক না কেন, তার চেয়ে বেশি কার্যকর হত ব্যক্তিগত ইচ্ছা। দিল্লি থেকে রাজধানী কতবার সরেছে আবার এসেছে। কিন্তু বর্তমান চিন্তাধারা এগুলির সম্যক পরিপন্থী। একালে নগর গঠন বিশেষ অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট হয় এবং সেই গড়ার কাজে আমরা সবাই অংশীদার।

দুর্গাপুর নগর পরিকল্পনায় বর্তমান যুগের নগর বিবর্তনের একটি দ্বৈত ঘটনার সিদ্ধান্তকে (থিয়োরী অফ টুইন ফেনোমেনা) স্বীকার করা হয়েছে। ''নগর হবে একটি বৃহৎ অট্টালিকা আর গৃহ হবে একটি ক্ষুদ্র নগর'' অর্থাৎ কিনা গৃহবাস ও নগরের মধ্যবর্তী বিস্তৃতির (স্পেস) গুণগত পরিবর্তনকে আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা। নগরের বিস্তৃতি যেখানে সরলরৈখিক নয়, সেখানে এর ভাষা অন্যরূপ। নগরের বৃদ্ধি যেখানে সরলরেখায় তার ছবি সেক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। আমাদের গৃহকে বাসোপযোগী করতে গিয়ে অনেক কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করে থাকি। বস্তুত দুর্গাপুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরগুলি একটি একটি বৃহৎ অট্টালিকা এবং এক একটি মণ্ডল বা গৃহসমষ্টি (জোন) হয়েছে ক্ষুদ্র নগর।

বিগত দিনে আমরা দেখেছি নগরগুলি সাধারণভাবে রাস্তার সঙ্গে যুক্ত থাকত। অর্থাৎ প্রতিটি ঘরবাড়ি রাস্তাগুলিকে আঁকড়ে রাখত। যানবাহন চলাচলের জন্যেই রাস্তা এবং বসবাসের জন্য উন্মুক্ত স্থান (স্পেস)।

কিন্তু দুর্গাপুরের প্রতিটি শহরে জমি সম্বন্ধে যে আধুনিক ধারণা তা সক্রিয় বলা চলে। রাস্তাকে অনেকগুলি ধর্মে (function) বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন রাস্তা হয়েছে যানবাহনের স্বার্থে, জীবনীশক্তি যোগানোর উদ্দেশ্যে, বাসস্থানের নিমিত্তে, জল নিকাশের আর সবুজের সমারোহের জন্যে (way of Green)। এরা সবাই রাস্তা, এদের এই রাস্তার রাজত্বে বস্তুত এরা পরস্পর বিরোধী। একত্রীকরণ অসম্ভব। বৈপরীত্যের ধর্মকে মেনে নিয়েই এদের সহবাস। হেভী বা ভিকার্স কিংবা স্টীল অথবা কোক্ ওভেন কলোনীগুলিতে মোটামুটি উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হলেও রাস্তার ধর্মের আর একটি দিককে দেখা হয়নি। যদিও এর

বিরুদ্ধে স্থপতিদের অনেক কিছু বলার থাকতে পারে। যা দেখা যায় নি তা হল পায়ে হাঁটিয়েদের (পেডেস্টেইন) অধিকার। এর জন্যে যে উপযোগী পথের (side walk) প্রয়োজন স্থপাতিরা হয়তো স্বীকার করতে নারাজ।

আগেই বলেছি দুর্গাপুর শহরগুলি বিক্ষিপ্ত। এবং এদের বৈশিষ্ট্য অসম্পৃক্ততায়। এই আত্মনির্ভরশীল এক একটি ইউনিটকে যদি 'গোষ্ঠী' ধরা যায় তাহলে সমগ্র দুর্গাপুর নগর পরিকল্পনার একটি সার্থক রূপায়ণ হয়েছে একথা বলা চলে। কেন না, আধুনিক নগর গঠন রীতিতে অনেক ক্ষেত্রে "জেলা প্রকল্পের পদ্ধতি'কে (Method of district project) তথা 'গোষ্ঠী পরিকল্পনাকে, (Neighbourhood Planning) গ্রহণ করা হয়ে থাকে। খণ্ড খণ্ড রাজ্যের প্রকৃতি বা চিত্তগঠন যেমন হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নিজ নিজ এলাকায় স্ব স্ব স্বার্থে তার চলা ফেরা। এই আত্মকেন্দ্রিকতা বা অসম্পৃক্ততা রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। এবং বিভিন্ন শিল্প ভিন্ন ভিন্ন এলাকা ইজারা পাওয়ায় এই ত্রুটি সম্ভব হয়েছে। হয়তো অধুনা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সজাগ হয়েছেন। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা "দুর্গাপুর ডেভালপমেন্ট অথরিটি" (D.D.A) গঠন করেছেন। এর মূল উদ্দেশ্য হল একটি সুস্থ ও সংহত সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি আধুনিক নগর পত্তনের কাজ শুরু হয়েছে। যার নাম 'নিউ টাউনশিপ'। নিউ টাউনশিপের দক্ষ পরিকল্পনা (Master plan) পর্যবেক্ষণ করলে একথা প্রতীত হবে শিল্প নগবের (Industrial Township) জন্যে একটি সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে নির্দিষ্ট এলাকার নির্দেশ আছে। আধুনিক নগর চরিত্রে যা প্রয়োজন ভা মোটামুটি সন্নিহিত হয়েছে। স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, মিউসিয়াম, আর্ট গ্যালারি, ময়দান, ওরিয়েন্টাল পার্ক, শিশুউদ্যান, হাসপাতাল, স্কুল কলেজ আর সবুজের অরণ্য (Green belt)।

স্থাপত্যশিল্পের একই রীতির মূল সত্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্থানীয় আবহাওয়া রীতি ও আচারে অনুপ্রাণিত হয়ে নব পর্যায়ে এক যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। ফরাসী দেশের শিল্পী কারবুশিয়ের-এর প্রত্যয় ও রীতি-কৌশল আমাদের দেশে বিভিন্ন রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। দুর্গাপুরের এই নগর আধুনিক মনে হওয়ার পেছনে পূর্বোক্ত কারণটি বর্তমান। দুর্গাপুরের সর্বত্র সুরম্য গৃহবাস, অট্টালিকা ও তার স্থাপত্যই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্থাপত্যশিল্প বহুকাল মন্দির, সমাধি ও প্রাসাদে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে সাধারণের গৃহনির্মাণে বিশেষ কোন উৎকর্ষ এতাবৎকাল দেখা যায় নি। বর্তমানকালে গৃহভিত্তির গঠন পদ্ধতির দিকে বেশ দৃষ্টি পড়েছে। আলো, বাতাস, উত্তাপের সক্রিয় ভূমিকায় সে প্রতিষ্ঠিত। এই আলো-ছায়ার স্থাপত্যকে নানা পর্যায়ে, (Shading divices) নানা ধরনে কার্যকর করা হয়েছে। আমাদের মতো গরমের দেশে এর ব্যবহার গৃহবাসীর তথা জাতির জীবনকে অনেক সুখী করেছে। জানলা দিয়ে রোদ আসা, ও প্রচণ্ড উত্তাপকে আয়ত্তে আনতে গেলে এর বিশেষ প্রয়োজন। ফিন্ (fins) কিংবা লুভার (Louver) বা ওভার হ্যাং (over hangs) অথবা এগক্রেট (eggcrate) ক্যানভাস ক্যানোপি (Cenvas canopy) ঐগুলি বর্তমান যুগের স্থাপত্যের এক নূতন সংযোজন। দুর্গাপুরের বাড়ি ঘরে এগুলি দুর্লক্ষ্য নয়।

খামচা খামচা মেঘের মতো বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড শহরে আর মুঠো মুঠো ছড়িয়ে থাকা গুচ্ছ গুচ্ছ গৃহসজ্জায় দুর্গাপুরের দেহটি অলংকৃত। 'ডি-এন', 'ই এন', রাতুরিয়া, স্টীল, হেভী, ভিকার্স। প্রকৃতির সুষম ভূমিকায় তার অঙ্গসজ্জা। শাল-পিয়ালের আড়ালে, মহুয়ার ফাঁকে ফাঁকে সুদর্শন, সুচারু গৃহবাস, ছুঁড়ে দেওয়া এক টুকরো ফুলন্ত বাগান আশ্চর্য সুষমায়, ঐশ্বর্যে দীপ্যমান। সামনে লেখা প্রাইমারী স্কুল। শাল গাছের ফাঁকে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে শান্ত ছেলের মতো এক বাড়ি। মাঝদেয়ালে কংক্রীটের জালি। ছেলের দল ছুটোছুটি করে। শাল মহুয়ার ছায়ায় ঘেরা আলোয় এদের ক্লাস বসে না, যা দেখা যাবে শান্তিনিকেতনে। তবু পরিচ্ছন্ন এই শিশুনিকেতন। প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা। সামনে কালো রাস্তা, সবজে ঘাসের পাড়, পাশে জলনিকাশের ড্রেন, পরে একটুকরো জমি, শাল পিয়ালের অগোছালো দাঁড়িয়ে থাকা, তারপরে বাড়ি।

একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে। আমরা দেখেছি, আগেকার দিনে যেখানে যত রেল কলোনী ও কারখানার স্টাফ কোয়ার্টার্র তৈরী হত সেখানে একটি নীতি মানা হত। নীতিটি অবশ্য এই যে, পদমর্যাদা ও মাস মাইনের হিসেব কষে এক এক সম্প্রদায় এক এক ধরনের এলাকায় থাকতেন, গৃহাদি পেতেন। এই ব্যবস্থা আগেকার দিনে চলেছে, কিন্তু এর ফলে আমাদের সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষা হয়নি, সমাজবাস-সুলভ চেতনাও জাগে নি। দুর্গাপুরের গৃহ পরিকল্পনায় এই পুরোনো নীতি না থাকই বাঞ্ছনীয়।

ই-এন্, ডি-এন, সি-এন কিংবা 'এ' টাইপ, 'বি' টাইপ, 'সি' টাইপ প্ল্যান যদি না অপছন্দ হয় তবে দুর্গাপুর নগর ভাল লাগারই কথা। এইসব আদর্শ নকশা (টাইপ প্ল্যান) এক ধরনের বিধিনিষেধকে মেনে চলে। স্থাপত্যে এই বিধিনিষেধের পরিণতির কথা আমাদের অজানা নয়। তবু মনে হয় নানা বর্ণের ও নানা রূপের ফুল একত্রে ফুলদানিতে সাজালে তার বিচিত্র শোভা একই জাতের ফুল দিতে পারে না।

বিশ্বাস করি, 'নিউ টাউনশিপে' এ ধরনের একঘেয়েমি হয়তো থাকবে না। সেখানে ব্যক্তি ফুলের বাসর সাজাবে আপন আপন রুচি আর সৌন্দর্যবোধে। নতুন দুর্গাপুর স্থপতি শিল্পের একটি আদর্শ নগরে (Archetype) রূপায়িত হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

□ 'দেশ' ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৫ □
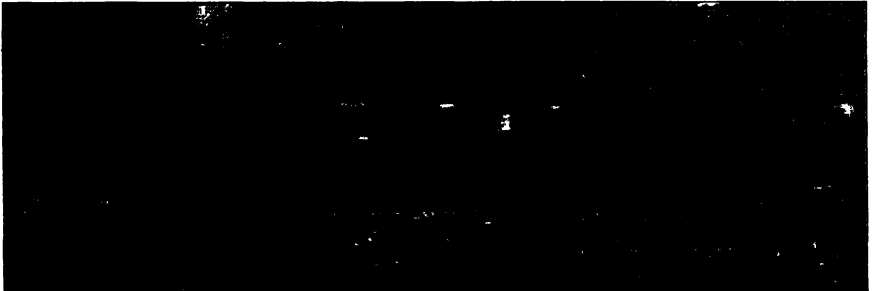
দুর্গাপুর প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক্-শিল্পায়নের যুগ

অশোক দাস

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের কোনও এক শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যায়, অথবা হেমন্তের কোন এক গোধূলিতে রানিগঞ্জ মহকুমার এগরা বা নারায়ণকুড়ি গ্রামে গৈরিক দামোদরের তীরে ক্ষয়ে যাওয়া মাটির নীচে পাওয়া কালো পাথরের উনুনে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আগুনের তাপ নিচ্ছিল হয়ত কোনও ধান-পাহারা-দেওয়া কৃষাণ অথবা মোষ-চরিয়ে-ক্লান্ত কোনও রাখাল বালক। আগুনের শিখা এক সময় নিভে গেল, কিন্তু ওরা দেখল যে কালো পাথরগুলো গনগনে আগুনে তখনো লাল। তারা ভাবল এই পাথরে হয়ত দামোদরের বা সংলগ্ন মহুয়াবনের কোন প্রেতাত্মা ভর করেছে। তারা শুকনো ডালপালা জ্বলতে দেখেছে, খড় জ্বলতে দেখেছে, কিন্তু পাথর জ্বলছে! এ তো ভয়ের কথা! তারা তখন জানত না, এ কালো পাথর নয়, কালো হীরে— ব্রিটিশ বণিক যার নাম দিয়েছে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। হযত বা হীরের চেয়েও দামি। জহুরি জহর চেনে। সাদা বেনেদের চোখ এড়াল না। তারা বুঝল যে সাত রাজার ধন রয়েছে এই মাটির তলায়। এ খবর পৌঁছাল ছোটনাগপুরের কালেক্টার হার্টলির কাছে। মাটির উপরে সোনার ধান নয়, মাটির নীচে থরে থরে সাজানো কালো হীরে তাদের চাই-ই। এদেশে তাদের রুটি কতদিন পর্যন্ত বরাদ্দ আছে, কে জানে! অতএব, যত তাড়াতাড়ি পারো লুঠে নাও। তাই, হার্টলি সাহেব গার্নার নামে আরও একজন ব্রিটিশ বণিককে নিয়ে এদেশেরই কালো মানুষগুলোকে ক্রীতদাস বানিয়ে এই মাটিতে গাঁইতি, শাবল দিয়ে আঘাত করলেন। কেঁপে উঠল ধরিত্রী, অরণ্যের ঘুম ভাঙল। সেটা ছিল ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ।

তিনি কয়লা তোলায় কতখানি সফল হয়েছিলেন জানা যায় না। তার বেশ কয়েক বছর পর ওয়ারেন হেস্টিংস এই অঞ্চলের কয়লা অনুসন্ধানের জন্য রুপার্ট জোন্সকে নিয়োগ করেন। তাঁরই রিপোর্ট অনুযায়ী পাকাপাকিভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কয়লা তোলা শুরু হল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই খনিগুলি ক্রয় করে আলেকজান্ডার কোম্পানি, জেসপ কোম্পানি কয়লা তোলা শুরু করে দামুলিয়া এবং নারায়ণকুড়িতে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে এর মালিকানা চলে যায় গিলমোর হামফ্রে কোম্পানির হাতে। এরপর কয়লা ব্যবসায় এগিয়ে আসেন দেশীয় মালিকেরা। প্রথম এলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কার-টেগোর এন্ড কোম্পানি। পরে এই কোম্পানিটির নাম হয় বেঙ্গল কোল কোম্পানি। কয়লাখনি জাতীয়করণের আগের দিন পর্যন্ত এটিই ছিল সবচেয়ে বড় কোম্পানি। এছাড়া ভিক্টোরিয়া কোল কোম্পানি, ইকুইটেবেল কোল কোম্পানি, বার্ড এন্ড কোম্পানি, নাগ কোম্পানি, এন্ড্রু য়ুল এন্ড কোম্পানি, করমচাঁদ থাপ্পার ইত্যাদি দেশি-বিদেশি বহু কোম্পানি এসে এই অঞ্চলের মাটির তলাটি একেবারে ফোঁপরা করে দিল। সে ইতিহাস অনেকেরই জানা। ধানবাদ-ঝরিয়া চাইবাসা সিন্ধ্রি থেকে শুরু করে কাজোরা উখরা পাণ্ডবেশ্বর পর্যন্ত দীর্ঘ একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চলল কয়লা লুণ্ঠন।

১৮৫৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে নামে একটি কোম্পানি এল। পূর্বাঞ্চলে প্রথম রেল চলল হুগলি পর্যন্ত। ১৮৫৫ সালে কয়লা তুলতে এই লাইন বিস্তৃত হল রানিগঞ্জ অবধি। ১৮৬৩ সালে অন্ডাল থেকে বেরিয়ে ইকড়া-চুরুলিয়া-গৌরাংডি হয়ে সীতারামপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হল, আরেকটি শাখা ইকড়া থেকে জামুড়িয়া-বরাবনি-চিঁচুড়িয়া হয়ে সীতারামপুরে এসে মিশলো। তখন গৌরাংডি ছিল কয়লা উত্তোলনের বিশাল কেন্দ্র। এরপর ডিহি শেরগড়ে যখন ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপিত করার পরিকল্পনা হল তখন ১৮৮৩ সালে আসানসোল পর্যন্ত এবং ১৮৮৫ সালে বরাকর পর্যন্ত রেল চলল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে আসানসোল থেকে আদ্রা-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-টাটা-চক্রধরপুর ইত্যাদি অঞ্চলে রেলের ব্যবসা শুরু করল। ওদিকে জামসেদপুরে, এদিকে কুলটি এবং বার্নপুরে লৌহ ইস্পাতের কারখানা; বার্ন স্ট্যান্ডার্ডের ওয়াগনের কারখানা; রানিগঞ্জের কাগজের কারখানা; গলফাবাড়ি, কুমারডুবি, জামগ্রাম, রানিগঞ্জে একে একে সিরামিকের কারখানা গড়ে উঠল। রানিগঞ্জ নয়, আসানসোল হয়ে উঠল প্রাণচঞ্চল এক শিল্পনগরী। আসানসোল এবং গৌরাংডিতে রেললাইন ও কয়লাখনি খোলার সুবাদে বেশ কিছু ইউরোপীয়ান এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বসবাস করতে শুরু করল। একদা কাঁকসা, ফরিদপুর, রানিগঞ্জ, বরাবনি এবং নিয়ামতপুর থানা নিয়ে গড়ে ওঠা রানিগঞ্জ মহকুমা তার কৌলীন্য হারাল। আসানসোল মহকুমাতে পরিণত হল। পরবর্তীকালে ইউনিয়ন বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হল। তখন ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ।

যখন হাওড়া-রানিগঞ্জ রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল, তখনই লাট গোপীনাথপুর মৌজায় দুর্গাপুরেও ট্রেন থামত। গ্রাম ছোট, স্টেশন আরও ছোট। আশে পাশে রয়েছে আরও অনেক ছোট ছোট গ্রাম। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দামোদর । যার পরিচিতি তখনও 'দুঃখের নদী' বলে, যেমন একদা হোয়াং-হো কে চীনের দুঃখ বলা হত। কেউ কেউ বলেন যখন দুর্গাপুর স্টেশনে প্রথম ট্রেন থামল, তখন সেখানে ছিল কয়েকটি মুদির দোকান, কয়েকটি হাড়ি-কুড়ির দোকান এবং একটি মাত্র পুঁতিমালা ডোরের দোকান। কয়লা সরবরাহ ছাড়াও কাঠ রপ্তানি করাও ছিল বেঙ্গল কোল কোম্পানির অন্যতম ব্যবসা। তাই সম্ভবত কাঠ সরবরাহের জন্যও গোপীনাথপুর মৌজায় একটি স্টেশনের প্রয়োজন ছিল এদের। এই কারণেই দুর্গাপুর স্টেশনের পত্তন হল। তখন কে জানত, সেই ছোট দুর্গাপুর আজ ভারত, তথা এশিয়ার বৃহত্তম শিল্পনগরীতে পরিণত হবে একদিন! আসানসোলে যখন একের পর এক নতুন কারখানা গড়ে উঠেছে তখন দুর্গাপুরেও কাঠ, কয়লা এবং টালি তৈরির উপযুক্ত মাটির সন্ধান পেয়ে বার্ন কোম্পানি একটি টালির কারখানা খুলল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। পরে এই কোম্পানি একটি সিরামিক ইউনিটও খুলেছিল। বলতে গেলে তখনই দুর্গাপুরে শিল্পায়নের সূচনা।

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ

'উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে' সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে ধরিত্রীর এই কঙ্করময় অঞ্চলটি পাথরমাটি দিয়ে গঠিত হয়েছিল, যাকে ঘিরে রাজমহল থেকে শুরু করে বালেশ্বর স্পর্শ করে ওড়িষ্যার কেওনঝড় পর্যন্ত এক অনুচ্চ শৈলশ্রেণী, দূর থেকে যাকে আশোকচক্রের মতো মনে হয়। এই বনরাজিনীলা শোভিত পাহাড়গুলির কি সুন্দর সব নাম - শুমরু, ত্রিকুট, মালঞ্চ, ফুলঝুরি,

ধনঝুরি, বোদমা, সুন্দরপাহাড়ি, পঞ্চকোট (পাঁঞ্চেত), জয়চণ্ডীপাহাড়, দলমা এবং আরও কত কি। এই পাহাড়গুলির আশেপাশে প্রবাহিত হচ্ছে সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, গন্ধেশ্বরী, দামোদর, বরাকর, অজয়, ময়ূরাক্ষী এবং অজস্র ছোটবড় পাহাড়ি নদী, যেগুলি শীতে ক্ষীণতোয়া, বর্ষায় দুকূলপ্লাবী; তারই মাঝে শাল, মহুয়া, কুর্চি, ধ, বহেড়া এবং আরও বৃহৎ বনস্পতির কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ যে শক্ত মাটি, সেই অরণ্য-প্রান্তরের কখনও নাম হয়েছে সুহ্ম, কখনও রাঢ় বা রাঢ়পুরী, কখনও ঢেক্করী বা ঢেকুরগড়, কখনও গোপভূম। ব্রিটিশ রাজশক্তি এর নাম দিয়েছিল জঙ্গলমহল, অস্ট্রিকভাষীরা বলত বিরভূম (অস্ট্রিক ভাষায় 'বির্' শব্দের অর্থ জঙ্গল)। বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে এই অঞ্চলটিকেই প্রাকৃতিক বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে প্রাচীন বলেছেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় এই অঞ্চলকেই ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত অজলা, ঊষর, জঙ্গলময় ভূমি বলেছেন। এখানে তিন ভাগ জঙ্গল, একভাগ গ্রাম, স্বল্পভূমি মাত্র উর্বর। ভবদেব ভট্টের একাদশ শতকের লিপিতেও এর উল্লেখ আছে। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ এই অঞ্চলকেই বলেছেন কজঙ্গল। দুর্গাপুরের বর্তমান ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গাছের গুঁড়ি এত মোটা হত যে তার ভিতর দিয়ে দুখানা ট্রেন চলে যেতে পারত। সেগুলিই মাটির তলায় কয়লাতে পরিণত হয়েছে।

এই রাঢ় অঞ্চলের গভীর অরণ্য ছিল আদিম মানবের লীলাভূমি। এখনও সেই সব শিশুমানবদের অমার্জিত, স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত প্রস্তর অথবা বৃক্ষশাখা অথবা পশু-অস্থি নির্মিত আদিম অস্ত্রের ভগ্নাবশেষ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মেদিনীপুরের মাটির অগভীর স্তরে, পর্বতগুহায়, গ্রামে প্রান্তে অবস্থিত কোনও টিলায়, অথবা নদীর তীরে এখনো পাওয়া যাচ্ছে। দুর্গাপুরের বীরভানপুর, কাঁকসা, আড়া, সগড়ভাঙ্গা, গোপালপুর, ভরতপুর, প্রতাপপুর, বামুনাড়ী গ্রামের কৃষিজমিতে, পুকুরের পাঁকের তলায় সেই সব অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ, সেই সঙ্গে গবেষক ও পণ্ডিতগণ, অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে সে অন্ধকারময় যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনও আবিষ্কৃত হচ্ছে। শুশুনিয়া পাহাড় এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শনগুলির আবিষ্কারক পরেশ দাশগুপ্তের মতে, প্রায় এক লক্ষ বছর আগে এই অঞ্চলে আদিম মানবগোষ্ঠী বিচরণ করত। দামোদরের তীরে এবং সন্নিহিত গ্রামগুলিতে ক্যানেল তৈরির সময় এবং স্থানীয় উৎসাহী মানুষ ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে খননকার্যের ফলে ১৯৩২ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে মোট ২৮২ খানা আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি মাইক্রোলিথিক যুগের বলে প্রমাণিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে নাতলা ফলক (Blades), অর্ধচন্দ্রাকৃতি আয়ুধ (Lunate), সূচীমুখ আয়ুধ (Point), ছিদ্র করার যন্ত্র (Borers), খোদাই করার যন্ত্র (Burins) এবং চাঁছার যন্ত্র (Scrapers)। মাকড়া পাথরের (Laterite) একটি অঞ্চল নিরীক্ষা করার সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ২২টি আয়ুধ নির্মাণ স্থল আবিষ্কার করেছেন। এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব আধিকারিক পরেশ দাশগুপ্তর এক বুলেটিনে। ১৯৬২-৬৫ সালের মধ্যে অজয়-কুনুর অববাহিকায় খননকার্য

চালিয়ে বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তে আরও কয়েকটি প্রাক্-ঐতিহাসিক স্থল আবিষ্কৃত হয়। 'দুর্গাপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় সুদীর্ঘ দশ-বারো বছর ধরে দুর্গাপুর অঞ্চলের সমস্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে এই অঞ্চলের প্রামাণ্য ইতিহাস সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন। শুধু লোককাহিনী বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে নয়, স্বয়ং অক্লান্ত পরিশ্রমে পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলি আবিষ্কার করেন এবং চোখে দেখে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছান। দুর্গাপুরের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থখানি থেকে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গেছে। প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের মতো এই অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদগুলি বিচার করে বোঝা যায় যে প্রস্তরযুগ অতিক্রম করে তাম্রপ্রস্তর যুগেও এখানে এক সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং পরবর্তী লৌহযুগ পর্যন্ত উভয় সভ্যতার সহাবস্থান ছিল। তাঁর ধারণা, এখানে লৌহ ব্যবহারকারী জনবসতির সঙ্গে পরবর্তী সময়ে মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রের সভ্যতার (Culture of North Indian Black Polished Pottery) সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পারুলিয়া গ্রামের 'রানিপোড়ার ডাঙ্গা' এবং অঙ্গদপুরের 'গ্রামরক্ষীতলা'য় খননকার্য চালালে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ না হোক, প্রাচীন যুগের কিছু নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে বলে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা।

প্রাচীন যুগ খ্রিস্ট পূর্ব ৫০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্রে' রাঢ়-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জনপদ আবার সুরভ (সুহ্ম) এবং বজ্জ (বজ্রভূমি) নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে আচারাঙ্গ সূত্রে যে ভূমিকে বজ্জ ভূমি বলা হয়েছে তা হল রাঢ়ের উত্তরাংশ। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে রাজা সিংহবাহুর মাতুল বাংলা দেশের রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে শেরগড় পরগণার সিংহারণ নামে যে নদী আছে তারই তীরে সিংহপুর নামে একটি প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখানে সিংহবাহু রাজত্ব করতেন। সিংহপুর নগর ধ্বংস হয়ে এর নাম হয় সিংহারণ্য। দুর্গাপুরের নিকটে প্রবাহিত সিংগারণ নদীটির নাম সিংহরণ্য থেকেই হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রভাস সেন এবং ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মত স্বীকার করেন না। মহাভারতের আদিপর্বে পূর্ব দেশাধিপতি ক্ষত্রিয় রাজা বলির মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভজাত পাঁচপুত্রের পাঁচটি রাজ্যের কথা বলা হয়েছে; সেগুলি হল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সূহ্ম। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এই সুহ্ম দেশকেই রাঢ় দেশ বলেছেন। অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর Sibi King Vessantara and His Country নামে একটি গবেষণা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে প্রাক্-বৌদ্ধযুগে শিবি-র রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগর, অর্থাৎ মঙ্গলকোট। তাঁর রাজত্ব কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে সময় রাঢ় রাজ্য, শিবি-র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অনুমান করা হয়। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস রচিত 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে বর্ণিত গঙ্গারিডি নামে এক পরাক্রান্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বাংলাকেই অনেকে সেই রাজ্য বলে মনে করেন এবং গঙ্গারিড়ি শব্দটি যে গঙ্গা এবং রাঢ় এই দুইটি শব্দের সমন্বয়ে রচিত এই মতেরও অনেকে সমর্থক আছেন। আবার অনেকে 'গঙ্গাহৃদি' শব্দটির বিকৃতরূপ 'গঙ্গারিডি' বলে মনে করেন।

অবিভক্ত বাংলায় দ্বিতীয় প্রাচীনতম শিলালিপিটি আবিষ্কৃত হয় শুশুনিয়া পাহাড়ে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এর পাঠোদ্ধার করেন। লিপিটি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। লিপিটি পুষ্করণার অধিপতি মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মা চক্রস্বামীর দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। এই চন্দ্রবর্মার রাজধানী ছিল বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার পোখন্না (পুষ্করণা-পোখন্না) গ্রামে। পোখন্না দামোদরের অপর তীরে অবস্থিত এবং দুর্গাপুর স্টেশনের সন্নিকটেই এর অবস্থিতি। চন্দ্রবর্মা একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। এলাহাবাদের দুর্গমধ্যে একটি শিলাখণ্ডে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করার কথা উল্লেখ আছে। এই চন্দ্রবর্মার রাজত্বও রাঢ় রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মনে হয়। কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যেও সুহ্মদেশের উল্লেখ আছে। সুহ্মবাসীগণের নতজানু হয়ে রঘুর আনুগত্য স্বীকারের কাহিনীটি অনেকে রূপক বলে মনে করেন। এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে সুহ্মদেশবাসীগণ যে গুপ্ত রাজাদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন সেই ইতিহাসই রূপকচ্ছলে বলা হয়েছে। তবে গুপ্ত রাজারা বেশিদিন এখানে রাজত্ব করেছিলেন বলে মনে হয় না। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদের কাণসোণ) রাজধানী স্থাপন করে নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলে ঘোষণা করেন। অনেকে কাঞ্চননগরকেই কর্ণসুবর্ণ বলে দাবি করেন। অনুকূলচন্দ্র সেন এবং নারায়ণ চৌধুরী এই দাবি করেছেন। যাই হোক, আমাদের আলোচ্যমান রাঢ় রাজ্য তখন শশাঙ্কের অধীনে ছিল। বুদবুদ থানার অন্তর্গত ভরতপুর গ্রামের নিকটে একটি টিলা থেকে একটি বৌদ্ধ স্তূপ সহ এগারোটি বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং সে সময় এ-অঞ্চলে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল একথা অনুমান করা বোধ হয় ভুল হবে না। 'দুর্গাপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাঁকসার দেবপদ দাসের নিকট একটি ব্রোঞ্জের লোকেশ্বর বুদ্ধমূর্তি ও একটি থম্ভল মূর্তি উদ্ধার করেছেন। বৌদ্ধমতে থম্ভল যক্ষরূপী এবং ধনাদির দেবতা। এছাড়াও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ভরতপুরে যে প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শনগুলি আবিষ্কার করেছেন, তাতে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল এবং এক প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মাৎস্যন্যায়ের যুগ আসে। তারপর পালরাজাদের শাসনের সূচনা হয়। এই সময়েই প্রকৃতপক্ষে বাংলাভাষা পূর্বমাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নতুন জন্মলাভ করে। এই সময়েই রচিত হয় চর্যাপদ। বাংলাভাষা সৃষ্টির সাথে সাথে অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার সাথে এর পার্থক্য সূচিত হয়। বাংলাভাষাভাষী জনগণ বাঙালি জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর থেকেই দুর্গাপুর তথা বাংলায় প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়।

প্রাচীন রাঢ়ের ইতিহাস (একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী যুগ)

ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মালদোয়ার রাজ এস্টেটে আবিষ্কৃত একটি তাম্রলিপির বঙ্গানুবাদ করেন। তা থেকে জানা যায় যে শ্রীধূর্ত ঘোষের পুত্র ছিলেন শ্রীবাল ঘোষ, তাঁর পুত্র ধবল ঘোষ এবং ধবল ঘোষের পুত্র ঈশ্বর ঘোষ রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। আমাদের পূর্ববর্ণিত সুহ্মই যে রাঢ় একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এছাড়া কৃষ্ণ মিশ্র রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে (১১শ শতাব্দীতে রচিত) রাঢ়ের উল্লেখ আছে এবং যে স্থাননামগুলি ব্যবহার করা

হয়েছে তার কোনোটাই কাল্পনিক নাম নয়। রাঢ়ের অধিপতি কে ছিলেন তা নিয়ে ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতভেদ আছে। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে ঈশ্বর ঘোষের পূর্বপুরুষ প্রথম মহীপালের কাছ থেকে রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ রাঢ় রাজ্যটি উপহার পান। আবার পালরাজগণ কেবলমাত্র গৌড়েরশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং কখনও রাঢ় রাজ্য তাঁদের অধিকারভুক্ত ছিল কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। ঈশ্বর ঘোষের নামের আগে 'মহামাণ্ডলিক' এই উপাধিটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর রাজধানী ঢেক্করী বলে পরিচিত। অপরদিকে প্রশ্ন থেকে যায় যে এই ঈশ্বর ঘোষই কি ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ইছাই ঘোষ? ইছাই ঘোষের বাবার নাম সোম ঘোষ বলে উল্লেখ আছে এবং তাম্রলিপিতে ঈশ্বর ঘোষের বাবার নাম লেখা আছে ধবল ঘোষ। যদি এরূপ অসামঞ্জস্য থেকে থাকে তাহলে তা অস্বাভাবিক নয়, কারণ মঙ্গলকাব্য হচ্ছে সাহিত্য এবং তাম্রলিপিটি হচ্ছে ঐতিহাসিক উপাদান। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বন করে কাব্যরচনাকালে কবিগণ অনেক কাল্পনিক চরিত্রের উপস্থাপনা করেছেন, এরূপ প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলকাব্যে উল্লেখ আছে যে ইছাই ঘোষ তাঁর আশ্রয়দাতা কর্ণসেনকে উৎখাত করে ঢেকুরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 'ঢেকুর' বলতে কোন্ স্থানকে বোঝাচ্ছে তা জানতে হলে বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়। তিনি বলেছেন- 'পূর্বে লোহার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাতা ঢেকুরু (ঢোকরা?) নামে এক জাতি ছিল। এখনও তাদের আস্তিত্ব আছে। এই লোহার ঢেকুরু জাতির বসবাসের প্রাধান্যের জন্যেই এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল ঢেক্করী বা ঢেকুর।' রাঢ়ের রাজধানী ঢেকুর ছিল কিনা, সে-সম্পর্কেও কোনও ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ নেই। তাম্রলিপি অনুযায়ী ঢেক্করী জটোদয়া নদীর তীরে অবস্থিত এবং ঢেকুর অজয় নদের তীরে অবস্থিত বলে ড. নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ঢেক্করী এবং ঢেকুর এক নয়। কালিকাপুরাণে বর্ণিত জটোদয়া > জটোদা > জয়া নদী কামরূপে প্রবাহিত। গোয়ালপাড়ার গৌরীপুর রাজ্যের জমিদারি 'ঢেকরী' নামে পরিচিত। অতএব তাম্রলিপিতে বর্ণিত ঈশ্বর ঘোষ এবং ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ এক ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থেকে যায়। তবে অজয় নদের তীরবর্তী ঢেকুর, কাঁকসা থানার গৌরাঙ্গপুরের ইছাই ঘোষের দেউল, দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীসংলগ্ন গ্রাম ইছাপুর ইত্যাদি নিদর্শনগুলি ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষের রাজ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে। কামরূপ অবশ্য রাঢ়ের বহুদূরে অবস্থিত। সে দিক দিয়ে বিচার করলে কামরূপ রাজ্যের রাজা কিভাবে রাঢ়ধিপ হলেন সে বিষয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আমরা সেই বতির্কে না গিয়ে দুর্গাপুরের পার্শ্ববর্তী আড়া, কালীনগর, বামুনাড়া, গৌরাঙ্গপুর, ইছাপুর ইত্যাদি গ্রামগুলি রাঢ় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করব।

'দুর্গাপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা প্রয়াত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের মতে দুর্গাপুরের মুচিপাড়া-শিবপুর রাস্তায় মুচিপাড়া থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তরে আড়া বা আড়রা গ্রামখানি রাঢ়াপুরীর স্মৃতি বহন করছে। আড়া নামটি রাঢ়া শব্দেরই অপভ্রংশ বলে তিনি মনে করেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর উক্তির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যে প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করেছেন, সেগুলি হল —

(১) কিংবদন্তী অনুযায়ী আড়া, বামুনাড়া, গোপালপুর, রূপগঞ্জ, কালিগঞ্জ এবং গড়ের জঙ্গলের অংশবিশেষ নিয়ে এক সময় রাঢ়াপুরী নামে এক সমৃদ্ধ নগরী ছিল। কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন স্থান।

(২) আড়া গ্রামের দক্ষিণে এবং রাঢ়েশ্বর শিবমন্দিরের পশ্চিমে পোড়েলপুকুর এবং আকুলেশ্বরী (আকুড়েশ্বরী > আকুলেশ্বরী) তলা গ্রাম্য দেবতার থান (>স্থান) টি এই অঞ্চলে ডোম সম্প্রদায়ের গৌরবের সাথে বসবাসের পরিচয় বহন করে। ডোম সম্প্রদায়ের পুরোহিতদের পোড়েল বলা হয় এবং এই সম্প্রদায়ের কারো কারো উপাধি আঁকুড়ে। এই ডোম জাতি অতীত বাংলার সৈনিক সম্প্রদায়। (আগা ডোম এবং বাঘা ডোম নিয়ে তো ছেলেভুলানো ছড়াই তৈরি হয়ে গেছে - মন্তব্য লেখকের)।

(৩) পোড়েল পুকুর থেকে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। আড়া গ্রামের বিখ্যাত গায়ক প্রয়াত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুরূপ একটি প্রস্তরমূর্তি পেয়েছেন; মূর্তিটি শীতলাদেবীর। অন্যান্য প্রস্তর মূর্তিগুলি সযত্নে রক্ষিত না হওয়ার ফলে অপসারিত হয়েছে।

(৪) আড়া গ্রামের দক্ষিণে 'চৌঠি' খেলার মাঠটিতে সৈনিক সম্প্রদায় যুদ্ধের মহড়া নিত। এই সৈনিকেরা ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

(৫) আড়া গ্রামের ধর্মরাজ থানে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধমূর্তিটি এই অঞ্চলের প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

(৬) গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে 'গড়দুয়ার' বলে পরিচিত অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কার করেন, যাতে মোট ১১টি খণ্ডচিত্র অঙ্কিত আছে, যার অধিকাংশই হর-পার্বতীর লীলামূর্তি।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই পোড়েল পুকুর এবং 'রমজা' নামে কিংবদন্তী-বিজড়িত আরেকটি পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করলে, সেই সঙ্গে মাঠ ও টিবিগুলিতে খননকার্য চালালে এই অঞ্চলের প্রাচীনত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাঁর মতে, দেউলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্যামারূপার ভক্ত ইছাই ঘোষ পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে জটোদয়া নদীতে গিয়ে সেখানে তাম্রলিপিতে জনৈক ব্রহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন — এই মতটি মেনে নেওয়া যক্তিযুক্ত। শ্যামরূপা তান্ত্রিক দেবী এবং তান্ত্রিক দেবীর ভক্তের পক্ষে কামরূপ এবং কামাখ্যায় তীর্থদর্শন করতে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এছাড়া ইছাই ঘোষ প্রকৃতপক্ষে কোনও রাজা মহারাজা ছিলেন কিনা, সে সম্পর্কেও চিন্তা করা দরকার। তিনি ছিলেন ত্রিষষ্ঠীগড়ের মহামাঙ্গলিক অর্থাৎ তেষট্টিটি গড়ের অধিপতিদের নেতা। অমরারগড়, পানাগড়, বলাগড়, রাজগড় (দেবশালা) নরোত্তমের গড় (চুরুলিয়া), শেরগড় (উখরা) ইত্যাদি স্থানগুলি সেই গড়গুলির স্মৃতি বহন করছে। এখনো আসানসোল দুর্গাপুরের বহু গ্রামে গড়ের জঙ্গল-এর অস্তিত্ব বর্তমান। চুরুলিয়ার যে জঙ্গলটি অজয় তীর ধরে গৌরাংডির আলিগঞ্জ মৌজার মীর্জাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার একাংশের নাম গড় দেমোর জঙ্গল মাইথনের দেবী কল্যাণেশ্বরী যে ইছাই ঘোষের আরাধ্য শ্যামারূপা - এই কিংবদন্তী এখনও প্রচলিত। একটি ভাদুগানে আছে—

পুর্ববাড়ি সেন পাহাড়ী ছিলেন মা কল্যাণী গো
শ্যামারূপা নাম রেখেছি গহনবাসিনী গো।

উল্লেখ্য যে রাঢ়ের এই অঞ্চলটিকে সেনপাহাড়ী বলা হত। প্রবাদ আছে যে ইছাই ঘোষের জামাতা শ্যামারূপার মূর্তিটি নিয়ে গিয়ে মাইথনে প্রতিষ্ঠা করেন। মাইথন মস্তৃস্থন্য > মাইথন?) তখন মঙ্গলকোটরাজের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল এবং ইছাই ঘোষের জামাতার নাম ছিল কল্যাণশেখর। সম্ভবত তাঁরই নাম অনুসারে অথবা তাঁদের বংশের নৃপতিদের নামের সাথে 'শেখর' শব্দটি যুক্ত থাকায় মানভূমের পঞ্চকোট রাজ্যের নাম ছিল শিখরভূম। শিখরভূম প্রচলিত ঝুমুর গানকে শিকরি ঝুমুর বলা হয়।

ইছাই ঘোষের পরবর্তী রাঢ় রাজ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগ

ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত হয়েছে যে ইছাই ঘোষ লাউসেন কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন এবং ঢেকুরে রাজত্ব করেছিলেন। তারপর ঢেকুরের লাউসেন বা তাঁর বংশধরদের আধিপত্য ছিল কিনা তার কোনও উল্লেখ নেই। ঢেক্করীর পরবর্তী রাজা ছিলেন প্রতাপসিংহ। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে প্রতাপ সিংহের বর্ণনা আছে। ঐতিহাসিকদের ধারণা ইস্পাতনগরীর উত্তরে নাচন গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রতাপপুর গ্রামটিই চিল এই প্রতাপসিংহের রাজধানী। বর্তমানে গোপালমাঠ-জামগড়া বাসরুটের মধ্যে প্রতাপপুর গ্রামটির অবস্থান। তবে গ্রামটিতে এখনও কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যা থেকে প্রতাপপুর গ্রামটিকে প্রতাপসিংহের রাজধানী বলা যায়। পারুলিয়া গ্রামটি এর দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে 'রানি পোড়ার ডাঙা' বলে একটি ডাঙায় একটি প্রাচীন বাড়ির ভগ্নাবশেষকে স্থানীয় লোকেরা রাজবাড়ি বলে মনে করেন। এখানে কয়েকটি পাথরের মূর্তিও নাকি পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায় এই বাড়ির অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্মালম্বী ছিলেন। স্থানীয় কুনুর নদীর তীরের শ্মশানঘাটটির নাম সতীঘাটা, যা সহমরণের স্মৃতি বহন করে চলেছে। বাংলাদেশে পালবংশের রাজত্বকালে রাঢ় অঞ্চলে প্রতাপসিংহ রাজত্ব করেছিলেন।

পালবংশের পতনের পর বাংলা দেশে সেনবংশের রাজত্বের সূচনা হয়, তার আগে অর্থাৎ যুগসন্ধিক্ষণে পালবংশের অবক্ষয় ঘটলে কলিঙ্গের গঙ্গবংশের নৃপতিগণ এই অঞ্চল অধিকার করেন। প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুর্গাপুরের বীরভানপুর গ্রামে একটি প্রাচীন সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তাঁর অনুমান মন্দিরটি গঙ্গবংশের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লেখকের এ-ও অনুমান যে নরসিংহদেবের পুত্র ভানুদেবের নামেই এই গ্রামটির নাম বীরভানপুর। 'রূপায়ণ' পত্রিকার ১৩৮৪ সালের শারদ সংকলনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে শ্যামসুন্দর শুকুল এই মত সমর্থন করেছেন। অতঃপর 'দুর্গাপুরের ইতহিাস' গ্রন্থের লেখক তাঁর মতকে যুক্তিসহকারে ও আড়া গ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্তিগুলিকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এরপর গঙ্গবংশের হাত থেকে কিভাবে রাঢ় রাজ্যের অধিকার সেনবংশের হাতে চলে যায় তার কোনও বিশদ ইতিহাস পাওয়া যায় না। বক্তিয়ারউদ্দীন বাংলাদেশ আক্রমণ করলে সেন রাজবংশের পতন হয়। তবুও গঙ্গরাজবংশ দীর্ঘদিন রাঢ় অঞ্চলে আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। তবে ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের রাজত্বকালে গঙ্গরাজবংশের আধিপত্য নষ্ট হয়। ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বসীমা মানভূম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সদ্‌গোপ রাজবংশ (৯০০-১৪০০)

কোন এক সময় আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা এবং তৎসংলগ্ন বীরভূম জেলার এক বিশাল অংশ গোপভূম নামে পরিচিত ছিল। নৃতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে একদল মানুষ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিকর্ম এবং অন্যদল পশুপালন করতে শুরু করল। গোপ এবং সদ্‌গোপ সম্প্রদায় পশুপালন এবং কৃষিকর্মের পত্তন করেছিল বলে অনুমান করলে ভুল হবে না। অমরারগড়, ভাল্‌কি, কাঁকসা, নীলপুর, রাজগড় প্রভৃতি অঞ্চলগুলির মানুষের মুখে প্রাচীন সদ্‌গোপ রাজাদের কীর্তি বিষয়ে নানা কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। সদ্‌গোপ সম্প্রদায় নিয়ে বিভিন্ন গবেষক প্রচুর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যেগুলি থেকে সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ড. অতুল সুর তাঁর 'সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য' গ্রন্থে ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ইছাই ঘোষ এবং তাঁর সমসাময়িক রাজা গণেশ ও রাজা হরিশচন্দ্রকে সদ্‌গোপ বংশজাত বলে দাবি করেছেন। এ-সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রমাণ নেই, শুধু কিংবদন্তির উপর নির্ভর করে এ অনুমান করা হয়েছে। ভালকী গড়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রাঘবসিংহ ভল্লুপাদ নামে জনৈক রাজার নাম উল্লেখ করেছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার তাঁর গ্রন্থে। রাঘবসিংহ সম্পর্কেও নানা মুনির নানা মত। তবে, মানকরের নিকট ভালকীগড়ে যিনি রাজবংশ ও রাজ্যস্থাপন করেছিলেন, তিনি যে সদ্‌গোপ বংশোদ্ভূত এ সম্পর্কে সকলে একমত, যদিও তাঁর রাজত্বকাল ও রাজ্যস্থাপন সম্পর্কে নানা মত প্রকাশিত।

আমরারগড়ের সদ্‌গোপ রাজবংশ ছাড়াও আরও কয়েকটি সদ্‌গোপ রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন কাঁকসা, ভরতপুর, মৌখিরা-কালিকাপুর, মঙ্গলকোট, নীলপুর ইত্যাদি অঞ্চলেও সদ্‌গোপ রাজারা রাজত্ব করেছেন। দুর্গাপুরের নিকটে পানাগড় স্টেশনসংলগ্ন কাঁকসা গ্রামের সদ্‌গোপ রাজবংশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ড. অতুল সুরের মতে এঁদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল ভবানীপতি কাঁকসা, ইনি কঙ্কনা থেকে বঙ্গদেশে এসে এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। কাঁকসা গ্রামের নামের উৎস সম্পর্কে যে কিংবদন্তিগুলি প্রচলিত আছে, সেগুলি পরস্পর সম্পর্কবিহীন। সুতরাং এ নিয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কাঁকসা গ্রামে প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি পুরাকীর্তির নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। যেমন— (১) লোকেশ্বর বুদ্ধমূর্তি, (২) খণ্ডলমূর্তি। এই মূর্তিগুলি বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন বলে তিনি প্রমাণ করেছেন। এছাড়াও তিনি দুটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কার করেছেন। এখানে কঙ্কেশ্বর শিবমূর্তিটি প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কঙ্কেশ্বর-এর অপভ্রংশ কাঁকসা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং কাঁকসার সদ্‌গোপ রাজবংশ নিয়ে গবেষণা করে এখানে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরার সুযোগ গবেষকদের রয়েছে।

সেন রাজংশের আমলে দুর্গাপুর (১১০০-১৩০০)

পাল রাজবংশের পতনের পর বঙ্গদেশে সেন রাজবংশ দীর্ঘদিন রাজত্ব করে। সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বল্লাল সেনের পূর্বপুরুষ হেমন্ত সেনের নাম উল্লেখ করা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে সেনরা কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ, কিন্তু বৃত্তিতে ক্ষত্রিয়। এঁদের রাজধানী ছিল নবদ্বীপ (নদীয়া)। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বিজয় সেনই সেন

রাজবংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। রাজা লক্ষ্মণ সেন এই বংশের শেষ নরপতি। তাঁর সভাকবি 'গীতগোবিন্দ' -রচয়িতা জয়দেবের সাধনক্ষেত্র অজয় নদের তীরে বীরভূমের কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামে। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন এই সেনপাহাড়ী গড়ে কিছুদিন অতিবাহিত করে গেছেন। স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস যে সেন-রাজবংশের নাম অনুসারেই অজয়তীরবর্তী এই অঞ্চলটির নাম সেনপাহাড়ী। ইছাই ঘোষের দেউল এবং শ্যামারূপার মূর্তি এই সেন পাহাড়ী থেকেই কল্যাণেশ্বরীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে ভাদু গানে উল্লেখিত আছে — একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অনেকে রাঢ়েশ্বর শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বল্লাল সেনের নাম উল্লেখ করেন। বামুনাড়া গ্রামে একটি নটরাজ শিবের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং তাঁরা কোনও মন্দির যদি প্রতিষ্ঠা না-ও করে থাকেন; তাহলে রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কার করা তাঁদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। এভাবে কোনও মন্দিরের সাথে তাঁদের নাম যুক্ত হয়ে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। বামুনাড়ার নটরাজ মূর্তি ছাড়াও দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী সংলগ্ন কুড়ুরিয়া গ্রামে আবিষ্কৃত সূর্যমূর্তি, ভিরিঙ্গির বিষ্ণুমূর্তি, বীরভানপুরের 'শঙ্খেশ্বরী-তলা'র মূর্তিগুলি সেনরাজাগণ হয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, না হয়, গঙ্গবংশের সম্মানার্থে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতাপপুরের নিকটবর্তী জামগড়ায় 'মেঝান বুড়ির' থানেও চারটি ভগ্নমূর্তি আবিষ্কার করে সেগুলি সেন আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে দাবি করেন। সুতরাং সেন রাজাদের আমলেও বৃহত্তর দুর্গাপুর অঞ্চলে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। পাল ও সেন রাজবংশের রাজত্বকালে নির্মিত যথাক্রমে বুদ্ধমূর্তি এবং হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তিগুলিই তার নিদর্শন।

তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালের দুর্গাপুর (১৩০০-১৭৫৭)

জনশ্রুতিতে বলে যে ইফ্‌তিকার-উদ্দীন-বিন-বখ্‌তিয়ার খিলজি নামে এক মহম্মদ ঘোরীর অনুচর মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে নদীয়া (নবদ্বীপ) জয় করে বাংলায় তুর্কী শাসনের সূচনা করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে। মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে রাজ্যজয় করার কাহিনী অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও একথা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে বখ্‌তিয়ার খিলজি যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন তখন সেনরাজাদের শেষ বংশধর লক্ষ্মণসেনের পাশে কেউ ছিলেন না, ফলে বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয় সহজসাধ্য হয়েছিল। বখতিয়ার খিলজি কোন্ পথে নদীয়া আক্রমণ করেছিলেন তারও কোনো বিস্তৃত বিবরণ কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বিহার জয় করে নদীয়া আসতে হলে বরাকর নদী অতিক্রম করে সোজাসুজি আসানসোল মহকুমার উপর দিয়ে আসতে হবে। পথমধ্যে অবশ্যই গোপভূমকে পদদলিত করে যেতে হয়। কিন্তু শেরশাহ্-র রাজত্বকালের পূর্বে এই পথে যাতায়াত করা কতখানি সহজসাধ্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে, এই পথে না এসে যদি বীরভূম সীমান্ত দিয়েই তিনি বঙ্গদেশে প্রবেশ করে থাকেন, তাহলে অজয় নদ অতিক্রম করে এই গোপভূমের উপর দিয়েই তাঁকে নদীয়া যেতে হয়েছে। তাহলে, সে-সময় কি এ-অঞ্চল পাঠান শাসনাধীন হয়ে গিয়েছিল? অনুকূলচন্দ্র সেনের 'বর্ধমান পরিচিতি' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে খ্রিস্টীয়

চতুর্দশ শতাব্দীতে সৈয়দ বোখারি কাঁকসা জয় করেন। এর আগে কোনও মুসলমান শাসনকর্তা এই অঞ্চল জয় করেছিলেন বলে জানা নেই। এছাড়া বর্তমান আসানসোল মহকুমা অঞ্চল মুসলমান শাসকদের রাজত্বকালেও পঞ্চকোট রাজার অধীনে ছিল এবং বর্তমান দুর্গাপুর মহকুমার অর্ধাংশ ছিল বিষ্ণুপুর রাজ্যের অধীন। কাঁকসা গ্রামে সৈয়দ বোখারির বংশধর বলে পরিচিত কয়েকটি সৈয়দ পরিবার বসবাস করেন। কিন্তু, কাঁকসার বাইরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সৈয়দ বোখারির রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল বলে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বখ্তিয়ারের নদীয়া আক্রমণের সময় এবং তার পরবর্তীকালে আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে দেশীয় রাজারা স্বাধীনভাবে অথবা তুর্কী শাসকদের হাতে নামমাত্র কর দিয়ে রাজত্ব করতেন। পাঠান আমলের শেষ দিকে জনশ্রুতিতে রাজা নরোত্তম নামে একজন হিন্দু রাজার নাম পাওয়া যায়। চুরুলিয়ার নরোত্তমের গড় নাকি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। শেষ পাঠান শাসনকর্তা দায়ুদ করনানির পরাজয়ের পর বঙ্গদেশে মোগল সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়। সকলেই জানেন যে দিল্লিতে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও দীর্ঘদিন বঙ্গদেশ তাঁদের অধিকারভুক্ত ছিল না। আকবরের সময়েই মোগল সাম্রাজ্য এতদূর বিস্তৃত হয়, কিন্তু সরাসরি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ অসম্ভব ছিল বলেই বাংলায় চলছিল তখন চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা। আকবরের সুবেদার মানসিংহের আমলেই কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল -- তার বিবরণ আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ' অংশে। এই অঞ্চলে স্থানীয় রাজাদের অস্তিত্ব থাকলেও শেরশাহ্-র অনেক নিদর্শন ডিহি শেরগড় (উখরা), ফরিদপুর ইত্যাদি অঞ্চলে বর্তমান। এমনকি শাহী শড়কের (জি.টি. রোড) পাশে অবস্থিত বঙরা চটি, বেনাচটি, রাজবাঁধ চটি, বুদবুদ চটি ইত্যাদি চটিগুলির মধ্যে অন্তত রাজবাঁধ চটি যে শেরশাহ্-র আমলে প্রতিষ্ঠিত তা স্থানীয় জনসাধারণ বিশ্বাস করেন। শোনা যায় রাজবাঁধের দাস পরিবারে (চরণ দাস) শেরশাহ্-র একটি তাম্রলিপি রক্ষিত ছিল। শেরশাহ্-র মৃত্যুর পর পুনরায় মোঘল রাজবংশের উত্থান হয় এবং আকবরের আমলে মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ আসে। সেই সময়েই পাঞ্জাব থেকে আগত বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে পাঠান ও মোঘল আমলে শাসকগণ সরাসরি রাজ্যশাসন করেননি, কিন্তু স্থানীয় শাসকগণ পুরোপুরি স্বাধীন ছিলেন এ-কথাও বলা যায় না।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশ থেকে কার্যত দিল্লির আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং নবাবি আমলের সূচনা হয়। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে নতুন ভূমিব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে নতুন এক জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, যাঁরা রাজা মহারাজা ইত্যাদি উপাধি ধারণ করে এলাকায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে রাজস্ব আদায় করতেন। দুর্গাপুর সংলগ্ন এলাকায় নবাবি আমলে এইরূপ কয়েকটি জমিদারি-বংশের উদ্ভব ঘটে -- যাঁরা অধিকাংশ এসেছিলেন বাংলার বাইরে থেকে। এঁদের মধ্যে যাঁদের পুরাতন বংশতালিকা পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে খাঁদরার সরকার বংশই হল প্রাচীন। এঁদের পূর্বপুরুষ রামদাস গজদানী সম্ভবত ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী কোনও এক সময় খাঁদরায় এসে বসতি করেন। ঠিক কোন্ সময়ে এসে কিভাবে জমিদারি পেলেন তার কোনও প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, এই বংশের বর্তমান বংশধরের

কাছে প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় একটি বংশপঞ্জী দেখে এইরূপ অনুমান করেন। উখরা, খাঁদরা, মাধবপুর, পাড়মাধবপুর, চকরঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাক্-স্বাধীনতা আমল পর্যন্ত এঁদের জমিদারি ছিল। প্রসঙ্গত, খাঁদরার বক্সী পরিবারের নামও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এঁরাও অনেক প্রাচীন বংশ।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য জমিদারবংশ হল উখরা জমিদার বংশ। এঁদের পূর্বপুরুষ মেহেরচাঁদ হুণ্ডা পাঞ্জাব থেকে এসে নবাব আলিবর্দী খাঁর দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেন। বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদের সাথে তিনি আত্মীয়সূত্রে আবদ্ধ হলে তাঁর মর্যাদা বেড়ে যায়। তাঁর পুত্র বক্তার সিং হুণ্ডা-র নামে বক্তারনগর গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত। এঁদের জমিদারি দেবশালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হীরালাল সিং-এর আমলে এঁদের জমিদারি ইকড়ার নিকট হিজলগড় থেকে ময়ূরেশ্বর পরগণা, অর্থাৎ সাঁইথিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এঁদের বংশধর বিমানবিহারী লালসিং ১৯৫২ সালে নির্বাচনে কংগ্রেসের বিধায়ক হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তখন কংগ্রেসের পক্ষে মনোনয়ন পেত কেবলমাত্র ব্রিটিশভক্ত রাজা-মহারাজারাই। বিমানবিহারী শৈশব থেকেই ইংলন্ডে শিক্ষালাভ করেন। জমিদারি চলে গেলে এঁরা কয়লাখনি এবং বাবুই দড়ির ব্যবসায় যুক্ত হন। এছাড়া এঁদের ছিল একটি সিনেমা হল, যার নাম ছিল লালটকী। পরে এর নাম হয় অপর্ণা সিনেমা।

সরপীর জমিদারি বংশেরও পত্তন হয় নবাব আলিবর্দীর আমলে। স্থানীয় কবি কালীপদ মুখোপাধ্যায় মধ্যযুগীয় কাব্যরীতিতে সরপীর রাজবংশের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করেছেন। এদের পূর্বপুরুষ অর্জুন রায়চৌধুরী জমিদারির পত্তন করেন। এছাড়া আঢ়া, বামুনাড়া, গোপালপুর এবং বীরভানপুরে রায় উপাধিধারী কয়েকটি জমিদারবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে বীরভূম জেলার সুগড়ের রাজা বিনোদ রায়ের জমিদারি শিবপুরে এবং ইছাই ঘোষের দেউল যে অঞ্চলে অবস্থিত অর্থাৎ গৌরাঙ্গপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নবাবি আমলের শেষ দিকে আঢ়া, বামুনাড়া, গোপালপুর, রূপগঞ্জ, কালীগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলের জমিদার হিসাবে ভুবনেশ্বর রায় সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। বীরভানপুরে রায় উপাধিধারি আরেকজন জমিদারের নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন পদ্মলোচন রায়। এই প্রসঙ্গে মৌখিয়া কালিকাপুরের রায় উপাধিধারি সদ্গোপ রাজবংশ, বনকাটি-অযোধ্যার রায়বংশ আকন্ধাড়ার জমিদারবংশ, আঢ়ার রায়বংশ (যাঁদের দৌহিত্র-বংশের অধস্তন পুরুষ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এতদঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন) এবং গোপালপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশের নাম উল্লেখ করতে হয়। চট্টোপাধ্যায় বংশের জমিদারির অর্ন্তভুক্ত ছিল যে-সমস্ত গ্রাম সেগুলি হল — শোভাপুর, বিজড়, কমলপুর, হিতোডোবা, মহিষ্কাপুরি প্রভৃতি। কমলপুর নুড়িপাথর ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে বহুদিন পূর্ব থেকেই পরিগণিত।

নবাবি আমলের শেষ পর্যায়ে নবাব আলিবর্দী খাঁর সময় একটি প্রবাদের জন্ম হয়, 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।' —অর্থাৎ একদিকে পর্তুগিজ জলদস্যুদের উৎপাত, অপরদিকে বর্গিদের অত্যাচারে বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বর্গিরা বিহার হয়ে পঞ্চকোট, বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লুঠপাট চালায়। গ্রামগুলি

শ্মশানে পরিণত হয়। অনেক রাজা, জমিদার নিহত হন, তাঁদের মধ্যে আমরারগড়ের রাজা বৈদ্যনাথ একজন। অবশেষে সিরাজ-উদ্-দৌলার আমলে বর্গির হাঙ্গামা দমন করা হয়, দেশে কিছুটা শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে।

ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানির আমল থেকে ব্রিটিশি আমল (১৭৫৭-১৯৪৭)

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি খুব সহজেই নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে পরাজিত করে ভেবেছিল যে সারা বাংলায় কেউ বোধ হয় তাদের পশুশক্তির কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলের মানুষেরা তাদের সে বিশ্বাসে প্রথম আঘাত হানল। কিন্তু মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিকে যারা পর্যুদস্ত করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল যারা তাদের নাম দেওয়া হল চুয়াড়, বর্বর। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ব্রিটিশ এই রাঢ় অঞ্চলে তাদের অভিযান শুরু করল। অনেক ভূস্বামী তাদের বাধা না দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, কিন্তু ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঘাটশীলা থেকে বরাভূম পর্যন্ত (বর্তমানে সিংভূম জেলার অন্তর্গত) এই অঞ্চলের মানুষ দু-দুবার গণবিদ্রোহ করেছিল। এরা লড়েছিল কোম্পানির বিরুদ্ধে ধলভূমির রাজার পক্ষে। এরপর শুরু হল একে একে পাইক বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। ভাগলপুরের তিলকা মাঝির নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই সময় চাকলা বর্ধমানে একজন রেসিডেণ্ট নিয়োগ করা হয়। রেসিডেণ্টগণ জমিদারির অংশবিশেষ লাটে বন্দোবস্ত দিতে শুরু করেন প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে। সেই সময় গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় এই অঞ্চলের বন্দোবস্ত নিয়ে তার নাম দেন লাট গোপীনাথপুর।

লর্ড কর্নওয়ালিস দ্বারা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হলে আর এক নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই সব মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের অত্যাচারে জনগণের নাভিশ্বাস ওঠে। মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাংলার কৃষক' প্রবন্ধে এবং মীর মশারফ হোসেন মরহুম 'জমিদারদর্পণ' নাটকে এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এই অঞ্চলের মানুষ অবনতমস্তকে অত্যাচার সহ্য করেনি, সাধ্যমত লড়াই করেছে। এদেরই বলা হয়েছে ডাকাত। শেষ পর্যন্ত রাঢ় বাংলার স্থানীয় ভূস্বামীদের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিয়েছিল ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি। নামমাত্র খাজনা দিয়ে পঞ্চকোট থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ রাঢ় অঞ্চল কোম্পানির আমলে স্থানীয় ভূ-স্বামীরাই শাসন করতেন, যাঁরা নবাবি আমল থেকে রাজত্ব করে আসছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যাঁরা এ-অঞ্চলের জমিদারি পেলেন তাঁদের মধ্যে নাচন গ্রামের জমিদারবংশের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা মণ্ডল উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। শোনা যায় কাশিমবাজার এস্টেটের দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে এঁরা জমিদারি লাভ করেন। কাশিমবাজাব এস্টটের পূর্বপুরুষ কাভমুদী ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির অনুগ্রহে রাজত্বলাভ করেন। নাচনের জমিদারবংশের জমিদারি ছিল নাচন, পারুলিয়া, কালিকাপুর, অঙ্গাদপুর, পলাশডিহা, ঝাঁঝরা ও বাসুদেবপুর গ্রামে। পরবর্তী বংশধরেরা পুনরায় বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করেন। এঁদেরই অধঃস্তন পুরুষ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন স্যার আশুতোষের আত্মীয়তা সম্পর্কে জামাতা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তাঁর আমলেই আসানসোল

মহকুমায় এথোড়া গ্রামে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জমিদারিতে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এথোড়া শ্রীশচন্দ্র ইন্সস্টিটিউশন উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত হয়। নাচনের জমিদারবংশ ছাড়াও মেজেডিহির ঘটকবংশের ধুনাড়া, পুড়শা, মেজেডিহি, মুজড়া ইত্যাদি গ্রামে জমিদারি এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। এই সমস্ত রাজপরিবার ১৮৫৭ সালে সিপাহীদের নেতৃত্বে প্রথম যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল, সেই গণ-অভ্যুত্থানের সময় পরোক্ষভাবে ব্রিটিশদেরই সহায়তা করেছিল। নবাবি আমলে নবাবের আনুগত্য এবং নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের পুরস্কারস্বরূপ যেমন খান, রায়, রায়চৌধুরী, মণ্ডল ইত্যাদি উপাধিলাভ করে তদানীন্তন নৃপতিকূল ধন্য হতেন, ব্রিটিশ আমলেও এই সমস্ত রাজ পরিবারের তেমনি ব্রিটিশ আনুগত্য প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। তার পুরস্কারও তাঁরা পেয়েছিলেন। তবুও এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল। কোনও কোনও রাজপরিবারের অধঃস্তন পুরুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন; কেউ কেউ নিজ নিজ শ্রেণীচরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখেও শ্রমিক আন্দোলনেও অংশ নিয়েছিলেন, তবে তার পেছনেও যে উদ্দেশ্য ছিল তা মূলত শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা। সে আলোচনায় আমরা বর্তমানে বিরত থাকছি।

ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে এবং একেবারে শেষ পর্যায়ে দু'দুটো দুর্ভিক্ষ গ্রামবাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। প্রথমটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) এবং দ্বিতীয়টি পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০) নামে কুখ্যাত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের চিত্র আমরা বিভিন্ন দলিল বা নথিপত্র ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মাধ্যমে পেয়েছি, আর পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রত্যক্ষদর্শী এখনও কেউ কেউ জীবিত আছেন। এছাড়া সে-যুগের পত্রপত্রিকা, সরকারি দলিলপত্র, সুকান্তের কবিতায় এবং বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে তার অনেকটা বিবরণ পাওয়া যায়। এই দুটি মন্বন্তরই হয়েছিল শাসকশ্রেণীরই সুবাদে একথাও সকলের জানা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় অনেক ছোটখাট জমিদারও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজরা জীবিকাচ্যুত হয়ে দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়েও ঠিক এই কারণে বহু জনপদ জনশূন্য হয়ে যায় এবং জঙ্গলে পরিণত হয়।

দুর্গাপুরের ডাকাত (১৭৫৭-১৯৪৭)

জমিদারদের রক্ষী সৈন্যদল হিসাবে যারা নিযুক্ত হত তাদের সর্দার, খাটোয়াল, পাইক ইত্যাদি পদ দেওয়া হত এবং বাঁধাধরা বেতনের পরিবর্তে এদের জমি দেওয়া হত। এরা বিভিন্ন বিদ্রোহে রাজাদের পক্ষ নিত। বলভূমের রাজার বিদ্রোহ, পঞ্চকোট রাজ্য বাকি খাজনার দায়ে নিলামে ওঠার সময় (১৭৯৮) থেকে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বরাভূমের বিখ্যাত গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা পর্যন্ত এরা বিভিন্ন সময়ে জমিদারদের সহায়তা করেছে। এরাই আসলে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসককুল-আখ্যাত জঙ্গলমহলের ডাকাত। বর্ধমান জেলা গেজেটিয়ারে জে সি কে প্যাটারর্সনের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের সমসাময়িক কালে জীবন নামে এক ডাকাত ছিল যাকে দমন করতে ব্রিটিশ শাসকদের সৈন্য প্রেরণ করতে হয়েছিল। তার দলে প্রায় ৪০০ জন লোক ছিল। আসানসোল অঞ্চলেও সোনা এবং জীবন -এই দুই ডাকাত ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এরা দুজনেই বাউরি সম্প্রদায়ভুক্ত।

সে-সময় বাউরিদের মধ্যে অনেকে খাটোয়াল পদে নিযুক্ত হত। তখন বর্ধমান বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলে দু'হাজারেরও বেশি ডাকাতদলের সৃষ্টি হয়েছিল। শেরগড়, সেনপাহাড়ী অঞ্চলে বহু ডাকাতের ডাকাতি করার রোমাঞ্চকর কাহিনী এখনও বয়স্ক লোকদের মুখে শোনা যায়। এদের অনেক মহানুভবতা, গরিবের প্রতি সহানুভূতি এবং বড়লোকদের প্রতি আক্রোশের কাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রচারিত হত। দুর্গাপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে জি টি রোড দিয়ে অনেক জমিদারের খাজনা বর্ধমান রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হত; সেই খাজনার টাকা লুঠ করার পক্ষে অনুকূল ছিল এই দুর্গাপুরের জঙ্গল। তাই, যারা ডাকাতিকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল তাদের আস্তানা ছিল এই জঙ্গলে। ছোট ছোট গ্রামে তারা সংসার পেতেছিল, সেই গ্রামগুলি আধুনিক দুর্গাপুর পত্তনের ফলে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। সেই মানুষগুলির বংশধরেরাও বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত হয়ে সৎজীবন যাপন করছেন। তবে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবী চৌধুরাণীর বিচরণক্ষেত্র হিসাবে দুর্গাপুরের জঙ্গলকে এবং সিটিসেণ্টার থেকে স্টেশন যাওয়ার পথে বাঁ-দিকে যে একটা উঁচু টিলা আছে তাকে দেবী চৌধুরাণীর ঢিবি বলে বর্তমান যে কিংবদন্তি প্রচারিত হয়েছে দুর্গাপুর শিল্পনগরী পত্তনের পর, তা সম্পূর্ণ অলীক এবং অনৈতিহাসিক। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর ঘাঁটি ছিল রংপুর জেলার বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলে। হাণ্টার-এর এক বিবরণীতে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ব্রেনানের নিয়োগের রিপোর্ট আছে। তিনি বৈকুণ্ঠপুরে ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরাণীর দলকে দমন করার জন্য নিযুক্ত হন। তবে উপরিউক্ত ঢিবিটি সম্পর্কে এখনও কোনো অনুসন্ধান বা গবেষণা হয়নি।

প্রাক্‌শিল্পায়ন যুগে দুর্গাপুরের সংস্কৃতি ও শিক্ষা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার এসেছিল। বৃহত্তর বঙ্গ থেকে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন অরণ্যঘেরা এই গ্রামগুলি কিন্তু একেবারেই অন্ধকারে লীন হয়ে যায়নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোছায়াচ্ছন্ন এই গ্রামগুলিতেও ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের ঢেউ এসে পৌঁছেছিল। এই অঞ্চল যাকে নিয়ে সর্বাধিক গর্ব করতে পারে, তিনি হলেন ধবনী গ্রামের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (সন ১২৪৮-১৩১৮ সাল), যাঁর কৃষ্ণযাত্রা শুধু রাঢ়বঙ্গে নয়, ভাওয়াল, বিক্রমপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ছাড়িয়ে সুদূর আসাম ও সিঙ্গাপুরেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রার গান শুনেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ; ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ উজ্জ্বল মানুষেরা। প্রথমে কাঁটাবেড়িয়ার গোবিন্দ রায়ের দলের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন, পরে গোবিন্দ আধিকারীর যাত্রাদলে যোগ দিলে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়। এছাড়া তিনি ৭০০০ ভক্তিগীত, কীর্তন ও লোকসংগীত রচনা করেছেন। তাঁর লেখা 'পয়সা নাই তার জনম বৃথা সংসারে' গানটি বাংলাদেশের শিল্পী রুনা লায়লা বর্তমানে রেকর্ড করেছেন, বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও এই গানটি রেডিওতে প্রচার করেছেন। নীলকণ্ঠের দুই ভাই সিতিকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠ কালীগঞ্জে হরেকৃষ্ণ বাগ এবং নীলকণ্ঠের পুত্র দুর্গাদাস কৃষ্ণযাত্রাদলের ঐতিহ্য কিছুদিন ধরে রেখেছিলেন। কৃষ্ণযাত্রাদল ছাড়াও এ-অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে হয় সখের যাত্রাদল না হয় থিয়েটারের ক্লাবে নিয়মিত নাটকের চর্চা হত। এই সমস্ত

সংস্থাগুলির মধ্যে আড়ার রাঢ়েশ্বর অপেরা পার্টি, অণ্ডালের ধর্মরাজ অপেরা পার্টি, সুভড়া মেজেডিহির সরস্বতী ক্লাব (পরবর্তীকালে এর নাম হয় সর্বমঙ্গলা সমিতি), গোপালপুর গ্রামের বীণাপাণি নাট্যসমাজ, নাচনের নাচন নাট্যসমাজ, সগড়ভাঙা গ্রামের ভৈরব নাট্যসমাজ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। নাট্যচর্চা ছাড়াও ভিরিঙ্গির কবিগানের দল, আড়া গ্রামের লোঠো গানের দল, কুলডিহির মনসামঙ্গল পালার দল, কাঁটাবেড়িয়ার খেলাই দাসীর ঝুমুর গানের দল লোকসংস্কৃতির ধারাকে অব্যহত রেখেছিল। পাশাপাশি আড়া গ্রামে কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ গানের চর্চা তাঁর সুযোগ্য পুত্র চারুচন্দ্রকে উৎসাহিত করেছিল। তিনিও পরবর্তীকালে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী, এম এ এম সি, এ বি এল কলোনি ইত্যাদি সমাজেও চারুবাবু সুপরিচিত ছিলেন। বর্তমান নিবন্ধের লেখকও তাঁর গান শুনেছেন যখন তিনি ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ। নাটক ও সংগীতচর্চা ছাড়া এই অঞ্চলে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা হত। অথচ, এখানে কোনও মুদ্রণযন্ত্র ছিল না। স্থানীয় কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ (মেঝেডিহি), গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (গোপালপুর), কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিরুডিহা), ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নাচন), সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (নাচন), রামবঙ্ক পট্টনায়ক (ভিরিঙ্গি), কালীকিংকর সেনগুপ্ত (উখরা) উল্লেখযোগ্য। কালীকিংকর সেনগুপ্তর কাব্য রাজরোষে পতিত হয় এবং সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। এছাড়াও অনেকে সাহিত্যসেবা করেছেন যাঁদের নাম বর্তমান প্রবন্ধকারের অজানা।

শিক্ষার দিকেও এই অঞ্চলটি খুব অনগ্রসর ছিল না। অরণ্যঘেরা যোগাযোগবিহীন এই অঞ্চলে বহু প্রাচীন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা বিল পাশ হওয়ার পর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ভিরিঙ্গিতে উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এছাড়াও পলাশডিহা, গোপালপুর, নডিহা এবং দুর্গাপুরেও হাইস্কুল স্থাপিত হয়। আজ থেকে ১১০ বছর আগে গোপালমাঠের মোহনপুরেও একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়।

উপসংহার

'নদী আর কালগতি একই প্রমাণ।' নদী আর মহাকালের কাজই হচ্ছে একূল ভেঙে ওকূল গড়া। ইতিহাস হচ্ছে সেই মহাকালের সাক্ষী। এতক্ষণ দুর্গাপুরের ইতিহাস একজন অনভিজ্ঞ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ এবং অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে যতটুকু পর্যালোচনা করা গেল তাতে মনে হল, পৃথিবীর তাবৎ সাম্রাজ্য বা সভ্যতার মতো দুর্গাপুরের ইতিহাসও ভাঙা গড়ার ইতিহাস। এ-কূল ভাঙে, ও-কূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা। নদী কিন্তু সামনের দিকেই এগিয়ে চলে। সভ্যতার ইতিহাসও অগ্রগামী। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে যা-কিছু ভাঙে তার কারণ নিহিত আছে শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের মধ্যেই। শাসকশ্রেণীর ত্রুটির ফলেই এক একটা নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় আবার মানুষ এগিয়ে আসে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর সৌধ নির্মাণ করতে।

উত্তরে অজয়, দক্ষিণে দামোদর এই দুই নদী ছাড়া রয়েছে কুনুর আর সিংগারণ। পূর্বে সমতল বাংলা, পশ্চিমে ঢেউখেলানো উচ্চাবচ ছোটনাগপুরের মালভূমি -- বরাকর নদী যে-মালভূমির ভিতর প্রবাহিত হয়ে বাংলা-বিহারের সীমারেখা সৃষ্টি করেছে। এরই

মধ্যে কাঁকসা থেকে শুরু করে মাইথন পর্যন্ত অজয়ের তীর বরাবর ইতঃস্তত ঘন জঙ্গল। এরই মধ্যে কয়েকশো গ্রাম দিবা-রাত্রি আনন্দ হাসিগানে কলরবমুখরিত হয়ে থাকত। দুর্ভিক্ষে বা রাষ্ট্রবিপ্লবে আবার এখানকার মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ত। এখানের মানুষ গান বেঁধেছে, আবার যুদ্ধও করেছে। প্রাচীন কালের কৈর্বত বিদ্রোহ থেকে শুরু করে রানিগঞ্জ পেপারমিলের আন্দোলনে কুলডিহার সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মত্যাগ, স্বাধীন ভারতে আশীষ-জব্বরের শহীদের মৃত্যুবরণ সবই দুর্গাপুরের ইতিহাস। এখনও পুষ্করিণীর গর্ভে, গ্রামের টিলায় অব্যবহৃত মন্দিরে অথবা অরণ্যের শিলাস্তূপে অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া যেতে পারে দুর্গাপুরের অনেক গৌরবগাধা। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন গঠিত হলে ১৯৫২-তে শুরু হয়ে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপুর ব্যারেজের কাজ শেষ হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ক্যানেলের জলে কৃষির উন্নয়ন -- এই উদ্দেশ্য নিয়ে দুর্গাপুর দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন কাজ শুরু করলে সারা ভারতের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে কোকচুল্লি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট (১৯৫৯), ডি টি পি এস (১৯৫৮), ফিলিপস্ কার্বন (১৯৫৮) এম এ এম সি (১৯৫৯), এ বি এল (১৯৬০), এ্যালয় স্টিলস্ প্লান্ট (১৯৬৩), স্যাংকি হুইলস্ (১৯৬৩), দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ (১৯৬৩) গ্রাফাইট ইন্ডিয়া (১৯৬৪), জেসপ (১৯৫৬), বি ও জি এল (১৯৬৫), এইচ এফ সি আই (১৯৬৬), দুর্গাপুর সিমেন্ট (১৯৭২) ইত্যাদি ছোট-বড় প্রায় ৪৫ টি শিল্প-কারখানা এবং চারশোরও বেশি ক্ষুদ্রায়তন কুটীরশিল্প গড়ে ওঠে। ফলে, বৃহত্তর দুর্গাপুর একটি অত্যাধুনিক শিল্পনগরীতে পরিণত হয়ে সারা ভারত তথা এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীর সম্মান পায়। পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা এবং ভৌগোলিক অবস্থানই হয়ত দুর্গাপুরকে এতখানি সমৃদ্ধ শিল্পনগরীতে পরিণত করেছিল, তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়েরও এক বিরাট আবদান ছিল এই অঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে। আগেই বলেছি যে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির টালি তৈরির কারখানাটিই দুর্গাপুরে স্থাপিত প্রথম কারখানা। এটি স্থাপিত হয় ১৯০৫ সালে। ১৯২১ সালে ফায়ার ক্লে থেকে নির্মিত ফায়ার ব্রিক্স তৈরির কারখানাটি স্থাপিত হয়। পরে এটি কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন হয়ে যায়। এরপব হিন্দ রিফ্রাক্টরিজ এবং হিন্দ রিফ্রাক্টরিজ এন্ড সিরামিক লিমিটেড নামে আরও দুটি ফায়ার ব্রিক্স্ এর কারখানা স্থাপিত হয়।

ইস্পাতনগরীর যে-সমস্ত অঞ্চল ছিল শ্বাপদসংকুল, দ্বিপ্রহরেও সেখানে সূর্যালোকের প্রবেশ ঘটত না, সে-সব অঞ্চল গভীর নিশীথেও বৈদ্যুতিক আলোয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ক্রমশ এখানে রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে বাসের যোগাযোগ বেড়েছে, বহু কমিউনিটি হল গঠিত হয়েছে, গঠিত হয়েছে সি এম ই আর আই স্কুল ও আধুনিক হাসপাতাল, স্থাপিত হয়েছে একটি সরকারি মহাবিদ্যালয়, দুটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ, গড়ে উঠেছে হাট-বাজর। পাশাপাশি সংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। বহু আন্দোলন, বহু সংগ্রামের সাক্ষী এই দুর্গাপুর। এখনও দুর্গাপুরের শ্রমিক, লড়াই করেই বাঁচে।

আজ সারা দেশে এক অদ্ভুত অস্থিরতা। স্বাধীন ভারতে যখন চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিনের কারখানা হল, চিত্তরঞ্জন শহরের পত্তন হল, আমরা সেই শহর দেখতে গিয়েছিলাম। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ এসেছিলেন, জওহরলাল নেহরু এসেছিলেন, বুলগানিন ও ক্রুশচেভ্ এসেছিলেন, এসেছিলেন চৌ এন লাই। আমরা তখন সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখছি, আর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু এক জায়গায় খটকা লাগছে। যারা ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ আনুগত্যের জন্য ব্রিটিশদের স্নেহধন্য হয়েছিল, এমনকি পলাশীর যুদ্ধে যারা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ নিয়েছিল, তারাই আজ শাসক দলের বিধায়ক! এ কি প্রহসন! তবুও কলেজে পড়ার সময় যখন দেখলাম, আমাদের অনেক সহপাঠী পড়াশুনা ছেড়ে দুর্গাপুরে আসছে, শুনলাম দুর্গাপুরে এক নতুন শহর স্থাপিত হচ্ছে, অনেক অনেক ছোট-বড় কারখানা হচ্ছে, তখন ভাবলাম এই তো স্বাধীনতা। চিত্তরঞ্জন দেখলাম। কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর। তারপর দুর্গাপুর। এদিকে হিন্দুস্থান কেবলস, সেনর‍্যালে সাইকেলের কারখানা — সে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। আর আজ? কু-রাষ্ট্রের মোহে পড়ে তিলে তিলে গড়ে ওঠা -- কারও দয়াদাক্ষিণ্যে নয়, মানুষের মেহনতে গড়ে ওঠা -- শিল্পকারখানা কতকগুলি মীরজাফরের মতো অকর্মণ্য, বহুজাতিকদের পুত্তলিকার খেয়ালে ধ্বংস হচ্ছে। কয়লাখনিগুলি আবার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, লাভজনক কারখানা বিক্রি হতে চলেছে, অন্যান্য কারখানা বন্ধের মুখে। আর সংবাদ-মাধ্যমগুলি লাগাতারভাবে এর জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে দায়ী করছে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, ভাঙা-গড়ার নিয়মে আজ যা ভাঙছে, কাল তা গড়ে উঠবেই। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে এ-মাটিতে আদিম মানবগোষ্ঠী বিচরণ করেছে, এ-ধরিত্রীকে কুসুমিতা মনোহরা করেছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে অরণ্যঘেরা ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলিকে কলরবমুখরিত করে রেখেছে, নয়া বসত গড়েছে সারা ভারতের অগণিত নরনারী, শিল্পনগরীকে আলোয় আলোময় করে তুলেছে। তারাই বাঁচাবে দুর্গাপুরকে। তারা অনেক রক্ত দিয়েছে, ঘাম দিয়েছে, না হয় আরও দেবে। এখানকার মাটি বলছে, দুর্গাপুর মরে না মরবে না, দুর্গাপুর বাঁচবেই।

সূত্র —

১। দুর্গাপুরের ইতিহাস - প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় (আকর গ্রন্থ)

২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি - বিনয় ঘোষ

৩। বাংলার ইতিহাস - রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাঙালির ইতিহাস - ড. নীহাররঞ্জন রায়

৫। সীমান্ত বাংলার লোকযান - ড. সুধীরকুমার করণ

৬। পত্রিকা —

ক) রূপায়ণ (শারদ ১৩৮৪)

খ) ইছাই ঘোষের দেউল ও শ্যামারূপার মন্দির - ড. সুজিত বিশ্বাস (ঝিল্লি/বর্ষা সংকলন ১৪০৭)

গ) আসানসোল - ইতিহাসের আয়নায় একাল সেকাল ও ভাবীকাল - নিশীথকুমার ঘোষ

□ নতুন চিঠি - শারদ ১৪০৬ □

শিল্পে-বাণিজ্যে দুর্গাপুরের সেদিন, এদিন

প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প বললে ধোঁয়া ওঠা চিমনির ছবি আর বাণিজ্য বললেই সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাজিয়ে সওদাগর বাণিজ্যে চলেছেন এই ছবিটা আমাদের চোখে ভাসত। এখন শিল্প এবং বাণিজ্য দুটোরই আকার আকৃতি প্রকৃতি অনেক বিস্তৃত হয়েছে, যার ফলে পরিবহনও এখন শিল্প, বৃহৎ সংবাদপত্রও এখন শিল্প আর কাপড়ের দোকান মুদি দোকান ছাড়াও সরকারী আধা সরকারী চিকিৎসক, শিক্ষক ইত্যাদি পেশার মানুষ নির্ধারিত সীমার বাইরে গিয়ে দুহাতে যা লুটছেন তাকেও আধুনিক সমাজ বাণিজ্য বলে আখ্যায়িত করছেন। বাণিজ্য বলতে মোদ্দা কথা ব্যবসাই বুঝি। শিল্পের সঙ্গে বাণিজ্যের একটা সম্পর্ক আছে। শিল্পনির্ভর বাণিজ্যও যেমন আছে, তেমনি শিল্প ছাড়াও বাণিজ্য হয়। এবারের বিষয় ''শিল্পে বাণিজ্যে বর্ধমান'' (ব্যবসা বাণিজ্যে) তবে আমার সীমানা দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল।

দুর্গাপুরের পত্তন হয়েছিল ১৮৫৫ সালে, সগড়ভাঙ্গার জমিদার গোপীনাথ চ্যাটার্জীর পুত্র দুর্গাচরণেরে নামে। দুর্গাপুর নামে কোন মৌজা নাই, গোপীনাথপুর মৌজা আদি দুর্গাপুর। শিল্প বিকাশ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুরের এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে যুক্ত হয়েছে, বীরভানপুর, রাধামাধবপুর, ভিড়িঙ্গি প্রভৃতি অনেক মৌজা। দুর্গাপুর স্টেশনে তখন কাঁচ ঘেরা লণ্ঠনের আলো জ্বলতো, স্টেশন সংলগ্ন আজকের বাস স্টান্ড তখন জলাজঙ্গল। জি. টি. রোডের দুধারে গভীর শাল মহুয়ার জঙ্গল। মুচিপাড়া মোড়ে কয়েকঘর মুচির বাস। পানাগড় বাজার ছেড়ে এলে অণ্ডাল মোড়ের আগে আর কোন মিষ্টি বা চায়ের দোকান ছিল না। ১৯০৫ সালে বার্ণ কোম্পানী দুর্গাপুর স্টেশনের পাশে একটি টালির কারখানা করেছিল সেটিই দুর্গাপুরের প্রথম শিল্প কারখানা তার আগে এখানে তৈরী হোত চাষের কোদাল। ১৯৫২-তে শুরু হোল দুর্গাপুর ব্যারেজের কাজ। ১৯৫৩ সালে খাঁটপুকুর, বাঁশকোপা, বামুনপাড়া থেকে অণ্ডাল পর্যন্ত সব মৌজায় শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি হয় যাতে লেখা ছিল "For the development of Industry of Durgapur" , শুরু হোল কারখানা গড়ার কাজ। দুর্গাপুর প্রজেক্ট, ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক, হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, এ. ভি. বি. অধুনা এ. বি. এল, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার, এশিয়াটিক অক্সিজেন, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা এবং মিশ্র ইস্পাত প্রভৃতি। সুষ্ঠু পরিবহন পরিষেবার প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠা হোল দুর্গাপুর স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন। দুরদর্শী ডা. বিধানচন্দ্র রায় দেখেছিলেন জি. টি. রোড এবং রেলপথে মাল পরিবহনের সুযোগ নিকটবর্তী এলাকায় সঞ্চিত কয়লা ও আকরিক সম্পদ, পর্যাপ্ত অরণ্যময় জমি আর সুলভ শ্রমিক -- শিল্প গড়ার এ সবই আছে দুর্গাপুরে। দামোদরের সেচখালের মাধ্যমে জলপথ পরিবহনের পরিকল্পনাও ডি. ভি. সি. কর্তৃপক্ষ করেছিলেন। বড় বড় বজরা ব্যারেজের পাশে দীর্ঘদিন দাঁড়িয়েছিল কিন্তু কোন মাল পরিবহন করেনি কোনদিন যার কারণ অজ্ঞাত। ৩৪টি বড় এবং মাঝারি কারখানার সঙ্গে সহায়ক শিল্প হিসাবে ২০০টি ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট গড়ে উঠেছিল ষাট সত্তরের দশকেই।

এইসব কারখানা তৈরীর জন্য যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি বিদেশ থেকেই ধার করতে হয়েছিল। দেশীয় প্রযুক্তি তখনও আজকের মত উন্নত হয়নি। নতুন অবস্থায় কিছুদিন ভালই হচ্ছিল উৎপাদন। পুরানো আমলের মেসিন, অনভিজ্ঞ পরিচালন ব্যবস্থা, মাথাভারী প্রশাসন, পরস্পর বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে পাইয়ে দেবার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নানাকারণে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি বেশীদিন অপটিমাম প্রোডাকসন দিতে পারেনি। দুর্গাপুর স্টীল এবং এ্যালয় স্টীল কারখানায় বহু কর্মসংস্থান হয়েছিল যারা এসেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে --বিহার, ইউ.পি., মাদ্রাজ,কেরল, ওপার বাংলার হাজার হাজার উদ্বাস্তু এসেছিলেন দুর্গাপুরে, যুক্ত হয়েছিলেন কারখানার চাকরিতে কিম্বা ব্যবসাবাণিজ্যে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের বাসস্থানের জন্য গড়ে উঠেছিল হাজার হাজার কোয়ার্টারিস এ জোন, বি. জোন, সি. এম. ই. আর. আই, ডি. পি. এল, ডিটি. পি. এম. কলোনী, নির্মিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ আবাসন প্রকল্প সগড়ভাঙ্গা, রাতুড়িয়ায়। ঐসব জোনের বাসিন্দাদের সুবিধায় তৈরী হোল সেক্টর মার্কেট, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে গিয়ে প্রয়োজন হোল কারখানার আধুনিকীকরণ। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে (সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা) আধুনিকীকরণ করা হোল যার সুফল আজও পাওয়া যায়নি। নিন্দুকেরা বলছে এই বিনিয়োগের অনেকটা চলে গেছে অসাধু আমলা ও ঠিকাদারদের পকেটে, কাজ হয়েছে নিম্নমানের। যে লোকটি সাইকেলে চড়ে সামান্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর কাজ করে বেড়াত অসাধু অফিসারদের ভেট দিয়ে হাত করে সে এখন তিনতলা বাড়ি মারুতি গাড়ির মালিক। যদি কোনদিন সি. বি. আই. হানা দেয় ঐসব আমলা ও ঠিকাদারদের ঘরে তবে দুর্গাপুরের নতুন ইতিহাস লেখা হবে। গত দু'বছরে দুর্গাপুরের ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলি যেমন একে একে বন্ধ হয়েছে, বড় কারখানা এম. এ. এম. সি, ফার্টিলাইজার, বি. ও. জি. এল ইত্যাদির শ্রমিকরা চাকা না ঘুরিয়ে এখনও বেতন পাচ্ছেন পাশাপাশি নতুন দু চারটি ফাউন্ড্রি, ফেরো অ্যালয় কারখানা খুলেছে কিন্তু তাদেরও বক্তব্য, "জমি পেলে জল নাই, জল পেলে বিদ্যুৎ সংযোগ পাই না" পরিকাঠামোর এই অবস্থা। রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভাল নয় তবে এখন সারাই হচ্ছে। আই. এন. টি. ইউ.সি, এবং বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে এই সময়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কে শ্রমিকদের বেশি পাইয়ে দিতে পারে। দায়িত্ব বোধ না জাগিয়ে শুধু তাদের অধিকার বোধকে জাগ্রত করার দীর্ঘ চেষ্টায় শ্রমিকরা কর্মে অনাসক্ত হয়ে পড়েছে। উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে, প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি তার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্কনীতি (আমদানী শুল্ক হ্রাস কিম্বা তুলে দেওয়া) ফলে বিদেশ থেকে হাজার সামগ্রী দেশীয় বাজারে ঢুকছে। দেশীয় শিল্প গুণগত মানে পিছু হটছে। এখন নেতাদের চেতনা হয়েছে তারা চেষ্টা করছেন ওয়ার্ক কালচারের উন্নতি ঘটাতে কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাস কারখানা থেকে পালিয়ে অন্য কাজ করা। মেসিন থামিয়ে দিয়ে মিটিং মিছিল আন্দোলন করার ফলে আজও সবাই সমান উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে পারছেন না। মেসিনেরও দোষ আছে--সার কারখানার পুরানো মেসিন যার এক একটা অংশ এক এক দেশে তৈরী পার্টস দিয়ে সারানো হয়েছে, ফলে দুদিন

চলে পাঁচদিন বসে এইভাবে চলতে চলতে এখন একবারেই বসে গেছে। তার খোল নলচে পালটাতে বহু টাকা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার লোকসানে চলা রাষ্ট্রীয় সংস্থায় আর টাকা ঢালতে নারাজ। কেন্দ্রের 'বন্ধু' সরকারকে দিয়েও এটা করানো যায়নি। পোখরান থেকে পানাগড় সর্বত্র শুধু দলীয় রাজনীতির দাপাদাপি। শিল্পায়ন নিয়ে যত মিটিং সেমিনার হয়েছে সেখানে যত প্রস্তাব এসেছে তার সামান্য অংশই কার্যকর হয়েছে। কেন্দ্রের কোন সরকারই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে যথাযথ সাহায্য দেয়নি তাই দুর্গাপুর পৌর নিগমের মেয়র পরিষদের সদস্য মনোজ হাজরা থেকে প্রাক্তন বিধায়ক সিটু নেতা তরুণ চ্যাটার্জীর একই মত—"কেন্দ্রের শিল্পনীতি এবং অর্থনীতির পরিবর্তন না হলে দুর্গাপুর শেষ হয়ে যাবে।"

৫০/৬০ বছর আগেও দুর্গাপুর ছিল একটা ব্যবসা কেন্দ্র। কাঁটাবেড়িয়া, শিবপুর, মলানদীঘি, বড়জোড়া, বেলেতোড় থেকে গরুর গাড়িতে ধান চাল আসত দুর্গাপুরের আড়তে। আর ফেরার সময় নিয়ে যেত তেল, মশলা, জামাকাপড়। দুর্গাপুরের জঙ্গল থেকে ওয়াগন বোঝাই করে যেত শাল বল্লা। নডিহার ত্রিলোচন মুখার্জীদের ছিল কাপড়, স্টেশনারী, মুদিখানা বিভিন্ন ব্যবসা এছাড়া ছিল করালী দত্ত, জ্ঞানমণ্ডলের মশলার দোকান। ব্যারেজের কাজ শুরু হলে নতুন ডি.ভি.সি মার্কেট হয়েছিল আর ডি. পি. এল-এর কাজ শুরু হলে খুলেছিল শ্যামপুরের বালিখাদ--এসব গল্প বলছিলেন নডিহার মুখার্জী পরিবারের প্রবীন ব্যবসায়ী অসিত মুখার্জী। নডিহার মুখার্জীদের দুর্গাপুর বাজারে কটি পাকা বাড়ি ছিল আর ছিল বিভিন্ন ব্যবসা। শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে সেসব ব্যবসা ছেড়ে তারা পেট্রল পাম্প, সিনেমা হল, বোর্ডিং লজ, ওষুধের দোকান এসব ব্যবসায় ঝুঁকলেন।

দুর্গাপুর চেম্বার অব কমার্সের অফিস ঘরে বসে অফিস সেক্রেটারি এ কে চন্দ বলছিলেন এই বেনাচিতিতে তখন দিনের বেলায় শেয়াল ডাকত। প্রান্তিকায় ছিল দরমা হাট আর নিশান হাট, যেখানে ইস্পাত কারখানার কর্মী, অফিসাররা থাকতেন। তাদের জন্য তাঁবু খাটিয়ে শুরু হল অনুরাধা সিনেমা। ওখানে আশপাশে দু-একটি চা আর দেশী মদের দোকান। গজানন শর্মা চেম্বার অব কমার্সের প্রথম সম্পাদক—রেডিও, ফ্যান, সেলাই মেসিনের দোকান করেছিলেন, ধারে বিক্রী করতেন। টাকা মার গেল ব্যবসা উঠে গেল। বোলপুরের দালালদের একটি কাপড়ের দোকান, কল্পতরু স্টেশনারী দোকান, রাধা ব্লাউজের দোকান, এমনি দু-চারটি স্থায়ী দোকান ছিল। ঘোষ মার্কেটে ছিল তালগাছ ঘেরা পুকুর; সেই তালতলায় বসত সবজী, জামা কাপড়, ফল, মাছ। বিকাল হলেই সাইকেলে মোট চাপিয়ে সব উধাও--শূন্য হাটতলা। মোরাম বিছানো নাচন রোডের দুপাশে শালের জঙ্গল, সারাদিনে দুটি বাস চলত খেয়া আর তরী। ট্রাকের ওপর ত্রিপল চাপিয়ে কারখানার বাবুদের আনা নেওয়া করা হত, লোকে হাসতে হাসতে বলত হেলিকপ্টার আসছে। দুর্গাপুর ইস্পাত, তাদের কোয়ার্টার তৈরীর পর বসালেন সেক্টর মার্কেট যার মধ্যে হর্ষ মার্কেট (এখন আশিস মার্কেট) বোধহয় প্রথম তৈরী হয়েছিল। বেনাচিতি প্রান্তিকায় টিনের গোলঘরে হল স্টীল মার্কেট। ইন্ডিয়ান টি হাউস, প্যারামাউন্ট এসব পুরানো দোকানগুলো আজও আছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে। সত্তরের দশকে তৈরী হয়েছে কয়েকটি খোলা মার্কেট, যার মধ্যে

উল্লেখযোগ্য চণ্ডীদাস মার্কেট। সাইকেলের পিছনে মালপত্তর নিয়ে এসে বসা আবার চলে যাওয়া হকার্সরা এইভাবে ব্যবসা শুরু করে। এরপর দু-চারজন গুমটি বা চট টাঙিয়ে বসতে লাগল। তারপর রাস্তা জবর দখল করে হকারের সংখ্যা বেড়ে যখন সমস্যাজনক অবস্থায় পৌঁছাল তখন ডি. এস. পি. কিছু স্টল তৈরী করে দিল। এর জন্য হকারদের প্রত্যেককে এককালীন টাকা জমা দিতে হল। মাসিক ভাড়ার থেকে যেটা বাদ দেওয়া হচ্ছে (Adjust)। এইভাবে চণ্ডীদাস মার্কেটে পাঁচশো দোকান বসেছে কিন্তু হকার সমস্যা মেটেনি। রাস্তায় এখনও অস্থায়ী দোকানঘর রয়েছে অনেক। হকার সংগঠনের সৌমেন চৌধুরী বলছিলেন হকারদের জন্য স্টল হয়েছে কিন্তু তাদের জন্য কোন ল্যাট্রিন নেই, নেই তাদের থাকার জন্য কোন ডরমেটরি, হোস্টেল কিম্বা কোয়াটার্স। "কাজেই আমাদের মনে হয় আগের ফুটপাতই ভাল ছিল"--মন্তব্য সৌমেনের। এখন ঘরে ঘরে ব্যবসা হচ্ছে। এত দোকান এত প্রতিযোগিতা অথচ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে কারণ অধিকাংশ শিল্প শ্রমিক অনিশ্চয়তার আতঙ্কে ভুগছেন। এম. এ. এম. সি. ফার্টিলাইজার, এইচ. এস. সি. এল-এর কর্মীদের সময়ে বেতন হচ্ছে না। ডি. পি. এল. বোনাস দেবে কিনা এখনও স্থির হয়নি (১লা সেপ্টেম্বর)। সেক্টর মার্কেটগুলির সেই জৌলুষ আর নেই। বেনাচিতি বাজারের কাপড়ের দোকান জুতোর দোকানে তবু প্রচুর ভিড় ঢোকা যাচ্ছে না, এ প্রসঙ্গটা তুলতেই তরুণ চ্যাটার্জী বললেন দুর্গাপুজো একটা জাতীয় উৎসব। জামা, কাপড়, জুতো সব পুজোর সময় হবে বলে অনেকেই ঝুলিয়ে রাখেন। তাছাড়া জনসংখ্যা বেড়েছে। তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মত তো কিনতেই হবে, তবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কেনাকেটা করতে পারছে না, এমনকি যারা কিনছে তারাও প্রয়োজন ছাঁট কাট করে কিনছে। রিয়েল ওয়েজ তো কমে গেছে। মামড়া, বেনাচিতি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে পূর্ববঙ্গের লোকেরা মায়াবাজারে তেমনি বিহারীদের আধিপত্য আর মারোয়াড়ী সম্প্রদায় কাঠের গোলা, হার্ডওয়ার, ফার্নিচারের ব্যবসা দখল করে রয়েছে।

শিল্প কিম্বা বাণিজ্য সবই তো মানুষকে নিয়ে আর মানুষ মাত্রেই রোগ অসুখের শিকার হবেই। আগে কেমন ছিল অসুখ, চিকিৎসা? শিল্পায়নের আগে লোকের এত রোগ হোত না। ১৯৪২ থেকে ৪৬ সালের মধ্যে খুব ম্যালেরিয়া হয়েছিল এখানে আর '৪২ এ হয়েছিল কলেরা মহামারী আকারে। রোগ বলতে তখন হত আমাশয়, টাইফয়েড, হত রোগী প্রায় ছিলই না। জটিল রোগ তেমন হত না। আমি আট আনার ওষুধে একটা রোগীকে সারিয়েছি যে রোগ এখন একশ টাকায়ও সারে না--বলছিলেন দুর্গাপুরের প্রবীনতম চিকিৎসক অভয়পদ ব্যানার্জী (৮৬)। সেই ১৯৪০ সাল থেকে আজও চিকিৎসা করছেন ডা. অভয়পদ ব্যানার্জী তাঁর দুর্গাপুরের বাড়িতে। তখন রোগী দেখার ফিজ ছিল না, পুরিয়া আর মিক্সচার দু-আনা, চার আনা, আট আনার ওষুধ। বাহন বলতে সাইকেল। রোগী দেখতে সাগড়ভাঙ্গা গেলে দুটাকা, রাতুড়িয়া নাচন গেলে চার টাকা আর শিবপুর (২০ কি মি.) গেলে দশ টাকা ভিজিট। "ব্যবসা নয় সেবাই ছিল মূল লক্ষ্য। জটিল রোগী দেখে এসে ঠাকুরের কাছে তার দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করতাম, ফলও পেতাম। সে বিশ্বাস আজও অটুট আছে। বলছিলেন অভয় ডাক্তার। তিনি স্বীকার করেন চিকিৎসা এখন ব্যবসা, স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা তাই

অপ্রয়োজনীয় ভাবে এক্সরে সোনোগ্রাফী হচ্ছে দুটির জায়গায় ছয়টি ওষুধ লিখে দিচ্ছেন ডাক্তারবাবু। ক্লিনিক্যাল টেস্ট নেই, স্পট ডায়াগোনেসিস অনেকেই পারেন না তাই হাতড়ে বেড়ান, অনেক ওষুধ দেন। বাজার দর প্রসঙ্গে বলেন দু পয়সার চা চিনিতে দশকাপ চা হত। তিন আনা, চার আনা সের মাছ, বেছে দেওয়া ফ্রি, চার আনা সের চিনি। তখন মেডিকেল হাসপাতালে একটা সিজারিয়ান কেস এলে হাসপাতাল তোলপাড়, সব ছাত্রদের ডাক পড়ত শেখার জন্য। এখন শব্দদূষণে মাথায় চাপ পড়ছে, মানসিক রোগী প্রচুর। কিছুই হয়নি তবু রোগী বলছেন আমার এই হয়েছে ঐ হয়েছে। টি বি ও খুব হচ্ছে।

জনসংখ্যা আতঙ্কজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে দোকানদারি বাড়ছে, জবর দখল বাড়ছে। প্রশাসন, কর্পোরেশন দেখেও দেখে না, রাজনৈতিক দাদাদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় রয়েছে অনেকক্ষেত্রে। আই. এম. এফ-এর চাপে ৩৪০টি পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে বা তুলে দেওয়া হচ্ছে। ভোগ্যপণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে। ভারতের মহান আদর্শ 'ত্যাগ' আজ অভিধানিক শব্দমাত্র, তাই ঘুরপথে টাকা রোজগারের প্রতিযোগিতা চলছে। শিল্পে মন্দার জোয়ার এলেও বাণিজ্যে এখনও তেমন ছাপ পড়েনি। শহরে শুধু দু-চাকা ছুটছে পঁচিশ হাজার (মোটর সাইকেল, স্কুটার) এই মুহূর্তটা সত্য কিন্তু আগামীকাল নিয়ে ভাবা দরকার। প্রকৃত ত্যাগ, সংযম, কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তুলতে না পারলে শুধু অর্থনীতি শিল্পনীতির পরিবর্তনেও বাঁচবে না দুর্গাপুর, বাঁচবে না দেশ।

□ 'বর্ধমান সমাচার' শারদ সংখ্যা, ১৯৯৮ □

ডি পি এল কারখানা

রাণীগঞ্জ সমাজের দর্পণে

রামদুলাল বসু

পটকথা

১৮৭৪-এর একটি সরকারি নথি, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের কয়লা বিষয়ক রিপোর্টে রাণীগঞ্জ নামটি প্রথম পাওয়া যায়। অনুমিত হয় তার বেশ কিছুকাল আগেই রাণীগঞ্জ জনপদের জন্ম হয়েছে। ঐ সময়কার মৌজা নকশায় রাণীগঞ্জ নামের উল্লেখ ছিল না। মনে হয় নামটি তখন মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। ১৭৭৪-এ রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লা উত্তোলনের শুরু। ১৭৭৭-এ রাণীগঞ্জের কয়লাঞ্চলে লৌহ আকরের খবর পাওয়া যায়। ১৭৭৪-এর আগস্ট মাসে এস. জি. হিটলি ও জে. সামনার দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সরকারের কাছে কয়লা খননের অনুমতি চান। রাণীগঞ্জ নামটি সরকারি নথিতে আঠারশ শতকের সাতের দশকে পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জ ছিল বর্ধমানরাজের একটি তালুক। এ পর্যন্ত গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় বর্ধমানের কোনো রাণীর নামে রাণীগঞ্জের নামকরণ এবং তিনি উখরা-রাজদুহিতা বর্ধমানরাজ তিলক চাঁদের স্ত্রী বিষ্ণুকুমারী বলেই অনুমিত হয়। কয়লা প্রাপ্তির জন্য রাণীগঞ্জের পরিচিতি। আর সেই সূত্র ধরে রাণীগঞ্জে জনপদের পত্তন। রাণীগঞ্জ নামকরণ সম্পর্কে আর একটি অভিমত--বর্ধমানের জমিদার (রাজা) জগৎরামের বিধবা পত্নী ব্রজকিশোরীর রাণীগঞ্জ অবস্থানকে নিয়ে রাণীগঞ্জ নামের ভিত্তি।

রাণীগঞ্জের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মঙ্গলপুরকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে একটা জনপদ গড়ে উঠেছিল। ১৮৫৫-র আগে পর্যন্ত মঙ্গলপুরে ছিল থানা এবং ডাকঘর। পরে সেগুলি রাণীগঞ্জে উঠে আসে। জনবসতিবিরল কৃষিক্ষেত্র রাণীগঞ্জ ধীরে ধীরে জনপদের রূপ পেল। রাণীগঞ্জে কয়লা শিল্পের সূচনার পর থেকে তার বাড় বাড়ন্ত। স্টীম ইঞ্জিনের ব্যবহারের জন্য কয়লার চাহিদা বাড়ে। ১৮২৮-এ দামোদরকে নৌ ব্যবহার করা হয় কয়লা পরিবহনের কাজে। স্টীমারের সাহায্যে কয়লা পরিবাহিত হতে থাকে। ১৮২০ সালে বেশ কয়েকটা কোম্পানি রাণীগঞ্জে কয়লা উত্তোলনের অংশীদার হয়। ১৮৩১-এ টমাস ব্রাকেন সিলেক্ট কমিটির সামনে রাণীগঞ্জে অনেক কয়লা খনির অস্তিত্বের কথা জানান। এই ব্যবসা গতিশীল হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংযোগে। দ্বারকানাথ রাণীগঞ্জে ব্যবসাসূত্রে আসেন। ১৮২৮-এ দ্বারকানাথ তাঁর বন্ধু উইলিয়াম কারের সঙ্গে যুগ্মভাবে গড়ে তোলেন 'কার টেগোর এণ্ড কোম্পানী'। ১৮৪৩-এ এই কোম্পানি গিলমোর হামফ্রে এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানী'র পত্তন করে। কেন্দ্রীয় অফিস হয় রাণীগঞ্জের পার্শ্ববর্তী এগরা গ্রামে। দ্বারকানাথ থাকতেন নারানকুড়ির বাংলোয়।

১৮৪৯-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন পাতার সিদ্ধান্ত নেয়। 'বাংলায় ভ্রমণ' (প্রথম খণ্ড / ২য় সংকলন ১৯৪০) থেকে এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য — 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী নামে একটি ব্যবসায়ী সঙ্ঘ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত ২৩ মাইল রেলপথ খোলেন। ইহাই পূর্ব-

ভারত রেলপথের সূচনা।' ১৮৫৫-র ৩রা ফেব্রুয়ারি ঐ রেলপথ রাণীগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ১৮৬৩-তে রেলপথ আসানসোল অভিমুখী হয়। কয়লা আবিষ্কার ও রেলপথের প্রতিষ্ঠা, রাণীগঞ্জকে ভূগোলে স্থান করে দেয়। কলকাতার সংবাদপত্রে রাণীগঞ্জের নানান খবর প্রকাশিত হতে থাকে। রেল ও কয়লা এই অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি গড়ে তোলে। রাণীগঞ্জ এক নতুন আলো নিয়ে আসে।

জনপদ ও জনজীবন

রাণীগঞ্জে রেল পৌঁছানোর পর নতুন নতুন কয়লাখনি গড়ে উঠতে থাকে। রেলস্টেশন ও সন্নিহিত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে জনবসতি শুরু হয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে মানুষ যেমন আসতে থাকেন ভাগ্যান্বেষণে, তেমনি কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে অবাঙালি জনসমাজও রাণীগঞ্জে বসতি স্থাপন শুরু করেন। বিহার উত্তরপ্রদেশ থেকে যেমন অনেকে এসেছেন, তেমনি অনেক রাজস্থানী বা মাড়োয়ারী সমাজের মানুষও আসেন ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। রাণীগঞ্জ জনপদ গড়ে ওঠার প্রায় শুরু থেকেই এখানে একটি মিশ্র জনসমাজ সৃষ্টি হয়। এছাড়া বেশ কিছু ইংরেজও রাণীগঞ্জে এসে পৌঁছান। তাঁরা ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের সকলেই রয়ে গেছেন রাণীগঞ্জে। কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে শ্রমিক সমাজে অনেক অবাঙালি মানুষ যোগ দিয়েছেন। তৎকালীন বঙ্গদেশের সন্নিহিত প্রদেশের মানুষদের মধ্যে ওড়িয়াদেরও পাওয়া যায়। মাড়োয়ারীদের পাশাপাশি গুজরাটিরাও এসেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে। এই হোল রাণীগঞ্জের প্রথম দিককার জনসমাজের চেহারা। রাণীগঞ্জের নিজস্ব বাসিন্দা বলতে প্রায় কেউ-ই ছিলেন না। সকলেই এসেছেন ভিন্ন স্থান থেকে। কেউ কাছের কেউ বা দূরের। একটা মিশ্র সামাজিক চেহারা নিয়ে রাণীগঞ্জের জন্ম। একটা পরিত্যক্ত ডাঙাকে কেন্দ্র করে নতুন জনবসতি এভাবে রাণীগঞ্জকে ধীরে ধীরে একটি পৌর শহরের স্তরে তুলে এনেছে এবং তাও একালে নয়। সেই ১৮৭৬-এ রাণীগঞ্জের পৌরসভার প্রতিষ্ঠা।

রাণীগঞ্জ শহরের মধ্যবর্তীস্থলে যে কালীবাড়িটি বর্তমান, সেটা শ্মশানকালী। শ্মশানকালীর প্রতিষ্ঠা শ্মশানভূমিতেই ঘটে থাকে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় রাণীগঞ্জের জনপদ দেশান্তরী ভাগ্যান্বেষীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। বাঙালিরা অধিকাংশই এসেছেন আশপাশ অঞ্চল থেকে, বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি সংলগ্ন জেলা থেকে। রাণীগঞ্জের গঠনপর্বে বাঙালি ও অবাঙালি বিশেষত মাড়োয়ারী সমাজের যৌথ প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করতে হয়। সূচনাকালে এসেছেন মুসলমান সমাজ। এঁদের মধ্যে বাঙালি নামমাত্র। অধিকাংশই উর্দুভাষী। এসেছেন বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে। বলাবাহুল্য কয়লা আবিষ্কারের পর সব সম্প্রদায়ই এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। যেহেতু একটা নতুন জনপদ গড়ে তোলার ব্যাপারে সব সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নিয়েছিলেন, সে কারণে শুরু থেকেই রাণীগঞ্জের সামাজিক জীবন ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। দেশ বিভাগের পর আরও কিছু মানুষ এসেছেন। এঁরা মূলত উদ্বাস্তু হয়েই এসেছিলেন। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে এসেছেন অনেক পাঞ্জাবি পরিবার। যাঁরা রাণীগঞ্জের শিশুবাগান অঞ্চলে বসবাস করছেন। এঁদের মধ্যে শিখ এবং হিন্দু দুই সম্প্রদায়ের মানুষই আছেন। আর এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে কিছু বাঙালি উদ্বাস্তু।

এঁরা রাণীগঞ্জে অশোকপল্লীতে সরকারি পরিকল্পনায় পুনর্বাসিত হয়েছেন। রাণীগঞ্জের সমাজ জীবনে, বিশেষ করে জনগোষ্ঠীতে আবার পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেছে ১৯৭১-এ কয়লাখনি জাতীয়করণের পর। কয়লাখনি সম্প্রসারণ হেতু ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে বহু মানুষ এসেছেন--কেউ বা চাকরি সূত্রে, আবার কেউ বা চাকরি কিম্বা ব্যবসায়ের সন্ধানে। রাণীগঞ্জ শহরও ক্রমে বেড়ে চলেছে। পৌরসভার এলাকাও বেড়েছে। আগে ছিল ১৫টি ওয়ার্ড এবং আয়তন ছিল ১.৮৫ স্কোয়ার মাইল। এখন আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪.৮৬ স্কোয়ার কিলোমিটার। ওয়ার্ডের সংখ্যা ২১। এই ভিত্তিতে প্রথম নির্বাচন হয় ২৮শে মে ১৯৯৫।

১৮৭৬ সালে পৌরসভা প্রতিষ্ঠাকালে ছিল সাহেবদের প্রাধান্য। প্রথম এ দেশীয় পৌরপ্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন জগন্নাথ ঝুনঝুনওয়ালা। মাড়োয়ারী সমাজের এই মানুষটি সেকালের রাণীগঞ্জে ছিলেন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ইনি ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। শ্রীঝুনঝুনওয়ালার উত্তরপুরুষরা এখন রাণীগঞ্জেই বসবাস করেন।

১৯৫৫-র আগেই মঙ্গলপুর থেকে থানা ও ডাকঘর রাণীগঞ্জে উঠে এসেছিল। তখনও সরকারি নথিতে রাণীগঞ্জের নাম ওঠেনি। ১৮৭৭-এ রাণীগঞ্জ মহকুমা শহরের মর্যাদা পায়। ১৮৮০ সালের আগে রাণীগঞ্জে বিচার বিভাগীয় আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাণীগঞ্জ সেকালের বৃহত্তর জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'সংবাদ প্রভাকর', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় রাণীগঞ্জের নানান খবর প্রকাশিত হত। রাণীগঞ্জের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনও রূপান্তরিত হতে থাকে। ১৮৫৬ সালে শিহাড়সোলের জমিদার গোবিন্দ পণ্ডিত স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৭৭-এ রাণীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৮-তে রাণীগঞ্জ স্কুল। ১৯০৫-এ রাণীগঞ্জ মাইনিং স্কুল। এটি সারা ভারতের মধ্যে প্রথম খনিবিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এভাবে রাণীগঞ্জ নিজেকে তৈরি করে নিতে থাকে সভ্য সমাজের উপযোগী করে। রাণীগঞ্জের সমাজ-জীবন এভাবে বৈষয়িক ও মানসিক উভয়ভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে।

আঘাত, আতঙ্ক ও অগ্রগতি

রাণীগঞ্জের সামাজিক জীবনে বড় আঘাত হয়ে আসে মহকুমার সদর দপ্তর আসানসোলে স্থানান্তরিত হবার পর (১৯০৬)। তার আগেই রেল পৌঁছে গেছে আসানসোলে (১৮৬৩)। এবার মহকুমা শহরের রূপে তার পরিচিতি। রাণীগঞ্জ এরপর নেমে আসে পৌর শহরে। তথাপি রাণীগঞ্জ থেমে থাকেনি। যে কয়লা রাণীগঞ্জের সমৃদ্ধির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেই কয়লাই রাণীগঞ্জের জীবনে আতঙ্ক হয়ে দেখা দেবে কে ভেবেছিল।

১৮৫২ সালে রাণীগঞ্জ খনি অঞ্চলে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। এরপর শুরু হয় ধ্বস। ১৮৬৫-তে ধ্বস নামা এলাকায় আগুন ধরে। সেই সমস্যা থেকে রাণীগঞ্জ আজও মুক্ত নয়। পর্যায়ক্রমিক ধ্বসের ঘটনা রাণীগঞ্জ শহরকে বিপন্নতার মুখে ঠেলে দিয়েছে। শহরের সংলগ্ন এলাকাও আশঙ্কামুক্ত নয়। ধ্বস প্রতিরোধে খনি নিরাপত্তা কমিটি দশটি প্রস্তাব দেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি জনসাধারণের স্থানান্তরকরণ। এটা আদৌ গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব নয়। তার অর্থ ধ্বস প্রতিরোধে এবং বিধ্বস্ত অঞ্চলে কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না

নিয়ে সহজ পন্থা গ্রহণ। কোনো অঙ্গ অসুস্থ হলে কেটে বাদ দেওয়ার বিধান গ্রহণযোগ্য তখনই যখন সেটি সারা অঙ্গের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়। কিম্বা কোনো চিকিৎসার উপায় থাকে না। ধ্বসের ব্যাপারটি সেরকম পর্যায়ে যায়নি। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার প্রতিকার যে সম্ভব পরবর্তীকালে সেই পরিকল্পনার বিষয়টি গৃহীত হলেও কার্যকর করার ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে। তার অর্থ ব্যাপারটিকে গুরুতর গণ্য করা হচ্ছে না।

১৯৮৯-এ ডি ডি-এর পরিকল্পনা মতো পরিত্যক্ত মঙ্গলপুরে জনপদ একদিন নবগঠিত ভূখণ্ড রাণীগঞ্জে উঠে গিয়েছিল। এখন আবার মঙ্গলপুরেই পরিকল্পিত শহর গড়ে উঠছে। এও ইতিহাসের এক বিচিত্র নিবন্ধ।

রাণীগঞ্জে জনবসতি মিশ্ররূপ পেলেও জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠিত। রাণীগঞ্জ ক্রমশ ব্যবসাপ্রধান স্থানে পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে কিছু শিল্প। রাণীগঞ্জের কয়লাকে নির্ভর করে কুলটিতে লোহার কারখানা (১৮৬৯)। ১৮৯১ -এ কাগজের কারখানা, রাণীগঞ্জে টালি ও রিফ্রাকটরি ব্রিক কারখানা (১৯০১), বার্নপুরে লৌহ ইস্পাত কারখানা (১৯১৮), ডিসেরগড়ে পাওয়ার সাপ্লাই কারখানা (১৯২২) গড়ে ওঠে। কয়লাখনি জাতীয়করণের (দু পর্যায়ে ১৭.১০.১৯৭১ ও ১.৫.১৯৭২) পর রাণীগঞ্জকে কেন্দ্র করে কয়লাঞ্চলের সামাজিক চেহারা নতুন রূপ পায়। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে মানুষ কাজ নিয়ে এবং কাজের আশায় এই অঞ্চলে ভিড় করতে থাকেন। এখানকার সামাজিক জীবনের চরিত্র সেজন্য বদলায়নি। তবে বৈচিত্র্য বেড়েছে। বহু সম্প্রদায় ও বহুভাষী মানুষ নিয়ে রাণীগঞ্জ। তবে বাঙালির সংখ্যা বেশি। এখানে বাঙালির পাশে বাস করেন মাড়োয়ারী, বিহারী, উত্তরপ্রদেশী, গুজরাটি, শিখ, পাঞ্জাবী হিন্দু, ওড়িয়া এবং তামিল সম্প্রদায়ের মানুষ। এছাড়া অবাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ও নিতান্ত কম নয়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান

বাঙালি ও অবাঙালি সমাজের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে অবাঙালি প্রতিষ্ঠান।

(১) মাড়োয়ারী যুবক সমিতি এই সংস্থা নানা ধরনের সামাজিক কাজ করেন। এ ছাড়া নাটক প্রযোজনাও করে থাকেন। এক সময়ে মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশিত হত। এঁদের নাটক পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও সমাদৃত হয়েছে।

(২) অখিল ভারতীয় সাহিত্য সমাবেশ এই সংস্থাটি রাণীগঞ্জে দুবার সর্বভারতীয় বহুভাষী সাহিত্য সম্মেলন করেন। এই সংস্থাটি অবাঙালি সংস্থা রূপে সেভাবে চিহ্নিত করা যায় না। সত্তরের দশকে প্রথমে ত্রিভাষা (বাংলা, হিন্দি, উর্দু) পরে ষড়ভাষা সাহিত্য সম্মেলন খুব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বভারতীয় পরিচিতি আছে এমন অনেক গুণী জ্ঞানীর সমাবেশ ঘটেছিল সম্মেলনগুলিতে।

(৩) রাজস্থানী সমাজ এঁরাও নানা সময়ে নাটক প্রযোজনা করে থাকেন। তা ছাড়া এঁরা কবি সম্মেলনেরও আয়োজন করে থাকেন।

(৪) হিন্দ কল্যাণ পুস্তকালয় (জয়সোয়াল সমাজ পরিচালিত)

(৫) গুজরাটি যুবক সঙ্ঘ গরবা নাচের অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাছাড়া সমাজসেবামূলক কাজও এঁরা করেন। গরবা নাচের অনুষ্ঠানে গুজরাটী মহিলারা অংশগ্রহণ করেন।

(৬) উর্দু ভাষা-ভাষীদের পাঠাগার শামা লাইব্রেরি বিতর্ক প্রতিযোগিতা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া গুণীজন সংবর্ধনা এঁরা করে থাকেন।

(৭) বর্ধমান জনপদ সাহিত্য সম্মেলন সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দি ভাষার উন্নতিবিধান। তবে সম্মেলনে অন্যান্য ভাষীরাও অংশ নিয়ে থাকেন। এঁদের নিজস্ব ভবনের পরিকল্পনা আছে।

(৮) তিলক লাইব্রেরী শহরের বিশিষ্ট মাড়োয়ারীদের উদ্যোগে ১৯২০ সালে এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা মাড়োয়ারীদের প্রতিষ্ঠিত সর্ববৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এঁদের সংগ্রহে নানা ভাষায় প্রায় ৮০,০০০ হাজারের মতো বই আছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। নিজস্ব সভাকক্ষ আছে। বাঙালি পাঠকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। পাঠাগারের উদ্যোগে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়। এই পাঠাগারে বহু জ্ঞানীগুণী মানুষের পদার্পণ ঘটেছে।

(৯) শিখ সমাজ দেশ বিভাগের পর বেশ কিছু শিখ পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে রাণীগঞ্জে এসে বসতি স্থাপন করেন। উত্তর পল্লীতে বর্তমানে ১০০ ঘরেরও বেশি শিখ পরিবার বাস করেন। এঁদের প্রধান প্রতিষ্ঠান হল গুরুদোয়ারা। এখানে এঁরা মিলিত হন বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে। এঁদের উদ্যোগে একটি জুনিয়র হাইস্কুল গড়ে উঠেছে।

(১০) খ্রীস্টান সমাজ বল্লভপুর অঞ্চলে বেশ কিছু বাঙালি খ্রীস্টান বাস করেন। জগন্নাথ ব্রিজের কাছে চার্চটি বহু পুরানো। খ্রীস্টান সম্প্রদায় ধর্মীয় ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠান করে থাকেন।

(১১) উর্দুভাষী সমাজ এঁরা নদৈ, মুসায়রা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন। সভা সেমিনারও আহ্বান করে থাকেন। সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে এঁরা আমন্ত্রণ জানান। রাণীগঞ্জে হিন্দি ও উর্দুভাষীদের জন্য ৬টি বিদ্যালয় আছে। স্থানীয় টি ডি বি কলেজে হিন্দি ও উর্দুতে অনার্স পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। মহিলা কলেজেও হিন্দি পড়ানো হয়। সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা।

রাণীগঞ্জে বেশ কয়েকটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলি এখানকার মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে। এদের মধ্যে বার্নস ক্লাব, বেঙ্গল পেপার মিল নাট্য সংস্থা (এখন লুপ্ত), সিহাড়সোল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, অশোকপল্লী নাট্য সংস্থা, পূর্বাচল নাট্য সংস্থা, শিশুবাগান, উত্তরপল্লী, নর্থ জোন কম্যুনিটি সেন্টার, ফোরাম গোষ্ঠী, কৃষ্টি ও কল্লোল, রাধারমণ সঙ্গীত কলেজ, আশারাম সঙ্গীত সমাজ, প্রমথনাথ মালিয়া সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, শিল্প শিক্ষাপীঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রাণীগঞ্জের সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া স্কুল কলেজের পাঠাগার, রাণীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি, কৃষ্টি ও কল্লোল পাঠাগার, তিলক লাইব্রেরি, শামা লাইব্রেরির নাম উল্লেখ করার মতো। এইসব প্রতিষ্ঠান রাণীগঞ্জের মানসিক বিকাশের সহায়ক। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে রাণীগঞ্জ যথেষ্ট সফল। এক সময়ে বার্নস ক্লাব রাণীগঞ্জে নাট্যাভিনয়ের

জগতে অগ্রণী ভূমিকা নিত। বহু নাটক মঞ্চস্থ করে তারা রাণীগঞ্জবাসীদের নাট্যরস পিপাসা মিটিয়েছে। রাণীগঞ্জের একাধিক নাট্য সংস্থা নাট্যাভিনয়ে বহির্বঙ্গেরও মন জয় করেছে। আর. ওয়াই. এম. সি.-এর পরিচালনায় 'শুধু ছায়া' নাটক এবং 'পূর্বাচলে'র 'রাম শ্যাম যদু' লক্ষ্ণৌ-এ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে।

পত্র - পত্রিকা

রাণীগঞ্জ থেকে এক সময় বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা তথা সাময়িকী প্রকাশিত হত। ১৯২৯-এ সংবাদ সাপ্তাহিক 'তরুণ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক শেখ কাল্লু। পত্রিকাটি পরে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বামফ্রন্টের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সরোজ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস হালদার প্রমুখ ব্যক্তিরা পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪০-এর দশকে প্রকাশিত হত 'শ্রমিক' । এরও উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি। ১৯৫৮-তে রঞ্জনী (সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) জ্ঞানদারঞ্জন ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র হলেও সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক রচনাও পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হত। সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে পরন্তপ (ত্রৈমাসিক) বাসুদেব মণ্ডলের সম্পাদনায় ১৯৭৭-এ। বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়, রত্নাকর (ত্রৈমাসিক ১৯৭৪), শুভদীপ বসুর সম্পাদনায় শিশুদের পত্রিকা কিশলয় (১৯৭২) প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও মফিজুল ইসলাম 'যোগমণি' নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকাগুলির কোনোটাই আজ জীবিত নেই। এইসব পত্রিকা রাণীগঞ্জ শহর থেকে প্রকাশিত হলেও শহরের সন্নিহিত কয়লাঞ্চল থেকেও বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হত। এগুলির কয়েকটি হল --- 'মানসলোক' (১৯৬৯ থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে) সম্পাদক জয়ন্ত চক্রবর্তী, তাপস ওঝা ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পদাতিক' সম্পাদক দীননাথ চক্রবর্তী, পরে সরোজ ভট্টাচার্য; কালকেতু-সম্পাদক মদন চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ ভাণ্ডারী, গৌতম গুপ্ত; 'আহ্বান' সম্পাদক -- কাজী আখতারউদ্দীন আহমেদ ও কাজী খায়রুল আলম; 'আঁধারমণি'--- সম্পাদক শুভময় চট্টোপাধ্যায়, যামিনীরঞ্জন অর্ণব ও আশিসকুমার সরকার, 'চিত্রকূট' , সম্পাদক সুকুমার চক্রবর্তী, 'শুধু শব্দ নয়', সম্পাদক অসীম পাণ্ডা, তারক পাণ্ডা ও মনোজ চক্রবর্তী, 'এষণা' সম্পাদক অশোক ভট্টাচার্য, মনোজ চক্রবর্তী ও কমল আচার্য। 'মানস লোক' ছাড়া এখন বাকি কোনোটাই টিকে নেই।

রাণীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত আর দুটি পত্রিকার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন রাণীগঞ্জ শাখার মুখপত্র 'অরণি' জহর বক্সীর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। পরবর্তীকালে যথাক্রমে তাপস মজুমদার ও শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হতে থাকে। কয়েক বছর হল পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ আছে। যতদূর জানা যায় ডা. গণেশ রাঠীর সম্পাদনায় 'অরণি' আবার প্রকাশিত হবে। দ্বিতীয় পত্রিকা 'শীকর' (১৯৮২)-এ ছিল ক্ষণজীবী। দীপঙ্কর গুপ্ত ও মফিজুল ইসলামের যুগ্ম সম্পাদনায় এটা প্রকাশিত হয়েছিল।

সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য

রাণীগঞ্জে বেশ কয়েকটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যাপৃত আছে। এদের মধ্যে লায়নস্ ক্লাবের তিনটি শাখা (লায়ন্স ক্লাব অফ রাণীগঞ্জ, লায়ন্স ক্লাব অফ গ্রেটার রাণীগঞ্জ, লায়নস্ ক্লাব দামোদর) রোটারি ক্লাব, বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন রাণীগঞ্জ শাখা, বিজ্ঞানমঞ্চ, রাণীগঞ্জের দুটি চেম্বার অফ কমার্স বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজে রাণীগঞ্জকে উন্নত করে চলেছে। লায়নস্ ক্লাব তাদের অন্যান্য কার্যক্রম ছাড়াও একটি চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাছাড়া, প্রতি বছর সহস্রাধিক ব্যক্তির ছানি অপারেশন ক্যাম্প করে বিনামূল্যে অপারেশন ও চশমার ব্যবস্থা করে চলেছে। রোটারি ক্লবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিশু চিকিৎসা ক্লিনিক এবং ফিজিও থেরাপী ক্লিনিক। রোটারি ক্লাবও প্রতি বছর চক্ষু অপারেশন শিবির বিনামূল্যে পরিচালনা করে। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ১৯৯৯ থেকে স্বাস্থ্য মেলা পরিচালনা করছে। দুদিনের মেলায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়াস এই মেলায় আছে। রাণীগঞ্জের সামাজিক উন্নয়নে এইসব এন. জি. ও.-র অবদান স্বীকার করতেই হয়। এছাড়া সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শাখা (১৯৭৮) গণতান্ত্রিক লেখক ও কলাকুশলী সমিতির শাখা, মৃত্যুঞ্জয় ইনস্টিটিউট, বর্ধমান জনপদ সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। ১৯৮১ সালে 'সম্মেলন' এর স্মরণিকায় একটি প্রবন্ধে লেখক শ্রী মহীদর চট্টোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি--'আজ থেকে তিন বছর আগে কোনো এক বর্ষণমুখর আষাঢ়সন্ধ্যায় বাদল দিনের প্রথম যে কদম ফুলটি ফুটে উঠেছিল, জানি না বিধাতার কোন্ আর্শীবাদে তরুণ বয়সের সেই ফুলটি পরিণত বয়সের ফলে পরিণত হয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির সেবায় লেগেছে। বহু প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ কবি সাহিত্যিকের জন্ম লগ্নকে স্বাগত জানিয়েছে এই সম্মেলন। ঘরোয়া পরিবেশে, পরস্পর বিদ্বেষ ভুলে নানান মতের ও ধর্মের সাহিত্যসেবীর ও সাহিত্যানুরাগীর সমাবেশ আমাদের সম্মেলনকে যথার্থ রূপ দিতে এগিয়ে এসেছে।' নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শাখা প্রতিমাসে সাহিত্য সভা ছাড়াও বার্ষিক সম্মেলনে শিল্পাঞ্চলে সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমীদের আহ্বান করে এবং সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সংগঠকদের সংবর্ধনা জানায়। রাণীগঞ্জের একটি বিখ্যাত সামাজিক প্রতিষ্ঠান মৃত্যুঞ্জয় ইনস্টিটিউট বীণাপাণি ড্রামাটিক ক্লাব ভবন গড়ে উঠেছিল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের (সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দাদামশায়) প্রদত্ত জমিতে। ১৯৩০ থেকে শুরু হয়ে ১৯৩২-এ নির্মাণ কার্য শেষ হয়। বীণাপানির নতুন নাম হয় 'মৃত্যুঞ্জয় ইনস্টিটিউট'। ১৯৩০ থেকে ইনস্টিটিউট একটি প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করছে। এই সংস্থার উদ্যোগে নানা ধরনের ইনডোর গেমস-এর প্রতিযোগিতা, নাট্যাভিনয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। ইনস্টিটিউটের চেষ্টায় একটি অতিথিশালা 'বঙ্গভবন' গড়ে উঠেছে। এঁদের একটি সিনেমা হলও আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মাড়োয়ারী সমাজের প্রতিষ্ঠিত রাণীগঞ্জের সবচেয়ে বড় অতিথিশালায় সভাকক্ষ ছাড়াও দেড়শত মানুষের থাকার ব্যবস্থা আছে। 'সীতারামজী

ভবন' অতিথিশালারূপে অন্যতম বিশিষ্ট সেবা প্রতিষ্ঠান। রাণীগঞ্জে এই ধরনের আরও কয়েকটি অতিথিশালা বর্তমান।

সাহিত্যচর্চা

এই প্রসঙ্গে রাণীগঞ্জের সমাজ জীবনে সাহিত্যচর্চার একটা রূপরেখা দেওয়া অসঙ্গত হবে না। আগে সাহিত্য পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে রাণীগঞ্জের অনতিদূরে দামোদর তীরবর্তী ভুলুই গ্রামের অধিবাসী পিতাপুত্র জগদ্রাম রামপ্রসাদ রচনা করেছিলেন রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলাকৃত সিন্ধু। পণ্ডিতদের অনুমান জগদ্রাম রামপ্রসাদের রামায়ণের সুলোচনা চরিত্রের আধারে মাইকেল মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রমীলা চরিত্রের পরিকল্পনা করেন। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য এই যে, কবি মধুসূদন সিয়ারসোল রাজাদের আমন্ত্রণে ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে রাজবাড়ির অতিথিশালায় কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। সেকালের অর্থাৎ উনিশ শতকের এবং একালের অনেক সাহিত্যে রাণীগঞ্জের উল্লেখ আছে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু', সত্যচরণ মিত্রের 'অবলাবালা' প্রভৃতি গ্রন্থে রাণীগঞ্জের উল্লেখ আছে। 'কল্পতরু'র পটভূমি রাণীগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। অবলাবালা-র কিছু অংশ জুড়ে আছে রাণীগঞ্জ। বিশ শতকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী'তে রাণীগঞ্জ এসেছে। শৈলজানন্দ, সমরেশ বসু, নজরুল ইসলামও রাণীগঞ্জকে স্থান দিয়েছেন সাহিত্যে। এ কালের বহু সাহিত্যিক রাণীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলকে তাঁদের সাহিত্যের বিষয়ীভূত করেছেন। একালে রাণীগঞ্জে সাহিত্যচর্চার সূচনা হয় বিশ শতকের প্রথম দিকে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে গল্প-কবিতা রচনায় হাত পাকাচ্ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন শৈলজানন্দ। যদিও দুজনে পড়তেন দুই প্রান্তের দুই স্কুলে। শৈলজানন্দ রাণীগঞ্জ হাইস্কুলে এবং নজরুল সিহাড়সোল রাজস্কুলে। শৈলজানন্দের শুরু পদ্য দিয়ে, নজরুলের গদ্য। পরে উলটে গেল রচনার মাধ্যম। শোনা যায় নজরুলের একটি কবিতা পড়ে সিহাড়সোল রাজস্কুলের হেডমাস্টার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ক্লাস ফোর-এ ভর্তি করেন এবং বোর্ডিং-এ থাকারও ব্যবস্থা করে দেন। সিহাড়সোল স্কুলে পড়ার সময়ে নজরুল তাঁর দুই শিক্ষক ভোলানাথ স্বর্ণকার এবং হরিশঙ্কর মিশ্রের বিদায় সভায় দুটি কবিতা লেখেন।এরপরে তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা একটি চড়ুই পাখিকে নিয়ে। 'মস্ত বড় দালান বাড়ির উইলাগা ঐ কড়ির ফাঁকে/ছোট একটি চড়ুই ছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে' ইত্যাদি। এই পর্বের নজরুলের দুটি অপ্রকাশিত কবিতা শৈলজানন্দ উদ্ধার করেছিলেন। সে দুটি নজরুলের গ্রামের নরোত্তম রাজার গড় নিয়ে লেখা। রাণীগঞ্জের উপরও নজরুল একটা কবিতা লিখেছিলেন। 'রাণীগঞ্জের অর্জুন পট্টির বাঁকে/যেখান দিয়ে নিতুই সাঁজে ঝাঁকে ঝাঁকে/রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহরে বৌ কলস কাঁখে।/সেই সে বাঁকের শেষে/তিন দিক হতে তিনটি রাস্তা এসে/ত্রিবেণীর ত্রিধারার মতো গেছে একেই মিশে।' অর্জুনপট্টির এই স্থানটি আজও বিদ্যমান। (এই কবিতাটি থেকে অন্তত একটি তথ্য পাওয়া যায়। তা হল রাণীগঞ্জের তৎকালীন জলাভাবের কথা। পানীয় জল সংগৃহীত হত

রাজার বাঁধ থেকে। অর্জুনপট্টী থেকে রাজার বাঁধের দূরত্ব এক কিলোমিটারের কম নয়। রাজার বাঁধ আজও বর্তমান)। শৈলজা নজরুলের কৈশোরের দিনে নাকি মাঝে মাঝে আসতেন ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। রাণীগঞ্জে সাহিত্যচর্চার ধারায় স্বাধীনতা উত্তরকালে কিছুটা অনুশীলন সূচিত হয়েছে। কবিতা রচনায় অনেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কেউ কেউ শিল্পাঞ্চলের গণ্ডিও অতিক্রম করেছেন। এঁদের মধ্যে কবিতায় ড. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, ড. আবদুস সামাদ, অসীম মুখোপাধ্যায়, তাপস মজুমদার, যামিনীরঞ্জন অর্ণব, দীপঙ্কর গুপ্ত, মদনমোহন ঘোষ, ডা. গণেশ রাঠী, শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত, মফিজুল ইসলাম প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। গল্প রচনায় অসীম মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধ ও রম্য রচনায় ড. মনোজ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য নাম। উর্দু কবি রৌণক নঈম সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব। হিন্দি কবিতায় সুরেশ মণ্ডল, রাওয়েল পুষ্প ও প্রবন্ধে ড. ডি. পি. বর্ণওয়াল, ড. জিউত মিশ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখন অনেকেই লিখছেন।

স্বাধীনতা হীনতায়

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে রাণীগঞ্জের নাম অলিখিত থাকলেও রাণীগঞ্জ পিছিয়ে ছিল না। রাণীগঞ্জের সমাজজীবনে স্বাধীনতা আন্দোলন এক সময়ে উত্তাল ঢেউ তুলেছিল। ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সরস্বতী কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভীমাচরণ রায়ের উদ্যোগে। এই প্রতিষ্ঠান ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আখড়া। এই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য ছিলেন, অমূল্যরতন ঘোষ, শান্তিময় ঘোষ, অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস বাজাজ, কৃষ্ণকালী চক্রবর্তী, বিনয়ভূষণ দেব, বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী, সুরেন্দ্রমোহন সরকার, জগদীশচন্দ্র রায়, কামাখ্যাচরণ সেনগুপ্ত, ক্ষিতিশচন্দ্র ঘোষ, দুর্গাদাস হালদার, বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া, শেখ কাল্লু, কাশীনাথ সিংহ, জ্যোতির্ময় দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সরস্বতী কর্মমন্দির গড়ে উঠেছিল সেবামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে। রোগীদের সেবা, মৃতদেহ সৎকার, দুর্ভিক্ষ, বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অর্থ-বস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ প্রভৃতি ছিল এই সংস্থার কাজ। ১৯২০ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ে। তখন কংগ্রেসই ছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল। কংগ্রেসের সমাজসেবামূলক কর্মসূচী ছাড়াও রাজনৈতিক কর্মসূচী তাঁরা কার্যকর করতেন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি রাজরোষে পড়ে। দুর্গাদাস হালদার, ভীমাচরণ রায়, অমূল্যরতন ঘোষ, বনোয়ারীলাল ভালোটিয়াকে কারাবরণ এড়ানোর জন্য মাঝে মাঝে আত্মগোপন করতে হত। তথাপি এঁরা সব সময়ে কারাবরণ এড়াতে পারেন নি।

অসহযোগ আন্দোলন রাণীগঞ্জের সমাজ জীবনকে আন্দোলিত করেছিল। গান্ধীজীর আহ্বানে শহরবাসী সাড়া দিয়েছিলেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও চরকায় সুতা কাটার প্রচলনে যুক্ত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঘটনা শেখ কাল্লুর চেষ্টায় 'তরুণ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন অণ্ডালের বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটি এ অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছিল মুখপত্র। অনেকের মতো সরোজ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে সি পি এম

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান) বড়বাজার ও স্টেশন অঞ্চলে তরুণ পত্রিকা বিক্রি করতেন। ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০-এ মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবর তরুণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর রাজরোষ। তরুণ প্রেস ও পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। শহরে জারি হয় ১৪৪ ধারা।

রাণীগঞ্জে বহু রাজনৈতিক নেতার আগমন ঘটেছে। ১৯২০ সালে আসেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। জগন্নাথ গার্ডেন-এ তিনি কয়েকদিন ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে রাণীগঞ্জে হয়েছিল ন্যাশনাল হাই স্কুল। প্রভুদয়াল হিম্মত সিংকা এসেছিলেন ১৯২০ সালে। ১৯৩০-এ এসেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। জগন্নাথ ঝুনঝুনওয়ালার আহ্বানে সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন ১৯৩০-এর ১৬ই ডিসেম্বর। রাণীগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের মাঠে জনসভায় তিনি ভাষণ দেন। সভার সভাপতি ছিলেন রাণীগঞ্জের প্রাক্তন পৌরপ্রধান গিরিশচন্দ্র মণ্ডল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন ডা. জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের গৃহে। স্বাধীনতা আন্দোলনকালে আরও যেসব নেতা রাণীগঞ্জে এসে সভা কিম্বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম লালা লাজপত রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বিপিনচন্দ্র পাল, বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ফকিরচন্দ্র রায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

সরস্বতী কর্মমন্দির ১৯৩৩-তে সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত হবার পর সেটি সরস্বতী লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত হয়। এখানেই রাণীগঞ্জের জীবনের স্বদেশী আন্দোলনের ইতি নয়। বিয়াল্লিশের আন্দোলন, লবণ আন্দোলন, মদ্যপান বর্জন আন্দোলন প্রভৃতি বহুবিধ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে রাণীগঞ্জের মানুষ জড়িয়ে ছিলেন। রাণীগঞ্জের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকা দীর্ঘ। পরবর্তীকালে চিরঞ্জীলাল কেজরিওয়াল, ভানুপ্রসাদ খৈতান, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল দাস, রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হারাধন রায় প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রাণীগঞ্জে স্বদেশী আন্দোলনের হোমশিখাটি উজ্জ্বলতর করেছেন। সেকালে যেসব বিপ্লবীরা আত্মগোপনের জন্য রাণীগঞ্জে আসতেন তাঁদের গোপনে আশ্রয় দিতেন বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া, দুর্গাদাস হালদার প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। অবশ্য বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী রণেন গাঙ্গুলী ছদ্মনামে সিহাড়সোল রাজবাড়িতে কাজ নিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আসে বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের নাম। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ও নিবারণ ঘটকের প্রচেষ্টায় সিহাড়সোলের যুবকেরা লাঠি ও ছোরা খেলায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল এবং বিপ্লবমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। নিবারণ ঘটক ছিলেন সিহাড়সোল রাজস্কুলের শিক্ষক। নজরুল এঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিবারণ ঘটকের বৈপ্লবিক কর্মে সহায়তা করতেন তাঁর মাসী দুকড়ি বালা। তিনি থাকতেন বীরভূমের নলহাটিতে। বিপ্লবী নেতা জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে নিবারণ ঘটক তাঁর মাসীর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণায় দুকড়িবালাও বৈপ্লবিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লুণ্ঠিত পিস্তল কাছে রাখার জন্য দুকড়িবালার তিন বছর জেল হয়। নজরুল নিবারণ ঘটকের কাছে বিপ্লববাদের প্রেরণা পান এবং স্বাধীনতার জন্য লেখার প্রেরণাও পান।

ধর্ম-কর্ম-উৎসব-আনন্দ

বহু সম্প্রদায় ধর্ম ও ভাষাভাষীর মানুষ নিয়ে রাণীগঞ্জের সমাজ। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান-শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্মের স্বাধীনতা থেকে এখানে গড়ে উঠেছে মন্দির, মসজিদ, গুরুদোয়ারা, চার্চ প্রভৃতি ধর্মস্থান। এছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা ধরনের ধর্মানুষ্ঠান তো আছেই। হিন্দুদের তেমনি দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব। রাণীগঞ্জে দুর্গাপূজার সূচনা প্রায় দেড়শ বছর আগে। আগে পারিবারিক পূজার প্রচলন ছিল বেশি। সেখানে বৃহত্তর সমাজের প্রবেশাধিকার ছিল না। সেই সীমাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়ায় রাণীগঞ্জে ধীরে ধীরে বারোয়ারী পূজার সূচনা। এগুলিও প্রথম দিকে ঠিক সর্বজনীন ছিল না। নানা উপ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত ছিল। সেকালে সব শ্রেণীর মানুষ পূজার অধিকার পেত না। এই বারোয়ারী পূজা পল্লীকেন্দ্রিক হওয়ায় সেটা রূপ পেত পল্লী পরিবারের। বাংলাদেশে দুর্গাপূজার ইতিহাসে পারিবারিক পূজা এসেছে আগে। রাণীগঞ্জে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে প্রায় দেড়শ বছর আগে রাম ময়রা প্রবর্তিত দুর্গাপূজাই রাণীগঞ্জের আদি দুর্গাপূজা। রাম ময়রার আসল নাম ছিল রামপদ রক্ষিত। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র গোষ্ঠবিহারী পূজা বজায় রাখেন। গোষ্ঠের পর তাঁর পুত্র ফকিরের আমলে এই পূজা বেশ জমকালো চেহারা পায়। ফকিরের পুত্রসন্তান না থাকায় এর পরে রক্ষিত পরিবারের পূজার দায়িত্ব পান তাঁর দৌহিত্র বংশ। এখনও রাণীগঞ্জের অর্জুনপট্টির রক্ষিত বাড়িতে এই পূজা হয়ে আসছে। তবে তার গায়ে এখন সময়ের ধুলো। আড়ম্বরহীন এই পূজা এখন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। পারিবারিক পূজায় এর পরের নাম পাল পরিবার। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে আনুমানিক পৌনে দুশ বছর আগে তাঁরা রাণীগঞ্জে বসবাস শুরু করেন। এখন বড় বাজার অঞ্চলের বাসিন্দা। নটবর পাল ও নীলাম্বর পাল এই পূজার প্রবর্তক। এ পূজার পেছনে একটা ছোট ইতিহাস আছে। পাল পরিবারের বংশ থাকতো না। নীলাম্বর রক্ষিত বাড়ির দুর্গাদেবীর কাছে মানত করেছিলেন যে, যদি তিনি বংশধর পান তো তিনি পূজা শুরু করবেন। সে পূজা আজও চলছে। এখন পাল পরিবার শাখা প্রশাখায় অনেক বড়। তাই এখন পূজোর সময়ে একসঙ্গে মেলামেশা হয় না। এই পূজোর বয়স প্রায় দেড়শ বছর।

রাণীগঞ্জের কুমারবাজার পল্লীতে বেশ কয়েকটি পারিবারিক পূজা আজও হয়ে চলেছে। কুমারবাজারের যমজয়ী (জামজুড়ি) থানের বা নীচু পাড়ার রায়েদের পূজার কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। এই পারিবারিক পূজাও প্রাচীন। রাসবিহারী নন্দীর বাড়ির পারিবারিক পূজাও প্রাচীন। খাড়গুলী পল্লীর সাধু পরিবারের পূজাও অনেকদিনের। একশ বছর পার হয়ে গেছে। বঙ্কুবিহারী সাধু এই পূজার প্রচলন করেন। পারিবারিক পূজার চল প্রায় উঠে যেতে বসেছে। নতুন করে কোনো পূজো হতে দেখা যাচ্ছে না। তার জায়গা নিয়েছে পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী পূজা। পারিবারিক পূজার নতুন সংযোজন ১৩৯০ থেকে অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তীর বাড়ির পূজা। পারিবারিক পূজা মূর্তি পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য, তা শাস্ত্রে দেবীমূর্তি। রাণীগঞ্জ তার ব্যতিক্রম নয়।

রাণীগঞ্জের বারোয়ারী দুর্গাপূজার ইতিহাসও কম দিনের নয়। রাণীগঞ্জের সবচেয়ে পুরানো বারোয়ারী পূজা হল শালডাঙা ভকত পাড়ার। এই পূজোর বয়স ১২৫ বছর পার হযেছে বলে জনশ্রুতি। এখনও উৎসাহে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দেবীমূর্তি প্রাচীন এবং ডাকের সাজ। অনেকটা ঘরোয়া পরিবেশ। এরপর যেটি উল্লেখযোগ্য সেটি ষোলোআনার পূজা। ডালপট্টির পূজা। ১৩০৪ সাল থেকে এই পূজার প্রচলন। জনশ্রুতি এই যে, এই পাড়ার মহিলারা নাকি ভকত পাড়ায় পূজা ও অঞ্জলি দিতে প্রত্যাখ্যাতা হন। এরপর পল্লীর সকলে স্থির করেন তাঁরা একটি বারোয়ারী পূজার ব্যবস্থা করবেন। রাখাল ময়রার উদ্যোগে এই পূজা প্রচলিত হয়। বৈজনাথ মিস্ত্রী, ডা. অমরনাথ কর, ফকির রুজ প্রভৃতি অনেকেই এই পূজার সঙ্গে যুক্ত হলে পূজার গুরুত্ব বাড়ে। ডা. রাধারমণ রোডের নিজস্ব মণ্ডপে এই পূজা এখন জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। দেবীমূর্তি শাস্ত্রোক্ত এবং সাজ ডাকের। শোনা যায় নাকি এখানেও এক সময়ে ভকত পাড়ার ছোঁয়াচ লেগেছিল। এক সময়ে নাকি এখানেও সকলকে পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দেবার অধিকার দেওয়া হত না। এরই প্রতিবাদে প্রচলিত হল মৃত্যুঞ্জয় ইনস্টিটিউটের পূজা। করোনেশন টকিজ হলে এই পূজার প্রচলন হয় ১৩৪৫ সন (১৯৩৮ খ্রি.) থেকে। এই পূজার দ্বার সকলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। প্রথম পুরোহিত ছিলেন সিহাড়সোল রাজস্কুলের ব্যোমকেশ পণ্ডিত। দ্বারিকানাথ সেন, রামরঞ্জন মিত্র, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, বৈদ্যনাথ গুপ্ত, হেমচন্দ্র মজুমদার, যুধিষ্ঠির লাহা, অনিলবরণ দত্ত প্রভৃতি পল্লীর বিশিষ্ট মানুষেরা এই পূজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে প্রথা ভঙ্গ করে প্রথম মাটির সাজের প্রতিমা নির্মিত হল। রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এও এক প্রতিবাদ! এর একবছর পরে শুরু হয় স্কুল পাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব (১৯৩৯)। অমরেন্দ্র ব্যানার্জী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডা. মন্মথনাথ ঘোষ, বিশ্বেশ্বর চন্দ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এই পূজার পত্তন। এরপর সর্বজনীন পূজা শুরু হয় পাড়ায় পাড়ায়। এখন শহরে ষাটটির মতো পূজা হয়।

রাণীগঞ্জের পাশের গ্রাম সিহাড়সোলে (এখন রাণীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত) পারিবারিক পূজা এখনও বেশ ধুমধামের সঙ্গে হয়ে চলেছে। সম্প্রতি বারোয়ারী পূজার চলও হয়েছে। বাড়ির পূজার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হাজরা পরিবারের। দুশ বছরেরও বেশি দিন ধরে এই পূজা হচ্ছে। হাজরা বাড়ির পূজায় বলিদানের পর অন্যান্য বাড়িতে হয়। এটাই এই পল্লীর সংস্কার। এই প্রতিমাগুলি প্রাচীন ধারার। সাজও ডাকের। এখানকার প্রতিমা পরিকল্পনার একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে, কার্তিককে দেবীর দক্ষিণে এবং গণেশকে দেবীর বামে দেখা যায়। আগে সিহাড়সোল রাজপরিবারেরও পূজা হত। এখন হয় না। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরানো পূজা নিমতা গ্রামের চট্টরাজ পরিবারের। প্রায় পৌনে তিনশ বছরের পুরানো বলে জানা যায়।

রাণীগঞ্জের পীরবাবার মেলা সামাজিক জীবনে একটি সাম্প্রদায়িক মিলন-তীর্থ। মৌলানা সৈয়দ শাহ সামসুদ্দিন ইন্দ্রাবি রহমতুল্লা আলের মৃত্যু হয় ১৯০১ সালে রাণীগঞ্জে। ইনিই পীরবাবা নামে খ্যাত। তাঁর মৃত্যুর বছর থেকে তাঁর মাজারে বসন্তকালে উরস উৎসব

উপলক্ষে ৪ঠা কিম্বা ৫ই ফাল্গুন থেকে মেলা বসে। প্রথম দিকে মেলা হত তিন দিনের। এখন দশ বারো দিন ধরে মেলা চলে। পীরবাবা এসেছিলেন বিহার অঞ্চল থেকে। এখন তাঁর বংশধররা থাকেন নেপালে। মেলার সময়ে প্রতি বছর নেপাল থেকে পরিবারের কেউ না কেউ আসেন। এতোয়ারী মোড় থেকে রাস্তার দু প্রান্ত জুড়ে রণাই পর্যন্ত বিস্তৃত এই মেলা কেন্দুলীর জয়দেবের মেলার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এই মেলা বৈচিত্র্য ও আয়তনের দিক থেকে যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি এর সাম্প্রদায়িকমুক্ত চরিত্র ও সামাজিক জীবনকে একতাবদ্ধ করে রাখার প্রেরণা দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দামোদর তীরে পৌষসংক্রান্তির মেলা। দামালিয়ার কাছে এই মেলা বসে। সিহাড়সোল রাজপরিবারের রথযাত্রা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই মেলাও সুপ্রাচীন। এই মেলা এই অঞ্চলের মানুষের মনে প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করে। রাজবাড়ির পিতলের বিরাট রথটিও আকর্ষণীয়।

উচ্চশিক্ষায় রাণীগঞ্জ

রাণীগঞ্জ মাইনিং ইনস্টিটিউটের কথা (১৯০৫) আগেই উল্লেখ করেছি। আগে ছিল ইভনিং মাইনিং স্কুল। ভারতের প্রথম মাইনিং ইনস্টিটিউট। এখন আরও সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ। এখানে ডিপ্লোমা কোর্স-এ আরও প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৫৭ সালে বনোয়ারীলাল ভালোটিয়ার উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে রাণীগঞ্জে একটি সহশিক্ষামূলক কলেজ স্থাপিত হয়। শুরু থেকেই কলেজটি সরকারি স্পনর্সড কলেজের মর্যাদা পায়। বনোয়ারীলাল ভালোটিয়াকে বলা হয় দানবীর। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর দান অবদান হয়ে সমাজ কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। তিনি রাণীগঞ্জের গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের জন্যও বহু অর্থ দান করেন। আসানসোল কলেজ পরবর্তীকালে তাঁর অর্থে পুনরুজ্জীবিত হয়ে বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া কলেজরূপে পরিচিত হয়। রাণীগঞ্জ কলেজ তাঁর স্ত্রীর নামে। ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ। ৩০০ ছাত্রছাত্রীর উপযোগী করে কলেজটি প্রথমে নির্মিত হলেও এখন ছাত্রছাত্রী সংখ্যা পাঁচ হাজার। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম কলেজ। শুধু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যায় নয়, বিষয়ের সংখ্যায়ও। পঁচিশটির মতো বিষয় এখানে পড়ানো হয়। কিছু বিষয় প্রথা বহির্ভূত। কয়েকটি আধুনিক বিজ্ঞানের। তাছাড়া প্রথাভিত্তিক কলা বাণিজ্য বিজ্ঞানের সব বিষয় তো আছেই। অধিকাংশ বিষয়েই অনার্স পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। শিক্ষকদের বাসস্থান, শিক্ষাকর্মীদের বাসস্থান। হোস্টেলসহ বিরাট এলাকা জুড়ে কলেজের অবস্থান। শতাধিক অধ্যাপক। এঁদের মধ্যে প্রায় চল্লিশভাগ ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত। কয়েকজন বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আছেন। ১৯৮১-তে স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় রাণীগঞ্জে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটি সিহাড়সোল-এ অবস্থিত। সহস্রাধিক ছাত্রী এখানে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করেন। ছাত্রী সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ের উপর পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানিয়ে আপাতত এই ইতিহাস শেষ কববে। ১৯৪০ সালের ১লা মার্চ রবীন্দ্রনাথ রাণীগঞ্জের উপর দিয়ে দামোদর পার হয়ে বাঁকুড়ায় যান।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী' (৪র্থ) গ্রন্থে এ সম্পর্কে একটি বিবরণ দিয়েছেন - 'বোলপুর হইতে ট্রেনযোগে খানা স্টেশন পর্যন্ত গিয়া, সেখান হইতে মোটর করিয়া কবি বাঁকুড়া যান রাণীগঞ্জের পথে। কবিকে দেখিবার জন্য পথে পথে কী ভিড়। রাণীগঞ্জে জনতার চাপে মোটরগাড়ি ভাঙিবার উপক্রম হয়'। রবীন্দ্রনাথ রাণীগঞ্জ পৌরভবনের পাশ দিয়ে জগন্নাথ ব্রিজ হয়ে মেজিয়ায় পৌঁছান। রাণীগঞ্জ স্কুলে কবির সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। কিন্তু তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে ভিড়ের মধ্যে নামেননি। একজন ছাত্র কবিকে গাড়ির মধ্যেই মাল্যভূষিত করেন। রাণীগঞ্জে কবির নামবার কথা ছিল না। তথাপি শহরবাসী তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। রাণীগঞ্জে কবির পিতামহ দ্বারকানাথ একসময় কয়লা খনির ব্যবসায়ের কাজে কিছুকাল বাস করেছিলেন। সেকথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। দ্বারকানাথের স্মৃতির কোনো চিহ্ন অবশ্য নেই। রবীন্দ্রনাথেরও নয়। রবীন্দ্রনাথের একটি মর্মরমূর্তি এই পথের সন্ধিস্থলে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ইতিহাস এগিয়ে চলে তার নিজস্ব ধারায়। কখনও সে স্রোতস্বিনীর মতো ঢেউ তুলে তুলে চলে, কখনও বা প্রবল প্রবাহে নতুন খাত গড়ে নেয়। ইতিহাস সমাজকে গড়ে, ভাঙে তার রূপান্তর আনে। কোথাও তাকে প্রাচীর দিয়ে ধরে রাখা যায় না। 'প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান। সম্পূর্ণ করে না তার গান।' রাণীগঞ্জের সমাজ-জীবনও চলমান। তবে ধ্বংসের অদৃশ্য গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে কতদিন সে জীবনের গান গাইবে জানি না। উল্লেখযোগ্য এই যে, রাণীগঞ্জ শহর বিপজ্জনক বলে ঘোষিত হয়েছে কিছুকাল আগে। তবু সে থেমে নেই, আপন গতিতেই এগিয়ে চলেছে।

□ 'আজকের যোধন' শারদ সংখ্যা, ১৪০৬ □

রাণীগঞ্জ যেভাবে বেড়ে উঠেছে

কালের বিবর্তনে রাণীগঞ্জ

তাপস মজুমদার

শেরশাহের জি. টি রোডের বাঁ দিকে শেরগড় পরগণার অধীন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল তখন রাণীগঞ্জ।

মূলত সিহাড়শোল রাজ এস্টেট, উখড়া রাজ এস্টেট এবং অণ্ডালের জমিদারের সিংহভাগ ঘিরে ছিল এই রাণীগঞ্জ। পরে এতে থাবা বসায় বেঙ্গল কোল কোম্পানী।

তখনও কয়লার খনন শুরু হয়নি, এ খনি অঞ্চলের জনকজননী রাণীগঞ্জ নিজেকে প্রসারিত করতে শুরু করেছে, সাহেবী উপনিবেশবাদে অ্যাংলো কালচারে ভূমিষ্ঠ হয়েছে আসানসোল।

সে সময় এই রাণীগঞ্জ ছিল মহকুমা শহর। যেখানে রাণীগঞ্জ হাইস্কুল আছে, পৌরসভার পূর্ব দক্ষিণ কোণে যেখানে ডাকবাংলো ছিল সেখানে ছিল ১৮৮৬ সালের পূর্বে জেল ও মহকুমার প্রশাসনিক অফিস। কথিত আছে যে রাণীগঞ্জ হাইস্কুলের পুরানো বিল্ডিং-এর মধ্যে যে কুয়াটি আছে তাতে নাকি ফাঁসিও দেওয়া হত। ১৯০৬ সালে এ মহকুমা রাণীগঞ্জ থেকে আসানসোলে স্থানান্তরিত হয়। ১৮১৪ সালে লর্ড হেস্টিংস রুপার্ট জোন্স-এর দ্বারা সর্বপ্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এগরা গ্রামে কয়লা তোলার কাজ শুরু করেন খাদ কেটে। পরে ১৮৪৩ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর নারানকুড়ি গ্রামে কার এণ্ড টেগোর মাইনস্ গড়েন। যার স্মৃতি আজও এখানে আছে।

১৮৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি শনিবার প্রথম হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ অবধি রেলপথ চালু হয়। এখানে তাঁবুও পড়েছিল। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিবারবর্গরা ঐ তাঁবুতে আসেন, খাওয়া-দাওয়া করে ফিরে যান। সে সময় রাণীগঞ্জ থেকে হাওড়ার প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ছিল ১১ টাকা ৪ আনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫ টাকা ১০ আনা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ১ টাকা ১৪ আনা।

তখন দামোদর নদী এত ভয়ংকর ছিল যে, তার বন্যার কবলে বল্লভপুর, নারানকুড়ি, এগরা গ্রাম, দামোদর কলোনী ভেসে যেত।

অণ্ডাল তখন যুক্ত ছিল রাণীগঞ্জের সাথে। পাণ্ডবেশ্বর, হরিপুর, উখড়া, অণ্ডাল, জামুড়িয়া, কালিপাহাড়ি অঞ্চল থেকে লোকজনেরা ও ব্যাপারীরা আসতো হাটবাজার করতে রাণীগঞ্জে।

মঙ্গলপুর মোড় অঞ্চলে ছিল পুলিশ থানা। রাণীগঞ্জের শহরে পুলিশ থানার কার্যালয় হওয়ায় এর অবলুপ্তি ঘটে। ওখানেই অর্থাৎ মঙ্গলপুরেই ছিল ডাকঘর। আঠারো শো শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি মঙ্গলপুরের নিয়ন্ত্রণে ছিল রাণীগঞ্জ।

রাণীগঞ্জ শহরের বুকে এতোয়ারী মোড়ে (এতোয়ারী শাও-এর চা দোকানের জন্য এ নাম ছড়িয়ে পড়ে) ছিল রাস্তার উপর একটি কুয়া এবং এন. এস. বি. রোডে নেতাজী মোড়ে ছিল একটি বিশাল কুয়া যাকে কুয়া মোড় বলা হত। ১৯৬৫ সালে ২৩শে জানুয়ারি

ঐখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তি স্থাপিত হয়। হয়তো তখনকার দিনে জলকষ্টে জলের প্রয়োজন মেটাত এ দুটি কুয়া।

সি. আর. রোডে করোনেশন টকীর পূর্বে রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় ইন্‌স্টিটিউটের যে হলটি ছিল সেখানে করিম দোলানী নামে এক ভদ্রলোক ক্রাউন টকী নামে সিনেমা হল চালু করেন। ঐখানেই সর্বপ্রথম সবাক চলচ্চিত্র রাণীগঞ্জে শুরু হয়। পরে ইনস্টিটিউটের কাছে ভাড়ায় বিভিন্ন ব্যক্তি শর্মা টকী, রবীন টকী, জৈন টকী নামে সিনেমা চালু করেন। তারপর জাকিরুল হক্ (মুন্সিজী) করোনেশন টকীর পত্তন করেন। এই সি. আর. রোড- এ (পূর্বে সি. আর. রোড ছিল অর্জুনপট্টী) বর্তমানে M. R. S. Hospital এর Cancer ভবনের বাঁদিকে ছিল লাডুরাম চৌধুরীর রয়েল টকী। এখানে নির্বাক ছবি দেখানো হত। তাও আনুমানিক ৬৫-৭০ বছর পূর্বের কথা।

রাণীগঞ্জ ষষ্টিগড়িয়ায় ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাণীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী। কথিত আছে এটি পূর্বে ছিল সরস্বতী লাইব্রেরী। প্রাচীন পশ্চিমমুখী লাইব্রেরীর ভগ্নদশা থেকে পরে সত্তরের দশকের শেষে সংস্কার হয় এবং বর্তমান গৃহ তৈরি হয়।

বেঙ্গল কোল কোম্পানীর অধীন ছিল ষষ্টিগড়িয়া (ষষ্টিগড়) অঞ্চল। রাণীগঞ্জ শহরের মধ্যে এখানে ছিল বিশাল পুকুর। বর্তমান প্রাচীর বরাবর ছিল বিশাল জলাশয়। সরু মেঠো রাস্তায় কোনোক্রমে লোক চলাচল করতো। সত্তরের দশকে ঐ পুকুরের তিন চতুর্থাংশ স্থান ভরাট করে তৈরি হয় পৌরসভার চিলড্রেন্স পার্ক, যা সরকার অনুমোদিত। ১৯৮৮ সালে এখানে আবার স্থান পায় পুরসভার বাজার বা মিউনিসিপ্যাল মার্কেট। অবশ্য এই ১৯৯৯-তে তা আবার স্থানান্তরিত হয় শিবমন্দির রোডে।

রোনাই অঞ্চল ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। যেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল বেশি। এর কাছে মাজার শরীফ অঞ্চলটি ছিল একদিকে রাজার বাঁধ পুকুরে (রাণীগঞ্জ অঞ্চলে সর্ববৃহৎ পুকুর) ডাঙা অঞ্চলের পাড়, অন্যদিকে মুসলিমদের কবরস্থান ও জঙ্গলে ভরা।

এখানেই বাস করতেন মৌলানা সৈয়দ শাহ্ সামসুদ্দিন ইন্দাবি নামে এক পীর ফকির। তাঁর প্রচেষ্টায় এবং মানুষের প্রতি, আর্তের প্রতি সেবায় ঐ অঞ্চলে ধীরে ধীরে বসতি গড়ে ওঠে। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের অনেক ইতিহাস শোনা যায়। ১৯০১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর ঐখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ঐ শের-ই বঙ্গাল সামসুদ্দিন বাবা ওরফে পীরবাবার স্থান হিসেবে এই পবিত্র মাজারের সৃষ্টি হয়। প্রতি বছর ৪ঠা ফাল্গুন সর্বধর্ম সমন্বয়ে বর্ধমান জেলার এক বিখ্যাত মেলার আয়োজন হয়, যেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক সমাগম হয়।

জে. কে. রোপ ওয়েজের বালি বহনকারী রোপ গাড়ি ঐ অঞ্চলে কালিপাহাড়ির উপর দিয়ে যখন চলাচল করতো তা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

ঐ স্থানের কাছে নিখা গ্রামে ছিল ছোট একটি বিমানপোত। ছিল সিগন্যালিং টাওয়ার। ষাটের দশকে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পানাগড়কে কেন্দ্র করে সামরিক যান ঐখানে

নামতো। ষাটের দশকে ছোট ছোট টু-সিটার 'মথ' জাতীয় এরোপ্লেন ঐখানে নামতে ও উড়তে দেখা যেত। রাণীগঞ্জ প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টারের পশ্চিম কোণে ছিল বরদহ বা বরদই কালীবাড়ি, উত্তর দিকে যে পতিত জমি ছিল সেখানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কবরস্থান ছিল বলে জানা যায়। এখন ঐ অঞ্চলে বসতি হয়ে নতুন অঞ্চল গড়ে উঠেছে। ইংরাজী ১৯৩১, বাংলা ১৩৪৬ সালের ১৭ই ফাল্গুন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রথম ও শেষবার বাঁকুড়া যাবার পথে রাণীগঞ্জ হয়ে মেজিয়া ও দামোদর নদী পার হয়ে বাঁকুড়া যান। সেদিন এত জনসমাগম হয়েছিল রাণীগঞ্জে যে তাঁর মোটরটি ভিড়ের চাপে ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল। জগন্নাথ ব্রীজটির উপর দিয়ে (বর্তমানে পরিত্যক্ত) তিনি মেজিয়া পৌঁছান এবং মোটর সমেত নৌকায় তিনি দামোদর নদী পার হয়েছিলেন।

রাণীগঞ্জের C.R. ROAD ছিল অর্জুনপট্টি এবং M. G. ROAD ছিল বড় বাজার, N. S B. ROAD ছিল ফিডার রোড। ঐ বড় বাজারে ১২০০ বঙ্গাব্দে প্রাচীন কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা হয়। কথিত আছে এই কালীবাড়ি এককালে শ্মশানকালী বলে পরিচিত ছিল।

আর. আর. রোড-এ পূর্বেকার ডালপট্টি মোড়ে যে প্রাচীন ষোল আনা দুর্গা মন্দিরটি আছে, তা পূর্বে K. P. Co-র যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি আছে সেখানে ছিল, পরে বর্তমান পূজাগৃহে স্থানান্তরিত হয়।

রাণীগঞ্জে এন. এস. বি. রোডে হাতিয়া তলাও অঞ্চলে পূর্ব-পশ্চিম কোণে ছিল বিখ্যাত মহাবীর রামনিগম তেল মিল। বর্তমানে পূর্ব কোণের অট্টালিকায় হয়েছে মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটির দ্বিতীয় ইউনিট এবং পশ্চিম কোণে স্থানান্তরিত হয়েছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। রাণীগঞ্জে একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যপূর্ণ মাঠ ছিল এই এন. এস. বি. রোডেই তার বাংলা ময়দান। ডাক ও তার দপ্তরের অধীন ছিল বলে এই মাঠের নাম তার বাংলা ময়দান। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জনসভা থেকে কোলকাতার নামী-দামী কোম্পানীর সার্কাসের তাঁবু পড়তো সেখানে। বিকেলে বসতো মাদারীর খেল ও মুরগীর লড়াই। এখন জনবসতিতে পূর্ণ এ মাঠ। এই রাস্তায় মাঠের উল্টোদিকে যেখানে 'অরুণ টকী' সিনেমা হল আছে সেখানে দক্ষিণ দিকে ছিল শহরের নামকরা এক পুকুর, বলা হত কুলু পুকুর। এই পুকুরে রাণীগঞ্জবাসীরা নানা সামাজিক কার্য সম্পন্ন করতো। সিহাড়শোল রাজ এস্টেটের স্মৃতিবহুল রাজবাড়ির কথা পরিশেষে না উল্লেখ করলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এ লেখা। এ রাজ পরিবারের ইতিহাস বহু স্মৃতি বিজড়িত। দুঃখ হয়, এর সৌন্দর্য আজ বিনা সংস্কারে অবহেলায় নষ্ট হয়ে চলেছে কালের পরিবর্তনে।

এ অঞ্চলের বিখ্যাত রথ উৎসব এবং প্রাচীন রথ এ রাজবাড়িতে। রথ উৎসবকে কেন্দ্র করে এখনও বসে মেলা। প্রাচীন পেতলের রথ এখনও বহু স্মৃতি বহন করে চলেছে।

১৮০০ শতাব্দীর এক কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোম্পানীর কর্মী হয়ে নিজেই পত্তন করেছিলেন নিজস্ব এক কোল কোম্পানী। তাঁর স্ত্রী দাড়িম্বদেবীর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন একমাত্র কন্যা হরসুন্দরী দেবী। তাঁর তিন পুত্র বীরেশ্বর মালিয়া, রামেশ্বর মালিয়া, দক্ষিণেশ্বর মালিয়া।

হরসুন্দরী দেবী অতি দানশীলা মহিলা ছিলেন। দেশের হিতে দশের হিতে তিনি নানা সাহায্য করতেন। তাঁর বদান্যতায় তৈরি হয় সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুল, টোল এবং ডাক্তারখানা। এ সংবাদ ১৬ই ভাদ্র ১২৮৭ সন-এ সোমপ্রকাশ-এ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এ রাজ পরিবারের সহায়তায় গড়ে ওঠে সিহাড়শোল গালর্স স্কুল, রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ। রাজপরিবারের প্রমথনাথ মালিয়া অত্যন্ত রাজসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র পশুপতিনাথ মালিয়া ও জীবনমোহন মালিয়া। পশুপতিনাথ মালিয়া অত্যন্ত সাহসী, দৃঢ়চেতা, সুদক্ষ প্রজাহিতকারী রাজা ছিলেন। এ অঞ্চলে জনগণ তাঁকে ভয় ও ভক্তি দুই করতো।

১৯৫১ সালে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম স্বাধীন দেশের বিধানসভা নির্বাচনে রাণীগঞ্জ বিধানসভা ক্ষেত্রে তিন ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁরা হলেন কংগ্রেসের চিরঞ্জিব কেজরীয়াল, কমিউনিস্ট পার্টির রবীন সেন এবং নির্দল প্রার্থীরূপে 'কলসী' চিহ্নে পশুপতিনাথ মালিয়া। সেদিন কিন্তু ঐ নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন পশুপতিনাথ মালিয়া। এ জয় প্রমাণ করে সিহাড়শোল রাজ পরিবারের প্রতি রাণীগঞ্জবাসীর শ্রদ্ধা ছিল অটুট। এখানে পণ্ডিত পুকুর রাজ পরিবারের স্মৃতিবিজড়িত পুকুর। আয়তনে বিশাল, বাঁধানো স্নানঘাটে এ পুকুর আজও ইতিহাস হয়ে আছে। এ পুকুরের জলে প্রজাদের যেমন প্রয়োজন মিটতো তেমনি রাজ পরিবারের কার্যেও ব্যবহার হত। এ পুকুরের পাশেই ছিল এ অঞ্চলের শ্মশান। আর রাজবাড়ির শিবমন্দিরগুলি ছিল সুদৃশ্য এবং মহিমান্বিত। বর্তমানে ভগ্নদশায়, কালের বিবর্তনে, অবহেলায় হারিয়ে চলেছে এক ঐতিহাসিক রাজ এস্টেট।

এই বাজ পরিবারের গৃহবধূ জুন মালিয়া বর্তমানে ব্যস্ততম নামী অভিনেত্রী। দূরদর্শনের পর্দায় তাঁর অভিনীত সিরিয়াল এখন দেখা যায়।

প্রাচীন শহর রাণীগঞ্জ, ইতিহাসের শহর রাণীগঞ্জ, জনক জননী রাণীগঞ্জ নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে সীতা হয়ে এই বিংশ শতাব্দীর দোরে বেঁচে আছে। এই মুমূর্ষু নগরীর দিকে ফিরে তাকাবে কে ?

সহায়ক পঞ্জী

১। অরণি -বঙ্গে প্রথম রেল ও রাণীগঞ্জ - তাপস মজুমদার (১৩৯৫)।
২। অরণি -বাঁকুড়ায় রবীন্দ্রনাথ - তাপস মজুমদার (১৩৯১)।
৩। আসানসোলের ইতিবৃত্ত - ড. রামদুলাল বসুর প্রবন্ধ।
৪। ড. আবদুল সামাদ ও অন্যান্য বিদগ্ধজনের জনশ্রুতি ও স্মৃতিকথা।

□ শারদীয় 'আজকের যোধন', ১৪০৬ □
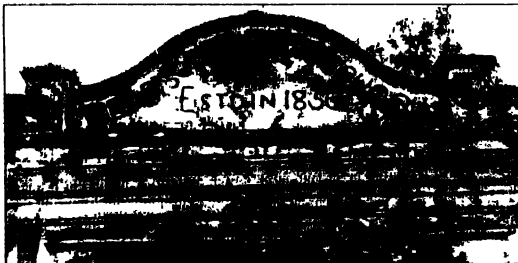
সিয়ারশোল রাজ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত

কবিতীর্থ চুরুলিয়ার প্রাচীন ইতিহাস

ঋদ্বিশ পাল

চুরুলিয়ার প্রাচীন ইতিহাস শুরু করার আগে চুরুলিয়ার ভৌগলিক অবস্থানের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। গ্রামটি বর্ধমান জেলার (আসানসোল) জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত। অজয় নদের তীরবর্তী এই গ্রামখানি মূল আসানসোল শহর থেকে ১৮ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত। গ্রামটি ২৪ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার নিকটে অবস্থিত। ভূগোলের ভাষায় গ্রামটি রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত বলা যেতে পারে।

প্রথমেই পাঠকদের বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এই স্বল্প পরিসরে চুরুলিয়ার সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। প্রাচীন অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা হল। গ্রামটি যে বহু প্রাচীন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। গ্রামের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত রাজা নরোত্তম সিংহের গড়ের ধ্বংসাবশেষ এর সাক্ষ্য বহন করে। এই প্রাচীন গড়ের ইতিহাস কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ এটিকে গড় বা দুর্গ না বলে লোহার কারখানা হিসাবে চিহ্নিত করলেও আমার মতে এখানে একটি গড় বা দুর্গ ছিল এবং সম্ভবত ১৫২৬ খ্রিঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পর এই দুর্গটির পতন ঘটে। (বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ. ৩০২) যাই হোক এইসব বিতর্কে না গিয়ে চুরুলিয়ার অন্যান্য প্রাচীন নমুনা বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

চুরুলিয়ার অন্যতম প্রাচীন শিব মন্দিরটি গ্রামের উত্তর সীমায় ভট্টাচার্য পাড়ায় অবস্থিত। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৩৯০ শকাব্দ। মন্দিরটির নির্মাণ ও গঠনশৈলী দেখে এর প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। মন্দিরটি পুরোটাই কামান পাথরের তৈরী। একটির পর একটি পাথর সাজিয়ে অনেকটা পিরামিডের মত আকৃতি বিশিষ্ট মন্দিরটিতে সিমেন্টের চিহ্ন মাত্র নেই। ৩০০-৩৫০ বৎসরের পুরানো রাবী দামোদর জিউয়ের মন্দিরটি এই গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির বলে এখানকার মানুষের ধারণা। মন্দিরটি গ্রামের মধ্যস্থলে নায়ক পাড়ায় অবস্থিত। বর্গী আক্রমণের সময় এই মন্দিরের বেশ কিছু গুপ্তধন খোয়া যায়।

হাজী পালোয়ান সাহেবের সমাধি মন্দির বা মাজারটি চুরুলিয়ার অপর এক প্রাচীন নির্দশন হিসাবে চিহ্নিত। এটি গ্রামের দক্ষিণ সীমায় কাজী পাড়ায় অবস্থিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই সিদ্ধপুরুষ চুরুলিয়ার মাটিতে পদার্পণ করেন। তখন চুরুলিয়ায় হিন্দু সামন্ত নরোত্তম সিংহের রাজত্বকাল। কোন কারণে রাজা নরোত্তম সিংহের সঙ্গে এই পালোয়ান সাহেবের সংঘর্ষ হয় এবং রাজা পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যান। তাঁরই মনস্কামনা অনুযায়ী এখানে কোন সমাধি মন্দির তৈরী করা হয়নি। কবি নজরুল এই পালোয়ান সাহেবের একান্ত ভক্ত ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি তাঁর মাজারে যাতায়াত করতেন।

লাল মিঞা ছিলেন চুরুলিয়ার প্রথম জমিদার। এরপর আমলাজোড়ার সরকার পরিবার এই জমিদারির পত্তনি পান। সবশেষে এই গ্রামের নবকৃষ্ণ সাধুকে বর্ধমানের রাজা বিজয়চাঁদ

মহাতাব পত্তনি দেন। খনি অঞ্চলে অবস্থিত চুরুলিয়ার প্রধান খনিজ সম্পদ ছিল কয়লা, ফায়ার-ক্লে ও পাথর। এককালে চুরুলিয়ার আশেপাশে অনেকগুলি কলিয়ারী ছিল। এগুলি হল দ্বিগুলি, দেশের মহান, গরধেশে, ইস্ট চুরুলিয়া তারা কলিয়ারী ইত্যাদি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম-সাময়িক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রেললাইন চুরুলিয়ার উপর দিয়ে অণ্ডাল থেকে চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে গৌরাণ্ডি থেকে চিত্তরঞ্জন লাইন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অণ্ডাল থেকে গৌরাণ্ডি পর্যন্ত ট্রেন চালু ছিল। কবি নজরুল যুদ্ধ থেকে ফিরে এই ট্রেনে চড়ে চুরুলিয়া ফিরেছিলেন।

চুরুলিয়ার সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে আলোকপাত করলে বলা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরও দশটা গ্রামের মতোই চুরুলিয়া ছিল বাংলার হাজার হাজার গ্রামের একটি। একেবারেই অজ পাড়াগাঁ। বাপ-ঠাকুরদার রেখে যাওয়া কিছু জমিজমা চাষ করেই লোকের দিন কেটে যেত। বেশিরভাগ লোকেরই কষ্ট আর অভাবের সংসার। তবে বাংলার হাজার হাজার গ্রাম অপেক্ষা এই গ্রামের (গ্রাম না বলে এলাকা বলাই ভাল) রূপ বৈশিষ্ট্যগতভাবে একটু ভিন্ন ছিল। যথার্থ বঙ্গদেশের শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা মনোমুগ্ধকর রূপ এখানে অনুপস্থিত। বঙ্গভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চল রাঢ়ভূমিতে অবস্থিত এই গ্রামের মাটি রুক্ষ রোদ ঝলসানো কাঁকুরে। ছোট ছোট বৃক্ষরাজির মাঝে শাল ও কেঁদ পলাশের গাছ। এই রুখু মাটির শান্ত মানুষের মধ্যে কিন্তু প্রাণের স্পন্দন ছিল। তাঁরা কিন্তু সময় পেলেই যাত্রা, কবিগান, লেটো বা ঝুমুরনাচের আসর বসাত। সেই সময় চুরুলিয়া ও তার আশেপাশে দু'তিনটে নামকরা লেটো গানের দল ছিল। অনেকেরই জানা যে কিশোর কবি নজরুল অনেক লেটো গান রচনা করেছিলেন এবং লেটোর দল পরিচালনা করেছিলেন।

এরপর চার পাঁচের দশকে স্বাধীনতার সময় থেকে গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে চুরুলিয়ারও সামাজিক পরিবর্তন শুরু হয়। শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার শুরু হয়। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে চুরুলিয়া নবকৃষ্ণ উচ্চ-বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের পাশে "তড়িৎ ছাত্রাবাসে" বহু দূরবর্তী ছাত্ররা পড়াশুনার জন্য আসত। অবশ্য এই কাজে চুরুলিয়ার অপর দুই স্কুল "শৈলবালা বালিকা বিদ্যালয়" ও "নজরুল বিদ্যাপীঠের" অবদানও কিছু কম নয়। শিক্ষা-বিস্তারের সাথে সাথে সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটে। চুরুলিয়ার উত্তর সীমায় তৈরী হয় বিশাল প্রেক্ষাগৃহ ফাল্গুনী। "শ্যামা সাংস্কৃতিক পরিষদ" ও "গন্ধেশ্বরী অপেরা" নামে দুটি যাত্রা পরিষদ গড়ে ওঠে। এদের যাত্রার মান তৎকালীন যে কোন কলকাতার যাত্রাদল অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। ধর্ম-আচরণের ক্ষেত্রেও চুরুলিয়ার মানুষ প্রাচীনকাল থেকে তাদের উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়ে এসেছে।

চুরুল্যা থেকে চুরুলিয়া। চারজন সাধক বিভিন্ন সময়ে এখানে বসবাস করেছিলেন বলে অনেকে এই গ্রামকে চার আউলিয়ার দেশ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। এককালে এই গ্রামের শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমৃদ্ধি বহু গ্রাম বাংলার ঈর্ষার বস্তু ছিল। চুরুলিয়া গ্রামটি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় গোটা ভারতের ইতিহাসেই আপন ঐতিহ্যে মহিমাময়।

গ্রন্থসূত্র :

১। সাবেক চুরুলিয়া ইউনিয়নের দেব দেউল - ডঃ হারাধন দত্ত

২। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

৩। কিশোর নজরুল - হায়াৎ মামুদ

□ 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' পত্রিকা ১৪০৬ □

আসানসোল ইতিহাসের আয়নায় সেকাল, একাল ও ভাবীকাল

নিশীথকুমার ঘোষ

আসানসোলের বর্তমান পরিচিতি বিস্তীর্ণ খনি-শিল্পাঞ্চল বলে। কিন্তু ইতিহাসের একটি শুরু থাকে। সেই পরিচিতির ইতিহাসের পাতা উল্টে আমরা যদি পৌঁছাই আদিকালে, তবে দেখা যাবে সেদিনের আসানসোলের অন্য এক রূপ, অন্য এক প্রকৃতি -- যেখানে তার শিল্পাঞ্চল বলে কোনো পরিচিতিই ছিল না। তাছাড়া 'আসানসোল' বলে কোনো নামই ছিল না। জৈনধর্মের প্রাচীন গ্রন্থ 'আচারঙ্গ সূত্রে' এই অঞ্চলকে 'বজ্জভূমি' বলা হতো। ভূতত্ত্বের ভাষায় 'বজ্জ' শব্দটিকে 'বজ্র' বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেছেন প্রায় দশ লক্ষেরও বেশি বছর আগে এই অঞ্চল বিরাট হ্রদ ও গভীর জলাভূমিতে ভর্তি ছিল। প্রকৃতির নিয়মে সেই হ্রদ পলি, উদ্ভিদ, বৃক্ষ প্রভৃতি বনসম্পদে চাপা পড়ে গড়ে উঠেছিল জৈব শিলার ভাণ্ডার — যা প্রাকৃতিক সম্পদের ভাষায় কয়লা, ফায়ার ক্লে, চুনাপাথর প্রভৃতি। 'বজ্র' অর্থাৎ কঠিন পাহাড়, পাথরের অঞ্চল বলেই ঐ নামকরণ ছিল শাস্ত্রে। কেউ কেউ আবার বলেন, লক্ষ বছর নয়, মাটির নিচে জৈব পদার্থ কয়লা হতে সময় নিয়েছে কয়েক কোটি বছর।

তখন আসানসোলের যেমন নামকরণ ছিল না, তেমনি ছিল না এর কোনো সীমারেখা। জৈব শিলায় ভরপুর কয়লাসম্পদ শুধু এইটুকুর মধ্যেই নয়, এর সীমানা ঝরিয়া পেরিয়ে হাজারীবাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। অর্থাৎ ভূবিজ্ঞানীদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটিই সম্পূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জনবসতি ছিল না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে হ্রদ জলাভূমি বনসম্পদ সম্পূর্ণ মাটির গভীরে চলে যায়। পরে আবার ধীরে ধীরে সমগ্র অঞ্চলে জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশ ফিরে আসে। এই গভীর জঙ্গলে তখন বাস করতো বাঘ, সিংহ, হাতি প্রভৃতি জন্তু জানোয়ার। ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে উঠে অনার্যদের ছোট ছোট জনপদ। ঐতিহাসিকগণ গবেষণা করে দেখেছেন এই এলাকার 'বাউরি' সম্প্রদায় অতি প্রাচীন অনার্য শ্রেণীভুক্ত জাতি। মেগাস্থিনিস বর্ণিত 'উবেরি' নামে বক ও কুকুরের উপাসক এই দুর্ধর্ষ আদিম অধিবাসীরাই পরবর্তীকালে অপভ্রংশে 'বাউরি' হয়েছে।

জৈনশাস্ত্র 'কল্পসূত্র'তে উল্লেখিত আছে 'অস্থিগ্রাম' নামে একটি অঞ্চলের পরিচয়। জৈনধর্ম নিয়ে বিশিষ্ট গবেষক প্রণবানন্দ যশ লিখিত 'Jainism in Eastern India' বইটিতে উল্লেখ আছেঃ "Asthigrama was formerly called Vardhamana. It would perhaps be more correct to say that Asthigrama was the earlier name of Vardhamana (Modern Burdwan, West Bengal)" 'কল্পসূত্র'তে এ-ও বলা হয়েছে যে মহাবীর জৈন প্রথম বর্ষার মরসুমে অস্থিগ্রামে এসে অবস্থান করতেন। ঐতিহাসিকদের মতে বর্ধমানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (অধুনা বর্ধমান জেলা) এক স্থান আসানসোলের সন্নিকটে পুঁচড়া গ্রামেই অবস্থান করতেন মহাবীর জৈন। পুঁচড়ার পূর্বোক্ত নাম ছিল পঞ্চচূড়া। এখানের জৈন

ধর্মাবলম্বীরা ঐ গ্রামটিতে মহাবীরের স্মরণে পাঁচটি চূড়া নির্মাণ করেছিলেন। ঐ চূড়াগুলির মধ্যে চারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলেও একটি চূড়ার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। জৈন যুগের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এখানে। জৈন ধর্মাবলম্বী 'সরাক' সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই গ্রামটিতে জৈনদের কেন্দ্রীয় কমিটি পরিচালিত একটি উচ্চবিদ্যালয় আছে। তাছাড়া বছরের নির্ধারিত সময়ে জৈনদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। সর্বভারতীয় জৈন তীর্থঙ্করাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এখানে।
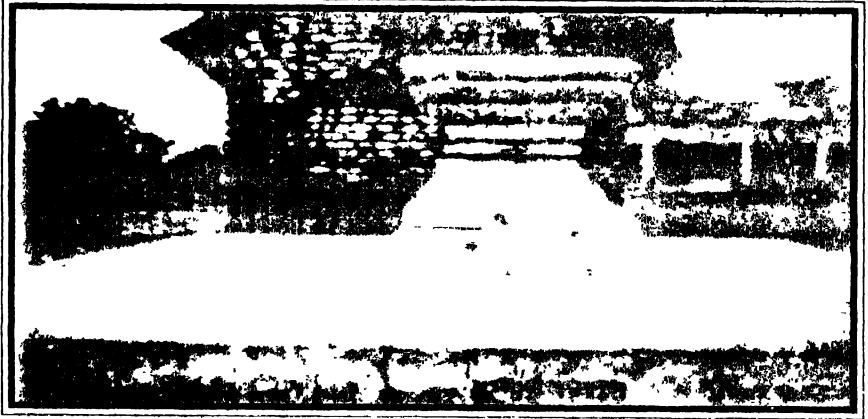
পুচড়ার ধ্বংসাবশেষ

অনার্য-অধ্যুষিত জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চলে অনার্যদের মধ্যেই জৈনধর্মের প্রভাব পড়ে প্রথম। জৈন ধর্মাবলম্বী 'সরাক' সম্প্রদায় আর্যদের সম্প্রদায়গত অত্যাচারে পালিয়ে আসেন এই অঞ্চলে। পরে এই অঞ্চলের আদিবাসী-অনার্য সম্প্রদায়কে নিয়ে এই অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের খোঁজে নেমে পড়েন। ধাতু হিসেবে 'তামা'র কাজই ছিল এঁদের প্রধান।

প্রবীণ গবেষক হরিপ্রসাদ তেওয়ারীর মতে তাম্রযুগ থেকেই এই অঞ্চলে 'সরাক' জাতির বসবাস। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব থেকেই এঁরা তামার কাজে ও ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন। ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে আদিম ও অনার্য মানুষেরা সরাকদের অধীনে শ্রমজীবী হিসেবে কাজ করতে থাকেন। এতদিন এই অঞ্চলে অনার্য সম্প্রদায় গৃহপালিত পশুদের পালন করতেন। পিটারসন সাহেবের তৎকালীন কিছু তথ্যের ভিত্তিতে লেখা থেকে জানা যায়, তখন এই অঞ্চলের অরণ্যে হিংস্র জন্তুজানোয়ার ঘুরে বেড়াতো। যেহেতু অনার্যরা মাংসাশী ছিলেন তাই পশু শিকারও ছিল তাঁদের অন্যতম কাজ। ক্রমে ক্রমে সরাকদের সাহচর্যে এঁরা কৃষিকাজে পারদর্শী হন। সুদূর অতীতে আসানসোলের কোনো নামকরণ ছিল না। এই বিশাল অঞ্চলটির নাম ছিল 'উত্তর রাধাভূমি'। পরে রাজত্বকারী রাজাদের পারস্পরিক ঝগড়া ও একে আরেকের রাজসিংহাসন কেড়ে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের নামকরণ হয় 'গোপভূম'। তারও আগে মগধ, নালন্দা ইত্যাদির সঙ্গে জুড়ে এই সমগ্র অঞ্চলটি বিম্বিসার, অজাতশত্রু প্রভৃতিদের শাসিত অঞ্চল ছিল।

তখন এই অঞ্চলটির 'আসানসোল' বলে পরিচিতি না থাকলেও এর সন্নিহিত 'দামোদর' ও 'অজয়' নদ দুটির সঙ্গে মানুষের নিবিড় পরিচয় ছিল। জঙ্গলাকীর্ণ এই ভয়াবহ অঞ্চলে এই নদ দুটির তীরবর্তী উর্বর জমিতে আদিবাসীরা চাষবাস শুরু করে। ষোড়শ শতকে রচিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' কাব্যে দামোদর নদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গোপভূমের বর্ণনায় অনেকস্থানে দামোদর-অজয়নদের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ জঙ্গল এলাকা রাজা চিত্রসেনের শাসিত রাজ্য ও রাজধানী ছিল বলেও উল্লেখ আছে। আবার ইতিহাস-গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর লেখায় বলা হয়েছে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের 'মহাবংশ' পালি গ্রন্থে এই অঞ্চলকে রাঢ় অঞ্চল এবং এখানে যে 'সিংহ' বংশ রাজত্ব করতেন তারও উল্লেখ আছে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও বীর সেনাপতি 'কালুবীর' সহ রাজা ধর্মসেন ও তাঁর পুত্র লাউসেন এখানে রাজত্ব করেছেন। তবে অনেক ঐতিহাসিকের মতে রাজা চিত্রসেন ও লাউসেন একই ব্যক্তি।

অনার্য আদিবাসীরা সরাক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলে চাষবাস ও পশুপালনে বেশ অগ্রগতি ঘটায়। এরপর থেকেই এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে শাসকদলের সঙ্গে সঙ্গে আর্য বলে কথিত শ্রেণীর মানুষও আসতে থাকে। তামা ও লৌহ ব্যবহারও বাড়তে থাকে।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'কার এন্ড টেগোর' কোম্পানির নারায়ণকুড়ি বাংলোর ধ্বংসাবশেষ

ইতিহাস-গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী লিখেছেন, ১২০১ সালে দিল্লির সম্রাট কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি বিহারের মধ্যাঞ্চল দখল করে বঙ্গদেশের দিকে এগিয়েছিলেন। তাঁরা এই পথেই ধ্বংসলীলা চালাতে চালাতে আসছিলেন। সেই সময়ই এই অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রচার ঘটে। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানে আসেন শের খাঁ। এর সঙ্গেই অধুনা আসানসোলের সন্নিকটস্থান সাঁকতোড়িয়ায় গড়ে উঠে 'শেরগড়', পরবর্তীকালে ইংরেজদের দেওয়া নাম হয় 'দি-শের-গড়'। এখন আমরা তাকে সহজ ভাষায় বলি 'ডিসেরগড়'।

ঐতিহাসিকদের ধারণা 'আসানসোল' নামকরণ হয় সম্ভবত চতুর্দশ শতকে। জঙ্গল পরিষ্কার করে গড়ে উঠলো একটি ছোট গ্রাম। কেটে ফেলা জঙ্গলের গাছগুলি ছিল 'আসন' ও 'শাল'। তাই ঐ ছোট্ট গ্রামটির নামকরণ হয় 'আসনশাল'। পরে ইংরাজি শব্দের উচ্চারণের দিক থেকে বাংলায় বলা হয় 'আসানসোল'। আবার কিছু কিছু ঐতিহাসিকের মতে অস্ট্রিক ভাষায় 'সোল' মানে জলাভূমি। সেই সঙ্গে 'আসন' গাছ ঘেরা এই 'সোল' জমির জন্যই নামকরণ হয়েছে 'আসানসোল'।

ভারতবর্ষের মানচিত্রকে এফোঁড় ওফোঁড় করে 'গ্রান্ডট্র্যাঙ্ক রোড' আসানসোলকে অতিক্রম করেছিল শেরশাহের আমলে। এর আগেও কিন্তু এই অঞ্চল দিয়ে রাস্তা ছিল। সেই প্রশস্ত রাস্তা দিয়েই তৎকালে মগধরাজগণ বর্ধমান পর্যন্ত প্রবেশ করেছিলেন। তাছাড়া আরও একটি বিস্তীর্ণ কাঁকুরে রাস্তা ছিল আসানসোলের অদূরে পূর্বদিকে রাণীগঞ্জের ভেতর দিয়ে। এই রাস্তাটি ছিল পাণ্ডবেশ্বরের অজয়নদের ঘাট থেকে রাণীগঞ্জের দামোদর নদের ঘাট পর্যন্ত। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই রাস্তাটির পরিচয় মেলে। তখনকার দিনে নবদ্বীপ থেকে জগন্নাথধাম পুরী পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়েই তীর্থযাত্রীরা পদব্রজে যাতায়াত করতেন। জঙ্গলাকীর্ণ এই রাস্তায় ডাকাতের হাতে বহু তীর্থযাত্রী আক্রান্ত হতেন। তখন ইতিহাসের পাতায় রাণীগঞ্জের নামও ছিল না। ওরই কয়েক মাইল দূরে নবদ্বীপ-পুরী রাস্তার ধারে বিস্তীর্ণ জঙ্গলে ডাকাতের আস্তানা ছিল 'সিঙ্গারন' নামক স্থানে। বর্তমানের খনি-পরিত্যক্ত এই অঞ্চলটিতে সিঙ্গারনের বনকালীর মন্দির ও পূজার অস্তিত্ব এখনও আছে।

তখন এইসব রাস্তা দিয়ে মানুষ শুধু পথ চলতো, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু হতো না। সেইসময় দামোদর নদের নাব্যতা ছিল বেশি। ষোড়শ শতকে এই দামোদর দিয়েই বাণিজ্যনৌকা চলতো, ব্যবসায়ীরা নুন আনতো মেদিনীপুর থেকে।

তখন এই অঞ্চলে রাণীগঞ্জের নামকরণ না থাকলেও দামোদর নদের ওপারে রাস্তা বরাবর যেখানে এখন মেজিয়াঘাট বলা হয় তা বলা হতো মেজিয়াচটি। অর্থাৎ তীর্থযাত্রী ও অন্যান্য পথক্লান্ত মানুষেরা ঐ চটিতে এসে বিশ্রাম নিতেন। সরাইখানায় রাত কাটাতেন। নদীর এপারে রাস্তার পাশে একটি লোকালয় ছিল। আসানসোল-এর মতো তারও নাম ছিল শিহারসোল। এখনও ঐ নামই বহাল আছে। শিহারসোল লোকালয় ও দামোদরের এপারের ঘাট বরাবর যে স্থানটি মানুষের দৈনন্দিন পণ্যদ্রব্যের বেচাকেনার কেন্দ্রস্থল হয়ে গড়ে উঠেছিল, সেটিকেই পরবর্তীকালে বর্ধমানের রাণীর নামে 'রাণীগঞ্জ' নামকরণ করা হয়। সেই সময় বর্ধমান রাজবাড়ির সঙ্গে শিহারসোল ও উখরার ছোট রাজস্টেটের রাজবাড়ির বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। তবুও এখানের এই 'রাণীগঞ্জ' নামের প্রচার পেতে পেতে বহুদিন লেগেছিল। আসানসোল-রাণীগঞ্জে কয়লাখনি শিল্পের সূচনা হয়েছিল ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বছরের এগারোই আগস্ট দু'জন ইংরাজ রাজকর্মচারী জন সামার ও এস জে হিটলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে শুরু করেন কয়লা উত্তোলন ও ব্যবসার কাজ। স্থানটি ছিল রাণীগঞ্জের কাছেই এগরা নারায়ণকুড়ি নামে জায়গাটি। কিন্তু অভিজ্ঞতাহীনভাবে কাজ করতে গিয়ে এক বছরের মধ্যেই তা থেমে যায়। তথ্যসূত্রে প্রকাশ, ১৭৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাজ বন্ধ হয়।

ইংরেজ সাহেবরা কীভাবে এখানে কয়লার সন্ধান পেলেন তাও এক মজার গল্প। তখন দামোদর নদ খরস্রোতা ছিল। ব্যবসার কারণে নৌকো চলতো। নৌকোর মাঝিরা রাণীগঞ্জের অদূরে একস্থানে দামোদরের পাড়ে বর্ষাধৌত এক খাঁজে কালো পাথরের মতো দেখতে একটুকরো জায়গায় কাঠ-পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলে ভাত রান্না করছিল। খাওয়া দাওয়া সেরে মাঝিরা চলে গেলেও ঐ কাঠের আগুন ঐ কালো পাথরের মতো বস্তুটিকেও গনগনে লাল করে জ্বেলে রেখেছিল। পরে ঐ স্থানে রাখালছেলেরা গরু চরাতে এসে তা দেখে এবং তা গ্রামের আশেপাশের মানুষকে বলে। এইভাবেই তারা কয়লার খোঁজ পায়। বর্ষাধৌত দিনে দামোদর নদের এই অঞ্চলের দু'ধার এইভাবেই ধুয়ে ধুয়ে বেরিয়ে আসতো কয়লা এবং গ্রামের মানুষ তাকে ক্রমান্বয়ে আগুন জ্বালানোর কাজে লাগাতে লাগলো দিনের পর দিন। এইভাবেই কয়লার ব্যবহার জেনেছিল স্থানীয় মানুষেরা।

যাইহোক, আবার ফিরে আসতে হয় কয়লা অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কথায়। জন সামার এবং এস জে হিটলির কয়লা উত্তোলনের কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের মাধ্যমে সে খবর পৌঁছেছিল ইংল্যান্ডে। সেইসময় আমাদের দেশে কয়লার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হতো কাঠ পোড়ানো 'অঙ্গার'— যাকে রাণীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের গ্রামীণ ভাষায় 'আঙ্গার বলা হয়। আর ইংরেজরা তাদের কাজে কয়লা আনতো জাহাজে করে ইংল্যাণ্ড থেকে। এতে করে বৃটিশ শিল্পপতিদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল। তাই ইংল্যান্ডে বসে বৃটিশ সরকার ভারতে কয়লা উৎপাদনে প্রসার ঘটিয়ে নিজেদের দেশীয় বাণিজ্যকে নষ্ট করতে চাননি। কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যুদ্ধজয়ে খুবই খ্যাতনামা হয়ে পড়েন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ইনি ফ্রান্সের রাজপদে আরূঢ় হন এবং তাঁর একের পর এক দেশ জয়ের প্রাবল্যে অন্যান্য দেশগুলি শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সেইসময় বাণিজ্যিক অবরোধ সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে কয়লা আনার অসুবিধা সৃষ্টির দরুন বৃটিশ সরকারকে নতুন করে ভারতেই কয়লা উৎপাদনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। এছাড়াও ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রসারকল্পে নিজেদের সৈন্যবিভাগ, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প সম্প্রসারণের জন্যও কয়লার প্রয়োজন হয়। সুতরাং ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশের গর্ভনরকে কয়লা অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের জন্য উদ্যোগ নিতে বলেন। এই কাজে উইলিয়ম জোনস নামে একজন বৃটিশকে নিয়োগ করা হয়। তিনি তৎকালীন বর্ধমানের রাণীর কাছ থেকে প্রায় একশ বিঘার মতো জমি বন্দোবস্ত নিয়ে রাণীগঞ্জের কাছে কয়লা অনুসন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মি. হামফ্রের 'দ্য আরলি হিস্ট্রি অব কোল মাইনিং ইন বেঙ্গল' প্রবন্ধে জানা যায় ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড ময়রার আমলে উইলিয়ম জোনসকে দায়িত্ব দিয়ে খনির কাজে লাগানো হয়। এই কাজে তাঁর যোগদানের তারিখ ১৬ এপ্রিল ১৮১৪ সাল। তিনি রাণীগঞ্জের নুনিয়া জোড়ের কাছে এগরা, নারায়ণকুড়ি, দামালিয়া অঞ্চলে খনির কাজ শুরু করেন। এরপর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে আর্থিক লেনদেনের কারণে উইলিয়ম জোনস্-এর কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেন আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোম্পানি। কিন্তু তিনিও এই কাজে বেশি দিন থাকলেন না। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি তাঁর খনি-সম্পদ বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব নেন।

এই কাজে সেই সময় এগিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদু প্রিন্স দ্বারকানাথ। সেইসময় ভারতের এই খনিজ সম্পদ বিদেশি বণিকদের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় ও বাঙালি হিসেবে এই ব্যবসায় নেমে পড়লেন। তিনি তাঁর দু'জন বন্ধুর সঙ্গে মিলে 'কার টেগোর এণ্ড কোম্পানী' গড়লেন। এই সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে আছে : "১৮৩৪ সালের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর আরও স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায় তাঁহার সরকারী চাকুরিটি (কাস্টমস, সল্ট এবং ওপিয়ম বোর্ডের দেওয়ানী) পরিত্যাগ করিলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই "কার ঠাকুর কোম্পানী" নামক হোম স্থাপন করিলেন। কলিকাতা নগরীতে য়ুরোপীয় আদর্শে ব্যবসায়ের কুঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনভাবে বিলাতের সহিত বাণিজ্য দৃষ্টান্ত দেশীয়দিগের মধ্যে ইহাই প্রথম। দ্বারকানাথ, মিঃ উইলিয়ম কার ও উইলিয়ম প্রিন্সেপ এই তিনজন কার টেগোর কোম্পানীর প্রথম অংশীদার ছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের খনি অঞ্চলের বাসস্থানটি রাণীগঞ্জের অদূরে নারায়ণকুড়ি গ্রামের কাছে আজও ভারতের কয়লা উত্তোলনের ইতিহাসের নীরব সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এখনও নারায়ণকুড়ি গ্রামের অনতিদূরে দামোদর নদের পাড়ে "কার টেগোর এণ্ড কোম্পানী'র খনিমুখের বহিরাবয়বের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাসস্থান ও অফিসটি পরে বেশ কিছুদিন অধিকারে রেখেছিলেন ঐ খনির সর্বশেষ ম্যানেজার ও বিশিষ্ট মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার মি. পি. কে. ঘোষ। মি. ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী বেশ কয়েক বছর ঐ বাড়িটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি চেষ্টা চালিয়েছিলেন বাড়িটিকে সরকারিভাবে সংরক্ষণের আওতায়

ভারতের প্রথম কয়লাখনি কার-এন্ড-টেগোর কোম্পানির নারায়ণকুড়িতে ব্যবহৃত তিনটি চেয়ার।

রাখতে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বাড়িটি এখন পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। ঐ বাড়িটি থেকেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থাৎ 'কার টেগোর কোম্পানী'র ব্যবহৃত তিনখানি চেয়ার দ্বারকানাথ ঠাকুরের কয়লা শিল্পের শেষ স্মৃতি হিসেবে পি কে ঘোষের সৌজন্যে সংগ্রহ করে পরম যত্নে নিজের কাছে রেখেছেন এই প্রবন্ধ লেখক।

সেই যুগে উৎপাদিত কয়লা অন্যত্র পরিবহনের ক্ষেত্রে দামোদর ও অজয় নদ দিয়ে নৌকোযোগই ছিল একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু তা কয়লার প্রয়োজন ও ব্যবহারের পক্ষে ছিল

নিতান্তই অপ্রতুল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরই এই সম্পর্কে পরামর্শ দেন ইংরেজদের কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন করার। ইংরেজকে নিজেদের শিল্প ও সৈন্যশিবিরগুলির জন্য কয়লা পরিবহনের স্বার্থে এই পরামর্শকে গ্রহণ করতে হয়। এরপর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ এই ১২১ মাইল দূরত্বের স্টীমইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয়।

এরপরই শুরু হয়ে যায় রাণীগঞ্জ-আসানসোল জুড়ে কয়লা শিল্পে বিপ্লব। বৃটিশদের সঙ্গে সঙ্গে কয়লাখনির কাজে নেমে পড়লেন বহু বিশিষ্ট বাঙালি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবকৃষ্ণ দাঁ, নিবারণ চন্দ্র সরকার, হেমন্ত কুমার নাগ, মুকুন্দ লায়েক, আর এল দত্ত প্রমুখেরা। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে কার টেগোর কোম্পানির সঙ্গে গিলকোর হামফ্রে কোম্পানির মিলনে জন্ম নেয় 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি'। কয়লাখনির কাজে নেমে পড়ে ইকুইটেবল কোল কোম্পানি, বার্ড কোম্পানি নামে আরও কয়েকটি বিদেশি সংস্থা। রাণীগঞ্জ থেকে কয়লাখনি ও কয়লা উৎপাদনের জায়গা বাড়তে থাকে আসানসোল ছুঁয়ে বরাকর ও তারও আগে।

এদিকে রেল কোম্পানির জায়গা অপ্রতুল হওয়ায় তারা রেললাইন সম্প্রসারণ করে আসানসোলে নিয়ে এল। সেটি ১৮৬৩ সাল। এরপর ১৮৮৯ সালে বি এন আর নামে আর এক রেলপথ পুরুলিয়া ছুঁয়ে আসনসোল এসে মিশলো। এদিকে ১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে রেল লাইন পৌঁছে গেল বরাকর অবধি।

খনি অঞ্চলের রেল কোম্পানির মূল দপ্তর ১৯২৮ সালে উঠে এল রাণীগঞ্জ থেকে আসানসোলে। আসানসোল হল রেলের জংশন স্টেশন। এদিকে কয়লা পরিবহন করার জন্য আগেই অর্থাৎ ১৮৬৩ সালে অণ্ডাল-ইকড়া-গৌরাংডি পর্যন্ত রেলের শাখা-লাইন চালু হয়। ইকড়া থেকে আরও একটি শাখা-লাইন বেরুলো বারাবনী হয়ে সীতারামপুর পর্যন্ত। এই লাইনগুলিতে যাত্রীট্রেন চলাও শুরু হয়। ইকড়া স্টেশন থেকে বারাবনী সীতারামপুর রেললাইন ও ইকড়া-গৌরাংডি রেললাইন ও রেলগাড়ি চালু হওয়ায় ইকড়া স্টেশনটি জংশনে পরিণত হয়। তখন রাণীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে কয়লাখনির কাজে মহোৎসব চলছে। সেই সময় ইকড়া গ্রামে একটি মাইনিং স্কুল স্থাপনের জন্য ঐ গ্রামের জমিদার প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় জমি দান করে স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও স্কুলের কাজ শুরু করেন। ঐ স্কুলটি স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তিনি নাকি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় নিজে এসেছিলেন ইকড়া গ্রামে ঐ অণ্ডাল-ইকড়া-সীতারামপুর শাখা-লাইনের ট্রেনে চেপে। যদিও পরে ঐ মাইনিং স্কুলটি ইকড়ায় না হয়ে বিহারের ধানবাদে হয়েছিল। ইংরেজরা রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের সম্প্রসারণ ও আসানসোলের বুকে যোগাযোগকেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল ঐতিহাসিক কারণেই। এরা ভারতবর্ষে এসেছিল বাণিজ্যিক কারণে, সেই সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তারে। সারাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার একমাত্র অবলম্বন স্টীমইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ি। যেহেতু রাণীগঞ্জ ছিল কয়লা উৎপাদনের কেন্দ্র, তাই রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হল এখান থেকেই আসনসোলকে ঘিরে।

এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, ইংরেজ শাসক ও তাদের আশ্রিত জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা, বাংলার বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের সাঁওতাল ও অন্যান্য খেটে-খাওয়া কামার কুমোর প্রভৃতি মানুষেরা একজোট হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় সিধো-কানু-চাঁদ-ভৈরো প্রভৃতি উপজাতি নেতৃবৃন্দ। এই বিদ্রোহী জোটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৮০ হাজার। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন সাঁওতাল পরগণার ভগবানডিহিতে প্রায় দশ হাজার মানুষের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল ইংরেজ শাসকদলের। সেদিন ইংরেজ শাসকদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সামরিকবাহিনী আনতে হয়েছিল ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য।

কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ যখন সারা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে, তখন তারই অনতিদূরে বাংলা-বিহার কেন্দ্রবিন্দুতে এই বিদ্রোহের সংকেত তাদের কাছে অশনিসংকেত হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই তারা খনিজ-কেন্দ্রিক শিল্প-বাণিজ্য সংযোগ-ঘাঁটি হিসেবে আপৎকালীন আসানসোলকেই বেছে নিয়েছিল।

আসানসোল ছিল একটি গ্রাম। আস্তে আস্তে তা হল নগরায়ণমুখী উন্নত গ্রাম। খনিসমৃদ্ধ রাণীগঞ্জকে নিজেদের স্বার্থে ইংরেজরা ১৮৫০ সালের ২৯ অক্টোবর ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত করে তার অধীনে আনে। এরপর ১৮৭১ সালে এলো পুরসভার অধীনে। ১৮৮০ সালে এখানে তৈরি হল আদালত। এরপর ১৮৮৪ সালে গঠিত হল আসানসোল পুরসভা। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে তা কার্যকর হল ১৮৯৬ সালে। সেই সময় আসানসোল পুরসভার অন্তর্গত জনসংখ্যা ছিল মাত্র বারো হাজারের মতো। ১৮৭২ সাল থেকেই রাণীগঞ্জ ছিল বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা। আসানসোল ছিল তারই অধীন এবং এর পুলিশ থানা ছিল নিয়ামতপুরে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আসনসোলে ইংরেজ সাহেবদের অবস্থান, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কর্মক্ষেত্র হিসেবে আসা বিভিন্ন জাতির মানুষের উপস্থিতির ফলে আসানসোলের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ফলে ১৯০৬ সালে রাণীগঞ্জের পরিবর্তে আসানসোল মহকুমা হিসেবে ঘোষিত হয়। রাণীগঞ্জ এসে যায় আসানসোলের অধীনে। আসানসোলেই তৈরি হয় বিচারবিভাগীয় মহকুমা আদালত। মহকুমা শহরের রূপ পেল আসানসোল।

আস্তে আস্তে আসানসোল মহকুমা অপেক্ষা শিল্পাঞ্চল হিসেবেই পরিচিত হতে লাগলো সর্বত্র। ১৯১৮ সালে এখানের বার্ণপুরে তৈরি হল এশিয়ার সর্ব বৃহৎ ইস্পাত কারখানা ইন্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টিল কোম্পানি। ঐ বছরই স্থাপিত হল রেল ওয়াগন তৈরির একটি বিরাট কারখানা বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড। ইতিমধ্যেই কয়লাখনিগুলির ইংরেজ মালিকরা তৈরি করেছেন তাঁদের খনিগুলির নিজস্ব যন্ত্রপাতি নির্মাণের বেশ কিছু কারখানা। গড়ে উঠলো সাইকেল কর্পোরেশন, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন, নীল কারখানা র‍্যাকিট এণ্ড কোলমেন, বিশ্বখ্যাত রেল ইঞ্জিন কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ, ভারতের প্রথম উন্নতমানের 'টেলিফোন কেবলস্' তৈরির কারখানা আসানসোলের অদূরে রূপনারায়ণপুরের 'হিন্দুস্তান কেবলস্'। এই কারখানার তৈরি কেবলস্ শুধু ভারতে কেন — সারা এশিয়া মহাদেশেই সমাদৃত। এছাড়াও কয়লাকেন্দ্রিক আসানসোলে তৈরি হয়েছিল পৃথিবীখ্যাত প্রথম শ্রেণীর কাঁচ তৈরির কারখানা 'হিন্দুস্থান

পিলকিনটন'। তৈরি হল রাণীগঞ্জের বেঙ্গল পেপার মিল, জে কে নগরের অ্যালুমিনিয়াম কারখানা। সঙ্গে কয়েক শত ফায়ারক্লে, ইট ও পাইপ তৈরির কারখানা, যা সারা ভারত তথা ভারতের বাইরের বহু স্থানে ইস্পাত কারখানাগুলিতে ইস্পাত গলানোর সময় কাজে লাগে।

সে এক এলাহি কাণ্ড। আসানসোলের বুকে যেন শিল্পবিপ্লব। বিগত ২২৫ বছরের কয়লাখনি জীবনের ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাণীগঞ্জ-আসানসোল খনি অঞ্চলে ১২০টি কোলিয়ারি আছে প্রায় ১৬০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে। দু'শ বছর ধরে এক নাগাড়ে রাণীগঞ্জ কয়লা উৎপাদন করে সারা দেশের সভ্যতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। রাণীগঞ্জ-আসানসোল কয়লাখনির নিচের স্তরে এখনও প্রায় ২৮০০ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত আছে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই কয়লাখনি অঞ্চলে লোকসংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৩০ লক্ষে।

আসানসোল সারা দেশকে অনেক সাফল্য এনে দিয়েছে। দেশের কলকারখানা, বিদ্যুৎ, রেল - কিসে নয়? কিন্তু বিনিময়ে কী পেয়েছে?

রাণীগঞ্জ খনি-অঞ্চলের (Coal Field) আয়তন মোট ১৫৫০ বর্গ কিলোমিটারের মত। ১৯৮১ সালের রাণীগঞ্জ খনি অঞ্চল মাস্টারপ্ল্যানে বলা হয়েছিল এই এলাকাটির বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলের মোট আয়তন ১৮১.১১ বর্গ কিলোমিটার। এখন শহরের জনবসতি বেড়েছে, প্রসার হয়েছে। সেই হিসেবে আয়তন বাড়বে। দিল্লি-হাওড়া মূল রেললাইন সহ আরও কিছু লুপলাইন, ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানির পাইপ লাইন, নদী, রাস্তা অর্থাৎ জি. টি. রোড প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মোট আয়তন ৩০০ বর্গ কিলোমিটারের মত।

কিন্তু এর মধ্যেই ডাইরেক্টর জেনারেল অব মাইনস্ সেফটি (DGMS) -এর হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৬০০ হেক্টর জমি ধসের আওতায় রয়েছে। এটি ওদের সরকারি রিপোর্ট। কিন্তু ১৯৭৩ সালে রাণীগঞ্জের কয়লাখনিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর আজকের ১৯৯৯ সাল অবধি এই দীর্ঘ ২৬ বছরে প্রায় দশ হাজার একর জমি ধসে গিয়েছে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং প্রাক্তন সাংসদ সুনীল বসু রায়ের দেওয়া খনি শিল্পাঞ্চল সংক্রান্ত এক তথ্যে প্রকাশ, রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কেভিং ও ওপেনকাস্ট পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের জন্য বছরে প্রায় ১০০ একর জমি নষ্ট হচ্ছে। আগামী ২০০০ সাল নাগাদ তা গিয়ে দাঁড়াবে ৫০০ একরে।

কয়লাখনিগুলি থেকে যাঁরা কয়লা তুলছেন, তাঁরা বলেছেন, "আমরা কয়লা উৎপন্ন করছি।" এই সম্পর্কে কয়েকবছর আগে ধানবাদে 'স্কুল অব মাইনস্'-এর এক সেমিনারে আমার সঙ্গে আলোচনাকালে এক প্রবীণ খনি বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছিলেন, "আমরা কয়লা উৎপাদন করছি না। উই আর কনজিউমিং কোল ফ্রম আওয়ার ওল্ড রিসোর্সেস। এই মজুত ভাণ্ডার একদিন নিঃশেষ হবেই।"

তারপর? এই নিঃশেষিত, শুষ্ক মরুভূমির মানুষেরা কোথায় যাবে?

ইতিমধ্যেই সারা রাণীগঞ্জ-আসানসোল খনি শিল্পাঞ্চলে ধসে বহু গ্রাম, কৃষি-জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গ্রামের মানুষ চাষবাস রুজিরোজগার হারিয়েছে। মাটির নিচে থেকে প্রাকৃতিক

সম্পদ কেবল তুলেই নেওয়া হয়েছে দু'শ বছর ধরে। কি বে-সরকারি খনি-মালিকেরা, কি খনি রাষ্ট্রায়ত্তের পর কেন্দ্রীয় সরকার - যাদের নিয়ন্ত্রণে কয়লাসম্পদ - তারা কেউই উদ্যোগ নেয়নি কয়লা উত্তোলনের পর খনি ভরাট করা কিংবা খোলামুখ খনি (open cast mine) গুলি 'ব্যাক ফিলিং' করার।

শুধু ধসই নয়। এই খনি-অঞ্চলে পরিত্যক্ত খনিগুলির ভেতরে আগুন জ্বলছে। মাটি ফুঁড়ে এই আগুন জমির উপরে লক্‌লক্‌ করে বেরিয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই প্রায় চল্লিশ বর্গ কিলোমিটার জায়গা এই আগুনের কবলে আক্রান্ত। আসানসোল অর্থাৎ রাণীগঞ্জ খনি শিল্পাঞ্চলে ১৯৫০ সাল অবধি ছিল শিল্পবিপ্লব, এরপর হয়েছে সারা অঞ্চল জুড়ে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিপ্লব। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্প অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার চক্রান্তর শিকার কাঁচ কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সাইকেল কারখানা, হিন্দুস্থান কেবলস্, চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা, বেঙ্গল পেপার মিল ধুকছে। বার্ণপুর ইস্পাত কারখানাও বন্ধ করার চক্রান্ত চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ফরমান জারি করেছে এই অঞ্চলের ৬৪টি কয়লাখনি বন্ধ করা হবে।

তাই যদি হয়, তার পরিণাম কী হবে? সারা অঞ্চলে পরিত্যক্ত খনিগুলির ধস নামবে। মাটির ভেতর আগুন গ্রাস করবে সারা এলাকাকে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে জলাভূমি ও গভীর জঙ্গল নিয়ে এই অঞ্চল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পাতালে চাপা পড়ে ধ্বংস হয়েছিল। তারপর তা থেকেই জৈবশিলা অর্থাৎ কয়লার জন্ম হয়েছে। ঠিক তেমনি আসানসোলের শিল্প ধ্বংস হবে, কয়লাখনি বন্ধ হবে। ধস ও অঞ্চলের তাপে বিধ্বংস হবে সারা এলাকার জনজীবন, সভ্যতা, সংস্কৃতি। প্রাকৃতিক নয়, আমাদেরই সৃষ্ট এই অপকর্মের ফলে পাতালগামী হয়ে মাটি চাপা পড়বে সমগ্র এলাকা। আবার লক্ষ লক্ষ বছরের প্রতীক্ষা— পাতালে জৈব শিলার মত কোনো প্রাকৃতিক সম্পদের জন্ম হয় কি-না এই আশায়।

পৃথিবীতে এখন বিজ্ঞানের বিশাল অগ্রগতি। মানুষ গ্রহ-গ্রহান্তরে ছুটছে। সমুদ্রের গভীরেও মানুষ বাসা তৈরি করছে। এই অগ্রগতির যুগে সদিচ্ছা নিয়ে রাণীগঞ্জ-আসানসোলের এই ধ্বংসলীলাকে কি আমরা রোধ করতে পারি না?

কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকার উদার বাণিজ্য নীতির নামে দেশকে বিকিয়ে দিতে চাইছে। বিদেশি কয়লা, বিদেশি ইস্পাত, বিদেশি আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি আমদানিকারকগণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই দেশীয় খনি, দেশীয় শিল্প-সংস্থাগুলিকে বন্ধ করে নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসা করতে চায়। আর এতে একশোভাগ সায় রয়েছে কেন্দ্রের।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আছে বাইশ বছর। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে একাই লড়তে হচ্ছে তাঁদের এই মরুভূমি-সদৃশ খনি শিল্পাঞ্চলকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু খনিজ কয়লা ও ইস্পাত তো কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পত্তি। সেখানে সীমিত ক্ষমতায় রাজ্য সরকার কতটুকু লড়তে পারবে? এর একমাত্রই পথ, তীব্র গণআন্দোলন। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষকে, খনি শিল্পাঞ্চলের মানুষকে

নামতে হবে গণআন্দোলনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। কেন্দ্র যদি কয়লাখনিগুলি বন্ধ করেই থাকে, তবে আগে রোধ করুক কয়লাখনির পাতালের আগুন, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি দিয়ে খনি ধস রোধ করুক। এলাকার মানুষের নষ্ট হয়ে যাওয়া হাজার হাজার একর কৃষিজমি, ঘরবাড়ি ফিরিয়ে দিক। এই অধিকার তো এই মানুষদের সংবিধানের অধিকারের মধ্যেই পড়ে।

□ 'নতুন চিঠি' শারদ সংখ্যা, ১৯৯৯ □

আসানসোল আশেপাশে
অজিত সরকার

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে একটি রাজ্য -- পশ্চিমবঙ্গ। তার একটি জিলা বর্ধমান। আবার বর্ধমান জিলার আসানসোল একটি মহকুমা। কোন রাজ্যের রাজধানী নয়, নয় কোন জিলা শহর। শুধু মহকুমার সদর শহর। এদিক থেকে আসানসোলের কোন কৌলিন্য নেই। কিন্তু আসানসোলের কৌলিন্য তার অন্তরে বা আত্মায়। সেখানে কালো মাণিক ঘুমিয়ে আছে যুগ হতে যুগে। আসানসোলের গর্ব তার কয়লাখনিতে যার সংখ্যা আনুমানিক ২০০। পশ্চিমবাংলার শ্যামলীমা এখানে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। হোঁচট খেতে হবে। কেননা এখানকার ভূমি শুষ্ক, লাল, প্রস্তরময়, তরঙ্গায়িত এবং অনুর্বর। কিন্তু শ্যামলীমা এর আশেপাশে -- শিল্পে, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বে। আসানসোল আজ ভারতের সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত অঞ্চলের অন্যতম। এখানে রয়েছে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কয়লা, এলুমিনিয়াম, রেলইঞ্জিন, কাগজ, সাইকেল, সিমেন্ট, সার, কাঁচ, টেলিফোনের তার, চশমার কাঁচ, ঔষধ, কোকচুল্লি, তাপবিদ্যুৎ, বিভিন্ন রিফ্রাক্টরি, পাথর প্রভৃতি মৌলিক ও বৃহৎ শিল্পের কেন্দ্র। কাছেই দুর্গাপুর শিল্পনগরী-আসানসোল-দুর্গাপুর ভারতের রূঢ় অঞ্চল।

সুতরাং বেড়াবার পক্ষে আসানসোল মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া আসানসোলের আশেপাশে বহু দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে। যেগুলো আসানসোলকে কেন্দ্র করে দেখে নেওয়া যায়। যেমন শান্তিনিকেতন, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, মাসানজোড়, কেন্দুবিল্ব, মাইথন ও পাঞ্চেৎ ড্যাম, বরাকর, চিত্তরঞ্জন, লামেয়ার পার্ক, বার্ণপুর, চুরুলিয়া, রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর প্রভৃতি।

রেলপথে আসানসোল ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান শহরের সঙ্গে যুক্ত। আসানসোল থেকে বোম্বাই-এর (এলাহাবাদ হয়ে) দূরত্ব ১৯৭৩ কি.মি.। তেমনি দিল্লী ১২৪১ কি.মি., মাদ্রাজ (কোলকাতা হয়ে) ১৮৬২ কি.মি., কানপুর ৮০৭ কি.মি. এবং কোলকাতা মাত্র ২০০ কি.মি.। ভারতের দু'নম্বর জাতীয় সড়ক আসানসোলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। স্থলপথে দিল্লীর দূরত্ব ১২৪৯ কি.মি. এবং কোলকাতা ২২৬ কি.মি.।

আসানসোল মহকুমার আয়তন মাত্র ৮৩৮.৫ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা ১৯৭৯ সালের জনগণনা অনুসারে ৮,৮৩,৫৭৬ জন। উচ্চতা ১২২ মিটার। বর্ষায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ১৩৯২.২ মি.মি.। উষ্ণতা গ্রীষ্মে ৪৫.১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালে ৮.০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

আসানসোলের হাতের কাছে দেখবার জন্য রয়েছে লা-মেয়ার পার্ক। বর্তমান নাম নেহেরু পার্ক। আসানসোল থেকে ৬ কি.মি.। দামোদর নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে এক অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত উদ্যান। এই পার্কের রূপকার একজন জার্মান স্থপতি। ছুটির দিনে চড়ুইভাতি করতে বহু লোক এখানে আসেন। আসানসোল থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে এই পার্কে। কাছেই বার্ণপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা। দেখতে অনুমতি লাগে।

মাইথন ড্যাম আসানসোল থেকে মাত্র ২৬ কি.মি. দূরে। বরাকর নদের উপর। ড্যাম দৈর্ঘ্যে ২০৬২ ফুট এবং উচ্চতায় ১৬২ ফুট। ড্যামের কাছে মাটির নীচে রয়েছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যার উৎপাদন গড়ে ৬০,০০০ কি. ভোল্ট। মাইথনের জলে বোটিংএর ব্যবস্থা আছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় জলাধার। জলাধার ৪০ বর্গমাইল ব্যাপী। মাত্র ৩ কি.মি. দূরে রয়েছে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। প্রাচীন মন্দির। শক্তি আরাধনার কেন্দ্রস্থল। পালযুগের সময়ে তান্ত্রিকের তন্ত্রসাধনার নিভৃত আশ্রয়স্থল ছিল। এখানে পূজা দিতে প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে প্রতিদিন। দেবী কালী এখানে কল্যাণেশ্বরীরূপে পূজিতা। ঐ একই সময়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহেও শক্তিপূজার প্রচলন ছিল। যেমন কাত্রাসগড়ে নীলকণ্ঠেশ্বরী, রাজারাপ্পায় ছিন্নমস্তা এবং বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনী।

কল্যাণ্যেশ্বরী থেকে ৬ কি.মি. দূরে বরাকর নদীর ধরে বরাকর-একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। বরাকর আসানসোল থেকে ১৬ কি.মি. দূরে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্ত শহর। এখানে বেশ কয়েকটি মন্দির আছে। বরাকরের মন্দির বলে পরিচিত এই মন্দিরগুলো উড়িষ্যার দেব-দেউলের নিদর্শন। অনুমান করা যায় এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীর। আর সে সময়ে বরাকরে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল। এবং সেটা নিশ্চয়ই পালযুগ। পালযুগ ৭৫০ খ্রি: থেকে ৮৫০ খ্রি: পর্যন্ত। আমরা জানি সে সময়ে পরেশনাথ পাহাড়কে কেন্দ্র করে জৈন ধর্মের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল। গুরু ছিলেন জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ।

পাঞ্চেৎ ড্যাম বরাকর থেকে খুবই কাছে। আসানসোল থেকে দূরত্ব মাত্র ৩১ কি.মি.। বিহারের ধানবাদ জেলায় অবস্থিত এই ড্যামটি দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে দৈর্ঘ্যে বড়। লম্বায় ৭১৩৫ ফুট এবং ১৩৪ ফুট। নিকটেই পঞ্চকোট পাহাড়। সেখানে শিবের মন্দির। শিব এখানে বিরিঞ্চি বাবা।

আসানসোলের কাছেই রয়েছে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মস্থান-চুরুলিয়া গ্রাম। আসানসোল থেকে মাত্র ২৩ কি.মি.। অজয় নদের ধারে। চুরুলিয়ায় একসময়ে সামন্তরাজা নরোত্তম সিংহের রাজধানী ছিল। তার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। দুর্গের নিকটেই কবি-পত্নী প্রমীলা দেবীর সমাধিস্থান। চমৎকার একটি উদ্যানে শায়িত তাঁর দেহ। পাশেই রাখা আছে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা কবি নজরুলের সমাধির কিছু মাটি।

একদিনে বক্রেশ্বর গিয়ে ঘুরে আসা যায়। মাত্র ৭০ কি.মি.। বীরভূম জেলায় অবস্থিত বক্রেশ্বরে উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। এই প্রস্রবণে রয়েছে অমূল্য সম্পদ। যেমন পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও বাই-কার্বোনেট, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস প্রভৃতি। তাছাড়া এখানে নাকি হিলিয়ামের মতো দুষ্প্রাপ্য গ্যাসও রয়েছে। এখানকার জলে স্নান করলে বহু রোগ আরোগ্য হয়। নিকটেই শিবের মন্দির। শিব এখানে বক্রেশ্বর।

আসানসোল থেকে বাসে শান্তিনিকেতনও ঘুরে আসা যায়। মাত্র ৯২ কি.মি.। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত স্থান। এখানকার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক

খ্যাতি লাভ করেছে। বীরভূম জেলার আরও দুটো জায়গা কাছাকাছি রয়েছে। যেমন মাসানজোড় ও জয়দেব কেন্দুলী। মাসানজোড়কে পশ্চিমবাংলার সুইজারল্যাণ্ড বলে। ময়ূরাক্ষী নদীর উপর চমৎকার একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নিকটেই সুন্দর এক উদ্যান। জয়দেব কেন্দুলীতে রয়েছে আশ্চর্য টেরাকোটা মন্দির। যা আরও দেখতে পাওয়া যাবে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে।

বিষ্ণুপুর আসানসোল থেকে ১২৮ কি.মি.। মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরের অনেক মন্দিরে টেরাকোটার কাজ দেখা যাবে। তাছাড়া এখানে সিল্ক, তসর ও শঙ্খশিল্পের বিপুল আয়োজন।

দুর্গাপুর একদিন গণ্ডগ্রাম ছিল। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে ভারতবিখ্যাত বৃহদায়তন শিল্প। দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর যে ব্যারেজ রয়েছে তা লম্বায় ২২৮১ ফুট এবং উচ্চতায় মাত্র ৩৮ ফুট। আজ দুর্গাপুর এক পরিকল্পনাময় শহর। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বও এর কম নয়। কাছেই কাঁকসায় শ্যামারূপার গড় এবং রাজগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। আর কাছে গৌরাঙ্গপুরে ২০০ বছরের পুরানো সামন্ত রাজা ইছাই ঘোষের দেব-দেউল।

রাণীগঞ্জ মাত্র ২২ কি.মি. দূরে। দামোদরের তীরে অবস্থিত রাণীগঞ্জের বল্লভপুরে কাগজের কল রয়েছে। আর রাণীগঞ্জ বলতেই বোঝায় কয়লাখনি অঞ্চল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে গড়ে উঠেছে চিত্তরঞ্জন শিল্প শহর। এখানে রয়েছে রেলইঞ্জিন কারখানা। দূরত্ব আসানসোল থেকে মাত্র ৩২ কি.মি.। পথে রূপনারায়ণপুরে রয়েছে টেলিফোন তারের কারখানা।

মাত্র সাড়ে চার কি.মি. দূরে সেনর‍্যালের সাইকেল কারখানার নাম উল্লেখ না করলে আসানসোলের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সাইকেল কারখানাকে কেন্দ্র করে সেনর‍্যালে এখন এক উপনগরী।

অল্প পরিসরে আসানসোল ও তার আশপাশ নিয়ে আলোচনা করা হল। আসানসোলের ইতিহাস-রূপান্তরিত কয়লার মতো মাটি চাপা। যেখানে অন্ধকারে দিনের পর দিন চাপা পড়ে আছে কালো হীরে-রূপকথার ঘুমন্ত দৈত্যের মতো।

□ 'বিদিশা' শারদ সংখ্যা, ১৯৮৬ □

বরাকরের দেউল

ঘাঘরবুড়ী চণ্ডীদেবী, আসানসোল

খাজা আনোয়ারের গোরস্থান

আবদুল লতিফ

বর্ধমান নগরে 'খাজা আনোয়ার' নামক এক সাধুপুরুষের সমাধি-ভবন আছে। যে পল্লীতে ঐ সমাধি-ভবন বিদ্যামান আছে, তাহা তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত 'নজুবাত ওয়াকফ্' সম্পত্তি হইতেছে। এজন্য ঐ পল্লী 'খাজা আনোয়ারের বেড়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সমাধিস্থানের চারিদিক্ ইষ্টক প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; প্রাচীরের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ড সুপ্রশস্ত ও সমচতুষ্কোণ।

সমাধি-ভবনের মধ্যস্থলে প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই খাজার সমাধি; উহার পূর্ব ও পশ্চিম ধারে দুইটি করিয়া চারিটি এবং পাশের দুই ঘরেতে দুইটি সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। খাজার সমাধির দুই ধারের সমাধিগুলি কাহাদের, তাহা জানিবার এখন আর কোনও উপায় নাই। তবে প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখের সমাধিটি খাজার সমাধি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। অপর সমাধিগুলি খাজার আত্মীয়-স্বজনগণের বলিয়া কিংবদন্তি চলিয়া আসিতেছে। খাজা আত্মীয়স্বজন লইয়া ঐ সুন্দর ও সজ্জিত সমাধি-ভবনে চিরনিদ্রায় শায়িত রহিয়াছেন। তাঁহার সমাধি-ভবনের বাহিরে চারিদিকে দিন দিন সমাধি-সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।

ঐ সমাধির প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিবার আমাদের সম্বল একটি ফারসী কবিতার একটি চরণ। উহা সমাধি ভবনের জনৈক কার্যাধ্যক্ষ মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। নিম্নে ঐ কবিতা-চরণ উদ্ধৃত হইল;—

'আহ্ আনোয়ার শহিদে আকবর শোদ।'

ঐ কবিতা চরণের প্রত্যেক অক্ষরের সংখ্যা একত্র করিলে ১১০৯ হয় ; ঐ হিসাবে ১১০৯ হিজরীতে (১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে) খাজা আনোয়ারের মৃত্যু হওয়া অবধারিত হয়।

খাজা আনোয়ার বাঙ্গালার ইতিহাস-পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। তিনি কোথা হইতে কি উপলক্ষে বর্ধমানে আসিয়াছিলেন এবং কোন্ হেতুতে তাঁহাকে নিহত হইতে হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস বাঙ্গালার ইতিহাসে দেওয়া আছে। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের সহিত তত্রত্য জমিদার শোভাসিংহের মনোমালিন্য ঘটিলে শোভাসিংহ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া প্রধান বিদ্রোহী আফগান-সর্দার রহিম খাঁকে আহ্বান করেন।

শোভার অপঘাত মৃত্যুর পর, তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণ রহিমের আজ্ঞাধীন হয়। রহিম ঐরূপে সেনাবলে বলীয়ান হইয়া 'রহিম শাহ' উপাধি ধারণপূর্বক আপনাকে স্বাধীন বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাঙ্গালার অনেক নগর ও জনপদ অধিকার করিয়া লন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের সমস্ত প্রদেশ (রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত) তাঁহার দখলে আসিয়া যায়। নবাব এবরাহিম খাঁ তখন বাঙ্গালার সুবাদার, ঢাকা তখন বাঙ্গালার রাজধানী। নবাব ভাগীরথীর পূর্বদিক্ রক্ষার ব্যবস্থা করিলেও পশ্চিমদিকে বিদ্রোহীর গতিরোধে সমর্থ হইলেন না।

রহিমের বিদ্রোহাচরণ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহার উপদ্রব নিবারণার্থ আপন পৌত্র শাহজাদা আজিমুশ্শানকে ১১০৮ হিজরীতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী-পদে বরিত ও খাজা আনোয়ারকে তাঁহার মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত করেন।

কুমার আজিমুশ্শান বাঙ্গালায় আসিয়া অগ্রে বর্ধমানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়াই, রহিমের বিদ্রোহ দমন করা তাঁহার প্রধান ও প্রথম কর্তব্য ছিল। কিন্তু, জমিদার ও প্রধানবর্গের আদর-অভ্যর্থনা ও নূতন সুবাদারীর নজরানা, তাঁহাকে কর্তব্যভ্রষ্ট ও মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া ফেলিল। বর্ধমানের অদূরে রহিমের রণভেরী বাজিয়া উঠিল, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রহিম বর্ধমান আক্রমণে উদ্যত, তদবস্থায় ঝটিতি তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য-চালনা করা সুবাদারের প্রধান কর্তব্য হইলেও, তিনি তাহা না করিয়া অর্ধোন্মীলিত চক্ষু মার্জন করিতে করিতে দূত-হস্তে রহিমের নামে এক পত্র দিলেন। পত্রে রহিমের অপরাধ মার্জনা করিবার আশা দেওয়া হইল ও তাঁহাকে বর্তমান যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে বলা হইল এবং পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে শাহি-দরবারের কোন উচ্চতম পদে অভিষিক্ত করিবার লোভ-লালসাও প্রদর্শন করা হইল। রহিম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রণনিপুণ বীর; তিনি যুদ্ধে হতবল বা হতোৎসাহ হইলে, শাহজাদার পত্র তাঁহার নিকট মূল্যবান্ হইতে পারিত। ফলে শাহজাদার পত্র পাঠে তাঁহাকে দুর্বল-বোধে রহিম বর্ধিত-সাহস ও গর্বস্ফীত হইলেন। তাঁহার পত্রের লিখিত উত্তরও দিলেন না। দূতকে এইমাত্র বলিয়া দিলেন, 'শাহজাদার প্রধান মন্ত্রী খাজা আনোয়ার যদি এখানে আসিয়া পত্র-সমর্থন করেন, তাহা হইলে রহিমশাহ, বাদশাহের আনুগত্য-স্বীকার করিবে।'

সাদাসিধা শাহজাদা একে ত রহিমকে পত্র দিয়াই দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উপর আবার ঘোর নিবুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। শত্রুর মুখের কথায় নির্ভর করিয়া ও তাহার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া এবং মোগল বংশের সম্মান-সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কয়েকটিমাত্র রক্ষী সমভিব্যাহারে খাজা আনোয়ারের ন্যায় সম্মানিত রাজপুরুষকে, রাজদ্রোহী পাঠান রহিমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদেশ দিলেন।

খাজা আনোয়ার রাজনীতি-বিশারদ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও, উদারস্বভাব ও সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। তাহার উপর অতিমাত্রায় প্রভুর আজ্ঞাবাহীও ছিলেন। সুতরাং রহিমের আচরণে অসরলতা ও শত্রুতার নিদর্শন স্পষ্ট প্রদর্শিত হইলেও, খাজা প্রভুর আদেশ রক্ষাহেতু বিনা বাক্যব্যয়ে কতিপয়মাত্র রক্ষী লইয়া শত্রু শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং শিবির সমীপবর্তী হইয়া সহসা শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করা অনুচিতবোধে, বাহিরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য রহিমকে আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু বলদর্পিত রহিম অহঙ্কারবশত শিবিরের বাহির হইলেন না, বরং খাজা শিবিরের ভিতর গিয়া সাক্ষীগণের সম্মুখে সন্ধি-সর্ত স্থিরীকৃত করুন, এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। রাক্ষস-প্রকৃতি রহিম যে, তখন নিরীহ খাজার শোণিত-পিপাসু হইয়াছেন, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তদ্দণ্ডেই নগরাভিমুখ হইলেন। খাজাকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া রহিম ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া সসৈন্যে শিবির বাহির হইয়া খাজা ও তাঁহার রক্ষীবর্গকে আক্রমণ

করিলেন। খাজা বা তাঁহার সহচরগণ কেহই রণবেশে সজ্জিত ছিলেন না, অথচ রহিম ও তাঁহার সেনাগণ সশস্ত্র, কাজেই তাঁহারা শত্রুর আক্রমণ রোধে সমর্থ হইলেন না, মুহূর্তমধ্যে তাঁহাদিগকে শত্রুর অস্ত্রমুখে প্রাণ সমর্পণ করিতে হইল।

আজিমুশ্শান ১১০৮ হিজরীতে সুবাদারী-পদে বরিত হওয়া ও খাজা আনোয়ার তাঁহার প্রধান অমাত্য থাকা ইতিহাস প্রমাণ দিতেছে। সুবাদার ও মন্ত্রীর রাজধানী হইতে বাহির হইয়া বর্ধমানে আসিতে কিছুদিন বিলম্বও হইয়াছিল। এমত অবস্থায় খাজার মৃত্যুর সন ইতিহাসে দেখিতে না পাওয়া গেলেও উপরিকথিত পারসি-কবিতা-চরণের সংখ্যানির্দিষ্ট ১১০৯ হিজরী যে তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত সন ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এখন ১৩৩৩ হিজরী চলিতেছে; অতএব খাজার মৃত্যু আজি ন্যূনাধিক ২২৪ বৎসর হইল সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল খাজার পুত্র-বংশের কোন সন্তানই বর্তমান নাই, এখনকার মতওল্লিগণ তাঁহার বংশধরদিগের কন্যাবংশের সন্তান হইতেছেন। বর্তমান মতওল্লিগণের মধ্যে মুন্সেফ মৌলবী মের্জা বেদার বক্ত্ সাহেব ও ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী মের্জা মেগোস্তা বক্ত সাহেব এবং সৈয়দ মোজতরা হোসেনের বাসস্থান বর্ধমান নগরে আছে। অপর মতওল্লি টিপু সুলতানবংশীয় শাহজাদা নসিরদ্দীন ও শাহজাদী মাহতাবুন্নে্সা বেগম কলিকাতা টালিগঞ্জে বাস করিয়া থাকেন।

□ অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, বর্ধমান, ১৩২১ 'স্মরণিকা' □
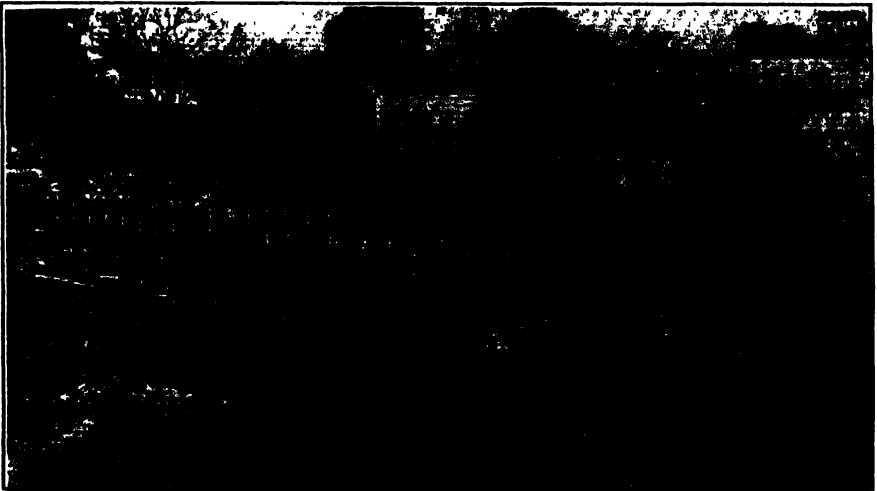
খাজা আনোয়ার সাহেবের নবাববাড়ি

বর্ধমানের কুলবধূ নূরজাহান

আবদুল গণিখান

দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন হীরে যার ওজন ৭৯৩ ক্যারেট ছিল, কাটাই হয়ে যার ওজন হয় ১৯১ ক্যারেট; সেই অমূল্য কোহিনূর মেহেরন্নিসার মুকুটে যিনি সোহাগভরে পরিয়ে দিয়েছিলেন, যার রূপ সৌন্দর্য মোগল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির দিনে জাহাঙ্গারী মুদ্রায় খোদিত হয়ে নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ গাজী নিজেকে ধন্য মনে করেন, 'দুনিয়ার আলো' বা নূরজাহান তিনি রাঙামাটি বর্ধমানের কুলবধূ।

'বয় মাজারে মা গরীবা ন চেরাগে ন গুলে
ন পারে পরওয়ানা সুজ্জদ্ ন সাদায়ে বুলবুলে'

আমার মত দীন গরীবের কবরে কোন প্রদীপ জ্বলবে না ফুলও থাকবে না পতঙ্গ পুড়বে না ও কোন বুলবুলের আওয়াজ শোনা যাবে না।

গরীব গোরে দ্বীপ জ্বেলো না ফুল দিও না কেউ ভুলে
শ্যামা পোকায় না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে।"

অনু: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উল্লিখিত দ্বিপদীটি বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরী নূরজাহান রচিত। বর্ধমান শহরে তার যৌবনকাল অতিবাহিত হয়েছে ---তখনকার গভর্নর (শাসক) বীর সন্তান শের আফগানের বেগম রূপে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ছিন্ন পাতা বর্ধমানের মাটিতে লুকিয়ে রয়েছে। বর্ধমানের শাসনকর্তা বীর শের আফগানের সমাধি আজও দেশ বিদেশের দর্শনার্থীর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনিই মেহেরুন্নিসার প্রথম স্বামী।

শের আফগানের সমাধি সম্পর্কে -- 'Antiquities of Burdwan-এ আছে

TOMB OF SHER AFGAN (1610 A.D.)

This is the most important of the ancient archaeological remains in the district and its origin is traced by tradition as far back as the reign of Emperor Akbar over three hundred years ago.

Burdwan was the country residence of Sher Afgan (Jaigirdar of Burdwan) the first husband of the famous Meherunnisa, afterwards Empress Nur-Jahan (Light of the world), who was treacherously attacked and slain just outside the town by Kutubuddin, the foster brother of Jahangir, the Emperor of India. Kutubuddin was promised Subadari of Bengal by the Emperor to procure Meherunnisa for his Royal Master. Jahangir subsequently married Meherunisa. and there is little doubt that her first husband was killed in the encounter. The scenes of which is still pointed out near the Railway station and his grave and that of Kutubuddin are still to be seen in the Mahalla of Peer-Baharam of this town.

In honour of Sher Afgan and Kutubuddin marble tombs were built by the Burdwan Raj and are kept in a fair state of preservation under the ancient Monuments Act.

নূরজাহানের পিতামহ খাজা মহম্মদ শরীফ খোরাসানের তাতার সুলতান বগলার বেগীর মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র মিরজা গিয়াসউদ্দীন মোহাম্মদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হওয়ায় তিনি ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। সম্রাট আকবরের দরবারে সুপ্রসিদ্ধ রত্ন ব্যবসায়ী মালেক মস্উদ একে ভারতে সঙ্গে করে আনেন। ভ্রমণ কালে গিয়াসউদ্দীনের পূর্ণগর্ভাস্ত্রী পথিমধ্যে কান্দাহারে একটি অপরূপা লাবণ্যময়ী কন্যাসন্তান প্রসব করেন। বাল্যকালে তাঁর নাম রাখা হল মেহেরুন্নিসা।

মালেক মস্উদের প্রচেষ্টায় বাদ্শাহ আকবরের আনুকূল্যে গিয়াসউদ্দীন সামান্য রাজকর্মচারী থেকে স্বীয় প্রতিভাবলে তিন হাজারী মনসবদার ও কাবুলের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হন। (১৫৯৫ খ্রি)। (দ্রঃ আইন-ই-আকবরী (Blockman) প্রথম খণ্ড ৫০৮-৯ পৃ.)

কৈশোরে আব্বা ও আম্মার কাছে মেহেরউন্নিসা আরবী ও ফারসী ভাষা শেখেন এবং কবিতা রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। সতেরো বছর বয়সে বিশ্বের অন্যতমা সুন্দরী মেহেরউন্নিসা আলীকুলি ইস্তাজলুর সঙ্গে পরিণীতা হন।

আলী কুলি ইস্তাজলু ছিলেন অতি সাধারণ ঘরের সন্তান। তিনি পারস্যাধিপতি দ্বিতীয় শাহ ইসমাইলের দরবারের সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু কঠোর ভাগ্য বিড়ম্বনায় ইস্তাজলু ভারতে আসতে বাধ্য হন। সোনার ভারত সেদিন ছিল বিশ্বের জীবনকেন্দ্র। তাই এখানে এলেই কিছু কর্ম সংস্থান হবে --- এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ইস্তাজলু সম্রাট আকবরের দরবারে উপস্থিত হন। তাঁর শক্ত সমর্থ শরীর দেখে সম্রাট তাঁকে সামান্য সৈনিকের কাজ দিয়ে প্রথমে সাহায্য করলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি সম্রাট ও ভাবী সম্রাট জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আকবরের মৃত্যুর পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ হন এবং শের আফগানকে জায়গীরদার করে বর্ধমান শহরে পাঠিয়ে দেন।

বলাবাহুল্য নূরজাহানের সঙ্গে ইস্তাজলুর বিবাহ বর্ধমান আসার বহু পূর্বেই দিল্লীতে সংঘটিত হয়। (আইন-ই-আকবরী - Blockman ৫২৪-পৃষ্ঠা)

ইস্তাজলু যৌবনে একটি বাঘকে (শের) ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করায় 'শের আফগান' উপাধি লাভ করেন। 'শের' শব্দের অর্থ হল বাঘ, 'আফগানদান' অর্থ হল ছুঁড়ে ফেলা। আর বাদশাহ হবার পূর্বে খোদ জাহাঙ্গীর (শাহজাদা সেলিম) আলী কুলিকে এই উপাধিতে বিভূষিত করেন। ('তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' Rogers and Beveredge ১ম খণ্ড - ১১৪ পৃষ্ঠা)

কিন্তু ব্লকম্যান বলেন, আলী কুলি ইস্তাজলু শাহজাদা সেলিমের সঙ্গে রানা প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে একটি শের (ব্যাঘ্র) নিহত করায় সেলিম তাঁকে শের-আফগান উপাধিতে ভূষিত করেন। (আইন-ই-আকবরী Blockman ৫২৪ পৃষ্ঠা)

যাই হোক ইস্তাজলু যে সে যুগের একজন শক্তিধর পুরুষ ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রণয় কাহিনী রোমাঞ্চকর কর[illegible] অনেক

লেখক বিচিত্র কল্পশব্দের আশ্রয় নিয়েছেন। বালিকা বয়সে হারেমের অভ্যন্তরে নাচ গান মজলিসে প্রণয় কক্ষে এদের হৃদয় বিনিময় হয় ও সেলিম প্রেমাবেশে মেহেরুন্নিসাকে আলিঙ্গন করেন, আকবর তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে শেরের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে বর্ধমানে পাঠিয়ে দেন একথা অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন। (Dows History of India. Vol-III Page -19-33) এও লিখতে ভুলেন নাই যে, কুতুউদ্দীনকে বর্ধমানে পাঠান হয় শের আফগানকে নিহত করতে এবং মনোমোহিনী মেহেরকে অঙ্কশায়িনী করতে। কিন্তু তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী পাঠ করলে স্পষ্ট জানা যায়, যখন জাহাঙ্গীর বাদশাহ হয়ে শের আফগানকে জায়গীর প্রদান করে বর্ধমান নগরীতে পাঠান সে সময় বাংলাদেশের পাঠান শাসনকর্তাগণ একত্রিত হয়ে মোগল প্রাধান্য খর্ব করতে ষড়যন্ত্র করছেন। শের আফগানও তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় জাহাঙ্গীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অকৃতজ্ঞ শের আফগানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য স্বীয় ধাত্রীপুত্র কুতুবউদ্দীনকে বর্ধমানাভিমুখে পাঠান। কুতুবউদ্দীন বর্ধমানে পৌঁছলে শের আফগান হঠকারিতাবশে তাঁর সঙ্গে বিবাদ করে হত্যা করেন ও নিজেও কুতুবউদ্দিনের সেনাদল কর্তৃক নিহত হন।

স্বামীর মৃত্যুর পর মেহেরুন্নিসা শের আফগানের ঔরসজাত কন্যা লাড়্‌লী বেগমকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লীতে স্বীয় পিতা মিরজা গিয়াসউদ্দীনের নিকট চলে যান। বলা বাহুল্য লাড়্‌লী বেগমের জন্ম হয় বর্ধমান শহরে। এবং নূরজাহান বর্ধমানে দীর্ঘ কয়েক বছর অবস্থান করেন। কিছুদিন পরে তিনি রাজমাতা সেলিমা বেগমের সহচরীরূপে নিযুক্ত হন। (জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রণয় কাহিনী—আবদুল মওদুদ, মাসিক মোহাম্মদী ৭০৩ ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

১৬১১ খ্রিস্টাব্দে 'নওরোজ' উৎসব উপলক্ষে জাহাঙ্গীর সর্বপ্রথম মেহেরুন্নিসাকে দেখেন ও তাঁর অতুলনীয় রূপরাশিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পাণি প্রার্থনা করেন। বিমাতা সেলিমা বেগমের উদ্যোগে তাঁদের বিবাহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় নূরজাহানের বয়স চৌত্রিশ বৎসর মাত্র।

অনেকের ধারণা বাদশাহ আকবর নীচকুলোদ্ভবা নূরজাহানকে পুত্রবধূ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই শের আফগানের সঙ্গে বিবাহ দেন। বলা দরকার শের আফগান বা নূরজাহান কেউই বংশ মর্যাদায় হীন ছিলেন না। স্বয়ং আকবরের মা হামিদাবানু বেগমও নূরজাহান অপেক্ষা উচ্চবংশজাত ছিলেন না। জাহাঙ্গীরের স্বলিখিত জীবনী থেকে জানা যায় যে নিজ প্রেম প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মান বর্ধিত করতে বাংলার জায়গীর দিয়ে শের আফগানকে তিনি কখনও পাঠাতেন না। (তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা)

কুতুবউদ্দীন সম্রাটের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শের আফগানকে বন্দী করতে বর্ধমানে আসেন, তাঁর পত্নীর জন্য নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় জাহাঙ্গীর শের আফগানকে হত্যা করার জন্য ফরমান দেন নিস্বীয়। ঔদ্ধত্যবশত আত্মদোষে শের নিহত হন।

শের আফগানের সঙ্গে বিবাহ হবার পূর্বেই জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করতে চান এবং পরে জাহাঙ্গীরের ইঙ্গিতেই শের আফগানকে বর্ধমানে হত্যা করা হয়—এই বহুল প্রচলিত কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা সন্দেহ। (ভারতকাহিনী ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৫)

দ্বিতীয় বিবাহের সময় মেহেরুন্নিসাকে বয়স ছিল চৌত্রিশ, তবুও তাকে দেখলে নবীনা যুবতী বলে ভ্রম হত। রূপমুগ্ধ ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে নূরজাহান বা নূরমহল বলে আখ্যা দেন। বর্ধমানের কুলবধূ নূরজাহান অনূন ১৫ বছর (১৬১২ খ্রি.) পর্যন্ত ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন।

অপূর্ব রূপসী নূরজাহান শের আফগান ও বাদশাহ জাহাঙ্গীরের জীবনে প্রবল ঝড় তুলেছিলেন। কত কাহিনী ও কিংবদন্তী তাকে ঘিরে প্রচলিত রয়েছে তার হিসাব নেই। কেবল রূপ নয় নূরজাহানের গুণও ছিল অসাধারণ।

বুদ্ধির দীপ্তিতে নূরজাহান সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবনে এমন প্রভাব বিস্তার করেন সে সময় তিনিই ছিলেন রাজশক্তির প্রধান উৎস। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে মুদ্রার একপিঠে খোদাই করা হল-তাঁর নাম। নূরজাহানের পিতা ইতমদদৌলা জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী এবং ভাই আসফ খান রাজকার্যে মহান দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল হলেন। আসফখানের কন্যা মমতাজের (নূরজাহানের ভাইঝির) সঙ্গে যুবরাজ খুরমের বিয়ে দেওয়া হল। (১৬১২) এ সবই নূরজাহানের প্রভাবে। নূরজাহান আগ্রায় পিতা ইতমদদৌলার সমাধির উপর যে হর্ম্য নির্মাণ করান তা মোগল স্থাপত্য শিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন। শের আফগান ও নূরজাহানের কন্যা লাডলী বানুর সঙ্গে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়রের বিবাহ দিয়ে নূরজাহান রাজ সিংহাসনের একমাত্র শাসনকর্ত্রী হলেন। মোগল রাজ পরিবারে কোন মহিলা এতদূর রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন নি।

ভারতের ইতিহাসে প্রথম মহিলা শাসকরূপে চিহ্নিত হয়ে রইলেন বর্ধমানেরই কুলবধূ নূরজাহান।

Rulers and Great Leaders Jahangir – By H. G. Rowlinson, C. I. E - তে উল্লিখিত আছে

In 1611, Jahangir married the famous Nurjahan or Light of the world. The weak and self indulgent emperor allowed his strong minded, consort to gain entire ascendancy over him, and the empress was the defacto ruler of Hindustan. She used her power wisely and well.

একবার নুরজাহান ছয়টি গুলিতে চারটি বাঘ নিহত করেন। তিনি ফারসীভাষায় কবিতা রচনা করেছেন প্রচুর। তিনি ছিলেন উন্নত রুচিসম্পন্না। নূরমহালী বাদলা, 'দু দাসী পেশোয়াজ' পাঁচ তোলিয়া উড়নী, কিনার-ই-ফরস চন্দনী পোশাক ও অলংকার আভরণ আজও তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভারতসম্রাজ্ঞী হয়েও তিনি অনাথ আতুরদের কথা ভোলেন নি। ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহান অন্যূন পাঁচ হাজার অনাথ বালিকার সুপাত্রে বিবাহ দিয়েছিলেন।

'She sat daily at the Audience Window, and a veil over her face hearing the grievances of her Subjects and personally redressing them. She spent much of her private, fortune in finding dowries for orphaned girls. She even had her named stamped on the coinage. She was a great horsewoman and a mighty Shikari.

(Jahangir)- by H. G Raw Linson

তাঁর রূপ, বুদ্ধি, কর্ম, সাহস সর্বোপরি তীক্ষ্ণ রাজনীতি বিজ্ঞান বিশ্বে অতুলনীয়। বর্ধমান শহর এই সর্বগুণসম্পন্না নারীকে অল্প কয়েক বছর পেয়ে সত্যিই ধন্য।

এখানে উল্লেখ্য যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দুধ-ভাই কুতুবউদ্দীন ও মেহেরউন্‌নিসার (নূরজাহান) প্রথম স্বামী শের আফগানের সমাধিসংলগ্ন দুটি মর্মর প্রস্তরে কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

জাহাঙ্গীরের জন্য মেহেরুন্নিসাকে হস্তগত করার উদ্দেশ্যে প্রভু কর্তৃক পুরস্কৃত হবার মানসে খণ্ডযুদ্ধে শত্রুকে নিহত করার যে কাহিনী বিরচিত হয়েছে তা সন্দেহজনক বলে মনে হয়। মর্মরপ্রস্তরে খোদিত লেখা দুটি নিম্নরূপ

KUTUBUDDIN

The foster brother of Emperor Jehangir, received the promise of the High office of Subadar of Bengal on condition that he would procure for his royal master the beautiful Meher-un-Nisa, wife of Sher Afgan. Kutubuddin fell in fight that ensured with his gallant opponent and is buried here.

SHERAFGAN

Here lies Sher Afgan, Governor of Burdwan and first husband of Meher-un-Nisa, Afterwards the famous Moghul Empress Nurjahan A. D. 1610

জেলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অবশিষ্ট শের আফগান ও কুতুবউদ্দিনের মারবেলে স্মৃতিসৌধটি বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব কর্তৃক নির্মিত এবং 'পুরাতন স্মৃতি চিহ্ন রক্ষণ আইনে সুরক্ষিত।'

□ 'মুক্তিচাই' শাবদ সংখ্যা, ১৩৯১ □

নূরজাহান

রাজা রামমোহন রায় ও বর্ধমান রাজবংশ

সুবোধ মুখোপাধ্যায়

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ তিলোকচন্দ পরলোক গমন করেন ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে তখন তেজচন্দের বয়স ছয় বৎসর। কাজেই এই বিশাল ভুখণ্ডের মালিক তেজচন্দের জননী মহারাণী বিষণকুমারী অভিভাবিকারূপে রাজকার্য পরিচালনা করেন। মহারাণী খুবই বুদ্ধিমতী এবং বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে মাসিক বৃত্তি গ্রহণ করে মোগল সম্রাট (নামে) শাহ্ আলম তখন এলাহাবাদে বাস করছেন--রাজ্য শাসন করছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। যথাসময়ে নির্দিষ্ট নজরানা দিয়ে বিষণকুমারী একমাত্র পুত্রকে বংশের খেতাবে ভূষিত করলেন বাদশাহের প্রদত্ত রাজাধিরাজ ও অন্যান্য অনুগ্রহে।

ওয়ারেন হেস্টিংস সেই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর হয়ে এলেন এবং বর্ধমানরাজের সম্পদ দেখে ও কথা শুনে লোলুপ দৃষ্টি দিলেন নাবালকের সম্পদ গ্রাসের জন্য। বুদ্ধিমতী মহারাণীর অনুরোধে মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত হেস্টিংস সফল হন নাই।

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে তেজচন্দ মহারাণীর কাছ থেকে রাজ্যের শাসনকার্যভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু শৈশব থেকেই কুসংসর্গে থাকার জন্য অযথা অনেক অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। শেষে কোম্পানির প্রাপ্য খাজনা দিতেও পারছেন না। কোম্পানির বোর্ড বাকি খাজনার জন্য বারবার তাগাদা দিতে লাগল -- কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায় কোম্পানি বর্ধমানরাজের কিছু সম্পত্তি নীলাম করে নিজেদের খাজনা আদায় করতে বাধ্য হয়। তেজচন্দ কোম্পানির উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করতেন না --- সে কারণে সকলেই তাঁর প্রতি বিরক্ত ছিলেন।

এই সময়ে মহারাণী বিষণকুমারী, রাজভাণ্ডার থেকে যে তন্খার ব্যবস্থা ছিল তাও ঠিক সময়ে পেতেন না--এই কারণে মাতা-পুত্রের মনোমালিন্য ছিল। এমন কি তন্খার জন্য মহারাণীকে মাঝে মাঝে গভর্নরের কাছে আবেদন করতে হত।

১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে বাকি খাজনার দায়ে বর্ধমান রাজ্য নীলাম হয় এবং মহারাণী বিষণকুমারী নীলামে বর্ধমান রাজ্যের বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। কোম্পানিরও তাতে সম্মতি ছিল কারণ বিষণকুমারীর কর্মকুশলতায় তাদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তেজচন্দ তখন আরও উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছেন--রাজকর্মচারীদের কার্যে সর্বদা নানারূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগলেন তার জন্য মহারাণীকে বাধ্য হয়ে তেজচন্দকে বর্ধমানের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য কোম্পানিকে অনুরোধ করতে হল--সেই মত কোম্পানির আদেশে তেজচন্দকে কিছুদিন বর্ধমানের বাইরে থাকতে হয়েছিল। এইসব কারণে মাতার সঙ্গে পুত্রের মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। তেজচন্দ মাতাকে বিপদে ফেলবার জন্য নানাবিধ অপকর্মের সাহায্য নিলেন।

সেই সময়ে মহারাণীর পক্ষে পরামর্শ দেবার এবং মহারাণীর বিষয়কর্মে সহায়তা করবার জন্য একজন অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত মানুষের প্রয়োজন হল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে বাংলা দেশ বিভিন্ন ভূমিতে বিভক্ত ছিল-- বর্ধমান ছিল তেমনি একটা ভূমি--জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) তখন ছিল বর্ধমান ভূমির অন্তর্গত-- এই জাহানাবাদের মধ্যেই ছিল খানাকুল রাধানগর গ্রাম।

বর্ধমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ যখন রাজা উপাধি পাননি-- জমিদার ও চৌধুরী বলে যখন এঁদের পরিচয় ছিল -- সেই সময়ে এই বংশের কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করে শোভা সিং। কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র জগৎরাম রায় বর্ধমান থেকে পালিয়ে গিয়ে ঢাকা দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধির শরণাপন্ন হন এবং পরে শাহাজাদা আজিম উস্‌সান-কে বাংলাদেশের সুবাদার করে পাঠান বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। আজিম ওস্‌সানের সাহায্যে জগৎরাম রায়ের জমিদারী পুনরুদ্ধার হয়। এই জমিদারী রক্ষার কার্যে জগৎরাম রায়কে সাহায্য করবার জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব নিযুক্ত করেন কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করার জন্য 'রায়' উপাধি লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাব সরকারের জন্য খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন জাহানাবাদ অঞ্চলের। এই স্থানে বসবাসকালীন তিনি জাহানাবাদ অন্তর্গত খানাকুল, রাধানগর প্রভৃতি কয়েকটি মৌজা ইজারা নেন বর্ধমানের জমিদারের কাছে। ক্রমে, স্থায়ীভাবে বসবাস করেন খানাকুল রাধানগরে। কারও কারও মতে অখণ্ড কয়েকটি মৌজা ইজারা নিলেও তখন স্থায়ীভাবে খানাকুলে বসবাস করেননি, কৃষ্ণচন্দের পৌত্র রামকান্ত রায় খানাকুলে স্থায়ীভাবে বাস করেন মুর্শিদাবাদ থেকে এসে এবং রামকান্ত আরও অনেক জমিদারী ইজারা নেন। যাইহোক জগৎরাম রায়কে কৃষ্ণরাম রায় নানাভাবে সাহায্য করেন তাঁর জমিদারীতে খাজনা আদায় ও পরিচালনার ব্যাপারে। তার পরে আরও কয়েক পুরুষ অতীত হয়ে গেছে। চৌধুরীরা রাজা থেকে মহারাজাধিরাজ হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণচন্দের বংশধরেরাও আরও বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়ে ছোটখাটো জমিদার হয়েছেন--বর্ধমান রাজারই অধীনে।

কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র রামকান্ত রায় এলেন মহারাণী বিষণকুমারীকে বৈষয়িক বিষয়ে সাহায্য করতে-ব্যবস্থা করেছিল তদানীন্তন কোম্পানির এজেন্টরা। রামকান্ত রায় রাজা রামমোহনের পিতা।

নিজের খুশীমত কর চাপাতে না পেরে মহারাজ তেজচন্দ মাতার প্রতি বিরক্ত তো হলেনই --বেশী বিরক্ত হলেন রামকান্তের উপর। তেজচন্দ এত ক্রুদ্ধ হলেন মাতার উপর যে নিজে চেষ্টা করে মাতার মাসিক তন্‌খা যাতে বন্ধ হয় তার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজে রাজার কার্যভার গ্রহণ করে মাতাকে বিপদেও ফেললেন। যাইহোক রামকান্তের চেষ্টাতেই কোম্পানির কাছে আনাগোনা করে বিষণকুমারী শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন এবং তাঁর প্রাপ্য তন্‌খা পেতে লাগলেন।

বিষণকুমারীর মৃত্যুর পর রামকান্তর সঙ্গে আর বর্ধমান রাজবংশের কোন সম্পর্ক থাকল না। কিন্তু তেজচন্দের বা তাঁর পরামর্শদাতাদের আক্রোশ থাকল রামকান্তের উপর

এবং রামকান্তকে বিপদে ফেলার সুযোগ সন্ধান করতে লাগলেন তাঁরা। অবশেষে সে সুযোগ এল। তখন জমিদাররা সময়ে খাজনা দিতে না পারলে বর্ধমানের রাজা তাদের হাজতবাস দিতে পারতেন।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে রামকান্ত রায়ের বেশ কিছু খাজনার টাকা বাকি পড়েছে বর্ধমানের রাজার কাছে। তেজচন্দ সেই সুযোগ নিয়ে রামকান্ত রায়কে হুগলীর গারদে ঢুকিয়ে দিলেন। খাজনার পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০ হাজার টাকা। এর আগে আর একবার কোম্পানির দেওয়ানী আদালতে রামকান্ত কয়েকমাসের জন্য জেল খেটে এসেছেন। তখন বর্ধমান শহরেই রামকান্ত বাস করেন--বাড়ি, ঠাকুরবাড়ি সব করেছেন এই শহরেই। রামমোহন তখন কলকাতায় একজন বিত্তশালী ব্যক্তিরূপে নাম করেছেন। কোম্পানির কাছেও দেওয়ান বলে তার বেশ পরিচিতি হয়েছে, কিন্তু পিতা পুত্রে সদ্ভাব না থাকার জন্য রামকান্ত রামমোহনের কোন সাহায্য গ্রহণ করলেন না—- আর রামমোহনও সাহায্যের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। রামকান্তকে পুনরায় জেল খাটতে হল দেনার দায়ে। শেষে রামকান্তর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহন পিতার হয়ে জেল খাটতে লাগলেন মেদিনীপুর জেলে। সেই অবস্থাতেই মুক্তি পেয়ে রামকান্ত বর্ধমান শহরেই দেহত্যাগ করলেন। রামমোহন খবর শুনে এলেন বর্ধমানে কিন্তু বিধর্মী বলে পিতৃশ্রাদ্ধে যোগদান করতে পারলেন না। বর্ধমানরাজের সঙ্গে এই হল রামমোহনের বংশের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা। পুরাতন শত্রুতার জের টেনে তেজচন্দ রামকান্তের বাকি খাজনার দায়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু রামমোহন পিতার ত্যাজ্যপুত্র বিধায়ে পিতার কোন সম্পর্কের অধিকারী হন নাই। সুতরাং তাঁর দেনার জন্যও দায়ী ছিলেন না। কাজেই তেজচন্দ রামমোহনের বিরুদ্ধে কিছু করতে সক্ষম হননি।

রামকান্তের মৃত্যুর পর রামমোহনও স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসে বসেছেন এবং কলকাতা তথা বাংলাদেশের বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও ঐশ্বর্যে একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিরূপে গণ্য হয়েছেন।

পুরান দিনের তিক্ত স্মৃতি মুছে ফেলে বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে সখ্যতা হয় তেজচন্দের একমাত্র পুত্র প্রতাপচন্দের দ্বারা। কারণ প্রতাপচন্দ প্রায়ই তখন কলকাতা যাতায়াত করতেন। বিশেষ, কলকাতায় তাঁর বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে ভোজের আয়োজনে যোগদান করবার জন্য। এমন কি রামমোহনের বাড়িতেও প্রতাপচন্দের বিভিন্ন সময়ে যাতায়াত ছিল। সেই অবসরেই প্রতাপচন্দের সঙ্গে মাহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের সখ্যতা হয়।

প্রতাপচন্দের মামলার সময়ে ডেভিড হেয়ার প্রতাপচন্দের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসে সে কথার উল্লেখ করেন।

প্রতাপচন্দের মৃত্যুর পর তেজচন্দের শ্যালক পরাণচন্দ প্রতাপচন্দের দুই মহিষীকে নানাভাবে বিপদগ্রস্ত করবার চেষ্টা করেন, এমন কি তাঁদের তন্‌খা পর্যন্ত বন্ধ করে দেন।

কিছুদিন পরে তেজচন্দকে রামমোহনের বাড়িতে যাতায়াত করতে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রামমোহন ও তেজচন্দ যুক্তভাবে কাজ করতে দেখাযায়।

১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে তেজচন্দের মৃত্যু হয়। রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিস্টেল। তেজচন্দ মৃত্যুর পূর্বে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন মহাতাবচন্দকে। মহাতাবচন্দ যখন বর্ধমানের রাজা সেই সময় রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদ রায় বর্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর হয়ে আসেন। পরাণচন্দ্র বাবু তখন পরলোকে। কাজেই পূর্বেকার সূত্র ধরে বিদ্বেষ জাগাবার আর কেউ ছিলেন না। রামপ্রসাদের সঙ্গে নানাভাবে মহাতাবচন্দের বন্ধুত্ব হয় এবং সে বন্ধুত্ব এতই প্রগাঢ় হয় যে মহাতাবচন্দ ব্রাহ্মধর্মের প্রতিও আকৃষ্ট হন। সখ্যতা এতই দৃঢ় হয় যে মহাতাবচন্দ রামপ্রসাদ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়ে নিজের প্রাসাদে সংরক্ষণ করেন। সেই তৈলচিত্র রামপ্রসাদের একমাত্র প্রতিকৃতি।

বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে রামমোহনের বংশের বন্ধুত্ব এবং বিরোধ এই পর্বেই শেষ হয়। প্রয়োজনে রাজবংশ নানাভাবে রামমোহন ও তাঁর পূর্বপুরুষের নানাভাবে সাহায্য পেয়েছেন আবার বর্ধমান রাজবংশও এঁদের বিরোধিতার জন্য যথাসাধ্য এদের বিপদগ্রস্ত করবার চেষ্টা করেছেন। সমস্ত ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায়---রামমোহন এবং তাঁর পিতৃপুরুষেরা বা অধস্তন পুরুষেরা সকল সময়েই বর্ধমান রাজবংশের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করেছেন এবং রাজবংশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজবংশেরই এক পক্ষকে তাঁদের প্রাপ্য আদায়ে সাহায্য করেছেন।

অবশ্য যার শেষ ভাল তার সব ভাল। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে রামমোহনের পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই বংশের মঙ্গলের জন্য তৎকালীন বাদশাহ কর্তৃক আদিষ্ট হন। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে রামমোহনের পুত্রের সঙ্গে মহতাবচন্দের সখ্যতায় তা সম্পূর্ণ হয়। প্রায় দুইশত বর্ষ ব্যাপিয়া এই দুই বংশের সম্পর্ক সত্যিই ঐতিহাসিক এবং বর্ধমানের পক্ষেও তা উল্লেখযোগ্য।

যে পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জীবন চরিত।

২) সংবাদপত্রে সেকালের কথা।

৩) জাল প্রতাপচন্দ্র — সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪) সেকালের লোক — মন্মথনাথ ঘোষ

৫) বর্ধমান রাজবংশ চরিত।

□ 'কফিন' ১ম বর্ষ, ১ম সংকলন, আগস্ট, ১৯৭৭ □

নীলকণ্ঠ দামোদর

প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায়

ছোট মেয়ে শবরী জিদ ধরেছিল তাকে দুর্গাপুর ব্যারেজে বান দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। তার বাবার অনুরোধে আমিও তাদের সঙ্গী হয়েছিলাম। ব্যারেজের খোলা গেটের উচ্ছ্বসিত জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই লেখার চিন্তাটা মাথায় এসেছিল--শবরীই এ লেখার প্রেরণা।

নদীমাতৃক দেশ এই বঙ্গভূমি। নদীকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে কত শহর শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র, আবার নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে কত পুরাকীর্তি , গ্রাম জনপদ, কত স্বপ্নের ঘটেছে সলিল সমাধি। নদী তার পথ পরিবর্তন করে কোন অঞ্চলকে করেছে ঊষর, কোথাও বা জন্ম দিয়েছে নতুন সম্ভাবনার, সবুজের সুরে ভরে উঠেছে কোন জনপদ। জন্মসূত্রে নদী আমার বন্ধু। দামোদরের ভাঙনধরা গ্রাম ছিলামপুরে একদিন মায়ের কোলে এসেছিলাম। ছাত্রজীবনের অনেক বিকেল কেটেছে বহরমপুরে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। অনেক স্মৃতি বিসর্জন দিয়ে প্রবেশ করেছি কর্মজীবনে। কাঁসাই -এর পায়রাচালি, দুয়াসিনীর ঘাটে বসেছি। নিঃসঙ্গ অনেক সন্ধ্যা জামালপুরে দামোদরের বালিতে বসে কেটেছে আর এখনতো দামোদরের পাশেই বাস--দুর্গাপুরে। দুর্গাপুরও একদিন গড়ে উঠেছে এই নদীকে কেন্দ্র করে, সে নদী দামোদর, দুঃখের নদী দামোদর। প্রতিদিন দেখি আর ভাবি সেই প্রবল প্রতাপান্বিত দামোদরকে আজ আমরা শুধু শৃঙ্খলিতই করিনি তার গলায় বিষ ঢেলে ঢেলে তাকে করে তুলেছি নীলকণ্ঠ।

একদা বাংলার প্রাণপুরুষ, রূপকার বিধানচন্দ্র রায় দুর্গাপুর শিল্প নগরীর পত্তন করেছিলেন, দামোদর ছিল তাঁর স্বপ্নের উৎস। টেনেসভ্যালি প্রজেক্টের অনুকরণে একদিকে উন্মত্ত দামোদরকে বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা, অন্যদিকে এই বিপুল জল সম্পদকে শিল্পে ব্যবহার করা, বিশাল জনসংখ্যার পানীয় জলের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও স্বপ্ন আরও ছিল — নদী জলপথ পরিবহন, যদিও এটা স্বপ্নই রয়ে গেল, পরিচালনগত ত্রুটির কারণে ক্যানেলের বুকে ভাটিয়ালির সুর শোনা গেল না।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু হাজার ফুট উপরে হাজারিবাগ জেলার পালামৌ পাহাড়ে জন্ম নিয়ে বিহারের মধ্য দিয়ে বহমানকালে উপনদী (বরাকর, কোনার) বাহিত বিপুল জলরাশিকে যুক্ত করে দামোদর এলো বাংলায়। জামালপুরের বেগুয়া থানায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মুণ্ডেশ্বরী গেল রূপনারানে আর উলুবেড়িয়ায় শ্যামপুরের কাছে গঙ্গায় মিলে গেল দামোদর। আগে প্রায় প্রতিবছর দামোদরে বন্যা হোত। এখন দুর্গাপুর ব্যারেজের আপ স্ট্রীমে বিশাল চড়া পড়েছে, সেখানেও জবরদখল বাস শুরু হয়ে গেছে। যদি কোনদিন ড্রেজিং করে এই বিশাল পলি সরানোর ব্যবস্থা হয় সেদিন নতুন সমস্যা আর একটা আসবে, তা হোল জবর দখলকারীদের অবৈধ আবদার--তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। ১৯৫৯ সালে দামোদরের বন্যার জল উঠেছিল প্রতি সেকেণ্ডে ৮.৫ (সাড়ে আট) লক্ষ ঘন ফুট। ১৯৪৩ - এর ভয়াবহ বন্যায়

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাংলার বহু গ্রাম, বিনষ্ট হয়েছিল বিপুল শস্যভাণ্ডার, প্রাণী সম্পদ। সাকুল্যে ক্ষতির পরিমাণ ছিল আট কোটি টাকা। যশস্বী বৈজ্ঞানিক ডা.মেঘনাদ সাহা, বর্ধমানের মহারাজা সহ দশজনের একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল এই বন্যার কারণ ও নিয়ন্ত্রণের অনুসন্ধানে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও পানীয়জল সরবরাহ, জল পথ পরিবহন, নিকাশি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিচালন, ভূমিক্ষয় রোধে অববাহিকা অঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন, সেচ ও শিল্পের মাধ্যমে পশ্চাদভূমি ও অববাহিকা অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এই কমিটি আমেরিকা যুক্তরাজ্যের টেনেসভ্যালি প্রজেক্টের অনুকরণে দামোদরের ওপর আটটি বাঁধ তৈরীর পরামর্শ দেন-শুরু হয় ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী অববাহিকা প্রকল্প ৭ই জুলাই ১৯৪৮ সালে।

দামোদরের কমান্ড এরিয়া ২৪২৩৫ বর্গ কি.মি., সেচের সুযোগ ৫.৬৯ লক্ষ হেক্টর জমি, ১৯৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম চারটি জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, একটি গ্যাস টারবাইন (৮২.৫ মেগাওয়াট), ৫০টি সাবস্টেশন, পাঁচটি বড় ড্যাম ও ব্যারেজ, মোট জলাধার ১২৭০ মিলিয়ান ঘন মিটার, এছাড়া চেক ড্যাম তৈরী ১৬৮৯টি, সেচ খাল ২৪৯৫ কি.মি., ফার্ম এবং অরণ্য সম্পদ সৃষ্টি ৬ লক্ষ একর। যদিও প্রস্তাব ছিল আটটি জলাধার নির্মাণের কিন্তু ড. সাহার সুচিন্তিত প্রস্তাব না মেনে তৈরী হোল চারটি জলাধার। দুর্গাপুরের দামোদর এখন শিল্প কারখানায় এবং শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ করে। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে, তিন কি.মি. দূরে ১৯৫২-৫৫ -তে তৈরী হয়েছে দুর্গাপুর ব্যারেজ। ২২৭১ ফুট লম্বা, ২৪ ফুট চওড়া ব্যারেজে ৩৪টি গেট রয়েছে, প্রতিটি গেট ৬০ ফুট চওড়া। এই গেটগুলি তোলা নামানো যায় এবং গেট দিয়ে সেকেণ্ডে ৬.৫ লক্ষ ঘনফুট জল বেরিয়ে যেতে পারে। দুর্গাপুর ব্যারেজ যুক্ত করেছে দুটি জেলাকে—বাঁকুড়া এবং বর্ধমান। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ দুর্গাপুরে আসেন শিল্প কারখানায় কাজ করতে কিংবা উৎপাদিত সব্জী, মাছ, কেউ বা মুড়ির বস্তা, খেজুর গুড়ের টিন নিয়ে। কৃষিনির্ভর বাঁকুড়া পেয়েছে একটা বড় বাজার। ব্যারেজ পেরিয়ে প্রতিদিন বহু যানবাহন চলাচল করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরে।

দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ডাইনে বাঁয়ে বয়ে চলেছে দুটি সেচ খাল লেফ্‌ট ব্যাঙ্ক মেন ক্যানেল (এল. বি. এম. সি.) ১৩৭ কি.মি. লম্বা এবং রাইট ব্যাঙ্ক মেন ক্যানাল (আর. বি. এম. সি.) ৮৯ মি.মি.। এই দুটি ক্যানেল থেকে শিরা উপশিরার মত অজস্র শাখা খালের (২২৭০ কি.মি.) মধ্য দিয়ে সেচের জল পৌঁছে যায় মাঠে, সবুজের স্থায়িত্ব বাড়ে। দুর্গাপুর শহরাঞ্চলের আশপাশে সেচের সুযোগ নেই তবে আমলাজোড়ায় নদীজল উত্তোলন প্রকল্প রয়েছে আর রাজবাঁধ থেকে সেচ খাল দিয়ে জল চলা শুরু হয়। শীতের মরশুমে ব্যারেজের আপ স্ট্রীমে পলিজমা দ্বীপে যাযাবর পাখীরা ভিড় করে, তাদের কলকাকলির সাথে সুর মেলায় রঙিন পোশাক পরা শিশুর দল, তবে ব্যারেজের সেই শ্রী আর নেই। সব সৌন্দর্যের ওপরই থাবা বসিয়েছে ক্ষুধার্ত মানুষ। জলের মাঝে চড়া পড়া দ্বীপেও মানুষ পৌঁছে গেছে, বাস করছে, পাখীদের আনাগোনা কমেছে, কমেছে ভ্রমণার্থীদের ভিড়।

ব্যারেজ থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের ১৩৭ কি.মি. লম্বা ৩০ ফুট চওড়া সেচ খালটি হুগলি নদীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ২৪টি লক্ গেটের সাহায্যে খালের জল বাড়িয়ে কমিয়ে জলযানগুলিকে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এই নেভিগেশন ক্যানাল দিয়ে। কম খরচে কয়লা, স্টীল কারখানায় উৎপাদিত মাল নিয়ে যাবার পরিকল্পনা ছিল। সত্তরের দশকে ট্রায়াল রান হয়েছিল। লঞ্চ, সারেং সবই ছিল কিন্তু সম্ভবত পরিকল্পনাগত ক্রটির কারণে কার্যকর হয়নি। দুর্গাপুরে নেভিগেশন সাব ডিভিসন আজও আছে। একজন সহবাস্তুকার, অবর সহবাস্তুকার, সুপারভাইজার, ক্লার্ক ইত্যাদি রয়েছেন কিন্তু কেন ব্যর্থ হল এই পরিকল্পনা তার উত্তর কর্তৃপক্ষ দিতে পারেননি।

দামোদরের এই বিপুল জলসম্পদ পরিকল্পনাগত ক্রুটি এবং কারখানা ও প্রশাসনের কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য আজ বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ বলছেন দুর্গাপুরে বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে বায়ু দূষণের কারণে হাঁপানির প্রবণতা বাড়ছে, তেমনি জলে মিশ্রিত অবস্থায় লেড, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, মার্কারী যৌগ বারে বারে গ্রহণ করার ফলে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে জণ্ডিস, কোষ্ঠবদ্ধতা, অ্যানিমিয়া, ক্রনিক আলসার, কিডনির রোগ, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়বিক দুর্বলতা, চর্মরোগ প্রভৃতিতে।

দুর্গাপুরের বড় বড় শিল্প কারখানার দূষিত ক্ষারিয় পদার্থ কোথাও সরাসরি কোথাও টামলা খাল দিয়ে এসে পড়ছে দামোদরে। শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরেছি, অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন সেচ দপ্তরের সহবাস্তুকার এস. এন. বোস, দুই এস. ও.- সুকুমার মজুমদার ও তরুণ সাহা এবং মহাদেব সাহা সময় দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, তথ্য দিয়ে। উখরার কাছে উৎপত্তি হয়ে পরিত্যক্ত এয়ার স্ট্রীপের পাশ দিয়ে মেন গেটের কাছ দিয়ে এ. এস. পি., ডি. টি. পি. এস., দুর্গাপুর কেমিক্যাল, ডি. পি. এল. হয়ে বাম ক্যানেলের তলা দিয়ে (সাইফন করে) পার হয়ে প্রায় সাড়ে ছ'মাইল পথ পাড়ি দিয়ে নিকাশি খাল টামলা ধবঘাটের কাছে খানায় গিয়ে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে। কেমিক্যালস্ কারখানার বর্জ্য পদার্থ পাইপ বাহিত হয়ে যেখানে টামলায় পড়ছে গ্রীষ্মকালে সেই সঙ্গম স্থলে দুর্গন্ধে দাঁড়ানো যায় না। এই নিকাশি খালের দেখভাল করেন সেচ দপ্তর। বর্ষায় মাঝে মাঝেই গরু ছাগল কুকুর মরা ভাসতে দেখা যায় এই টামলা খালে। মরা গরু তোলার খরচ নেহাৎ কম নয় অথচ এই টামলার সংস্কারের জন্য সেচ দপ্তরের কোন অ্যালটমেন্ট নেই। দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের ছাই জলের সঙ্গে মিশিয়ে দামোদরের পাড়ে অ্যাশ পন্ডে এসে পড়ছে। ব্যারেজের কাছে হারবার পন্ড থেকে শুরু হয়ে দামোদর নদীর পাশাপাশি ডি. পি. এল. কলোনীর পিছন দিক দিয়ে টামলা খালকে ডাইনে রেখে ২৬৫০০ ফুট লম্বা জল সরবরাহ খাল গিয়ে শেষ হচ্ছে ওয়ারিয়া স্টেশনের কাছে বৃহৎ জলাধারে। হঠাৎ কখনও জলের টান পড়লে দুর্গাপুর স্টীল প্রজেক্ট যাতে এই আপৎকালীন সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন সেজন্য তৈরী হয়েছে এই জলাধার। অঙ্গদপুর শিব মন্দিরের কাছে পানীয় জলের খাল কচুরিপানায় ভর্তি, বিভিন্ন জায়গায় দেখলাম বাঁধানো বা পাথর বসানো ঘাটে স্নান কাপড়কাচা চলছে। পিট ল্যাট্রিন, কলোনীর জল এসে পড়ার জন্য পাকা নালা, কোথাও বা

দেখলাম ঐ অপরিশোধিত জল দিয়ে তৈরী হচ্ছে চোলাই মদ। গাড়ী দেখে চোলাই কারখানার স্থানটি থেকে লোকজন ছুটে পালালেও সাহসিকতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতেও দেখা গেল বেশ কয়েকটি চোলাই ভাটিতে। আশীষনগর কলোনীর কাছে (১৩.৮ চেনে) পানীয় জলের খাল আর টামলা খাল পাশাপাশি চলেছে, কখনও কখনও টামলার দূষিত জল উপচে পানীয় জলের খালে পড়ে একথা খালপাড়ের বাসিন্দারা বলেছেন। পানীয় জলের খালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের। পানীয় জলের খালের পাশে, বামদিকের মেন ক্যানালের এমব্যাঙ্কমেন্ট বা ইনস্‌পেকসন পাথ বন্ধ করে গড়ে উঠেছে জবর দখল কলোনী, তাদের জন্য ডি. পি. এল. কলোনীর পিছনদিকে পাকা কল বসানো হয়েছে। ফার্টিলাইজার, গ্রাফাইট, ফিলিপস্ কার্বন, ভারত অপথ্যালমিক, ডি. এস. পি., ডি. টি. পি. এস., এ. এস. পি., এম. এ. এম. সি., প্রভৃতি সংস্থার প্রয়োজনীয় জল সংস্থার নিজ নিজ উদ্যোগে এই খাল থেকে তোলা হচ্ছে, আবার দুচারটি বাদে ঐ সব কারখানার বর্জ্যপদার্থযুক্ত দূষিত জল ফেলা হচ্ছে টামলায় বা দামোদরেতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পরিশোধন না করেই। ব্যারেজ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ডাউনে টামলা দামোদরে মিশলেও নিম্ন দামোদরের গাঁয়ের মানুষ ঐ দূষিত জল ব্যবহার করছে আর যখন বর্ধমান শহরে পৌঁছাচ্ছে তখনও ঐ জল প্রাকৃতিক কারণে শুদ্ধতা পাচ্ছে কি ?

ট্রাফিক জ্যাম এড়িয়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ দূরত্ব কমিয়ে ইনস্‌পেকসন পাথ ধরে এক সময় ডি. ভি. সি.-র অফিসাররা দুর্গাপুর থেকে বর্ধমানে যেতেন, এখন আর তা সম্ভব নয় — জবর দখল হয়ে গেছে এই পথ। যেহেতু কাটিং জোন, তাই ক্যানালের এই অংশ জলোচ্ছ্বাসে ভাঙবে না কিন্তু যেভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা, উগ্রপন্থীরা হামলা করছে তাদের পক্ষে এই সব অবৈধ আবাসস্থল কিছু ঘটাবার পক্ষে নির্ভরযোগ্য স্থান। সেচ খালের বাঁধের মাটি কেটে ঘর তৈরী হচ্ছে। মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া জলের পাইপ ফাটিয়ে জল নেওয়া হচ্ছে (রায়ডাঙ্গা) গাড়ী তো নয়ই হেঁটে গিয়েও দেখার উপায় নেই-এ অভিযোগ সেচ দপ্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের।

দুঃখের নদীকে বেঁধে যে সুখের নাব্যতা আনার কথা চিন্তা করা হয়েছিল, প্রশাসনিক দুর্বলতায়, সুদূরপ্রসারী চিন্তার অনুপস্থিতিতে তার সুফল আমরা হারাচ্ছি। আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে আগামী দিনে। ১৯৬১ সালে লন্ডনে একটি আইন করে চিকিৎসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে শিল্পাঞ্চলে দূষণজনিত কারণে যে সব রোগের প্রার্দুভাব ঘটবে সেগুলি চিফ্ ইনস্‌পেক্টর অব ফ্যাক্টরীজকে জানাতে হবে। দুর্গাপুরের পানীয় জলে ক্যাডমিয়াম, মার্করী, লেড, আর্সেনিক প্রভৃতির যৌগ মানবদেহে সহজভাবে গ্রহণীয় হার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে থাকছে বলে চিকিৎসকরা মন্তব্য করছেন যার জন্য এই এলাকায় জন্ডিস, কোষ্ঠবদ্ধতা, অ্যানিমিয়া, আলসার, স্নায়বিক দুর্বলতা, চর্মরোগ প্রভৃতি বাড়ছে কিন্তু এখানের চিকিৎসকরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেউ নোটিফায়েড অথরিটিকে তা জানাচ্ছেন কি? কিংবা এ. ডি. ডি. এ. বা ডি. এন. এ. কর্তৃপক্ষ কি এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে কোন উদ্যোগ নিয়েছেন? এ. ডি. ডি. এ. অফিসে 'জল দূষণের ওপর সাম্প্রতিক তথ্য' সংগ্রহের জন্য ৩/৪ দিন

ঘোরার পর জনৈক আধিকারিক একটি অসম্পূর্ণ তথ্য দিলেন, তাও বছর পাঁচেক আগের সমীক্ষা-তা আমার কাজে লাগলো না। পানীয় জলের খালের পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে দেখেছি জঙ্গল, আর গর্তে ভরা সে পথে দীর্ঘদিন কোন আধিকারিকের গাড়ী চলেনি বোধহয়, তাই অবৈধ মদ ভাটি, জবরদখল বসতি, গুল তৈরীর কারখানা তৈরী হয়েছে। প্রশাসন উদাসীন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দূষণের দায়ে যদি কোন কারখানা বন্ধ হয় তবে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে অনাহারে মরবে মানুষ, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে। পশ্চিমবাংলার গর্ব দুর্গাপুর আর দুর্গাপুরের সম্পদ দামোদর, তাকে ঘিরে সোনালী সম্ভাবনাময় ছোট বড় শিল্প কারখানা। সরকারী বা বেসরকারী যেই মালিক হোক না কেন তাকে আর আপামর জনগণকে সচেষ্ট হতে হবে দামোদরকে দূষণমুক্ত রাখতে। একের উপেক্ষায় অন্যকে সোচ্চার হতে হবে-তার জন্য আজ প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার, কঠোর প্রশাসন আর গণ আন্দোলন।

□ শারদীয় বর্ধমান সমাচার, ১৪০১ □
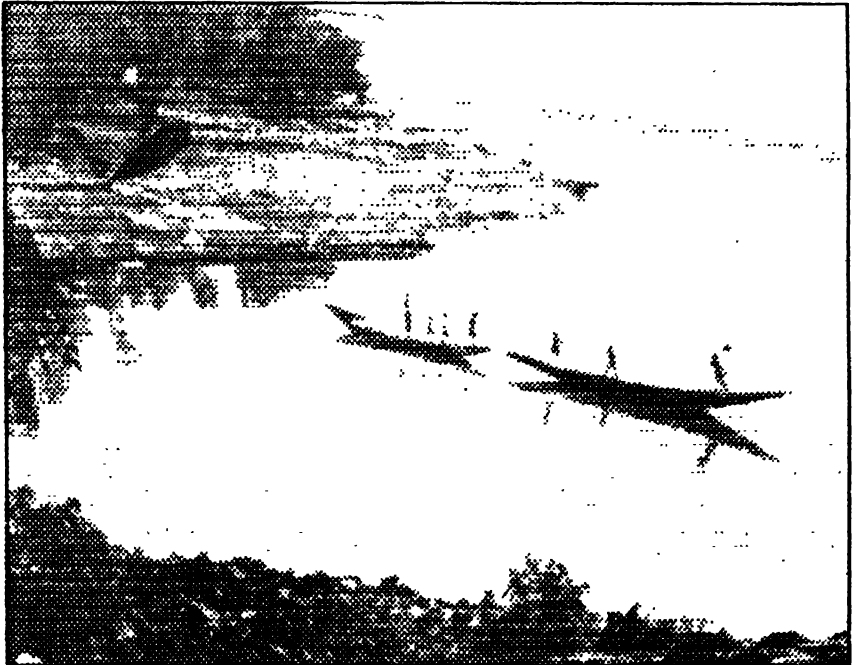
জেলার প্রান্তে দামোদর নদের একাংশ

বাঁকা নামে নদীটি

শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু নদীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?'' নদী সে কথার স্পষ্ট কোন উত্তর দেয়নি। প্রকৃতি বিজ্ঞানীর কবি মন কিন্তু নদীর কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে শুনতে পেয়েছিলেন, নদী যেন বলছে, ''মহাদেবের জটা হইতে।'' পৌরাণিক গল্পগাথা যাই হোক, মহাদেবের জটা যে হিমালয়ের তুষারমৌলি কোন শৃঙ্গ তা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। পতিতপাবনী গঙ্গার মর্তে আগমনের কাহিনী আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে। ভূগোলের অন্যান্য সংজ্ঞা নিয়ে যতই হিমসিম খাই না কেন আমরা, নদীর সংজ্ঞা আমাদের জানা। ''পাহাড় বা পর্বত হইতে বাহির হইয়া, সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যে জলস্রোত অন্য কোন নদী, হ্রদ বা সাগরে পতিত হয় তাহাকে নদী বলে।'' নদী নানা রকমের। বর্ধমান জংশনে ট্রেন ঢোকার আগে যে ঘুমভাঙানিয়া সেতুর কাছে এসে প্রায়ই লালচক্ষু দেখে ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়, সেখানে রেলকোম্পানীর একটা সাইন বোর্ডে লেখা আছে 'বাঁকা নালা।' নদী তো নয়ই, খাল নয় বিল নয় নেহাৎই ''নালা''। যাঁরা বাঁকা নালাকে 'নদী' বলে ডাকেন যেন তাদের অজ্ঞানতাকে বিদ্রূপ করার জন্যই ঐ সাইনবোর্ডটি ওখানে টাঙানো হয়েছে।
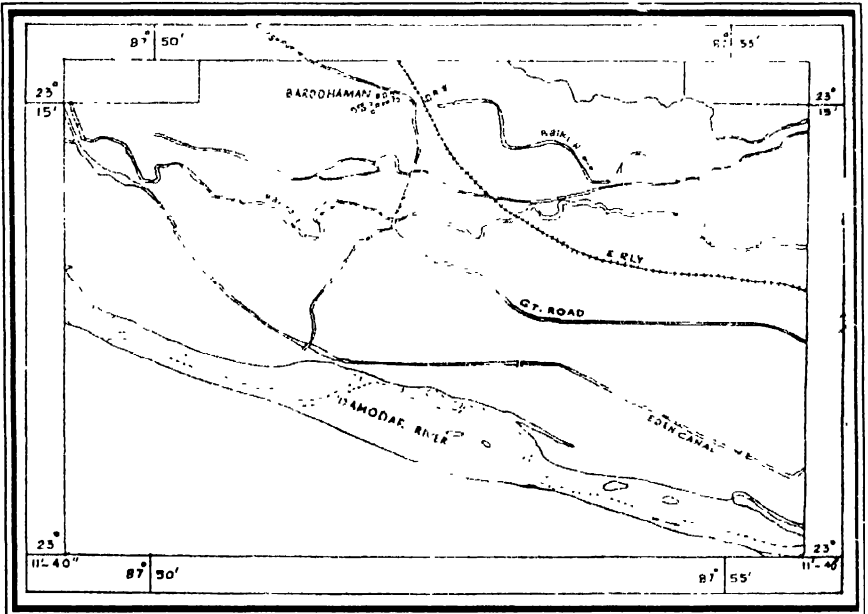
বিদ্রূপের কথা থাক। বাঁকা নদী না নালা সে বিতর্কও তোলা থাক মনের কুলুঙ্গীতে, আমরা একে বাঁকা বলেই ডাকব। বর্ধমানের লোক একবাক্যে বাঁকা বলেই সম্বোধন করে। বাঁকার সঙ্গে নদী শব্দটা যোগ করে দেওয়ার মধ্যে অজ্ঞানতা না ভালোবাসা প্রকাশ পায় মনস্তত্ত্ববিদরা তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করুন। ইতিমধ্যে আমরা খোঁজ নেবার চেষ্টা করি এই জলধারাটি কোথা থেকে বেরিয়েছে, কোথায় পড়েছে এবং বর্ধমানের মানুষের সঙ্গে এর নাড়ীর যোগ কতটা। সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে নদীর তীর বরাবর। গ্রীস, মিশর, মেসোপটিমিয়া, চীন, সিন্ধুসভ্যতা -- প্রাচীন সবকটি সভ্যতার জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বাঁকা নদীর কোন কৌলীন্য নেই, বাঁকার তীরে কোন সভ্যতাও গড়ে ওঠেনি, তবুও সে স্রোতস্বিনীতো, মানুষের ঘর গেরস্থালী গড়ে উঠেছে বাঁকার উভয়তীর বরাবর, অনিবার্য কারণেই, আমরা আগেই বলেছি যে বাঁকা কোন কুলীন নদী নয়। হিমালয় বা ছোটনাগপুরের পর্বতমালা থেকে বরফগলা জল বা বৃষ্টির জল বুকে নিয়ে সে প্রবাহিত হচ্ছে না। বর্ধমান শহর থেকে জি টি রোড ধরে নাক বরাবর পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেলে রামগোপালপুর গ্রামের সাইনবোর্ড দেখা যাবে গলসীর কাছাকাছি জায়গায়। সোজা বাঁদিক বরাবর তিনচার কিলোমিটার পথ রামগোপালপুরের। ঐ গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমের একটা মাঠ থেকে, বস্তুত একটা জলা থেকে বাঁকার জন্ম। মহাভারতের অর্জুন না অন্য কেউ, ভীষ্ম বা অন্য কোন গুরুজনকে মৃত্যুকালে বাণ মেরে ধরিত্রীর বুক চিরে জলের অমৃতধারা বের করেছিলেন কিনা আমরা জানি না। শুধু জানি বাঁকা বর্ষাতি নদী নয়। অর্থাৎ কাঁদর নয়। সারা বছর তার বুকে জল থাকে। কখনও সে শুকিয়ে যায় না একেবারে। সে যাই হোক ঐ জলামাঠ থেকে বেরিয়ে বাঁকা চঞ্চলা কিশোরীর মত সেই যে ছুট দিয়েছে এঁকেবেঁকে আর তাকে ঘরে ফেরানো যায় নি। কোন্ স্রোতস্বিনীকেই বা যায়। যে একবার ঘর ছাড়ে সে কি আর ঘরে ফেরে? এঁকে-বেঁকে পথ কেটে গ্রাম ছেড়ে সে শহরে ঢুকেছে। তাই সে বাঁকা। ঐ যে অনেকসময় হয় না- মেয়ের নাম রাখা হল খেঁদি, তখন সে খুব ছোট। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যখন রূপসী হোল বাড়ীর লোকজন ভুলেই গেল একটা মানানসই নাম রাখতে। বাঁকার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সে এঁকে-বেঁকে চলে, কোন্ নদীই বা সোজাপথ ধরে। তাই বলে কি একটা ভালো নাম রাখা যেত না। আমার মনে হয় বাঁকাকে নদী বলে কেউ গ্রাহ্যই করেনি। তাছাড়া বাঁকা বয়ে যেত গ্রাম থেকে একটু দূর দিয়ে--মাঠের মধ্য দিয়ে। এই মানুষজনেরাও খুব কল্পনাপ্রবণ বা কবিতাবিলাসী ছিলেন না। তাই যদি হোত, যদি এ নদীর নাম হত, রূপসী কিবং ইচ্ছামতী, ময়না কিংবা তটিনী জীবনানন্দ দাসের। বাঁকাকে নিয়েই কবিতা লিখতেন। বাঁকাকে নিয়ে কেউ ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো না। আসামের ধানসিঁড়ি এমন কিছু বড় নদী নয় -- তবুও জীবননান্দ লিখলেন, "আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে।" ধানসিঁড়ি বিখ্যাত হয়ে গেল। বেহুলা নদীর খাত তখন লুপ্ত স্মৃতি, তবুও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী যতদিন স্মৃতির বয়সী থাকবে বেহুলাও বেঁচে থাকবে।

বাঁকানদীর তীরে কেউ ফিরে আসার জন্য আকুল হয় না। নাম মাহাত্ম্য বলেও একটা কথা আছে। বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে কাঞ্চননগরের কাছে বাঁকা বর্ধমানে ঢুকেছে।

তারপর রথতলাকে ডানপাশে রেখে, মহন্ত অস্থলের গা ঘেঁসে নির্মলঝিল শ্মশান ছুঁয়ে আলমগঞ্জ, সর্বমঙ্গলা ও বীরহাটার ব্রীজের নীচে দিয়ে কালনা গেটে রেলব্রীজের নীচে দিয়ে সংগোপনে আবার এঁকে-বেঁকে চলে গেছে লোকালয় থেকে দূরে, সবুজ ধানক্ষেতের বুক চিরে রসুলপুর মেমারি হয়ে, নাদনঘাট, কালনা মহকুমাকে ছুঁয়ে ধাত্রীগ্রামের কাছে। এই যাত্রাপথ খুব সোজা নয়, খুব কম দীর্ঘ নয়। সব মিলিয়ে একশ কিলোমিটারের বেশী ছাড়া কম হবে না।

এবার দেখা যাক বর্ধমান শহরের সঙ্গে বাঁকার সম্পর্ক কত প্রাচীন এবং কতখানি নিবিড়। নদী বিশেষজ্ঞরা বলেন যে দামোদরের প্রাচীন একটি খাত মজে গিয়ে আজকের বাঁকা হয়েছে। হয়তো কথাটা সত্যি, হয়তো নয়। তবে হতে পারে। কারণ নদী দিক পরিবর্তন করে, পাশ ফিরে শোয়। এখন যেমন পদ্মানদী জলঙ্গী শহরটাকে নিজের বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু যদি দামোদরেরই প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন হবে তাহলে নাম 'বাঁকা' কেন? এইসব কুটকচালী ছেড়ে আমরা বাঁকার কথায় ফিরে আসি। একদা বর্ধমানের প্রসিদ্ধ রাজপরিবারের আদি বসতি গড়ে উঠেছিল কাঞ্চননগরে। তখন ডিভিসি ক্যানেল হয়নি। দামোদর ও বাঁকা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। পাগলা দামোদরকে তখনও বশ মানানো যায় নি। ফি বছর বন্যা হত। কাঞ্চননগরের রাজপরিবারকে অতিষ্ঠ করে দেয় বন্যার প্লাবনের মত্ততা। শুধু দামোদর নয় বাঁকাও যোগ দিত এই খেলায়। শেষ পর্যন্ত দোর্দণ্ড-প্রতাপ রাজপরিবারকে উঠে আসতে হয় বাঁকানদী পেরিয়ে শহরের অভ্যন্তরে। ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়। এখন দামোদরকে পোষ মানানো গেছে, বাঁকা এখনও খেয়ালী। তার শরীর জুড়ে অনাবিল বন্যতা রয়ে গেছে। এখনও, কোন কোন বছর বাঁকা অভিমানী হয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে, ভাসিয়ে দেয় দু-কূল। বর্ষায় বাঁকার রূপ খোলে। সেই রূপ দেখতে গেলে আপনাকে যেতে হবে শহর থেকে একটু দূরে, কাঞ্চননগর রথতলায় অথবা রসুলপুরের মাঠে। অথবা মন্তেশ্বর ধাত্রীগ্রামে। বর্ধমান শহরের বুক চিরে যে বাঁকা প্রবাহিত—তাকে ধাপার খাল বানিয়েছি আমরা। বাঁকার আসল রূপ এটা নয়। রামগোপালপুর থেকে কাঞ্চননগর পর্যন্ত বাঁকার জল পরিষ্কার, ছেলেরা সাঁতার কাটে, দু'চারখানা নৌকাও বাঁধা আছে ঘাটে ঘাটে। বর্ধমান শহরকে আজ থেকে এক শতাব্দী আগে থাকতেই পানীয় জলের যোগান দিত বাঁকা। বাঁকা তাই এই শহরের প্রাণদাত্রী। আজও লাকুড্ডির জলকল বাঁকার জলই পরিশুদ্ধ করে শহরে যোগান দেয়।

বাঁকা তীরেই গড়ে উঠেছে মহন্ত অস্থল। নির্মলঝিল শ্মশান। গঙ্গায় স্নান করার পুণ্য সঞ্চয় করি বাঁকায় স্নান করে কারণ বাঁকা গঙ্গাতেই লীন হয়েছে ধাত্রীগ্রামের কাছে। শের আফগানের সমাধি ক্ষেত্রে, শিশুদের পার্ক, সর্বমঙ্গলা মন্দির বর্ধমানের প্রসিদ্ধ অনেক কিছুই গড়ে উঠেছে বাঁকার উত্তর তীরে। বাঁকা পূর্বগামিনী। তার দক্ষিণ তীর বরাবর গড়ে উঠেছে চালমিলগুলি। এবং বসতি, এই শহরের যা কিছু ময়লা, দূষিত জল-তার বেশিরভাগটাই বহন করে বাঁকা। তবুও তারই তীরে তীরে অপর্ণা ঘাট, গড়গড়াঘাট তৈরী হয়েছে। শহরের সার্কাস বসে বাঁকার মাঠে। কতরকমের মেলা বসে বাঁকার পলি দিয়ে গঠিত সবুজ মাঠে। দামোদরের তীরে এ রকম গর্ব করার মত কিছু নেই।

বাঁকার রূপ খুলেছে আবার যখন সে শহর ছেড়েছে। ধাত্রীগ্রামের কাছে গিয়ে সে মিলিত হয়েছে জি টি রোডের উত্তর দিক দিয়ে বয়ে যাওয়া খড়ি নদীর সঙ্গে। খড়ির সঙ্গে বাঁকার প্রচুর মিল। যেন দুই সহোদরা। দুজনেই উপেক্ষিতা। ধাত্রীগ্রামের কাছে যেখানে ওরা মিলিত হয়েছে সেখানকার সৌন্দর্য অপরূপ। ছবির নদীর মত। তারপর তারা একসঙ্গে মিলেমিশে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমাদের ছোটনদী চলে আঁকে বাঁকে"-- পড়তে পড়তে বাঁকার কথা মনে পড়ে আমার, অন্যদের কথা বলতে পারব না।

পুনশ্চ বাঁকা পাড়ের মানুষদের কথা না বললে বাঁকানদীর কথকতা শেষ হতে পারে না। বর্ধমান শহরে একটা চলতি কথা আছে-বাঁকা পারের মানুষ। দেশবিভাগের পর ছিন্নমূল মানুষেরা এসে বর্ধমান শহরে প্রথম বন কেটে বসত করেন রথতলায় বাঁকার পারে। পরে ক্রমে ক্রমে নীলপুর, ইছলাবাদ, শিয়ালডাঙায়। বাঁকাকে পেয়ে নদীর দুঃখ ভুলেছেন এরা। অনেকদিন থেকেই এরা বর্ধমানে আসেন বাঁকা পেরিয়ে। বাঁকার পারে রথতলার মাঠে একদা রাজারাণীর রথ বেরত। মেলা বসত জাঁকজমিয়ে। সেই কাঠের রথ এখন নেই। তবুও প্রতিবছর এখানে রথ টানা হয়। মেলা বসে। হাজার হাজার শহুরে মানুষ বাঁকা পেরিয়ে মেলায় যান বিকিকিনি করতে, নাগরদোলায় চাপতে।

পূজা-পার্বণে, সংক্রান্তিতে বাঁকা স্নান করেন অনেকে। পদ্মাপারের সাবেকী মানুষজনের বাঁকাতে মন ওঠে না, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা বর্ষার বাঁকাতেই সাঁতার শেখে, মেয়েরা কলসী ভাসিয়ে বুক ডোবায় বাঁকার জলে। প্রকৃতি মানুষের মত নিষ্ঠুরও নয়, হিসেবীও নয়, নাক উঁচুও নয়। তাই শরৎকালে রোদ্দুরের রঙে যখন সোনালী আভা ফোটে, বাঁকা নদীর উভয়তীর কাশফুলের সমারোহে মেতে ওঠে। পালসিটের কাছে বাঁশের ঝাড় পাতা ঝরায় বাঁকার জলে। ধাত্রীগ্রামের কাছে আম জাম কাঁঠাল গাছ ছায়া বিছায় বাঁকার বিস্তার জুড়ে।

শহর বর্ধমান বাঁকাকে মর্যাদা দেয় নি। প্রতিদিন তাকে দূষিত করছি আমরা। যেমন অমল গ্রাম্য বালিকা শহরে এসে তার অমলতা হারিয়ে ফেলে বাঁকাও রথতলা ফেলে এসে শহরে ঢুকে মলিনা হয়েছে। এ দোষ আমাদের। অভিমানী কিশোরীকে যেমন, বাঁকাকেও তেমন বলা দরকার তোমরা অমলিন আছ, মলিনতা যা কিছু আমাদেরই।

নদীর কথা ফুরোয় না। আপাতত এই ।।

□ শারদীয় বর্ধমান সমাচার, ১৪০১ □

বিলুপ্ত নদী সিঙ্গটীয়া

মহম্মদ আয়ুব হোসেন

অতি প্রাচীনকালে বাংলার পশ্চিমাংশ বিভিন্ন নদ-নদী দ্বারা বিধৌত ছিল। এইসব নদ-নদীগুলির অনেক এখন মজে গেছে; কিছু প্রায় বিলুপ্তির পথে। সুপ্রাচীনকালে আদিম মানুষেরা পর্বত গুহা হতে জলের সন্ধানে এইসব নদ-নদীর উৎস হতে মোহনার দিকে চলে এসেছিল। পরবর্তীকালে এদের বংশধরেরা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এইসব নদীতীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এই বসতি স্থাপন একদিনে হয়নি। বন জঙ্গল কেটে, হিংস্র জন্তুকে বধ করে, বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজেদের জীবনে সহ্য করে, এইসব মানুষেরা স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ জীবনযাপনের চেষ্টা করেছিল। বাংলার পশ্চিমাংশের অজয়, কুনুর, কোপাই, দামোদর, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষী, কপিশা, সুবর্ণরেখা, সিঙ্গটিয়া, খড়ি, বেহুলা, ভল্লুকা, মইয়া, সাঁপজলা, ভাগীরথী প্রভৃতি নদীতীরে এইসব প্রাচীন যুগের মনুষ্য বসতির কিছু কিছু নিদর্শন খোঁজ খবর করলে পাওয়া যাবে। এইসব নদী তীরে যেসব আদিম মনুষ্য বংশধরেরা বসবাস করতো তাঁরা আবার বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল যথা নিষাদ, কিরাত, অস্ট্রিক, শবর, পুলন্দ, মুণ্ডারী প্রভৃতি। পূর্ব-ভারত তথা বাংলার পশ্চিমাংশে এই মনুষ্য বসতি এবং তাঁদের সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন বুকে নিয়ে অনেক নদী আজ প্রায় বিলুপ্তির মধ্যে। এমনি একটি নদী "সিঙ্গটিয়া"। এই প্রবন্ধে এই নদী এবং তীরবর্তী প্রাচীনসভ্যতা ও কয়েকটি প্রাচীন গ্রাম সম্পর্কে কিছু আলোচিত হলে।

স্বদেশকে জানার জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য গ্রামের পর গ্রাম পদযাত্রা করেছি। গত পূজার ছুটিতে (বাং ১৩৮৩) এই উদ্দেশ্যে এবং মদীয় গুরুদেব ড. শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন মহাশয়কে দর্শনের ইচ্ছায় পদযাত্রা করে আমি স্বগ্রাম রাজুয়া (থানা কাটোয়া, জেলা বর্ধমান) হতে গুরুগৃহ কুড়মিঠা (থানা ইলামবাজার, জেলা বীরভূম) গিয়েছিলাম। এইসময় সিঙ্গটিয়া নদীর সন্ধান পাই। নদীটির বর্তমান উৎসস্থল হল তিলুটিয়া গ্রামের মাঠ (থানা নানুর, জেলা বীরভূম)। নদীটি তিলুটিয়ার মাঠ হতে বেরিয়ে উভয় পার্শ্বে যেসব গ্রাম পরিক্রমা করেছে তা হল তিলুটিয়া, চণ্ডিপুর, বড়া, দাতিনা, বেলুটি, ফতেপুর, ডোংরা, বল্লভপুর, মনিগ্রাম, উদয়পুর (কুমিরা), রয়ান, চারকলাগ্রাম, নানুর চণ্ডিদাস, উচকরণ, পাকুড়হাস, সেরান্দি, শাঁখরা বন্দর, বেলে, বালাশের, (এইসব গ্রামগুলির থানা নানুর, জেলা বীরভূম, এরপর বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার গ্রাম রতনপুর, পেঁয়ো, খাসপুর, তিলডাঙ্গা, পালিটা, দধিয়া-বৈরাগ্যতলা, কাঁচড়া, কুলুন, মালুন, কুলাই, পাণ্ডুগ্রাম, খাটুন্দী, খেরাই, বান্দ্রা, গুড়পাড়া, হাটপাড়া, কৌড়ি, কোপা, ভুলকুড়ি, দক্ষিণডিহি, মালিহা, কোমডাঙ্গা, তৈপুর, অট্টহাস, কেতুগ্রাম, অম্বলগ্রাম, বন্দর, গোমাই, কাকুড়হাটি, শিবলুন, গঙ্গাটিকুরী, বালুটিয়া, যারুলিয়া, রাউন্দি, মুরুন্দী, জলসোথী প্রভৃতি। গ্রাম পরিক্রমার পর গঙ্গাটিকুরীর পূর্বে অজয়-ভাগীরথী সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে শাখাই গ্রামের পশ্চিমে অজয়ে মিশেছে। এখন স্থানীয় লোকদের নিকট এটি বড় কান্দর

নামে পরিচিত। কেউ কেউ একে "ঈশানী" ও "বকুলা" নদী বলে থাকেন। দুটি উপনদী এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। একটি বীরভূমের কোপাই অববাহিকা হতে বেরিয়ে এসে খাটুন্দীর নিচে মাসুন্দী পেরিয়ে এসে এই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অন্যটি নারেঙ্গা গ্রামের নিকট হতে অজয় নদীর চাঁদখালীর দহ হতে বেরিয়ে এসে খাটুন্দীর নিচে এই নদীতে মিশেছে। সম্ভবত অতি প্রাচীনকালে সিঙ্গটিয়া নদীটি কোপাই নদীর শাখা ছিল। এইভাবে তিন দিকের জলধারা বহনের জন্য নদীটি একসময়ে নাব্য ছিল। আমি পদযাত্রায় নিরীক্ষণ করেছি যে নদীটির বর্তমান বক্ষ পূর্বে খুব চওড়া ছিল। এখনও দেখে নদী বক্ষের মত মনে হয়। এখন এই নিচু জায়গাগুলি ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

অজয় এবং কোপাই নদীর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য অতি প্রাচীনকালে এই সিঙ্গটিয়া নদী তটের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রাক্ ইতিহাস যুগে। যার নিদর্শন এখনও পাওয়া যাবে বেলুটি ফতেপুরে, বল্লভপুরে, চণ্ডিদাস নানুরে, কাঁচড়া-শান্তিপুরে এবং কেতুগ্রামে।

বেলুটি ফতেপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। সিঙ্গটিয়া নদীর দক্ষিণ পূর্ব তটে এর অবস্থান। গ্রামের লোকের ধারণা মহাকবি কালিদাস এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানে একটা উঁচু ডাঙ্গাকে লোকে কালিদাসের ভিটে বলে। সন্নিকটে একটি উচ্চবিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। তার সঙ্গে কালিদাসের নাম যুক্ত। ভিটের দক্ষিণে বিখ্যাত 'সরস্বতীকুণ্ড'। স্থানীয় কিংবদন্তী যে এই কুণ্ডে আত্মহত্যা করতে এসে কালিদাস সরস্বতীর কৃপালাভ করেছিলেন। কুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত আধুনিককালের এক মন্দিরে কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি আছে। সেগুলি খুবই প্রাচীন বলে মনে হল। কালিদাসের ভিটের মধ্যে এবং চারিপাশে কিছু প্রত্ন-দ্রব্য পড়ে আছে। তন্মধ্যে এক প্রকার জমাট দ্রব্য দেখা যায়। এগুলি সম্ভবত লৌহ বা অনুরূপ ধাতু গলানোর গাদ। অনুরূপ দ্রব্য, উজানি মঙ্গলকোটে, পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়েছে। ঢিবিটির মধ্যে বহু প্রত্ন-দ্রব্য লুক্কায়িত আছে বলে মনে হয়। আমি এখানে তাম্রাশ্মীয় যুগের একটি মাটির পাত্রের ভগ্নাবশেষ পেয়েছি। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্থানটি কেটে নষ্ট করে দিচ্ছেন।

বল্লভপুর নামক স্থানটি হল বেলুটি ফতেপুরের উত্তরে, নদীটির উত্তর তটে অবস্থিত। এই নামে মৌজা আছে কোন গ্রাম নাই। তবে এ-নামে গ্রাম পূর্বে ছিল। কারণ স্থানটিতে মনুষ্য বসতির চিহ্ন দেখা যায়। এখানেও প্রাচীন মনুষ্য বসতির চিহ্ন আছে।

চণ্ডিদাস নানুর মহাকবি চণ্ডিদাসের স্মৃতি বুকে নিয়ে এখন বিখ্যাত। সিঙ্গটিয়া নদীর উত্তর তটে স্থানটির অবস্থান। বেলুটিতে যেমন কালিদাসের ভিটে আছে, নানুরে তেমনি চণ্ডিদাসের ভিটে আছে। চণ্ডিদাসের ভিটেটি কালিদাসের চেয়ে অনেক প্রাচীন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভিটের অংশ বিশেষ খনিত হয়েছিল। খননকালে যেসব প্রত্ন দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে তা হল (১) পোড়া মাটির একটি স্ত্রী মূর্তির মস্তক (খ্রী. ৩-৪ শতক) (২) পোড়া মাটির নারী মূর্তির নিম্নাঙ্গ একটি (গুপ্ত পরবর্তী যুগ), (৩) খেলনা, ষাঁড়, ঘোড়া, প্রদীপ প্রভৃতি। এছাড়াও এখানে আছে একটি কাঠের বালিশ। স্থানটি ভালভাবে খনিত হলে আরও অনেক প্রত্ন-দ্রব্যের

সন্ধান মিলবে। আদিম মানুষদের বংশধরেরা যে এখানে বসবাস করতো তার নিদর্শন যেমন মাটির নিচে সুপ্ত আছে, তেমনি স্থানীয় তপশীল জাতিদের মধ্যে নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আদিম যুগের কিছু কিছু স্মৃতি রয়ে গেছে।

কাচড়া-শান্তিপুর গ্রামটির অবস্থান এই নদীর উত্তর তটে। থানা কেতুগ্রাম, জেলা বর্ধমান। গ্রামটির দক্ষিণে এবং নদীর উত্তরে একটি ডাঙা জায়গায় এবং সংলগ্ন চাষের জমিতে প্রচুর পোড়ামাটির পাত্র পড়ে আছে। এর মধ্যে তাম্রাশ্মীয় যুগের কিছু লাল কালো ভগ্ন মৃৎ পাত্রের সন্ধান আমি পেয়েছি। ডাঙাটির একটু পূর্বে বর্তমান কৃষি জমিতে পাতকুয়া দেখা যায়। জমির বর্তমান মালিক এখান হতে নানারকম ধাতু দ্রব্য পেয়েছেন বলে শোনা গেল। এখানের মত অনুরূপ পাতকুয়ো উজানি মঙ্গলকোটে দেখা যায়। স্থানটি অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। স্থানটির আরও ভালভাবে অনুসন্ধান প্রয়োজন। স্থানটির সন্নিকটে দধিয়া বৈরাগ্যতলা নামক একটি বৈষ্ণব পীঠস্থান অবস্থিত। এখানে শ্রীল গোপাল দাস বাবাজীর সাধন ভজন ও সমাধিস্থল। প্রতি বৎসর মাকুড়ী সপ্তমীর দিনে এখানে বিরাট মেলা বসে।

শ্রীপাট কুলাই একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট। এখানে পদাবলীকার বাসুদেব ঘোষের জন্মস্থান। শ্রী চৈতন্যদেব রাঢ় দেশ পরিভ্রমণের সময় এখানে এসেছিলেন। গ্রামটি নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত।

পালিটা গ্রামটি নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। পূর্ব নাম পালধি। ছাপান্ন গাঁঞির অন্যতম গাঁঞি। কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ পুত্র রাম এই শাসন গ্রাম লাভ করেছিলেন তৎকালীন রাঢ়া ধীশের নিকট হতে। এই গ্রাম হতে পালধি গাঁঞির উদ্ভব। এই গ্রামে সুলতানী আমলের প্রাচীন মসজিদ ও অন্যান্য নিদর্শনাদি দেখা যায়।

পাণ্ডুগ্রাম ও খাটুন্দী দুটি গ্রাম পাশাপাশি এবং বেশ বড় গ্রাম। পাণ্ডুগ্রামে পূর্বে সংস্কৃত চর্চা হত। পাণ্ডু নাম নাকি পঞ্চপাণ্ডবের নামের সঙ্গে যুক্ত বলে কিংবদন্তী। খাটুন্দী গ্রামে পূর্বে সংস্কৃত চর্চা হতে। নবদ্বীপ হতে স্থানটি একটু খাটো ছিল। তাই এর নাম ছিল "খাটো নদীয়া" এই নাম হতে খাটুন্দী নামের উদ্ভব। গ্রাম দুটি নদীর উত্তরে অবস্থিত।

অট্টহাস কেতুগ্রাম অট্টহাস একটি তপোবনসদৃশ জঙ্গল এখানে দক্ষকন্যা শিবপত্নী সতীর ওষ্ঠ পড়ে ছিল। তাই স্থানটির নাম অট্টহাস। দেবীর নাম ফুল্লরা। ভৈরব বিশ্বনাথ।

কেতুগ্রাম অতি প্রাচীন গ্রাম। পুরাতন নাম বহুলা। নদীতীরে 'রণখণ্ড'। এখানে দক্ষকন্যা সতীর বামবাহু পতিত হয়েছিল। দেবী বহুলাক্ষ্মী, ভৈরব ভীরুক। গ্রামটি খুব প্রাচীন। গ্রাম মধ্যে রাজার ডাঙ্গায় তাম্রাশ্মীয় যুগের মৃৎ পাত্র পাওয়া যায়। এখানে বিখ্যাত কবি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচয়িতা চণ্ডিদাসের জন্মস্থান।

অম্বলগ্রাম বালুটীয়া বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামদুটি খুব প্রাচীন। বাংলার সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেনের মা বিলাসীদেবী কোন এক সূর্য গ্রহণের দিনে গঙ্গা স্নান করে ও বাসুদেব নামক এক সামবেদীয় ব্রাহ্মণকে হেমাশ্ব দান করে দক্ষিণাস্বরূপ বাল্যহিট্টা গ্রাম দান করেছিলেন। এই বাল্যহিট্টা গ্রামের চারিপাশের গ্রামের নাম হল নাড়ডিন, অম্বয়িল্লা, খণ্ডয়িল্লা, জলসোথী, মুরুনন্দী প্রভৃতি। এইসব গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হত। নাম সিঙ্গটিয়া। এসব কথা লিপিবদ্ধ আছে বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে। এই নৈহাটী গ্রাম কেতুগ্রাম থানায় অবস্থিত।

প্রাচীন সভ্যতা একদা যে নদীতটে গড়ে উঠেছিল, যার নাম বল্লালসেনের তাম্রশাসনে, উৎকীর্ণ; সেই নদী আজ সামান্য কাঁন্দরে পর্যবসিত হয়েছে। এরপর হয়তো জল নালী হয়ে থাকবে। আমি এদিকে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

□ শারদীয় বর্ধমানের ডাক, ১৩৮৪ □
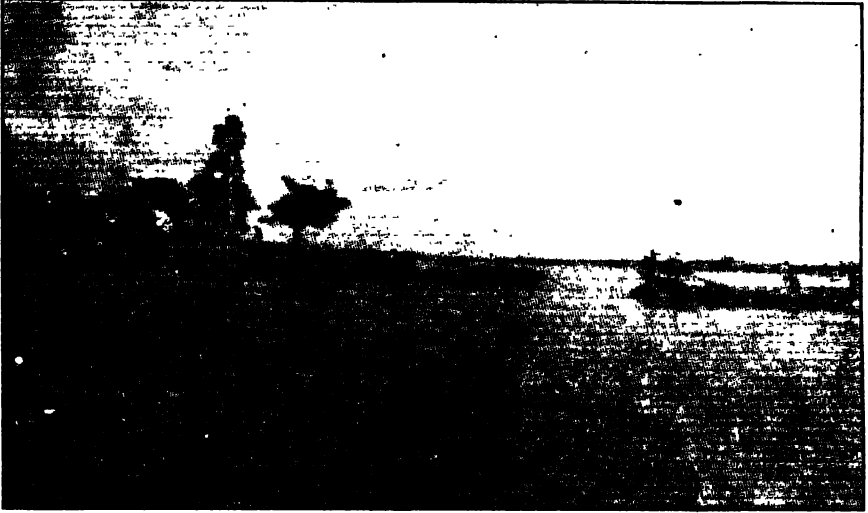
অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল

রাণীগঞ্জ নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর

সজল চট্টোপাধ্যায়

নদী বা পাহাড়-পর্বতমালা বহু অঞ্চলেরই স্বাভাবিক সীমারেখা হিসাবে গণ্য থাকে। শাসনকার্যের সুবিধা বা রাজনৈতিক অজুহাতে এই স্বাভাবিকতাকে প্রায়ই লঙ্ঘন করা হয় বলেই সড়ক, রেলপথ এমন কি কৃত্রিমভাবে চিহ্নিত মৌজা, গ্রাম প্রভৃতিকেও নানা অঞ্চলের বিভাজক রেখা রূপে বর্তমানে গণ্য করা হয়েছে। বর্ধমান জেলার সাম্প্রতিক মানচিত্র দেখলে অনুমান করাই যাবে না যে, এ অঞ্চলের প্রাচীনতম শহর রাণীগঞ্জকে (২৩°৩৬′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭°৬′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) কেন্দ্র করে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে যে রাণীগঞ্জ মহকুমা (৫৩২ বর্গমাইল) গঠিত হয়েছিল তার তিনদিকই চিহ্নিত ছিল নদ-নদী দিয়ে—উত্তরে অজয় নদ, দক্ষিণে দামোদর নদ ও পশ্চিমে বরাকর নদীই ছিল এই সীমারেখা। পূর্বদিকে কোনও বড় নদনদী না থাকলেও খড়ি, কুকুয়া ও পঞ্চগঙ্গা প্রভৃতি মাঝারি ও ছোট উপনদীগুলির উৎপত্তিস্থল বহুলাংশে রাণীগঞ্জ মহকুমার পূর্ব প্রান্তকে ঘিরে রেখেছিল।

সে যাই হোক, রাণীগঞ্জ থানার বর্তমান সীমা এবং সংলগ্ন অঞ্চলের মধ্যে যে তিনটি নদী প্রবাহিত, রাণীগঞ্জের জলপথ সম্বন্ধীয় আলোচনা সেগুলি নিয়েই করা সমীচীন। জলপথ তিনটি হল —

(১) দামোদর নদ

(২) নুনিয়া নদী

(৩) সিঙ্গরাণি বা সিঙ্গারণ নদী

নদনদীগুলি বর্ণনা করার আগে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। প্রথমত রাণীগঞ্জ থানা মুখ্যত দামোদর অববাহিকায় অবস্থিত হলেও দক্ষিণাংশের ঢাল পূর্বমুখী হওয়ায় এই অঞ্চলটি কুনুর নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। উল্লেখ্য কুনুর অজয়ের প্রধান উপনদী এবং সেইজন্য এই দক্ষিণাঞ্চলকে অজয়ের অববাহিকায় অবস্থিত বলাই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয় সিঙ্গারণ ও নুনিয়া দামোদরেরই উপনদী। তবে বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ায় এবং এই অববাহিকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়ায় উপরোক্ত উপনদী দুটিতে জলপ্রবাহ বহুলাংশে কমে গেছে। তাছাড়া পলি সঞ্চয় এবং গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ও রেলপথ নির্মাণের ফলে জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় গ্রীষ্মকালে নদী দুটি অনেক জায়গায় প্রায় শুকিয়েই যায়। অথচ একসময়ে নুনিয়া ছিল দামোদরের অন্যতম প্রধান উপনদী, যে জন্য একটি প্রবাদ এখনও প্রচলিত আছে

ক্ষুদে, নুনে, বরাকর —
তিন নিয়ে দামোদর।

দামোদর নদ

দামোদর নদ বিহারের ছোটনাগপুরের পালাখেট জেলার ঘুড়ি রেল স্টেশনের কয়েক মাইল পশ্চিমে টোরির নিকটে ৩৫০৪ ফুট (১০৬৭ মি.) উঁচু খামারপাৎ পাহাড় (২৩°৩৭′ উত্তর

অক্ষাংশ ও ৮৪°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) থেকে উৎপন্ন। যে প্রধান ঝরনা থেকে দামোদরের উৎপত্তি তার নাম সোনাসাথী। খামারপাৎ ও বীরজংগা পাহাড় দুটি বৃষ্টির জলে সৃষ্ট বলে এই ঝরনা সোনা জুড়ি বা সোনা জুড়িয়া নামে পরিচিত। উৎপত্তিস্থলে এই নদের স্থানীয় নাম--'দেওনদ'--ধর্মমঙ্গলে এটি অবশ্য দেবনদ নামে উল্লেখিত। হাজারিবাগ জেলার ১০০০ ফুট উচ্চ উপত্যকাতে প্রবেশ করার পর দেওনদ 'দামোদর' নদ নামে পরিচিত হয়েছে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত এই নদের দৈর্ঘ্য ৫৪১ কি.মি. (মতান্তরে ৩৭০ মাইল -- বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা — কপিল ভট্টাচার্য, পৃ.-৭১ এবং ৩৫০ মাইল-Bengal District Gazetteers, Burdwan, J. C. K. Peterson, p-8)। এর মধ্যে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অংশ যথাক্রমে ২৮৭ কি.মি. ও ২৫৪ কি.মি.। দামোদরের মোট অববাহিকার (আয়তন ২৪ হাজার ২৩৫ বর্গ কিলোমিটার) দুই তৃতীয়াংশ বিহার রাজ্যে এবং এক তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলা নিয়ে গঠিত। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে প্রবাহ পথে ঢাল গড়ে প্রায় দু-ফুট। নিম্নতর উপত্যকায় মানভূমে পৌঁছলে ডিসেরগরের কাছে বরাকর নদ দামোদরে এসে মিশেছে এবং এখান থেকেই দামোদর পূর্ববাহিনী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। মোটামুটি পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েই বর্ধমানের ১৫ মাইল (২৪ কিলোমিটার) পূর্বে চাঁচাই গ্রামের কাছে দামোদর নদ হঠাৎ সমকোণে বাঁক নিয়ে দক্ষিণমুখী গতি নিয়েছে। এখান থেকে এই নদ জামালপুরের প্রায় ৭০ মাইল বা ১১২ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ফলতায় হুগলী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে হুগলী নদী নাম ধারণ করে ডায়মন্ড হারবারের কাছে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

দামোদর নদ বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার মধ্যে স্বাভাবিক সীমারেখা তৈরি করেছে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঠিক হয় কুলটি থানা থেকে গলসী থানা পর্যন্ত সমগ্র নদীখাত বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। অবশ্য প্রাকৃতিক কারণে উত্তর তীর ক্ষয়প্রাপ্ত হলে পূর্ব সীমারেখাই জেলার সীমারূপে বলবৎ থাকবে। কিন্তু বালি সংগ্রহ বা অন্য কৃত্রিম উপায়ে উত্তর তীর পরিবর্তিত হলে নতুন তীরভূমিকে জেলার সীমারেখা বলে গণ্য করা হবে।

দামোদর নদের বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণের ফলে এবং রেলপথ ও সড়ক তৈরির জন্য জলপ্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় দামোদরের গতি বহুলাংশে শ্লথ হয়েছে। এই একই কারণে নদীখাতে পলিসঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে দামোদরের নাব্যতা এখন আর নৌ চলাচলের উপযোগী নেই। অথচ রাণীগঞ্জে কয়লা শিল্প গড়ে ওঠার সময়ে এই নদীপথকে মাল পরিবহনের একমাত্র রাস্তা বলে গণ্য করা হত। Mr. J. C. K. Peterson জানিয়েছেন।

"During the rains it is navigable by country boats and before the construction of the railway, which runs parallel to it along its north bank, large quantities of coal were sent down it from the Raniganj mines in boats of 20 tons burden and upwards to the depot at Mahishabha in Hooghly, and were thence transhippad and forwarded via the Uluberia canal and the Hooghly river to Calcutta --(Bengal District Gazetteers. Burdwan p-8).

উপরন্তু এক সময়ে এ অঞ্চলের বনভূমি থেকে সংগৃহীত বড় বড় কাঠের গুড়িও জলস্রোতে ভাসিয়ে বা নৌকাযোগে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হত। নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার ফলে সেই পরিবহন প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে গেছে।

সম্প্রতি রাণীগঞ্জ ও মেজিয়ার মধ্যে যুগ্ম রেল ও সড়ক সেতু নির্মিত হওয়ার পর দামোদরের গতি আরও অবরুদ্ধ হয়েছে। তবে নুনিয়া নদীর সঙ্গম এখনও বুজে না যাওয়ায় এবং সঙ্গমস্থল নতুন সেতুর নিম্নভাগে অবস্থিত হওয়ায় নদীখাতের নাব্যতা বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। সেতুটি এই অঞ্চলের বহুদিনের এক অসুবিধা দূর করেছে। তবে সেতুটিতে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত সংযোগকারী রাস্তা এখনও নির্মাণ না হওয়ায় সেতুটি সম্পূর্ণভাবে কার্যপোযোগী হয়ে উঠতে পারছে না।

নুনিয়া নদী

সালানপুর থানার আছড়া গ্রামের এক উচ্চভূমি থেকে নদীর উৎপত্তি। উৎপত্তিস্থলে ধারাটি নুনিয়া জোড়া নামে পরিচিত। উৎপত্তিস্থল থেকে নুনিয়াজোড়া নদীটি প্রথমে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে মঙ্গলামাঝি গ্রামের উপর দিয়ে দক্ষিণামুখী বয়ে গেছে। নুনিয়াজোড় নামে অন্য একটি ধারা পরদ্বরপুর থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে অখশীল গ্রামের দক্ষিণে এসে নুনিয়াজোড়া ধারাটির সাথে মিশেছে। মিলিত এই ধারাটি এই সঙ্গম থেকে নুনিয়া নদী নামে মদনমোহনপুর ও চুরুলিয়া অতিক্রম করে আসানসোলের ২ কি. মি. উত্তর-পূর্বে কেশবগঞ্জের দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

রূপানারায়ণপুরের দক্ষিণে রাঙামাটি গ্রামের কাছ থেকে আর একটি ছোট ধারা দক্ষিণমুখে আলকুশা, ধুন্দাবাদ, মহিষমারা ও কালিকাপুর গ্রাম পার হয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে চক কেশবগঞ্জের কাছে মূল নুনিয়া নদীর সঙ্গে মিশেছে। নুনিয়া নদী এরপর কালিপাহাড়ির ২ কি.মি. পশ্চিমে রতিচটি গ্রাম অতিক্রম করে গেছে।

দোমাহানী থেকে দক্ষিণ দিকে আগত পুনতাল খাল জামুরিয়া থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে আগত দামোদর খালের সঙ্গে চক কেশবগঞ্জে মিলিত হয়ে কালিপাহাড়ির ৩ কি.মি পশ্চিমে নুনিয়া নদীর মূল ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নুনিয়া নদী এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হলে কুমারডিহি, শাল ডাংরা, হাড়ভাঙা, আমকোলা অতিক্রম করে রাণীগঞ্জের ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে নারায়ণকুড়ি গ্রামের কাছে দামোদর নদের সঙ্গে সঙ্গম সৃষ্টি করেছে। এই নিম্নপ্রবাহে বেড়াল গ্রামের পাশ থেকে জোড়নালী নামে একটি খাল চবলপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মূল নুনিয়া নদীতে পতিত হয়েছে। উৎপত্তিস্থল থেকে দামোদর নদের সঙ্গম পর্যন্ত নুনিয়া নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৪০ কিলোমিটার। বর্ষার সময়ে এই নদী পশ্চিম বর্ধমান জেলার এক বিস্তীর্ণ এলাকার জল বহন করে এনে দামোদরকে পুষ্ট করে। বর্তমানে এই নদীর খাতে পলি জমায় এবং বিভিন্ন রাস্তার জন্য সেতু নির্মাণের ফলে জলপ্রবাহের গতি অবরুদ্ধ হওয়ায় নুনিয়া নদী এক অগভীর নালায় পরিণত হয়েছে। গ্রীষ্মকালে বহু জায়গায় নদীখাত শুকিয়ে গেলেও শেষ ১০/১২ কিলোমিটার প্রবাহে জলধারা ক্ষীণ জলেও অব্যাহত থাকে। দামোদর ও নুনিয়া নদীর সঙ্গম স্থলে গড়ে উঠেছিল রাণীগঞ্জ অঞ্চলের প্রথম সফল ও স্বচ্ছল কয়লাশিল্প। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেঙ্গল

কোল্ কোম্পানির কার্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ এই সঙ্গমস্থলের কাছেই অবস্থিত। এই ধ্বংসস্তূপের অবস্থানই নির্দেশ করছে নুনিয়া নদীর পূর্বতন নাব্যতা ও গুরুত্ব।

সিঙ্গরাণি বা সিঙ্গারণ নদী

জামুরিয়া থানার অন্তর্গত অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লুপ রেলওয়ে লাইনের ইকরা রেল স্টেশনের কাছে বিজয়নগর গ্রাম থেকে সিঙ্গরাণি নদীর উৎপত্তি। উৎপত্তিস্থল থেকে দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হয়ে— ইকরা, সার্থকপুর, সিঙ্গরাণি, তপসী, মালেপুর, হরিশপুর, বক্তারনগর, দিগনালা, অণ্ডাল ও শ্রীরামপুর অতিক্রম করে ওয়ারিয়ার পশ্চিমে পিজরাপোল গ্রামে সিঙ্গরাণি নদী দামোদরে পতিত হয়েছে। জামশোল গ্রামের পূর্বদিক থেকে একটি জলধারা দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে কুলডাঙা গ্রামের কাছে সিঙ্গরাণির মূল ধারায় মিলিত হয়েছে। সিঁদুলী গ্রামের দক্ষিণ দিক থেকে একটি তৃতীয় জলধারা মধুসূদনপুর ও ভাদুর পার হয়ে দিগনালা গ্রামের পশ্চিমে সিঙ্গরাণি নদীতে মিশেছে।

হরিশপুর ও বক্তারনগর গ্রামের মাঝখানে সিঙ্গরাণি নদী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডকে উত্তর থেকে দক্ষিণে অতিক্রম করেছে। এই সড়ক নির্মাণের জন্য সেতু নির্মাণের ফলেই সিঙ্গরাণি নদীর প্রবাহ প্রথম অবরুদ্ধ হয়।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক (পূর্বতন শাহী সড়ক) ও সিঙ্গরাণি নদীর মিলনস্থলে—নদীর পশ্চিমপাড়ে ও সড়কের দক্ষিণদিকে রাণীগঞ্জ অঞ্চলের প্রথম বাণিজ্যিক কেন্দ্র বক্তারগঞ্জ গড়ে উঠেছিল। সে সময় রাণীগঞ্জ শহরের পত্তনই হয়নি। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের সার্ভে মানচিত্রেও বক্তারগঞ্জের উল্লেখ আছে। বক্তারগঞ্জ বর্তমানে বক্তারনগর নামে পরিচিত এবং রাণীগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত। বক্তারনগরের মধ্য দিয়ে যে রেলপথটি দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে --সেই রেলপথটি বর্তমান রাণীগঞ্জ থানার পূর্বসীমা বলে গণ্য হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে 'মহাবংশ'-এ বর্ণিত রাঢ়রাজ সিংহবাহুর রাজধানী এই সিঙ্গরাণি নদীর অববাহিকার ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। অরণ্যটি সিংহ অধ্যুষিত হওয়ায় নদীটি সিঙ্গারণ বা সিঙ্গরাণি নামে পরিচিতি লাভ করে। অন্যমতে সিংহ জন্তুটি ছিল রাঢ়রাজ বংশের টোটেম বা প্রতীক চিহ্ন এবং এই কারণেই নদীটির এই নামকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে উখরার প্রতিষ্ঠাতা জমিদার মেহেরচাঁদ হাণ্ডা তার পরিবারে সিংহ পদবী যোগ করেন। ফলে তাঁর পুত্র বক্তার হাণ্ডা বক্তার সিং হাণ্ডা নামে পরিচিত হন। মেহেরচাঁদ হাণ্ডার কন্যা বিষণকুমারীর সঙ্গে বর্ধমানের রাজা ত্রিলোকচাঁদ রায়ের বিবাহ হয়। ফলে মেহেরচাঁদ এ অঞ্চলের জমিদারী লাভ করেন। রাণীগঞ্জ শহরের নাম রাণী বিষণকুমারী থেকে উদ্ভূত বলে অনেকে মনে করলেও-- সিঙ্গরাণি নদীর কাছে গড়ে ওঠা এই শহরের নাম উক্ত নদীর থেকেই উৎপত্তি এ-কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের নামকরণের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করার পরিসর এখানে সীমিত। তবে এই সিঙ্গরাণি নদীর ধারেই গড়ে উঠেছিল এ অঞ্চলের প্রথম বাণিজ্যকেন্দ্র বক্তারগঞ্জ এবং রাণীগঞ্জ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ এই নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। বর্তমানে একটি ক্ষুদ্র নালায় পরিণত হলেও সিঙ্গরাণি বা সিঙ্গারণ নদীকেই রাণীগঞ্জ থানার পূর্ব সীমা বলে গণ্য করা উচিত।

□ শারদীয় 'আজকের যোধন', ১৪০৬ □

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'মুড়াই' নদী ও 'পাঁইটা' গ্রাম

ড. পঞ্চানন মণ্ডল

দক্ষিণ বর্ধমানের পাঁইটা গাঁয়ের নদী মুণ্ডেশ্বরী। আজ এটা একটা সামান্য মরা খাল মাত্র। কিন্তু এই খালের এই হাল, আগে এর ছিল না। চারশো বছর আগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতেন, বহতী এই নদী, নৌকোয় চেপে পারাপার হতেন। তিনি মুণ্ডেশ্বরীর নাম লিখে গেছেন 'মুড়াই' নদী। আমার মনে হয়, এর 'মুড়াই' নামটাই ঠিক। কেন, সে-কথা বলছি।

বিদেশী ও স্বদেশী পণ্ডিতেরা মেনে নিয়েছেন, এই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে কোল দ্রাবিড় ও কিরাত জাতির বাস ছিল। এঁরাই আদি বাঙ্গালী। সভ্যতার উন্মেষযুগ তখন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এসে পড়ায়, তাঁদের ঠেলায় এঁরা ক্রমে ক্রমে কোণঠাসা অচ্ছ্যুৎ হয়ে পড়লেন। কতক 'নবশাখ' বা 'নূতন শাখা' হয়ে ঢুকে গেলেন উচ্চতর সমাজে।

'কোল' বা 'কোলা' বলতে মুণ্ডা গোষ্ঠী বোঝায়। সাঁওতাল, হো, শবর, গদব-এই সব জাত এরই ভেতর। এঁরা দীর্ঘকাল আদিম বাঙ্গালী হয়ে ছিলেন এই রাঢ় দেশে। এখন আমি যদি বলি, পাঁইটা গাঁয়ের নদী 'মুণ্ডেশ্বরী' বা 'মুড়াই'-এদেশে সেই মুণ্ডাদের বসবাসের স্মৃতি বহন করছে আজ হাজার হাজার বছর ধরে, তাহলে আপনারা কি চমকে উঠে আপনাদের ঘরের ঐ ছোট্ট খালটিকে আর একবার চেয়ে দেখে আসতে যাবেন না? কিন্তু, আমার একথা ঠিক্। মুণ্ডাই (জাত্যর্থে) মুণ্ডাই > মুড়াই অর্থাৎ 'মুণ্ডা' বা 'মুড়া' জাতির নামে এই নদী। অথবা মুণ্ডা + ঈশ্বরী = মুণ্ডেশ্বরী বা মুণ্ডাগণের পূজিতা দেবী 'চাণ্ডী' ঈশ্বরীর নামেও এই নাম টেনে বুনে সিদ্ধ হতে পারে।

এখন হাজার হাজার বছর আগেকার দিনের কথা মনে মনে একবার স্মরণ করে নিন। নদী মুণ্ডাই তখন পুরাদস্তুর প্রবাহিত। তীরে তীরে তার সেকালের নগরের ঘটা-ছতা বা ছাতা পোখারি, নলিয়া, আকনা, লোহারিয়া, দেওড়া, বানরপুর, দাদুরঘাটা, তিরিল, ময়ীগ্রাম, পুইন, কোচাগাড়া, তেলো-এইসব। সেকালের বাণিজ্যতরী 'মধুকর' নানা ময়ূরপঙ্খী মেলে, ঘাটে ঘাটে ফিরছে কেনা বেচা করতে করতে। পণ্যের ফিরিস্তি? সে আজ থাক্। পুরাতন সাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করলে আপনারা এসব জানতে পারবেন।

'কুলি' খাল আছে এই পাঁইটা গাঁয়ে। আসলে ওটা যে খাল নয়, পথ, সে কথা বোধ হয় আজ আর কিছুতেই বিশ্বাস হবে না। সংস্কৃতে 'কুল্যা' শব্দের মানে হল-পথ। তা থেকেই ঐ 'কুলি' শব্দটা এসে গেছে ভাঙতে ভাঙতে। কোনও কালে যেন কোনও প্রশস্ত পথ যেন কোনও পুরাতন নগরকে ঘেরে ছিল বলে অনুমান করি। অবশ্য আড়াই হাজার বছর আগে কৌটিল্য জলপথকেও 'কুলি' বলেছেন। যাই হোক্, আজকের অচেনা সে-নগরে হদিশ বোধ হয় পাওয়া যাবে আপনাদের ঐ দাদুর ঘাটা, আগুন খাকী, ষষ্ঠী বা পেয়ারা ডাঙার নিচে নিচে। ঐ নামে ধর্মঠাকুরের উৎসব করে, মৃত স্বামীর চিতায় শুয়ে 'সতী' হয়ে, বা সন্তান কামনায় ষষ্ঠী ঠাকুরের পুজো চালিয়ে, দীর্ঘকাল ধরে এই গাঁয়ের পূর্বতনেরা, সেই

পুরাতন যুগের স্মৃতিটিকেই টেনে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, সেকালের 'কুলি' পথ, আজ বুঝি খাল হয়ে ভুলের জলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

তারপর ধরুন, আপনাদের গাঁয়ে এত পুকুর রয়েছে। ছোট বড়ো নানা ধরনের সব পুকুর। দেখে মনে হয়, যেন মরা নদীর সোঁতা থেকে এসব পুকুর কালে কালে তৈরী করে নেওয়া হয়েছিল। পুকুরগুলির নামও সব এক সময়ের নয়। যেমন, বুড়ীপুকুর, গোবাতিন, কুমকুমি, চেঙরা, পেঁকো, আধকাটা, মুচিশিমলে, ধর্ম সায়ের(ডোমনা?) চাঁড়ালগড়ে, বোদা, রাজার পুকুর, সানবাঁধি, ছট্‌পুকুর, নলদীঘি, দিগের পুকুর, সাগর পুকুর, জটাপুকুর - এই সব নাম খুবই পুরাতন। আর প্রত্যেকটা নামের একটা করে অর্থ আছে। আছে সংস্কৃতির ইতিহাস জড়িয়ে। রাজার পুকুরের মালিক কোন্ সে রাজা, কবে ছিলেন এখানে? সান্‌বাঁধি, ছট্‌পুকুর, নলদীঘি, দিগের পুকুর, সাগরপুকুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খোঁজা চলে কি ? দ্বাদশ শতকের ময়ীগ্রামের 'ময়' রাজার পোতায় 'বড়োর পোতা', 'মেজোর পোতা' পাওয়া গেছে। 'ছোট' কি এখানে উঠে এসেছিলেন? সানবাঁধি, ছোট ছোট ছট্ ছত বা ছতা পুকুর (ছাতা পখর), নলে দীঘি সাগর-পুকুরের নাম থেকে, নলের বিজয়-রাজা ও সাঁকটিগড়ের (সঙ্কট গ্রাম) অর্জুন রাজার কথা মনে আসে। 'দিগের' ঐ সময়ের এবং আরও আগের দিক্‌দার বা ওয়াচ্ এণ্ড ওয়ার্ড্। নলের বিজয় রাজা জাতিতে ছিলেন তিলি আর ময়রাজা ও অর্জুনরাজা ছিলেন 'চণ্ডধামা' 'উগ্র' বা আগরী। এখানকার সাবেক বনেদী আগরী মহলের কুলজী খুঁজে এটা ঠিক করে নিতে হয়। এতে দ্বাদশ শতকের দক্ষিণ রাঢ়ের ইতিহাসের ওপর অনেকখানি আলোকপাত হবে। রামপালের সঙ্গে পাল প্রধান গোপাল বেড়ার, ময়ীগ্রামের, নলের বা শক্তিগড়ের কি সম্পর্ক ছিল, ঠিক জানা যাবে।

এর আগে, অনেক আগে, 'ডোম্ম-রায়' কোনও ডোম রাজা ছিলেন কি ? যাঁর কুলদেবতা ছিলেন ধর্মঠাকুর? মনসাপূজাও করতেন যিনি মহা ধুমধামে? বুড়ীপুকুর, গোবাতিন, কুমকুমি, চেঙরা, পেঁকো, আধকাটা, মুচিশিমলে, চাঁড়াল গড়ে, বোদা - এই নামগুলি যাঁর নামের সঙ্গে জোড়া যায়? যাঁর উত্তর পুরুষগণ এখনও এ গাঁয়ে 'ঘাঁটী' আগলে বসে আছেন? তাঁর ঘাঁটি থাকতে পারে-ঐ আপনাদের দাদুর ঘাটীতেও।

'চেঙরা' বা 'চেঙমুড়া' পুকুরের পাড়ে, দশহরার দিনে, হাঁস বলি দিয়ে 'চেঙমুড়ী কানী মনসার' পূজার প্রবর্তন কে করেছিলেন, কে বলবে আজ? তবে, এখানে মনসার এই 'চেঙ' নামের ব্যবহার খুবই আশ্চর্য। ওটা আসলে চীনে তিব্বতী ভাষার শব্দ, অর্থ হচ্ছে- পবিত্র, বিশুদ্ধ। 'মুড়ী' বা 'মুরী' শব্দের অনেক ব্যাখ্যা আছে। তার একটা হল তান্ত্রিক যন্ত্র- আঁকা মুণ্ড-প্রতীক। তিব্বতে আকাশের প্রধান দেবতার নাম ডরজি-চেঙ্ বা বজ্র সত্ত্ব। যাই হোক্ এই হল মনসা ঠাকুরের প্রতীক। এবং দেবতা প্রতীক এই শব্দটি এখানে, মানে, এই গাঁয়ে, তার আদি রূপেই পূজা পাচ্ছে।

এবার আপনাদের গ্রাম দেবতা বলরামের কথা বলি। বলরাম-তলার তিনি স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ। ক্রমাগত মাটি নামিয়ে তাঁর জো পাওয়া যায় না। কিন্তু জো তার পেতেই হবে। এখন কথা হচ্ছে, এই নদীর পলিমাটির কিনারে সহসা এমন পাথর গজালো কি করে? আমার মনে

হয়, পরবর্তী রাজার পুকুর অঞ্চলে ডোমরাজা মারা গেলেন যখন, দস্তুরমতো তাঁর সমাধি বা চিতার উপর এই আকোঁদা স্মৃতি প্রস্তরটি গাড়া হয়েছিল। কিরাত-কোল-দ্রাবিড়দের দেশ, এই ছট্‌নাগপুরে গেলেই আপনারা মাটির ওপর আক্‌ছাড় এরকম স্বয়ম্ভুর সাক্ষাৎ পাবেন আজও।

তারপর হল কি জানেন? কাল গেল। স্তম্ভটি মাটি চাপা পড়ে গেল নানা কারণে। আবার কাল এলো। স্তম্ভটি জাগলো। নতুন যুগের নতুন চাষী মানুষ ওটিকে কৃষি-প্রতীক ঈষ্‌ আর তার বাহক-দেবতা বলদেবের কল্পনা করে নিলেন অতি সহজেই। একই ইতিহাস 'ঐ বুড়োশিবের'ও। তিনি আবার সরেস ধান-চাষী। কৃষাণ ভীমের দৌলতে সালিয়ানা ফসলের হার তাঁর—আড়াই হালা। আপনাদের বলদেবকে ধ্যানে বলা হয়েছে 'কৈলাসশিখরাকার' অর্থাৎ আছোলা পাহাড়ের চুড়ো। এবং বুড়োশিবের তিনি জাতভাই। বাস তাঁর শ্মশানে। চাই কি? আরও খুঁড়লে হয়তো আরও জো পেয়ে যাবেন ডোম-ধর্মের প্রতীক কূর্মের আর কৃষি প্রতীক ষাঁড়েশ্বর শিবের প্রতি-রূপ। অজয় তীরের ভেদিয়া অঞ্চলে আমারই আবিষ্কার 'পাণ্ডুরাজার পোতার' প্রতিদান তো এই-ই। সুতরাং, রাঢ়ের এই পরম্পরা হাজার হাজার বছর আগের।

এখানে ভেদিয়ারা (ভেদিয়া। বেদ্বিয়া + রা) গ্রামে বিরাজ করছেন ষষ্ঠী বুড়ী। মাটির তলায় আছে শিলামূর্তি তাঁর। ঐ শিলাটির বয়স কত ? পরিচয় কি তাঁর ? বলরাম শিলার সঙ্গে তার কোনও মিতালী আছে কি ? উঁচু নিচু অসমান ষষ্ঠীডাঙা, ষষ্ঠীপুকুর, প্রাচীন বটতলা দেখে ওকে তো বনেদী ভূশুণ্ডী বলেই মনে হচ্ছে। ষষ্ঠী-শীতলার কাহিনী আছে অনেক। সেকথা আজ থাক্‌। কিন্তু আপনাদের ঐ ষষ্ঠী বুড়ী যে একটা প্রকাণ্ড মাউণ্ড আগ্‌লে বসে আছেন, সে সংবাদ আজ দেবে কে ? ইনিই কি পাঁইটে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'পুইনে-বুড়ী'? পুইন-টে > পাইন-টে > পাঁইন-টে > পাঁইটে হতে পারে। এই গাঁ থেকে কিছু আগে গিয়েই 'পুইন' গ্রামে মুণ্ডেশ্বরী তাঁর মজা তীরে পুইনে বুড়ী'কে স্বীকার করেছেন। মুখলিঙ্গ ব্রহ্মাসুর আর বদর পীর রয়ে গেছেন তাঁর ডাইনে বাঁয়ে। আপনারা শুনে অবাক্‌ হয়ে যাবেন - মিশরী ভাষায় 'পুইন' শব্দের মানে হচ্ছে—পাতাল। সে আলোচনা আজ থাক্‌।

গোলটের আহের, ক্ষণমালী, অক্ষমালী, গায়েন্দা, পুকুরের সব নামগুলিও কম যায় না। বর্তমানের চোখে ওরা যেন এক অচেনা জগতের ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে। আজও আপনাদের পেঁকো-পুকুরের পাড়ে বার-উয়ারী রক্ষাকালীর পূজার আগে শোভাযাত্রা যাচ্ছে—চেঙরায় মনসার কাছে। নলদীঘিতে, যাচ্ছে বগধীপাড়ায়, যাচ্ছে শীতলাতলায় বলরায়ের কাছে-কোন্‌ সে আত্মীয়তার গন্ধে গন্ধে, কে জানে।

এদিকে, আজও প্রতি মকর-সংক্রান্তিতে, গাঁয়ের তীর্থ স্বরূপ-নারানের দ'য়ে স্নান করতে যাচ্ছেন আপনারা। কেন, বলতে পারেন ? বার্ষিক এই যোগাযোগ কিসের জন্যে ? এতেই বা, আদিম যুগের কোন্‌ সে স্মৃতির মাকু চালাচালি হচ্ছে ? কিন্তু জানেন কি, তক্ষশিলার নতুন আবিষ্কার ঘটে ছিল এইভাবেই। আপনাদের পেয়ারা-বাগান ডাঙার মাটির তলায়, কোন সে বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে, দ্বার উন্মোচনের অপেক্ষায়, আন্দাজে বলা শক্ত।

স্বরূপনারান ধর্মঠাকুর বিরাজ করছেন এখনকার হরিশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের বাড়িতে। তাঁর বাড়ি থেকে সম্প্রতি শ্রীমান্ হরিমোহন দাস কতকগুলি হাতেলেখা পুরাতন পুঁথি আমার জন্যে সংগ্রহ করেছেন। সে পুঁথিগুলিতে সেকালের একজন জানা কবির অজানা রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু, পাতা ক'খানি এত ছতিচ্ছন্ন যে, তাতে আমাদের কোনও কাজ এগোচ্ছে না। শ্রদ্ধেয় মণ্ডল মহাশয়ের ঘরে রাখা বাকি পাতাগুলি পাওয়া গেলে, দেখা যেত, এ অঞ্চলের ধ্যান-ধারণা সেকালে কোন্ পথে এগোচ্ছিল। মান্যবর মণ্ডল মহাশয়ের বদান্যতার প্রশংসা করি। আর শ্রীমান্ হরিমোহনের পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রযত্ন, গ্রামের সকলেরই অনুকরণ করার যোগ্য।

পাঁইটার রেণুপদ রজক পণ্ডিতের ঘরে আছেন এক ঝাঁক ধর্মঠাকুর। —বাঁকড়ো রায়, ক্ষুদিরায়, যাত্রাসিদ্ধি আর কালু রায়। পঞ্চানন-ধর্ম আছেন গোল্‌টে গাঁয়ে বগধী-পণ্ডিত সিংহদের বাড়িতে। এতগুলি ধর্মঠাকুরের মধ্যে, এক যাত্রাসিদ্ধি ছাড়া, সবগুলিরই প্রতীক হচ্ছে সাদা বা কালো পাথরের কচ্ছপ। এ প্রতীক ধর্মপুরাণসঙ্গত বটে। তবে, কথা উঠ্‌ছে যাত্রাসিদ্ধির মূর্তিটি নিয়ে। ওটি নয়-কচ্ছপ, নয়-ব্যাঙ, —এইরকম পাথরের দেখতে। যদি ব্যাঙ-ই হয়, তাহলে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হয়।

কূর্মীদের কূর্ম মূলে ধর্মঠাকুরের যূপ বা প্রতীক। কিন্তু ব্যাঙের নাম তো শোনা যায়নি। তবে, কোলা ব্যাঙ আছে। আর ধর্মঠাকুরের নামও আছে— 'অনুকূল কোলা', 'কোলা' বলতে স্পষ্টতই কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠী বোঝায়। গড়বাড়ীর রক্ষক হিসাবে এই নাম ভারতচন্দ্র ব্যবহার করেছেন, 'প্রথম গড়েতে 'কোলাপোষের' নিবাস'। এই কোলদের দাড়ি ছিল কিনা, তারা ম্লেচ্ছ কিনা, তারা খল কিনা, তারা 'চোল' বা কেবালার লোক কিনা, তারা আসল ক্ষত্রিয়; সগররাজ কর্তৃক বেদ বহিষ্কৃত হয়ে, ম্লেচ্ছ নামে ব্রাহ্মণ্য সমাজে পরিচিত ছিল কিনা -- সে আলোচনার গহনে আর আজ প্রবেশ করছি না। তবে মোদ্দা কথাটা মনে রাখতেই হয়, ব্যাঙ প্রতীক ধর্মঠাকুর, মূলত মুণ্ডাদেরই ভাব প্রতীক দেবতা।

আপনাদের এই 'দাদুরঘাটা' কথাটার মানে হচ্ছে, 'ব্যাঙঘাটা', অর্থাৎ একদা মুণ্ডাই নদীর যে অংশে ব্যাঙের বাহুল্য ছিল। কিংবা 'কোলা' এই জাতিগত অর্থেও হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এইরকম 'কোলা', ব্যাঙ বা ঘাটা দিয়ে স্থানের নাম অনেক আছে। —যেমন, কোলাঘাটা, কুমীর কোলা, ব্যাঙ চাতরা, 'কুঞ্জর ঘাটা' 'লা ঘাটা' 'বিষে ঘাটা' 'গো ঘাটা' 'হরিণ ঘাটা' ইত্যাদি সে কত। আর দেখুন, সে সব জায়গাগুলো মরানদীর ধারে কাছেই। ব্যাঙের পোশাকী নাম – দাদুর। হয়তো একদা অধ্যুষিত এই দাদুর নিয়েই এই স্থানের নাম ধর্মঠাকুরের কৃচ্ছ্রসাধ্য উৎসবের নাম, এমন কি 'অনুকূল কোলার' বদলে 'যাত্রাসিদ্ধি' নামেও, ধর্মরাজের এই ব্যাঙের আদল এসে গেছে।

জাত 'বাইতি' উঠে গেছে এখন এখান থেকে। 'খেলারায়'—ধর্মঠাকুর কুলদেবতা ছিলেন তাদের। আজ থেকে সাড়ে তিনশো বছর আগে, ঐ কাইতি শ্রী-রামপুরের কবি রূপরাম চক্রবর্তী শ্বেত গঙ্গায় ধর্মপূজা প্রসঙ্গে বলেগেছেন, হরিহর বাইতি 'আদ্যিঢুমলি'বাজিয়ে ধর্মঠাকুরের ঘুম ভাঙ্গাবেন। এ কথাটার ব্যাখ্যা করতে গেলে,

কলমীলতার জের বের হবে যে অনেক। সে আজ থাক্। তবে একটা কথা জেনে নেওয়া যেতে পারে, ধর্মঠাকুর নব্য-ব্রাহ্মণের সম্পত্তি নয়। তিনি বাইতি-ডোম-মুচির ঠাকুর সুপ্রাচীন কাল থেকে। অর্থাৎ এখানকার ঐ অচ্ছুৎদেরই মৌলিক ও মহান্ সংস্কৃতি বিবর্তনের জের, ঐ অত্যন্ত কড়ামেজাজের ঠাকুরটি। কাছের ঐ ডোমমা রায়, বা 'ডোম্মরায়' বা ডোমরাজা তো রয়েই গেছেন আদ্যি কালের ঐ স্থানের নামে। উনিই তো শিব-ধর্ম। মুণ্ডা-গাজন তো ওঁরই। —সে পুরানো কাহিনীর ব্যাখ্যানও থাক্ আজ।

এবার জাতের কথা সামান্য কিছু বলি। বামুন সজ্জনদের আদ্যকথা জানেন আপনারা অনেকেই। সে বিষয়ে নতুন গবেষণা শোনাবার অবকাশ আজ নাই। আজ আমি আপনাদের গাঁয়েরই দু'চারটে জাতের কথা আপনাদের কাছে বলবো, যাদের কাহিনী আপনাদের মনে চিন্তার নতুন খোরাক যোগাবে। আপনাদের গাঁয়ে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, আগরী, তিলি, মালী, কামার, নাপিত, রজক, বগধী, ডোম, চাঁড়াল, দুলে, মুচি- এইসব জাত রয়েছে। এবং বলা বাহুল্য, এই সব প্রত্যেকটি জাতের একটি করে গৌরবময় ইতিহাস আছে। আমাদের সমাজে নানা জাতের ছোট বড়ো এমন গড়ন হল কি করে, জাতিভেদের গোড়ার কথা কি ছুৎ অচ্ছুৎ গজালো - কি করে সে সব জটিল বিষয় নিয়ে আজ আলোচনা করবো না। তবে এ কথাটা জোর দিয়েই বলা যায়, জাতির পাঁচির কড়াকড়ি গোড়ার দিকে ছিল না। এক একটা ছোট ছোট দল, যে যার আপনা গুণ কর্ম নিয়ে পাশাপাশি বাস করতো। আটশো বছর আগেও ব্রাহ্মণের মতো চণ্ডালও পৈতে পড়তেন, এক সঙ্গে খানাপিনা করতেন। বৌদ্ধ সাধুরা একথা চোখে দেখে লিখে রেখে গেছেন। রাঢ়ের পড়শী ছোটনাগপুরে গেলে আপনারা আজও দেখতে পাবেন- ওঁরাও, মুণ্ডাদের গলায় পৈতে ঝুলছে, বামুনদের মতোই। আর একটা তাজ্জব দেখুন আপনাদের গাঁয়ে, গড় মনসা বা নবগ্রহ মনসা পুজো করছেন আজও চাঁড়ালরা। উনি তো বৈদিক দেবতা। তাহলে, পুজার ব্যাপারে বামুনদের সঙ্গে চণ্ডালদের সমান অধিকার বর্তালো কি সূত্রে ? এতেও কি মনে হয় না, উভয় জাতিতে ভেদ ছিল না।

বৈষ্ণব গড়ে উঠলো, অন্তত দুহাজার বছর আগে 'চক্রস্বামী'র পূজা করে। আর শ্রীচৈতন্যের আর্বিভাবের পর, যে কোনও জাত থেকে 'ভেক' বদলে। আগরী এলেন রাজার স্থাপ্যধনের ট্রাস্টি হয়ে এবং স্বয়ং রাজা হয়েও। 'নবশাখা' গজিয়ে উঠলো নতুন শাখা হয়ে, নব্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজে। তার আগে তাঁরা যে কি ছিলেন, সে সাক্ষ্য কে দেবে আজ ? এক ঐ মরা নদী 'মুড়াইকে' যদি কথা কওয়ানো যেত তা ছাড়া ?

এদেশের বাগধী জাতি বৈদিক 'বগরী' জাতির অবশেষ বলেই আমার দৃঢ় ধারণা। পূজনীয় সুনীতিবাবুও তাই মনে করেন। এই জাতটার নাম শুনেছিলেন বৈদিক ঋষিরা, কিন্তু খুঁজে পান নি। দেশী বিদেশী পণ্ডিতরাও এদের নিয়ে অনেক জল ঘোলা করেছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। কিন্তু আমি স্থির বলতে পারি, এদের প্রাগবৈদিক আদি-বাঙ্গালীর বনেদীআনা নিয়ে আজ গৌরব করার হেতু আছে। সিংহ, বাগ, রায়, দিগের, কারক, ধাড়া, ধাবক, পণ্ডিত ইত্যাদি পদবি বিচার করলে এদের জাতিগত পেশা কালে কালে কি কি ছিল, জানা যাবে।

নাপিতদের পদবী 'বেজ' শব্দটি আসছে মূল 'বৈদ্য' শব্দ থেকে। অর্থাৎ সেকালের শল্য চিকিৎসায় নরুণবাহন এঁরাই ছিলেন সমাজের প্রধান অবলম্বন। তাই সেকালের কৃতজ্ঞ সমাজের দেওয়া এঁদের এই সসম্মান কবিরাজী খেতাব।

মুচিদের সাধারণ পদবী 'রুইদাস' কথাটি আসছে ছোটনাগপুরের 'রোহিদাস পাটন' বা মূল বৈদিক 'রোহিতাশ' শব্দ থেকে। 'রোহিতাশ্ব' হলে, আপনাদের চেনা রাজা হরিশ্চন্দ্রের, ছেলের নামের জের-নামে বইছেন এঁরা। পক্ষান্তরে, পদবি 'গাঁদরোব' থেকে 'পরামাণিক' এল কি করে, সে ব্যাখ্যা আর করবার সময় নাই। চাঁড়ালদের গড়-মনসার মতন বৈদিক 'সাতবোন মনসা'—পূজা করেন মুচিরা, মরা গরু খেতেও দোষ ছিল না এঁদের। হঠাৎ মনে হয়, 'মুণ্ডাইদের এঁরা জাতভাই যেন।

এবার এ গাঁয়ের প্রধান বাসিন্দা আগরীদের কথা কিছু বলছি। আপনাদের আটশো বছর আগেকার ইতিহাস এই মুণ্ডাই নদীর ধারে কাছেই কিছু পেয়ে গেছি। 'ময়ীগ্রামের' 'রাজার পোতার' বিস্তৃত কাহিনী আমি বলেছি এবং প্রকাশ করেছি। সে আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন।

রামপালের সামন্তরাজা ময়গল সীহের রাজধানী ছিল ঐ 'ময়ী' গ্রামে। রাজ্য ছিল তাঁর এই উচ্ছাল প্রদেশের ব্যেপে-সম্ভবত দামোদর তীরের 'গল-সী' পর্যন্ত। সড়ক ছিল সে-রাজ্যে আনাগোনার -- 'ম-গল-মারি' বরাবর। সে-কথা আমি উচালন- ভাষণে বলেছি। অবশ্য বৃহত্তর ভারতের চম্পা রাজ্যের আদিবাসীদের নাম রয়েছে-'ময়ী'। কে বলবে আজ, কোন দিক্ থেকে কে এল গেল? বর্তমান 'ময়ীগ্রামের' 'রাজার পোতা' এখনই খুঁড়ে দেখা দরকার।

আদিম আর্য বাঙ্গালী ভাস্করের উত্তরপুরুষ আপনারা। রাজরক্ত আপনাদের ধমনীতে। ময় ভাস্করের শিল্পবোধ সহজাত আপনাদের মনে। আপনাদের গৌরবের সীমা নাই। আজ আটশো বছর ধরে আপনারা এই অঞ্চলে আধিপত্য করে এসেছেন, ব্রাহ্মণের আর প্রজাপুঞ্জের স্থাপ্যধনের ন্যাসী বা অগ্রহারী হয়ে।

দেড়শো দু'শো বছর আগেকার নানা দলিল দস্তাবেজ আপনাদের এই সেরপুর, ঠাকুরাণী চক্ ইত্যাদি গাঁ হাঁট্রে সংগ্রহ করে, বিশ্বভারতী থেকে বই করে ছাপিয়ে দিয়েছি। তা থেকে আপনাদের এই অঞ্চলের সেকালের গৃহস্থালীর নানা খুঁটিনাটি ঘরোয়া বিবরণ পাওয়া যাবে। সে সব আপনারা দেখলে আনন্দিত হবেন।

দামিন্যার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের উত্তরপুরুষদের পৌরোহিত্য-অধিকার ছিল এই অঞ্চলে, সম্ভবত স্বয়ং কবি মুকুন্দরামও এধারে আনাগোনা করতেন। আমার মনে হয়, এদিকে সাময়িকভাবে বসবাসও করেছিলেন তিনি। অদূরের শাঁকো-মীর্জাপুর গ্রামের বেনে ফণী মাহিন্দারের বাড়ির অন্দর, একদা কবি মুকুন্দরামের দখলে ছিল বলে প্রবাদ। কেঁউটে গ্রামে কবির শ্বশুর বাড়ী ছিল-এ কথা লিখে গেছেন অম্বিকা গুপ্ত মহাশয়। সেই সূত্রে সন্নিহিত শাঁকোয় তাঁর গতিবিধি থাকা অসম্ভব নয়। ঐ গাঁয়ে সদ্‌গোপ শম্ভু পিরির বাড়ীতে আছে বহু পুরাতনকালের একটি বিগ্রহ—রামচন্দ্রের।

এ খবর খুবই কৌতূহল জাগায়। কবিকঙ্কণ বংশ এবং কবি নিজেও ছিলেন অন্যতম রামভক্ত। তাঁর বা তাঁদের পূজিত মূর্তিটির আজ আর কোথাও কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। শাঁকোর ঐ মূর্তিটি দেখতে হয়। অনেক কথা আছে ফটিক গ্রামের বা ফুটো-বাবলার ! ওখানে, কেলে - কাঁদা (বা 'কো-কান্দর'?) পাড়ায় যে সব প্রত্নবস্তু ছড়িয়ে আছে সেগুলো দেখিয়ে লোকে আজও বলে, ওখানে 'হুমগড়' রাজার রাজধানী ছিল। আমি এক লহমায় ও কথা বিশ্বাস করি। তবে ওটা ডাড়িকেসি নদীর কাহিনী বলে, বহতা মুণ্ডাই-এর আলোচনার এক্তিয়ারে আসে না। কিন্তু, এক্তিয়ারে না এলেও এখনই তার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করে ফেলা দরকার। সুপ্রাচীন পরম্পরায় দক্ষিণ রাঢ়ের সত্যি ইতিহাস লেখা সম্পূর্ণ হতে পারে না, ও সব খুঁটিয়ে না জানলে।

□ শারদীয় দামোদর, ১৩৭০ □

বর্ধমানের কৃষি ব্যবস্থা
(মোঘল আমলে)
অজিত হালদার

সুবা বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে তখনকার বাংলাকে শাসনকাজের ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। গ্রান্টের মতে চাকলাগুলির নির্দিষ্ট স্থায়ী সীমানা ছিল, নিয়মিত রাজস্ব পরিমাপ ও আদায় ব্যবস্থা ছিল, পৃথক ফৌজদারী শাসন ছিল, ছিল পৃথক আমিলদার (অর্থ সচিব) ১/৪৫। আজকের বর্ধমান জেলা এই চাকলাগুলির মধ্যে একটি।

নবম শতক থেকে বাংলা কৃষিভিত্তিক সমাজ হয়ে ওঠে আর তখন থেকে ভূমি হয়ে ওঠে প্রধান সম্পদ। কিন্তু ভূমির মালিকানা ছিল একমাত্র রাজার। এমনকি বিক্রয় অথবা নিষ্কর দান করার পরও ভূমির মূল মালিকানাস্বত্ব রাজারই থেকে যেত, যা হস্তান্তরিত হত তা কেবল দখলী অধিকারস্বত্ব (২/২৫৬-৬০)। মোগল যুগেও এই ধারণা ও তদনুযায়ী কাজ অব্যাহত ছিল।

মধ্যযুগের বর্ধমানে দু'ধরনের মানুষের কাছে ভূমি শব্দটি দুটি পৃথক অর্থ বহন করত। স্বাধীন কৃষক এবং রায়তের কাছে ভূমি ছিল সম্পত্তি, অধিকার ছিল স্থায়ী। কিন্তু এই অধিকার ঠিক পুঁজিবাদী অর্থে যে অধিকার বোঝায় তা নয়। এই অধিকারের বলে ভূমি ব্যবহার করা যেত, উত্তরাধিকারীকে অর্পণ করা যেত, এমনকি দান-বিক্রয়ও চলত কখনও কখনও, কিন্তু কখনই অব্যবহারে ফেলে রাখা যেত না। বাদশা, জমিদার আর অন্য মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে ভূমি ছিল এমন একটি স্থান যার অন্তর্গত অধিবাসীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা সম্ভব হত(৩/৩৯)। কৃষক ও রায়তের অধিকার ছিল যেন চামড়ার অধিকার, আর রাজা-জমিদারের অধিকার যেন তার নিচে হাড়ের অধিকার। এই অস্থিচর্ম অধিকারতত্ত্ব চীনেও অনেকদিন প্রচলিত ছিল (৪/৮)।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে বর্ধমান চাকলায় ভূমির উপর ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত অধিকারের একটা অদ্ভুত ধরনের সংমিশ্রণ চালু ছিল।(৩৬/২৮৪)। সর্বসাধারণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত অধিকার বজায় থাকত, যার ফলে নিষ্ফলা ভূমি, গোচর, সেচখাল, সেচের দীঘি প্রভৃতির অধিকার কোনো ব্যক্তির উপর বর্তানো সম্ভব হত না। অন্যদিকে ফলবতী ভূমির দখলীস্বত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যক্তির হাতে থাকত আর এই স্বত্বের বিনিময়ে শাসনকর্তা বা তাঁর মনোনীত কোনো ব্যক্তির হাতে খাজনা-কর দিতে হত। যদি এই খাজনা-কর সরাসরি রাজকোষে জমা পড়ত, তাহলে যে ভূমি এই আদায় দিয়েছে তাকে বলা হত খালসা ভূমি। কিন্তু মোগল শাসনকর্তাদের কদাচিৎ নগদ মাইনে দেওয়া হত, প্রথা হিসেবে যা চালু ছিল তা নগদ মাইনের পরিবর্তে রাজস্ব আদায়ের ভূমি বন্দোবস্ত। (১/১৪)। যখন খাজনা কর সরকারী কোষাগারে জমা না পড়ে ভূমিস্বত্বভোগী নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে যেত তখন সেই খাজনা-আদায়ী ভূমিকে নিষ্কর বা লা-খিরাজ ভূমি বলা হত।

সব লাখিরাজ ভূমিই ছিল বৃত্তি খাজনার অন্তর্গত। তবু স্বত্বভোগীর কাজের ধরন অনুযায়ী লাখিরাজ ভূমিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে সেইসব ভূমি যেগুলি মাইনের পরিবর্তে দেওয়া হত। রাজস্ব-আদায়কারীদের জন্য ছিল নানকর, চাকরান ছিল চৌকিদার থানাদারের, আর পাইকান ছিল পাইক বা সৈন্য-সংগ্রাহকের। দ্বিতীয় ভাগে নিষ্কর ভূমি, ব্যবহার হত গ্রাম সমাজের স্বার্থে কিছু বৃত্তিভোগীর কাজের বিনিময়ে। কামার, কুমোর, স্যাকরা, নাপিত, শিক্ষক, চিকিৎসক সকলেরই লাখিরাজ ভূমি থাকত, সকলেই এই ভূমির উপস্বত্ব ভোগের বিনিময়ে সমগ্র গ্রামসমাজকে শ্রম-খাজনা দিতেন। তৃতীয় ভাগে ছিল দাতব্য ভূমি বিলি। যেমন দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, আয়মা প্রভৃতি। বর্ধমানে এই ভাবে প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ছিল সব থেকে বেশি। ১৭৪০ সালে রাজা তিলকচাঁদের আমলে বর্ধমান চাকলায় ৪৬২০০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল যা তখনকার দিনে চাকলার সমগ্র কর্ষিত ভূমির এক ষষ্ঠাংশ। সবরকমের নিষ্কর ভূমি যোগ করলে বর্ধমান চাকলার অধিকাংশ ভূমিই উপস্বত্বভোগীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

খুদকাস্ত প্রজা অর্থাৎ গ্রামের অধিবাসী হয়ে গ্রামের জমি যাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে চাষ করতেন আর যাঁরা অন্যদের অর্থাৎ খিদমতপ্রজাদের দিয়ে চাষ করাতেন এঁদের সকলকেই রায়ত বলা হত। পাইকাস্ত প্রজা বলা হত তাঁদের যাঁরা এক গ্রামের অধিবাসী হয়ে অন্য গ্রামের জমি চাষ করতেন। খুদকাস্ত রায়তের পাট্টা ছিল মৌরসী অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে। কিন্তু পাইকাস্ত কৃষকের চাষের অধিকার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমায় বাঁধা থাকত না (৫/১। অধিকার যে-রকমেরই হোক না কেন, এঁদের সকলকেই খাজনা-কর দিতে হত। বর্ধমান যখন একটি পরগণামাত্র ছিল তখন আকবরের আমলে রাজা টোডরমল বর্ধমানের রাজস্ব নির্ধারণ (তক্‌শিস্) করেন। নির্ধারিত পরিমাণ অর্থাৎ জমা পরবর্তীকালে তাঁর নাম অনুযায়ী 'মাল' বলে পরিচিত হয়। এই সময় রাজস্ব বা খাজনা-পরিমাণ ছিল করের উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ। বর্ধমান চাকলা হওয়ার পর আওরঙ্গজেবের আমলে এই পরিমাণ উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ হয়ে দাঁড়ায়। আরও পরে নস্‌ক্ প্রথায় নির্ধারণের ফলে এই পরিমাণ আরও বর্ধিত হয়। বর্ধমান চাকলার রায়ত তৎকালীন বাংলা সুবার মধ্যে সব থেকে বেশি কর-খাজনা দিত, বর্ধমান চাকলার রাজস্ব পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায়-ব্যবস্থা সবথেকে ভাল ছিল। ১৭৬০ সালে খালসা, জাগীর ও চৌথ মিলিয়ে বর্ধমান চাকলার মালগুজারী ছিল ত্রিশ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। (৪/১৪০)।

রাজস্ব আদায়-ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ তিন চারটি স্তরে জড়িত ছিলেন। প্রথমেই ছিলেন প্রত্যেক গ্রাম বা মৌজায় একজন প্রাথমিক জমিদার। অবশ্য এই জমিদার ইংরেজ আমলের জমিদার নয়, এঁরা কখনই কেবলমাত্র রাজস্ব-আদায় চুক্তিতে মালিক ছিলেন না। এঁরা আসলে ছিলেন জোতদার অর্থাৎ স্বাধীন কৃষক, নিজেরা চাষ করতেন, কখনো কখনো অন্যদের অর্থাৎ পাইকাস্ত অথবা আদিবাসীদের দিয়ে বর্গাপ্রথায় চাষ করাতেন। এঁদের কাজ ছিল রায়তদের রাজস্ব নির্ধারণ করা এবং তা সংগ্রহ করে উর্ধ্বতন কর্মচারীর হাতে অর্পণ করা। এই কাজের পরিবর্তে তারা ছোট ছোট চাকরান ভূমি ভোগ করতেন।

এঁদের এই অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল। দ্বিতীয় স্তরের জমিদারী অধিকার ছিল মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকার। কয়েকটি মৌজা নিয়ে তৈরী হত একটি মহাল বা পরগণা। একটি মহালের সব মৌজায় রাজস্ব-আদায়ের হার একই থাকত। মহালের প্রাথমিক জমিদারদের মধ্যে যাঁকে সবচেয়ে বিচক্ষণ ও সমর্থ মনে করা হত তাঁকে নাজিমের তরফ থেকে মুকদ্দম বা মুখ্য বা মণ্ডল বা গ্রামপিতা নিযুক্ত করা হত। এঁরা প্রাথমিক জমিদারদের কাছে রাজস্ব আদায় করে রাজকোষে জমা দিতেন। এর পরের স্তরে থাকতেন চৌধুরী, সাধারণত কয়েকটি পরগণা মিলিয়ে এঁদের অধিকার ছড়িয়ে থাকত। চৌধুরীদের মধ্যে কেউ কেউ রাজা খেতাবাদি পেতেন দিল্লীশ্বরের তরফ থেকে। (৩/৩৯)।

মোগল-যুগের ভূমিব্যবস্থার প্রধান দ্বন্দ্ব ভূমি-মালিকানার মধ্যে নিহিত ছিল। রাষ্ট্রের মালিকানাস্বত্ব আর ব্যক্তির দখলীস্বত্ব মোগল সাম্রাজ্যের পড়ন্ত বেলায় সংঘাতের মুখে পৌঁছেছিল। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে মোগল-সাম্রাজ্য ভারতের স্বাভাবিক সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, নতুন করে তার আর বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল না। তার ফলে নতুন ভূখণ্ড জয় করে নতুন রাজস্ব আদায় করার সম্ভাবনাও লুপ্ত হয়েছিল। অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন জায়গীর ও মনসবের চাহিদা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। জায়গীর ব্যবস্থার প্রধান গুণ ছিল এই যে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের একটা ভারসাম্য থাকত। মাইনে-বাবদ নগদ অর্থ ব্যয় করতে হত না বলে রাজস্ব কতটা আদায় হল তা নিয়ে বেশি দুর্ভাবনা থাকত না। (৩/১৪৪)।

কিন্তু এই ব্যবস্থা রাজস্বের বর্ধিত চাহিদার মুখে অস্থিতিস্থাপক ছিল। দুটি ভিন্ন কারণে এই ব্যবস্থা অস্থিতিস্থাপক হয়ে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে প্রকট করেছিল

(ক) জায়গীর-ভূমির চাহিদা দ্রুত বেড়েছিল। অথচ সম্রাটের পক্ষে একদিকে যেমন নতুন ভূখণ্ড অধিকার করা সম্ভব ছিল না, অন্যদিকে তেমনি জায়গীরদার-মনসবদারের সংখ্যা কমানো অসম্ভব ছিল। সুতরাং বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে খালসা-ভূমিকে জায়গীরভূমিতে রূপান্তরিত করতে হত, যার ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব দ্রুত কমে যেত। রাজস্ব বাড়াবার জন্য আমলাদের কাজে লাগাতে গিয়ে রাজস্ব আদায় কম হত।

(খ) ভূমির পরিমাণ বাড়াতে না পারায় রাজস্ব তথা শোষণ বাড়াবার একটি পথই খোলা ছিল --তা ছিল রাজস্বের হার বাড়ানো। কিন্তু প্রাথমিক জমিদারেরা অর্থাৎ গ্রাম প্রধানরা এই ব্যাপারে প্রচণ্ড বাধা দিতেন।

এই দ্বন্দ্বের পরিণামে একটি নতুন ব্যবস্থা, ইজারা প্রথার উদ্ভব ঘটল। ইজারাদাররা নির্দিষ্ট রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে উদ্যোগী মধ্যস্বত্বাধিকারীর ভূমিকা পালন করতেন। নির্দিষ্ট রাজস্ব অবশ্যই প্রচলিত জায়গীর-ব্যবস্থায় আহরিত উদ্বৃত্ত থেকে বেশি হত। আর এজন্য ইজারাদাররা বেশি হারে খাজনা আদায় করার যথা - প্রয়োজন সরকারী অনুমতি ও সাহায্য পেতেন। একদিকে সামরিক কর্মচারী ও সরকারী আমলারা নিশ্চিত অথচ অধিক উদ্বৃত্ত-প্রাপ্তির সম্ভাবনায় ইজারাপ্রথাকে স্বাগত করলেন, অন্যদিকে উদ্যোগী ও ধনী ব্যবসাদাররা অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় ইজারা গ্রহণে আকৃষ্ট হলেন। ফারুকশিয়রের সময়ে এই

প্রথার দ্রুত প্রসার ঘটল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্ধমানে গঙ্গারাম ভুতোরিয়া নামে এক ধনী রাজপুত বস্ত্র-ব্যবসায়ী দশ বছরের মধ্যে পাঁচশ গ্রাম ইজারা নিয়েছিলেন। ক্রমশ দেখা গেল কোম্পানীর রাজত্ব শুরু হওয়ার আগে বর্ধমানের শতকরা প্রায় একশভাগ ভূমি হতে রাজস্ব আদায়ের অধিকারী হলেন চারটি অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী পরিবার। বর্ধমানের রাজ-পরিবার এই পরিবারগুলির অন্যতম।

অবশ্য এই অধিকার অর্জন কখনই নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক ছিল না। গ্রাম প্রধান বা প্রাথমিক জমিদারদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত প্রায়শই বিভিন্ন স্তরের মধ্যসত্ত্বাধিকারীদের বিপদে ফেলত। মধ্যসত্ত্বাধিকারীরা একদিকে চাইতেন গ্রাম-প্রধানদের ক্রমশ দরিদ্র করে একেবারে ভাগচাষীর পর্যায়ে নামিয়ে আনতে, অন্যদিকে তোষণ ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে উচ্চধাপে ওঠার জন্য চৌধুরী ও রাজা হবার চেষ্টা করতেন। দিল্লীশ্বর এই দ্বন্দ্বের সহজ সমাধান খুঁজতেন প্রভাবশালী ইজারাদারকে অভিজাত সভাসদদের পদ্ধতিতে স্থান করে দিয়ে, রাজা খেতাব দিয়ে, অথবা জায়গীর ও মনসব দান করে। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে বস্ত্র-ব্যবসায়ীর সন্তান আবু রায় বর্ধমানের চৌধুরী নিযুক্ত হন, আর ১৭৩২ সালে সেই বংশের চিত্রসেন রায় বাদশাহ মুহম্মদ শাহের ফরমানে রাজা উপাধি লাভ করেন। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অনেক বিদ্রোহ ঘটে গেছে। বিদ্রোহ ঘটা স্বাভাবিক ছিল, কারণ সব উচ্চাভিলাষী ইজারাদারকেই তো আর ভাল জায়গীর কি মনসব দেওয়া সম্ভব হত না। ফলে সংঘাত ও বিদ্রোহ চলতেই থাকত। তাই আমরা বর্ধমান রাজপরিবারের কৃষ্ণরাম রায় আর জগৎরাম রায়ের করুণ মৃত্যু দেখতে পাই, কীর্তিচাঁদ ও চিত্রসেন রায়ের নতুন পরগণা জয়ের অভিযান দেখতে পাই, দেখতে পাই শোভা সিং, রহিম খান প্রভৃতি বিদ্রোহীর নিধন।

মোগল যুগের ভূমিব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক দখলীস্বত্বের দ্বৈতাবস্থা বজায় থাকার ফলে বর্ধমানের গ্রাম-সমাজে এক ধরনের সম্পত্তিগত অসাম্যের উদ্ভব ঘটে! গ্রাম প্রধান বা প্রাথমিক জমিদারদের হাতে রায়তকে কি পরিমাণ খাজনা কর দিতে হবে তা হিসেব করার এবং তা সংগ্রহ করে জমা দেওয়ার ভার থাকত। তিনি একদিকে ছিলেন গ্রাম-সমাজের প্রতিনিধি এবং অন্যদিকে ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী। তিনি আমিলদার-নির্ধারিত সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় দিতে পারলে মোট ভূমির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ লাখিরাজ ভূমি হিসাবে ভোগ করতে পারতেন। (৬/২৩৯)। আওরঙ্গজেবের সময় থেকে বর্ধমানে জব্‌ত্ প্রথার পরিবর্তে নস্‌ক্ প্রথায় রাজস্ব নির্ধারণ শুরু হয়েছিল। নস্‌ক্ প্রথায় রাজস্ব নির্ধারণের প্রাথমিক একক ছিল গ্রাম। আমিলদার গ্রামের রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দিলে কোন্ রায়তের ভাগে কত পড়বে তা হিসাব করতে হত গ্রাম-প্রধানকে। বর্ধমানের কবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কন তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণনা করেছেন কেমন করে অসাধু গ্রামপ্রধান রায়তের রাজস্ব নির্ধারণের সময় ১৫ কাঠা জমিকে ২০ কাঠা দেখাতেন ও অকর্ষিত ভূমিকে কর্ষিত ভূমি দেখিয়ে বেশি রাজস্ব আদায় করে সরকারী খাতে জমা দিতেন কম! এমনকি তিনি সমগ্র গ্রাম-সমাজের দখলী জমির কিয়দংশ নিজের বলে দাবী করে নিষ্কর ভোগ করতেন। বস্তুতপক্ষে ১৫ বিঘা চাষ করলে ১০ বিঘার খাজনা দিতেন (৭/১১-১৮)। আবার সুযোগ

পেলে উপরতলার লোকেদের তুষ্ট করে কিছু লাখিরাজ স্বত্বও আদায় করতেন। এই অসাম্য বৃদ্ধির প্রসার দ্রুতহারে ঘটত যখন খাজনার হার বাড়ত, কি শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে খাজনা আদায় করা হত। কারণ নগদ অর্থ সুলভ না থাকার জন্য রায়তকে গ্রামপ্রধানের কাছেই হাত পাততে হত। এইভাবে অনেক গ্রামপ্রধান ৫০ বিঘা থেকে শুরু করে ২০০ বিঘা ৩০০ বিঘা পর্যন্ত জমির অধিকারী হয়েছিলেন (৩/২১)।

যেহেতু মোগল আমলে বেশির ভাগ খাজনাই আদায় হত ফসলী ও খামার পদ্ধতিতে, সেজন্য কি সরকার কি রায়ত সকলেই কৃষির উন্নতির প্রতি যত্নবান থাকতেন। এমনকি সরকারী কর্মচারীরাও ফসলের ভাগে ভূমি-উদ্বৃত্ত থেকে নিজেদের মাইনে পেতেন বলে নিজের নিজের নির্দিষ্ট জায়গীরে কৃষি উৎপাদন যাতে বাড়ে তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। এই কারণে সরকার যেমন কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপরিকাঠামোয় জলসেচ- ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতেন, তেমনি গ্রামসমাজে বাঁধ নির্মাণ ও খালখননের প্রয়োজনে একটি সামাজিক দায়িত্বের (পুলবন্দী) সৃষ্টি হয়েছিল। "জলের সাধারণ ও সার্থক ব্যবহারের প্রাথমিক প্রয়োজনেই" এই সামাজিক দায়িত্বের উদ্ভব ঘটেছিল (৮/৭১)।

বর্ধমানের ক্ষেত্রে জলের সাধারণ ও সার্থক ব্যবহার আমরা দেখতে পাই মৌজায় মৌজায় মাঠে মাঠে ছড়ানো সেচের দীঘির ব্যবহারের মধ্যে। দীঘিগুলির আয়তন ছিল বিরাট, জলকর ৩০ বিঘা থেকে ৩০০ বিঘা পর্যন্ত এবং এগুলির প্রত্যেকটিই খনিত হয়েছিল প্রাক্ ইংরেজ পর্বে। বর্ধমানের সেচ-খালের প্রসঙ্গে উইলিয়াম উইলকক্সের "বাংলায় প্রাচীন সেচ ব্যবস্থা'র নিম্নলিখিত অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য

'দামোদরের প্রধান স্রোতধারা জামালপুরের পরে সমকোণে বেঁকে গিয়ে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত ছিল, মূল স্রোতধারার বাঁদিকে একটি শক্ত বাঁধ দেওয়া হয়েছিল যাতে বর্ধমান, হুগলী, হাওড়ার (তখনকার বর্ধমান চাকলা) উর্বর জমিগুলি রক্ষা পায়। এই জমিগুলিতে সেচের জন্য সাতটি খাল কাটা হয়েছিল এবং এই সাতটি খাল মিলে বদ্বীপ সৃষ্টি করেছিল। এই খাল বা কানানদীগুলি দামোদরের উপচে পড়া জলনিজেদের মধ্যে বহন করে সারা বর্ধমান জুড়ে ছড়িয়ে দিত। দামোদর ও ভাগীরথীর মধ্যে এই খালগুলি মোট ৭০০০০০০ একর জমি সেচের আওতায় এনেছিল। এমন সুন্দরভাবে এই খালগুলি তৈরী হয়ে ছিল যাতে বহু শতাব্দী ধরে তারা কাজ করে যেতে পেরেছে। —সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে বার্ণিয়ের দুবার বাংলা ভ্রমণ করে লিখেছিলেন রাজমহল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বহু পরিশ্রমে খনন করা অসংখ্য খাল অনেককাল ধরে সেচ ও পরিবহনের কাজ করত।

১৮১৫ সালে হ্যামিল্টন বর্ধমানের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করে লিখেছিলেন সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের দিক দিয়ে বর্ধমান প্রথম স্থান অধিকার করে, দ্বিতীয় তাঞ্জোর।"

সেই সময় বর্ধমানে কৃষি ও শিল্পে শ্রমবিভাগ তেমন স্পষ্ট ছিল না এবং শিল্প তখনও পৃথক বৃত্তি হিসেবে গড়ে ওঠেনি। কৃষক পরিবারগুলি তখন চাষ করা, হাতে সুতো কাটা ও হাতে তাঁত বোনার এক বিচিত্র সমন্বয়ে স্বয়ম্ভর জীবন যাপন করত (৮/৭৫)। ১৭৫২

সালে রবার্ট ওরমে লিখেছিলেন "বাংলায় একটি গ্রামও খুঁজে পাওয়া শক্ত যেখানে প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রী ও শিশু বস্ত্র উৎপাদনে ব্যস্ত নয় (১০/১৭৩)। অন্য কুটিরশিল্পগুলিও অনিবার্যভাবে কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকত। গ্রাম সমাজের কারিগরদের উৎপন্ন দ্রব্যের গ্রাহকরা সাধারণত সেই গ্রামেরই অধিবাসী হতেন, কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী দুটি-একটি গ্রাম থেকে আসতেন। কারিগররা যেসব দ্রব্য তৈরী করতেন সেগুলির প্রত্যেকটি ধরে ধরে তাঁদের দাম দেওয়া হত না। তাঁদের পরিশ্রমের পরিবর্তে প্রতি রায়তের কাছে উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ তাঁরা পেতেন, অথবা তাঁরা কিছু পরিমাণ লাখিরাজ ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করতেন। এইভাবে আর্থিক বিনিময়-বাজারের অভাব থাকলেও ভূমি-ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকরা তাঁদের প্রাপ্য পেতেন। তাই গ্রামগুলি বস্তুতপক্ষে এক একটি স্বয়ম্ভর সমাজ হিসেবে টিকে থাকত। বাইরের জীবনের, রাষ্ট্রীয় ঘটনার, দেশী বিদেশী উত্থান-পতনের ফলে এই সমাজে বিশেষ পরিবর্তন ঘটত না। প্রভাব যা পড়ত তা ভাল বা খারাপ আবহাওয়ার জন্য ফসল ভাল বা খারাপ হওয়ার মতই।

তথ্যপঞ্জী -

১। A. C. Banerjee : The Agrarian System of Bengal Vol. I : 1582-1793 K. P. Bagchi & Co. 1978.

২। নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস। সাক্ষরতা প্রকাশন।

৩। Saiyed Nurul Hasan : Thoughts on Agrarian Relations in Mughal India. (P. P. H., 1973)

৪। F. Floud : Report of the Land Revenue Commission : Bengal : Vol. I, 1940. Bengal Govt. Press.

৫। S. C. Chatterjee : Bengal Ryots.

৬। N. A. Siddique : Land Revenue Administration Under the Mughals (1700 - 1750).

৭। A. I. Chicherov : India : Economic Development in the 16th -17th Centuries. Nanka Pub. House, Moscow 1971.

৮। K. Marx., F. Engels : On Precapitalist Formations.

৯। A. Mitra (ed.) : Census 1951 : District Hand book, Burdwan

১০। S. Bhattacharyya : The East India Company and The Economy of Bengal.

১১। বিনয় চৌধুরী ঃ বাংলার ভূমি ব্যবস্থার রূপরেখা।

□ 'নতুনচিঠি, শারদ সংখ্যা, ১৯৮২ □

বর্ধমানের ভূমি ব্যবস্থা
(ইংরেজ আমলে)
অজিত হালদার

॥ এক ॥

মীরজাফর মসনদে বসার খেসারত হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে যে-পরিমাণ অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বস্তুতপক্ষে তা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। তাই নগদ অর্থের পরিবর্তে তিনি ১৭৫৮ সালে বর্ধমান আর নদীয়ার রাজস্বের কিছু অংশ তন্‌খা হিসেবে কোম্পানীকে দিতে চাইলেন। কিন্তু কোম্পানীর অফিসাররা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তখনকার সমৃদ্ধতম চাকলা বর্ধমানকে নিজ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। মীরজাফর রাজী না হওয়ায় গদীচ্যুত হলেন, আর মীরকাশিম মসনদে বসলেন।[১]

১৭৬০ সনের একটি সনদের মাধ্যমে মীরকাশিম বর্ধমান চাকলাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দিলেন। তাতে বর্ধমানের রাজা ও গ্রাম-প্রধানদের নির্দেশ দিলেন যে তাঁরা যেন ইংরেজ কোম্পানীর কাছে সরাসরি রাজস্ব আদায় দিতে অন্যথা না করেন।[২] বর্ধমানের রাজার অবস্থা তখন খারাপ। শাহ্ আলমের সঙ্গে যুদ্ধে আর বর্গীর হাঙ্গামায় তাঁর জমিদারীতে আর্থিক দৈন্য তখন চরমে। তিনি তাই যথাসময়ে রাজস্ব আদায় দিতে না পেরে কোম্পানীর বিরোধিতা করলেন। তার ফলে একটি ছোট যুদ্ধে ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের হাতে পরাজিত হলেন।

পরাজিত রাজা রাজস্ব আদায় দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্তারা মোগল আমলে নির্ধারিত রাজস্বকে যথেষ্ট বিবেচনা করলেন না। তাঁরা মনে করলেন বর্ধমানের জমির উৎপাদন- ক্ষমতা ও তদনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের আসল ক্ষমতা আরও অনেক বেশী। তাই তাঁরা ১৭৬১ সালে বর্ধমানে একজন অফিসারকে পাঠালেন। এঁর কাজ ছিল জমির বর্ধিত রাজস্ব হার নির্ধারণ করা আর রাজার কাছ থেকে তা কিস্তিমাফিক আদায় করা। এই অফিসার পদের নাম হল রেসিডেন্ট।[৩]

॥ দুই ॥

রেসিডেন্টের অধীনে বর্ধমানে প্রথম যে পরিবর্তন ঘটল তাতে জমিদারী প্রশাসন আর ফৌজদারী প্রশাসন আলাদা হয়ে গেল। মোগল আমলে সাধারণত রাজস্ব আদায়ের জমিদারী প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ফৌজদারী প্রশাসন পৃথক থাকত।[৪] কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে একটি বিশেষ সনদের বলে বর্ধমান চাক্‌লার জন্মলগ্ন থেকেই এই দুটি প্রশাসন একই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত ছিল যার ফলে বর্ধমানের রাজা, রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় আর ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা দুয়েরই সুবিধা ভোগ করতেন।[৫] তাই বর্ধমানের রায়তদের যথাপ্রয়োজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বর্ধমানের রাজাকে একটি বেশ বড় সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখতে হত। আর এই কাজটি ঠিকমত করতে পেরে তিনি একজন প্রায় স্বাধীন স্থানীয় রাজা হয়েছিলেন।

জন জনস্টন ১৭৬৩ সালে বর্ধমানে রেসিডেন্ট হয়ে এলেন। এসেই তিনি প্রথম যে কাজটি করলেন তা হল রাজার সেনাবাহিনীকে কার্যকরভাবে অনেক কমিয়ে দেওয়া।[৬] এই কাজে সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে পুলিশ ও বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইংরেজ সরকারের একটি বিশেষ বিভাগের আওতায় আনলেন। এর ফলে বর্ধমানের জমিদারী কেবলমাত্র একটি রাজস্ব আদায়ের ঠিকাদারী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এই ঠিকাদারী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়ে গেল। কিন্তু ফৌজদারী বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা হারিয়ে বর্ধমানের রাজার পক্ষে এখন থেকে রায়তদের কাছ থেকে জোর করে দেয় রাজস্বের অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ল।

এতদিন গ্রামের চৌকিদার-পাইকরা পর্যন্ত রাজার আমলাদের অধীনে ছিল। ১৭৯২ সালের পুলিশ আইনে তারা বর্ধমানে নতুন প্রতিষ্ঠিত ১৬টি থানার দারোগাদের আদেশ পালনে বাধ্য হল। কাজেই প্রয়োজনানুযায়ী কোনো বিশেষ ব্যক্তির শারীরিক নির্যাতনের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা ও অধিকার এখন থেকে দারোগাদের হাতে চলে এল। আঠারো শতকের শেষ তিন দশকে বৃটিশ প্রশাসন যত বেশি করে সংগঠিত হতে লাগল, তত বেশি করে রাজার স্থানীয় ক্ষমতা কমে গেল, আর তার পরিবর্তে দারোগাদের দাপট বেড়ে গেল। তাদের দাপটের বহর দেখে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমতাবান হওয়ার ধারণা বদ্‌লে গেল। "বাবা, তুমি রাজা হও" না বলে এখন থেকে লোকে বলতে লাগল, "বাবা, তুমি দারোগা হও"।[৭]

কিন্তু যখন রাজার হাত থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা সরে গিয়ে বর্ধমান চাকলার দারোগাদের হাতে ন্যস্ত হল, ঠিক সেই সময়ে ইংরেজদের কেন্দ্রায়িত মিলিটারী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল অন্য কাজে, সারা দেশ জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায়। কাজেই রাজার রাজনৈতিক ও মিলিটারী ক্ষমতার অবলোপের পর দারোগারা দেখল যে তাদের প্রত্যেকে প্রায় ২০০ গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছে, যদিও প্রত্যক্ষভাবে তাদের অধীনে কয়েকটি কনস্টেবল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গ্রামের চৌকিদার ও পাইকরা আইনত দারোগার আদেশ মানতে বাধ্য হলেও তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল গ্রামের প্রধান মোড়লের, যোগাযোগ-ব্যবস্থাহীন দশ বিশ মাইল দূরবর্তী থানার দারোগাদের তারা প্রায়শ চোখের দেখাও দেখতে পেত না। এমন অবস্থায় ২০০টি গ্রামের সবগুলিতে দূরের কথা, যদি কয়েকটিতেও একযোগে কোনো বিক্ষোভ হত তাহলে দারোগারা বিপন্ন বোধ করতেন। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান ছিল ক্ষমতার কিছু অংশ দিয়ে গ্রামের মোড়লদের সন্তুষ্ট রাখা। দারোগারা সেই পথই বেছে নিলেন। আসল ক্ষমতার ভাগাভাগি হল গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে দারোগাদের। রাজা আর রেসিডেন্ট দুজনেই দূরে থাকলেন।

মোগল আমলে এই গ্রাম-প্রধানরাই প্রাথমিক জমিদার ছিলেন। গ্রামের রাজস্ব আদায় করার ভার তাঁদের হাতে থাকত। আবার রাজার পাইক বরকন্দাজ দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ছোটখাট বিচার করার ক্ষমতাও তাঁদের হাতে ছিল। তাই আইনত যে রাজস্ব আদায়

করার ভার তাঁরা পেতেন তার অতিরিক্ত অনেক বে-আইনি কর, আবোয়াব ও মাথোট তাঁরা রায়তদের পেষণ করে আদায় করতেন। এই আদায়ের কিছু ভাগ রাজা পেতেন। এখন দারোগাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির ফলে সেই ভাগ নিয়মিত দারোগাদের কাছে যেতে থাকল।

ক্ষমতা ভাগাভাগির এই নতুন ব্যবস্থা একটি নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল। একদিকে সমস্ত মিলিটারী ক্ষমতা ইংরেজ শাসকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হল, কোথাও স্থানীয় ক্ষমতার চিহ্নমাত্র থাকল না, রাজা কেবল নামেই রাজা থাকলেন। অন্যদিকে গ্রামগুলিকে শাসন করার আসল ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রায়িত হল, দারোগা ও গ্রামপ্রধান এই ক্ষমতা অবস্থানুযায়ী ভাগ করে নিলেন।

॥ তিন ॥

রেসিডেন্ট হিসেবে জনস্টনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ হল বর্ধমানের 'বাজে জমি' অর্থাৎ লা-খিরাজ (বা বিনা-রাজস্ব) ভূমিকে রাজস্ব আদায়ের আওতায় আনার চেষ্টা করা। তিনি অবশ্য এসব জমির সরকারী অধিগ্রহণের কথা আদৌ ভাবেন নি। কারণ একদিকে যেমন বর্ধমানের বেশীর ভাগ জমিই ছিল লা-খিরাজ, অন্যদিকে তেমনি সরকারী প্রশাসন-ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা দুইই ছিল অপ্রতুল। তাই তিনি নিজে কি-কাজে লাগছে তার বাছবিচার না করে সব লা-খিরাজ জমির উপর ঢালাও ভাবে বিঘাপ্রতি ন' আনা রাজস্ব ধার্য করলেন।[৮] ছাড় দিলেন কেবল ১৭৬৫ সালের আগের বাদশাহী সনদে পাওয়া লা-খিরাজ জমিগুলিকে।

কিছুদিন পরই কোম্পানী দেখল বর্ধমানের বেশীরভাগ জমির উপর বিঘাপ্রতি দু-টাকার জায়গায় ন-আনা রাজস্ব আদায় করে মোট রাজস্বের পরিমাণ সর্বোচ্চ করা যেতে পারে না। তাই কোম্পানী আরও বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্যই সামন্ত-কাঠামোর লা-খিরাজ জমিতে "আধা-ভূমিদাস" প্রথার অবসান ঘটিয়ে সরকারী অধিগ্রহণের মাধ্যমে একটি আর্থ-বিনিময় ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করল।[৯] সরকারী অধিগ্রহণের জন্য কোম্পানী যে যুক্তি দেখাল, তা হচ্ছে (১) যেসব জমি থেকে কোনো কর আদায় হত না তা থেকে ন্যায়সংগত কিছু রাজস্ব আদায় করা যাবে, (২) বেনামী লা-খিরাজ জমির মাধ্যমে কম হারে রাজস্ব নির্ধারণ বন্ধ হবে, (৩) অধিগ্রহণ করতে গিয়ে জমিদারীগুলির নূতন সেটেলমেন্ট করা হবে, আর (৪) অকৃষক ভূমি-মালিকের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকের হাতে দিতে পারলে জমির সদ্ব্যবহার হবে ও উৎপাদন বাড়বে।[১০]

১৭৯৩ সালের এক আইনবলে সরকার বর্ধমান-রাজের থানাদারি ও পাইকান জমির সবটুকু বা একাংশ অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। ফলে, অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫শ ১৬ বিঘা থানাদারি জমি রাজস্ব-দানকারি সম্পত্তিতে পরিণত হল, আর পুলিশ-জমা বাড়তি কর হিসেবে রায়তদের ঘাড়ে চাপল।[১১]

ঐ একই বছরের ২২শে মার্চের ঘোষণায় সরকার সমস্ত লা-খিরাজ জমির ব্যাপারে অনুসন্ধান করার ক্ষমতা গ্রহণ করলেন আর ১০০ বিঘার নিচে যেসব লা-খিরাজ জমি ছিল সেগুলিকে মেনে নিলেন।

বর্ধমানের জমি-মালিকদের এই আইন সম্পর্কে প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, যেমন করে হোক আইনের ফাঁকে জমি ধরে রাখার চেষ্টা করা। তাঁরা ১৭৬৫ সালের আগের তারিখের জাল বাদশাহী সনদ জোগাড় করতে লাগলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় সম্পত্তিকে একশ বিঘের কম টুকরো করে আইনের ফাঁকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকলেন। আবার নানা ছল-ছুতোয় মামলা করেও জমি ধরে রাখতে চাইলেন। বর্ধমানে এক বছরে ৭০ হাজারের মত বিরাট সংখ্যায় সনদ রেজিস্ট্রীকরণ মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল।[১২] অবশ্য যেমন মামলা তেমনি তার বিচার। কেবলমাত্র একদিনে (৩,৫,১৮৩৭) বর্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর এইরকম ৪২৯টি মামলা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তি করেছিলেন।[১৩] এইভাবে ৪৫ হাজার মামলা নিষ্পত্তি হল। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সরকার অর্ধেকের বেশী লা-খিরাজ জমি অধিগ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ, গ্রাম-প্রধান ও বড় বড় জমি মালিকদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া হাজার হাজার ছোট ছোট লা-খিরাজ-দারকে খুঁজে বের করা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর তাঁরা এ সাহায্য করতে গিয়ে নিজের নিজের পায়ে কুড়ল মারবেন এটা ভাবা মোটেই সংগত নয়। শুধু তাই নয়, যেসব জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পেরেছিলেন তারও বেশির ভাগ জমি কম খাজনায় আসল জমিমালিকদের কর্মচারী ও মুৎসুদ্দীদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দিতে হয়েছিল। এইভাবে সরকারকে প্রধান জমি মালিকদের সঙ্গে একটা আপোসে আসতে হল। প্রায় ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার বিঘে জমি মাত্র ৭০ জন লোকের হাতে বিলি করতে হল।[১৪] আর বর্ধমানের রাজার পক্ষে প্রিভি-কাউন্সিলের একটি রায়ের পর ও চেষ্টা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

সুতরাং বর্ধমানে লা-খিরাজ জমি থেকে গেল। থেকে গেল সামন্তপ্রথার অবশেষ হিসেবে। কারণ বর্ধমানে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, আয়মা, মহত্তরণ প্রভৃতি নামে যেসব লা-খিরাজ জমি ছিল, অন্তত উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এগুলির অধিকারীরা সামাজিকভাবে জমি কর্ষণ এমনকি তার তদারকি করা থেকেও বিরত থাকতে বাধ্য হতেন। কাজেই জমি ভাগে দিয়ে অনার্জিত উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। অবশ্য অন্য উপায়ের থেকে উদ্বৃত্ত কিছু কম আসত না, প্রায়শই বেশি পাওয়া যেত। মধ্যস্বত্বভোগী জমিদাররাই এসব জমি বেশী ভোগ করতেন। ১৮৭৩ সালে শতকরা ৮ জন পত্তনিদার শতকরা ৭০ ভাগ লা-খিরাজ জমির অধিকারী ছিলেন।[১৫]

॥ চার ॥

জনস্টনের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ছিল একটি ভূমিবাজার তৈরী করা। তাঁর মতে, একটি অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যতিরেকে বর্ধমানের জমির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ সম্ভব ছিল না। "যেহেতু কোনো লোকই লোকসান হবে মনে করে কিছু কিনতে চায় না" সেজন্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দর তুলে সর্বোচ্চ মূল্য যাচাই করা যায়। জনস্টন তাই দেয় রাজস্বের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণের জন্য একটা নীলাম-বাজার তৈরী করলেন। অবশ্য এই বাজার ছিল রাজস্ব-প্রদানকারী জমিদারী কেনাবেচার বাজার। তাঁর তৈরী এই ব্যবস্থাকে "Outcry system" বলা হত।[১৬]

তত্ত্বগতভাবে এই ব্যবস্থা যতই সঠিক হোক না কেন বাস্তব প্রয়োগে এটি বিশেষ কার্যকর হল না। বর্ধমানের রাজা ও তাঁর বেনামদাররা আঠারো শতকে এই ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করতে সফল হয়েছিলেন। যে-সব মহাল বিক্রী হত, তাঁরা সেসব মহালের প্রয়োজনীয় দলিলপত্র লুকিয়ে রাখতেন। তারপর মহাল কিনে কিস্তি বাকি ফেলতেন। তারপর আবার তা নীলামে উঠত। এবার তাঁদের নিযুক্ত লোকেরা নীলাম ডাকতেন,--- তবে আরও কম দরে। এবার তাঁরাও ইচ্ছে করে খরিদ দর বাকি রেখে অনাদায়ী করতেন। ফলে মহালগুলি আবার নীলামে উঠত। এরকম বারকয়েক হাত-বদল হলেই দেয় রাজস্বের পরিমাণ অনেক কমে যেত। বেশির ভাগ জমিদারী সম্পত্তি বর্ধমানের রাজা এভাবেই বেনামে কম দরে কিনেছিলেন।[১৭] অন্যরাও একই পথ অনুসরণ করতেন।[১৮]

অবশ্য এসব জমিদারী সম্পত্তি ধার্য রাজস্বহারের থেকে কম দরে না কিনলে তাঁদের চলতও না।[১৯] কারণ তখনকার ধার্য রাজস্বহারের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি ছিল। ১৭৬৩ সালে গ্রান্ট বর্ধমান চাকলায় গড় রাজস্বহার কত ছিল জানার জন্য একটি সমীক্ষা করেন, তাতে দেয় রাজস্বের পরিমাণ জানা যায় ৪৬ শতকের বিঘে পিছু ২ টাকা।[২০] মনে রাখতে হবে তখন ধানের দর ছিল ৪ আনা মণ।[২১] কাজেই মোট উৎপাদনের প্রায় ৬০ শতাংশ চলে যেত রাজস্ব দিতে, বাকি ৪০ শতাংশ জমিদার ও রায়তের মধ্যে ভাগাভাগি হত। সুতরাং বেআইনি ব্যবস্থায় না গিয়ে সোজা পথে চললে বড় জমিদারী থেকেও আয় বেশি হত না। মার্কসের ভাষায়, এরকম বড় সম্পত্তিগুলো তখন সম্পত্তির ভড়ং-এ রূপান্তরিত হচ্ছিল।[২২] তখনকার সব থেকে বড় জমিদার বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদ ১৭৭১ সালে যখন মারা যান তখন তাঁর উত্তরাধিকারীদের গয়নাগাটি বিক্রী করে ও ইংরেজ সরকারের কাছে ধার করে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করতে হয়েছিল।[২৩]

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কিছুদিন পর থেকে এই অবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেয় রাজস্বহারের পরিমাণ বরাবরের জন্য স্থির হয়ে গেল আর তা স্থির হল টাকার অঙ্কে, অথচ কৃষিউৎপাদনের বাজার মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল। কাজেই ধানের হিসেবে দেয় রাজস্বের পরিমাণ দ্রুত কমতে লাগল। নিচের সারণী থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাবে [২৪]

বছর	মাথাপিছু ধানের দর (টাকায়)			সালে জমির একর পিছু দেয় রাজস্ব (টাকায়)			একর পিছু ধানের হিসাবে দেয় রাজস্বের পরিমাণ (প্রায়)
	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই	
১৭৬৩	০	৪	০	৪	৫	৭	১৮০ মণ
১৭৮৯	০	৮	০	৪	৫	৭	৯ মণ
১৮০০	০	৯	৫	৪	৫	৭	৮ মণ
১৮২১	১	১	৩	৪	৫	৭	৪ মণ
১৮৯০	১	৭	৭	৪	৫	৭	৩ মণ
১৯২০	৪	৮	১০	৪	৫	৭	১ মণ
১৯৫৪	৯	৮	০	৪	৫	৭	½ মণ

দেয় রাজস্বের পরিমাণ দ্রুত কমলেও রায়তদের কাছ থেকে মধ্যসত্বভোগীদের আদায় কিছু কমল না। কারণ এই আদায়টা প্রায়শই হত উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ হিসেবে, আর তার সঙ্গে আবোয়াব, মাথোট প্রভৃতি বেআইনী অর্থসংগ্রহের মাধ্যমে। কাজেই মধ্যসত্বভোগীদের হাতে উদ্বৃত্ত দ্রুতহারে বাড়তে লাগল। জমিদারীতে বিনিয়োগ নিশ্চিতভাবে লাভজনক হয়ে উঠল। একদিকে এই নিশ্চিত লাভ ও অন্যদিকে ঠিকসময়ে রাজস্ব আদায় করা ও জমা দেওয়ার জন্য সরকারী চাপ, এই দুটি শক্তির প্রতিক্রিয়ায় বর্ধমানের মধ্যসত্বভোগীদের অনায়াস উদ্বৃত্তভোগের একটি সুগম রাস্তা তৈরী হল। ইজারা-ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিদারী কেনাবেচা শুরু হল। মোগল আমলের ইজারা-তালুক এখন একটু পরিবর্তিত হয়ে তৈরী হল পত্তনী তালুকে। আগে ইজারা তালুক ছিল অস্থায়ী, পত্তনী তালুকের নতুন ব্যবসায় তা হল স্থাবর সম্পত্তি, উত্তরাধিকারে প্রাপ্তব্য আর ক্রয়বিক্রয়যোগ্য। পুরোনো ব্যবস্থায় জমিদার যেমনভাবে সরকারের কাছে দায়ী থাকতেন, নতুন ব্যবস্থায় পত্তনীদার ঠিক তেমনিভাবে দায়বদ্ধ হলেন জমিদারের কাছে, দরপত্তনীদার পত্তনীদারের কাছে, সে-পত্তনীদার দরপত্তনীদারের কাছে, চারপত্তনীদার সে-পত্তনীদারের কাছে। এইভাবে মধ্যসত্বভোগীদের সংখ্যা ও তাদের আহরিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ দুইই অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে চলল। আর প্রত্যেকেরই রায়তদের কাছ থেকে কিছু না কিছু বাড়তি আদায় হতে থাকল।

১৮৭৩ সালে বর্ধমান জেলায় এরকম মধ্যসত্বভোগীদের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ৮০ হাজারে। অবশ্য এই ৮০ হাজারের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৬ জনেরই বাৎসরিক জমার পরিমাণ ছিল ৫০০ টাকার নীচে। অর্থাৎ বাৎসরিক নীট আয়ের পরিমাণ ৫০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে থাকত।[২৫] এত কম আয় হওয়া সত্ত্বেও এঁরা পত্তনীতালুক কেনার জন্য আগ্রহী হতেন প্রধানত দুটি কারণে। একটি ছিল বংশপরম্পরায় নিশ্চিত আয়। তবে প্রধান কারণ এই ছিল যে এঁদের সকলকেই স্থানীয়ভাবে জমিদার বলা হত আর জমিদার নাম পাওয়া তখন সামাজিকভাবে সম্মানের ব্যাপার ছিল। কিন্তু এঁদের বাদ দিলেও তখন বর্ধমান জেলায় প্রায় ৫০০ জমিদার ছিলেন যাঁদের আয় বেশ ভাল ছিল। অন্তত দশজন ছিলেন যাঁদের আয় বছরে টাকার অঙ্কে ২৫০ হাজারের বেশি ছিল। তবু এঁরাও আয়ের দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিলেন না অন্য কারণে। উদ্বেগহীন নিশ্চিন্ত অনায়াস আয়ের জন্য এঁরা আগেই এঁদের জমিদারী পত্তনী তালুকে বিলি করে দিয়েছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আয়ের পরিমাণ যেমন নিশ্চিত হয়েছে তেমনি তা স্থিরও হয়ে গেছে। কাজেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে প্রতিপত্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা তাঁদের পক্ষে ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠতে লাগল। তাই বিশ শতকের প্রথম দিকে বর্ধমানে খুব বড় জমিদারদের প্রত্যেকেই অন্য আয়ের উৎস সন্ধান করেছেন। বর্ধমানের মহারাজা তাঁর উদ্বৃত্ত ঢেলেছেন কলকাতা ও লন্ডনে কোম্পানীর শেয়ার কেনা, চকদীঘির সিংহরায়রা জাহাজ-পরিবহন ও অন্য ব্যবসায়, ভুতুরিয়ারা তেজারতি-ব্যবসায় আর সিয়ারসোলের পণ্ডিতরা খনি ব্যবসায়।[২৬] আগে এঁদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিল জমিদারী, আর এই সময় থেকে এঁদের আয়ের প্রধান উৎস হল শিল্প ও ব্যবসা।

কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পত্তনীদারদের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। পত্তনী কেনার আগে এঁরা বিভিন্ন বৃত্তি ও ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিলেন। কিছু ব্যক্তির কৃষিজাত আয় থাকলেও বেশীর ভাগেরই জমি থেকে কোন আয় ছিল না। পত্তনী-ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিদার হয়ে এঁরা একটা স্থায়ী মধ্যসত্ব-আয়ের উৎস খুঁজে পেলেন। এই অনার্জিত নিশ্চিত আয় তাঁদের জীবনে বিলাস-বৈভবের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পথে অভিযানের সুযোগ করে দিল, যাতে কেবলমাত্র আর্থিক আয়বৃদ্ধি চরম লক্ষ্য ছিল না। তাই আমরা বর্ধমানের পত্তনীদার শ্রেণীর মধ্যে দেখতে পাই প্রখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায়কে, বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায়কে, প্রতিভাধর আইনবিদ রাসবিহারী ঘোষকে, অনন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামী রাসবিহারী বসুকে, জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত প্রশাসক রমেশচন্দ্র দত্তকে, চলচ্চিত্রে পথিকৃৎ দেবকীকুমার বসু প্রভৃতি আরও অনেককে।

কিন্তু যেহেতু পত্তনী-ইজারা কখনই উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষি-ইজারা ছিল না, সেজন্য পত্তনীদারী প্রকৃত অর্থে জমি-মালিক ছিলেন না কোনোদিন। তাঁদের মালিকানা ছিল মাথাগুনতি প্রজাদের, যাদের গলায় গামছা দিয়ে কিছু আদায় করা যেত। মাঝারি মাপের রায়ত প্রজার সংখ্যা কমলে তাঁদের আয়ও যেত কমে। জমি-মালিক হিসেবে গ্রামের মোড়ল ও বড় রায়তদের বিকল্প হওয়া এঁদের পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না।[২৭] বরং বড়-রায়ত ও মোড়লরাই মাঝে মাঝে বড় পত্তনী কিনে এঁদের বিকল্প হয়ে যেতেন। পত্তনী কেনাবেচার বাজার তাই প্রকৃত ভূমি-বাজার হিসেবে বিকশিত হল না।

॥ পাঁচ ॥

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি-কর্ষণ স্বত্বের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, আর কর্ষণের অধিকারকে এই বন্দোবস্তের মাধ্যমেই প্রথম অরক্ষিত রাখা হল। ফলে মোগল আমলে দখলী-স্বত্বের যে আইনগত অধিকার ছিল তা এখন থেকে আইনত উঠে গেল। মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে সপ্তম ও পঞ্চম আইনের দুটি অস্ত্র তুলে দেওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ হল। একে রায়তদের জমিতে আইনত অধিকার নেই, তার উপর এই দুটি আইনের বলে তাদের আটক রেখে বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রী করে অনর্থনৈতিক আদায় তীব্রতর করায় খাজনার হার দ্রুত বাড়তে লাগল। হ্যারিংটন দেখিয়েছেন, বর্ধমানে ১৮০০ থেকে ১৮১০ সালের মধ্যে খাজনা দুগুণ হয়ে যায়, খাজনার পরিমাণ রায়তদের মুনাফার থেকে তখন অনেক বেশি ছিল।[২৮]

একদিকে সরকারের আয় স্থির থাকছে, অন্যদিকে রায়তদের আয় ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে, অথচ মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের আয় দ্রুতহারে বাড়ছে, এ অবস্থাটা হ্যারিংটন, রিকেট প্রভৃতি কোম্পানীর কিছু অফিসারের বেশ মনঃপূত হল না। তাঁরা নতুন করে ভাবতে লাগলেন। তার উপর রপ্তানী বাজারের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া কর্তৃত্ব উঠে যাওয়ায় আর বিলেতে কলকারখানার প্রসার ঘটায় কয়েকটা শস্যের রপ্তানী বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল। ফলে রায়তদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেওয়া একান্ত দরকার হয়ে পড়ল। আর একাজ করতে গেলে মধ্যসত্বভোগীদের বাড়তি

আদায়ের পরিমাণ কমানো ছাড়া কিছুতেই চলে না। তাই ১৮২৬ সালে রায়তদের অধিকার নিয়ে একটা আইনের খসড়া তৈরী করা হল। তবু যতদিন না পর্যন্ত সাহেব নীলকররা বেশী সংখ্যায় রায়তী জোতের দখলদার হল ততদিন পর্যন্ত এই খসড়া আইন বাস্তব রূপ পায়নি। অবশ্য এইসব চাপের সঙ্গে নিচ থেকে উঠে আসা গ্রাম-প্রধান ও বড় রায়তদের রাজনৈতিক চাপও যুক্ত হয়েছিল।[২৯] এসবের মিলিত ফল হল ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন পাশ।

১৮৫৯ সালের খাজনা আইনে একজন রায়তের একাধিক্রমে ১২ বছরের দখলীস্বত্বকে অধিকার বলে স্বীকার করা হল। আসলে এই আইনে দখলীস্বত্বহীন রায়ত কোর্ফাপ্রজা আর ভাগচাষীদের কোনো অধিকারই স্বীকৃত হল না। কিন্তু এমন সব বড় রায়ত এই আইনের আওতায় এলেন যাঁরা জমিদারকে বছরে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত খাজনা দিতেন। বস্তুতপক্ষে সরকার এই আইনের মাধ্যমে কৃষক সাধারণের মধ্যে একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী বর্গকে বেছে নিলেন যার সম্পন্ন সদস্যারা ক্রেতা হিসেবে কাজ করে একটি ভূমি-বাজার তৈরী করতে পারবে। ১৮৫৬ সালে রিকেটস্-এর প্রস্তাবিত রেজিস্ট্রেশন ফীর উচ্চহার থেকে এটা সহজেই প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে প্রচুর সংখ্যক ঋণগ্রস্ত ছোট রায়ত এই বাজারে বিক্রেতার কাজ করতে বাধ্য হলেন।

১৮৫৯ সালের আইন পাশের পর কৃষি-জমির হস্তান্তর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল। বর্ধমানের জেলা রেজিস্ট্রারের হিসেবমত ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫-এর মধ্যে ৩৫২৮টির জায়াগায় ৭২০০টি কৃষিজমি হস্তান্তরের ঘটনা ঘটেছে।[৩০] এই হস্তান্তর প্রায় সবক্ষেত্রেই ভূমির কেন্দ্রীভবন ঘটাত। ১৮৭৩ সালে পাবনায় কৃষক-বিদ্রোহের পর ১৮৫৯ সালের আইনে কিছু সংশোধন করা হয়। পরে আরও কয়েকবার সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই আইনের মূল চরিত্র ইংরেজ আমলে বদলায়নি।[৩১]

॥ ছয় ॥

বিলেতে শিল্প-বিপ্লবের পর সেখানে ভারতীয় কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দ্রুত কমে গেল। ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটল। শিল্পজাত দ্রব্যের বদলে রপ্তানী হতে লাগল নানা ধরনের কাঁচামাল। বর্ধমান থেকে রপ্তানী হত প্রধানত তুলো, নীল আর চিনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'বিনিয়োগের' পরিবর্তনে এই ছবি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। কাপড়ের উপর কোম্পানীর 'বিনিয়োগ' ১৭৯৫ সালে ৪৭ লক্ষ টাকা থেকে কমে ১৮২৩ সালে দাঁড়াল সাড়ে ৩ লক্ষ টাকায় কিন্তু নীলের উপর 'বিনিয়োগ' ১৮১০ সালে ২০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৮২৩ সালে দাঁড়াল ৪০ লক্ষ টাকায়।[৩২]

বর্ধমানের কৃষকরা এই বিনিয়োগের শিকার হলেন প্রধানত নীল, তুলো আর চিনির উপর দাদনের মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে উৎপাদন বাড়ল কিন্তু চাষীদের ঋণভার কমল না। ঋণশোধ করা ও রাজস্ব দেওয়ার জন্য অর্থের চাহিদা বাড়ল। ফলে বর্ধমানে দ্রব্য-অর্থ সম্পর্ক নিয়ে যে বাজার তৈরী হল তা একদিকে যেমন স্বাধীনতা পেল না, অন্যদিকে তা স্বয়ম্ভর গ্রাম অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারল না। কৃষি উৎপাদনের পুরোনো প্রথাই চালু থাকল, উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠল না।

ব্যবসায়িক কৃষিপদ্ধতি যে গড়ে উঠল না তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বর্ধমানের তুলো চাষের ইতিহাসে। তুলো চাষ বর্ধমানে কিছু কম হত না, কিন্তু তুলোর কোনো বাজার বর্ধমানে গড়ে উঠেনি। যা উৎপাদন হত সবটাই বর্ধমানের বস্ত্রশিল্পে ব্যয়িত হত। কোম্পানী যখন উৎপাদিত বস্ত্রে 'বিনিয়োগ' বন্ধ করে দিয়ে তুলোর উপর বিনিয়োগ বাড়াল তখন থেকেই তুলোর উৎপাদন কমতে আরম্ভ করল। তুলোর দাম বাড়লেও উৎপাদন বাড়ল না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬২-৬৫) তুলোর দাম অনেক বেড়ে গেল। সরকারও নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে উৎপাদনের মান ও পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু সব বৃথা। কৃষিকাঠামোয় মূলগত কোনো পরিবর্তন না ঘটায় সরকারী প্রচেষ্টার কোনো ছোঁয়া ছোট রায়ত পর্যন্ত পৌঁছল না। ১৮৭৮ সালে বর্ধমানের জমিদার বাবু সারদাপ্রসাদ রায়কে সরকার বিনামূল্যে উচ্চমানের হিঙ্গুলঘাট তুলোবীজ দিয়েছিলেন যাতে তিনি তা রায়তদের মধ্যে বিতরণ করে পরীক্ষামূলক উৎপাদন করতে উৎসাহ দেন। পরের বছর ১৮৭৯ সালে বর্ধমানে কমিশনার রাভেনস্ তাঁর প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন, উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা বিতরণ করা পর্যন্ত হয়নি।[৩২] ১৮৬০ সালেও বর্ধমানে প্রায় ১০ হাজার মণ তুলো উৎপাদন হত কিন্তু ১৮৮০ সালে তা দাঁড়াল ৫ হাজার মণে আর বিশ শতকে এসে এই শস্যের উৎপাদন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।[৩৩]

তবে নীল চাষে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বর্ধমানে জন চীপ এই চাষ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুরু করেন। তুলো কিংবা আখ চাষের মত এই চাষ বর্ধমানে প্রথাগত চাষ ছিল না। তবু কয়েক দশকের মধ্যে বর্ধমানে নীলচাষ ব্যাপকভাবে হতে থাকে, পরিমাণে ঢাকা জেলার পরই বর্ধমানের স্থান ছিল।[৩৪] তবে অন্যান্য জেলার থেকে এই জেলার পার্থক্য এই ছিল যে এখানে নীলচাষের প্রায় সবটাই নিজ চাষ পদ্ধতিতে হত। রায়তী পদ্ধতিতে চাষ না হওয়ার কারণেই বোধহয় এই জেলায় নীল-বিদ্রোহের প্রভাব পড়েনি। নিজ চাষ-পদ্ধতিতে সাহেবরা জমি ইজারা নিয়ে সাঁওতাল কুলি দিয়ে চাষ করাতেন। জমি ইজারা নিতে প্রচুর সেলামী আর উঁচু হারে খাজনা দিতে হত। তা সত্ত্বেও লাভ বেশ ভালই হত। ১৮৬০ সালের ইন্ডিগো কমিশনে সাক্ষী দিতে গিয়ে বর্ধমানের কালনার নীলকর সয়ার্স জানাচ্ছেন, একমণ নীলে সব খরচ মিটিয়ে নীট লাভ ছিল ৫০ টাকা আর এক হাজার বিঘে নীল চাষ করলে নীল পাওয়া যেত ৫০ মণ। অর্থাৎ বিঘেপিছু আড়াই টাকা নীট লাভ। সয়ার্স তখন ১৭ হাজার বিঘে চাষ করতেন।[৩৫]

বর্ধমানের নীলচাষ পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হলেও তার মধ্যে প্রকৃত পুঁজিবাদী চরিত্র গড়ে উঠল না। নীলকররা দ্রুত লাভ করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, আর যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ধনী হয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। আর যেহেতু এদেশের অধিবাসী হয়ে দীর্ঘদিন থাকা তাঁদের পছন্দসই ছিল না, সেজন্য তাঁরা কৃষি উদ্বৃত্ত জমিতে পুনর্বিনিয়োগের কথা ভাবতেনই না। ফলে একদিকে যেমন কৃষি-পুঁজি গড়ে উঠল না, অন্যদিকে তেমনি নীলের দাম কমতে শুরু করার আগেই বর্ধমানে বর্ধমান জ্বর দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিঃশব্দে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেলেন। দেশীয় ধনী

ব্যক্তিরাও অনর্জিত আয়ে অভ্যস্ত থাকার জন্য এই চাষে আগ্রহী হলেন না। ফলে সাহেবদের কুঠিবাড়িগুলির বেশির ভাগই রাজার দখলে গেল।

॥ সাত ॥

সারা ইংরেজ-শাসনে বর্ধমানের জমিতে জনসংখ্যার চাপ তখন অনুভূত হয়নি। এর কারণ ১৯২১ সাল পর্যন্ত বর্ধমানে জনসংখ্যা আদৌ বাড়েনি। ১৮১৪ সালে বর্ধমানে জনসংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার, ১৮৭২ সালে ১৪ লক্ষ ৮৩ হাজার আর ১৯২১ সালে ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার[৩৬]। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে বর্ধমান-জ্বর দেখা দেয় প্রধানত তাই এই স্থিতিশীল জনসংখ্যার কারণ। এই জ্বরের প্রকোপে মৃত্যুহার বেড়ে গেল, আর জন্মহার কমল। দামোদরের বন্যা থেকে রেললাইন আর জি. টি. রোড বাঁচাবার জন্য নদীর একদিকে একটি বাঁধ দেওয়া হয় যার ফলে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়, আবহাওয়া ভিজে ও স্যাঁতসেতে হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের আর্বিভাব ঘটে। তখন এইসব রোগের কারণ আবিষ্কার হয়নি আর তাদের আলাদা করে চেনা যেত না, তাই এদের সমাহারকে বলা হত বর্ধমান-জ্বর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই জ্বর তার তাণ্ডব চালিয়ে গিয়েছে। জনসংখ্যা না বাড়ায় আর কৃষি কাঠামোয় বড় ধরনের পরিবর্তন না আসায় ইংরেজ আমলে বর্ধমানে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কেবলমাত্র কিছু অরণ্যচারী উপজাতি ও রেলপথ সম্প্রসারণের কাজে নিযুক্ত কিছু লোক কয়লাখনিতে বেশি মজুরিতে কাজ করতেন।[৩৭] আর বর্ধমানে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বেশি না থাকার জন্যই কয়লাখনিতে বিহারী শ্রমিক আমদানী করতে হত ব্যাপকভাবে।

অবশ্য ভূমিহীন ক্ষেতমজুর কম থাকার মানে এই নয় যে, ইংরেজ আমলে সব গ্রামবাসীরই ভূমিতে রায়তীস্বত্ব ছিল অথবা ভূমির কেন্দ্রীভবন বন্ধ ছিল। বরং এই সময়ে তার উল্টোটাই ঘটেছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ধানের দাম দ্রুত বাড়তে আরম্ভ করল আর রেলপথ সম্প্রসারণের ফলে তা আরো দ্রুত হল। ফলে কৃষিজমিরও দাম বাড়ল আর দখলীস্বত্ব বিক্রয়যোগ্য হওয়ায় যাঁদের হাতে উদ্বৃত্ত ছিল তাঁদের তা কৃষি জমি ক্রয়ে বিনিয়োগের পথ শঙ্কাহীন হয়ে উঠল। উনিশ শতকের শেষদিকে কৃষিজমি কেনাই বিনিয়োগের সবথেকে লাভজনক পথ হল। আর তা কেনার সবথেকে সহজ পথ হল ঋণে আবদ্ধ ছোট রায়তের জমি আইনত হস্তান্তর করা। এইরকম ঋণসঞ্জাত হস্তান্তরের ফলে কৃষিজমি ক্রমশ অকৃষক তেজারতী-কারবারী, ব্যবসায়ী ও জমিদার বড় রায়তের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকল। আর এই কেন্দ্রীভবনের ফলে যে বড় বড় কৃষি-জোত তৈরী হল তা নয়। অকৃষক-মালিকরা বড় কৃষিজোত তৈরী করায় মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তাঁদের আগ্রহ ছিল ছোট রায়তদের ভাগচাষীতে রূপান্তরিত করার। ফলে বর্গাচাষে জমির পরিমাণ ও বর্গাচাষীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল।

একদিকে স্থিতিশীল ভূমি-মানুষ অনুপাত আর অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান বর্গাচাষের পরিমাণ, এই দুই বাধার ফলে বর্ধমানে কৃষি-শ্রমের প্রতিযোগিতাভিত্তিক কোনো বাজার গড়ে উঠল না। উঁচু জাতের জোত-মালিকরা কখনও নিজ হাতে চাষ করতেন না, নিজেদের

তত্ত্বাবধানে চাকরবাকর দিয়ে চাষ করাতেন।[৩৮] কিন্তু চাষের কাজে নিযুক্ত এই চাকরদের কখনই টাকা পয়সা দিয়ে দিনমজুরি দেওয়া হত না। সাধারণত তাঁদের খাওয়া-পরা দিয়ে ও ধান দিয়ে সারা বছরের জন্য নিযুক্ত করা হত, আর কখনও কখনও শুধুই উদ্বৃত্ত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হত। ধানবারি দেওয়া থাকলে ফসল ওঠার সময় সুদ সমেত কেটে নেওয়া হত।[৩৯] ফলে স্বাধীন শ্রমের স্থানীয় বাজারও বর্ধমানে গড়ে উঠল না আর যেহেতু চিরাচরিত খাওয়া-পরা আর ধানের মাধ্যমে চাকরদের মজুরি দেওয়া হত তাদের শোষণের হারও এক জায়গায় থেমে থাকল।[৪০]

॥ আট ॥

এটা স্পষ্ট যে বর্ধমানে, ইংরেজ আমলের প্রথমার্ধে অন্তত ঔপনিবেশিক শোষণের প্রধান পদ্ধতি ছিল সর্বাধিক রাজস্ব আদায়, আর সরকারের প্রাথমিক কাজ ছিল এই আদায়কে যথাযথ ও ত্বরান্বিত করা। বর্ধমানের সামন্ত-কাঠামোর মধ্যে যথাসময়ে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রয়োজন হল একটি সুশৃঙ্খল কেন্দ্রায়িত আমলাতন্ত্রের। আর বৃটিশ ঐতিহ্যবাহী এই আমলাতন্ত্র তার লক্ষ্যপূরণের জন্য বিলেতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্ধমানে কৃষি কাঠামোয় কিছু কিছু বুর্জোয়া নীতি চালু করার চেষ্টা করল। যে চেষ্টা তখন করা হল তা হচ্ছে

(১) সমস্ত সেবাভিত্তিক ভূমিব্যবস্থা লা-খিরাজ-এর পরিবর্তে একটি আর্থ-বিনিময় ব্যবস্থা চালু করা।

(২) একটি ভূমি-বাজার তৈরী করে তার মাধ্যমে জমির প্রকৃত প্রতিযোগিতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ করা।

(৩) চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিতে উদ্যোগী একটি বর্গ তৈরী করা যাঁর সদস্যরা বড় কৃষি-জোতের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি লগ্নী করতে পারবেন, এবং

(৪) স্থানীয় সামন্তপ্রভু রাজার ক্ষমতা খর্ব করে একটি কেন্দ্রীভূত পুলিশ ও প্রশাসন ব্যবস্থা বজায় রাখা, যার ছত্রতলে গ্রামীণ ভদ্রশ্রেণী ক্ষমতাবান হবার সুযোগ পাবেন।

কিন্তু এই নীতিগুলির বাস্তব রূপায়ণের জন্য ইংরেজ সরকার প্রথমদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের সহায়ক মুৎসুদ্দী চরিত্রের কিছু ব্যক্তিকে উদ্যোগী বলে বেছে নিয়েছিলেন যাঁরা এই সমস্ত কাজের জন্য সঠিকভাবে উপযুক্ত ছিলেন না। কাজেই যে উদ্বৃত্ত পুঁজিভিত্তিক বড় কৃষিজোতের প্রসার ঘটাবে বলে ভাবা হয়েছিল, সেই উদ্বৃত্ত নিয়োজিত হতে থাকল রাজস্ব-প্রদানকারী জমিদারী কেনায়। এবং এইসব ব্যক্তিরা মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই ঠিক মোগল আমলের মত ধাপে ধাপে বিভক্ত অভিজাতশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। মোগল আমলের তালুকদাররা ইংরেজ আমলে যেন নাম বদলে পত্তনী তালুকদার হলেন। জমির নীলামে কেনাবেচার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে যোগসাজসই প্রধান নিয়ন্ত্রক হল। লা-খিরাজ জমি স্বরূপে ও অন্যরূপে বহুল পরিমাণে বজায় থাকল।

এই আমলে প্রধান সামাজিক দ্বন্দ্ব ছিল ঔপনিবেশিক সরকার ও সাধারণ রায়তদের মধ্যে। বর্ধমানের বড় পত্তনীমালিকরা এই দুই-এর মধ্যে একটি মধ্যবর্তী বর্গ হিসেবে অবস্থান করতেন। তাঁরা সরকারের সঙ্গে সবসময় একটি সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন, তার কারণ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এই সরকারই তাঁদের প্রচুর উদ্বৃত্ত আহরণের সুযোগ করে দিয়েছিল। তাঁদের সরকারকে দেয় পরিমাণ ছিল স্থির কিন্তু রায়তদের কাছে আদায়ের পরিমাণ ছিল ক্রম-বর্ধমান। এই ক্রম-বর্ধমান আদায়ের জন্য এই সরকারই মোগল আমলের স্থির পরগণা-হারের পরিবর্তন করে প্রয়োজনানুযায়ী রাজস্ব হার পরিবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছিল। আবার তাঁরা বড় রায়ত ও গ্রাম প্রধানদের সঙ্গেও একটি সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। কারণ তাঁদের সাহায্য ছাড়া উচ্চহারে খাজনা, আবোয়াব ইত্যাদি আদায় করা আদৌ সম্ভব ছিল না। বড় পত্তনী-মালিকদের ব্যবহারের এই দ্বৈত-চরিত্রের জন্যই এই বর্গের মধ্যস্থিত কিছু ব্যক্তি বৃটিশ সরকার তথা সামন্ত রক্ষণশীলতার শক্তিশালী সহায়ক হলেন, আবার কিছু ব্যক্তি জাতীয় স্বার্থ তথা সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রগতির অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত হলেন।

বৃটিশ শাসনের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বোঝা গেল যে বড় মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষিতে পুঁজিবাদ-বিকাশের ধারক-বাহক হতে পারবেন না। তাঁরা ইতিমধ্যেই তাঁদের উদ্বৃত্ত ব্যবসায় ও শিল্পে বিনিয়োগ করতে আরম্ভ করেছেন, কৃষি তাঁদের বিচারের মধ্যে আদৌ আসেনি। কৃষিতে এই বর্গের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাধান্য হ্রাস পেল এই কারণে যে ইংরেজ-শাসন সুরক্ষিত করার জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয়তা ততদিনে ফুরিয়েছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজ সরকারের নজরে পড়ল বড় রায়ত আর মোড়লদের উপর। এঁরাই কৃষিজোত পরিচালনা করতেন। কিন্তু এতদিন এঁদের দখলী সম্পত্তির কোনো আইনগত অধিকার ছিল না। যদিও এঁরা জমিদারদের সামনে প্রায়শ খুব একটা অসহায় ছিলেন না, তবুও কিছুদিন পরপর এঁদের উপর উচ্চহারে খাজনার চাপ পড়ত। কাজেই কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের জন্য এঁদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়ার প্রয়োজন ঘটল। এঁদের স্তরে পুঁজি জমা করার জন্য উদ্বৃত্ত বাড়াবার প্রয়োজন হল আর তা করতে গিয়ে দেখা গেল রায়তদের খাজনার হার বেঁধে না দিলে উদ্বৃত্ত জমিদারদের হাতে চলে যাচ্ছে। ১৮৫৯ সালের খাজনা-আইন এই কাজেই ব্যবহৃত হল।

॥ নয় ॥

মোগল আমলের বর্ধমানের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই বড় রায়তদের ক্ষমতার মূল প্রোথিত ছিল। নিজামতের পতনের সময় (১৭৫৭-৬৫) রাজস্ব প্রশাসনে নৈরাজ্য ও বর্ধমানের রেসিডেন্টের জমিদারী ইজারার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা (১৭৬৫-৮৬) বড় রায়ত ও গ্রামপ্রধানদের শক্তি বাড়িয়ে নেবার সুযোগ করে দিল। ১৭৯৩-এর সেটেলমেন্টের সময় বর্ধমানের কালেকটর আবিষ্কার করলেন যে ছোট রায়তরা যখন উঁচুহারে খাজনার ভারে জর্জরিত হচ্ছেন তখন প্রধান রায়তরা অনেক বেশি জমি গরিব রায়তদের তুলনায় বিঘেপিছু অর্ধেকেরও কম খাজনায় ভোগ করছেন।[৪১] ১৭৯৪ সালে কোলেব্রুক দেখলেন এঁরা ছোটখাটো পুঁজিপতির মত ব্যবহার করছেন, বীজ আর শস্য ধার দিয়ে লোক খাটাচ্ছেন আর ভাগচাষে জমি বিলি করছেন।[৪২]

১৮২০ সালে হ্যামিলটন লক্ষ্য করেছিলেন যে বর্ধমানে প্রতি ১৬ জনে ১জন এমন বড় রায়ত বা জোতদার ছিল যাঁর জমির পরিমাণ ৩০ থেকে ১০০ একরের মধ্যে থাকত। এইসব জোতদাররা তাঁদের জমির কিছু অংশ নিজেরাই চাষ করতেন, বাকি অংশ ভাগে বিলি করতেন।[৪৩] এঁরা জমিদারের খাজাঞ্চী খাতায় রায়ত ছিলেন কিন্তু অধীনস্থ কোর্ফা প্রজা ও ভাগচাষীদের কাছে ভূস্বামী ছিলেন। ১৮৫৯ সালের আইনে জমিদারদের বিপক্ষে এঁদের অধিকার রক্ষা করা হল কিন্তু এঁদের বিপক্ষে ভাগচাষীদের অধিকার অস্বীকার করা হল। আবার এই সময়ের মধ্যে বড় মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে এঁরা শেষ পর্যায়ের ছোটখাটো পত্তনী-তালুক খরিদ করে জমিদার নাম কিনেছেন। কাজেই এঁদের ধনী হওয়ার পথ নানা দিকে প্রসারিত হল। মোটামুটি পাঁচটি লাভজনক আয়ের উৎসের সঙ্গে এঁরা যুক্ত ছিলেন রাজস্ব আদায়, নানা ধরনের চাকরের সাহায্যে কৃষিজোতের নিজস্ব পরিচালনা, বর্গাদারদের কাছে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ কি তারও বেশি আদায়, তেজারতি কারবার এবং ধান কেনাবেচার ব্যবসা। প্রচুর আর্থিক উদ্বৃত্ত, আইনগত অধিকার ও ক্ষমতা, দারোগাদের সঙ্গে যোগসাজস, পত্তনী জমিদার হিসেবে সামাজিক প্রতিপত্তি আর নগদী লাঠিয়ালদের জোরে এঁদের প্রত্যেকে বর্ধমানের গ্রাম-সমাজকে সবদিক থেকে এক-একটি সম্রাটের মত শাসন করতেন। এঁরা এঁদের স্বার্থের পরিপন্থী প্রত্যেকটি কাজের সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করতেন। এমনকি ইংরেজ সরকারও এ বিষয়ে রেহাই পায়নি। ১৯৩৯ সালের বিখ্যাত বর্ধমানের ক্যানেল-কর আন্দোলনে এঁরা এঁদের শক্তির সফল পরীক্ষা দিয়েছেন। এই আন্দোলন যাঁরা পরিচালনা করতেন সেইরকম ২৫ জন প্রধান প্রধান ব্যক্তির মধ্যে ২০ জনই ছিলেন জোতদার।[৪৪] তাঁরা সরকারকে তাঁদের সঙ্গে আপোস আলোচনায় আসতে বাধ্য করেছিলেন, এবং ক্যানেল-করকে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনতে সফল হয়েছিলেন।

এইসব বড় রায়ত যাঁরা ১০০ বিঘে কি তারও বেশি জমি নিজ দখলে রাখতেন তাঁদের সংখ্যা সারা ইংরেজ আমলে প্রায় একই ছিল।[৪৫] অবশ্য হিসেবের মধ্যে বর্ধমান জেলা-সংলগ্ন অন্য জেলাগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণের ব্যাপারটাও মনে রাখতে হয়েছে। আজকের আয়তনের বর্ধমান জেলায় এঁদের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার ছিল, এবং ইংরেজ আমলে তার বিশেষ হেরফের ঘটেনি। অথচ জেলায় সমস্ত রায়তের সংখ্যা উনিশ শতকের শেষদিকে প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। এর অর্থ এই যে, অনেক ছোট রায়ত এই সময়ের মধ্যে ভূমিহীন হয়ে পড়েন এবং বড় রায়তরা সংখ্যায় একই থাকলেও ছোট রায়তদের জমি নিজেদের দখলে এনে আরও বেশি ধনী হয়ে পড়েন।

যদিও অনেক গরিব রায়তদের জমি বড় রায়তরা তাঁদের দখলে এনেছিলেন, তবু তাঁরা সেই সব জমি এই আমলে বড় জোতে রূপান্তরিত করে নিজ চাষের অন্তর্ভুক্ত করেননি। প্রচলিত পশ্চাৎপদ কৃৎকৌশল, বর্গাচাষের মাধ্যমে অতি সহজে উদ্বৃত্ত আহরণের উপায় আর পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে কৃষির রূপান্তরকরণের অনভিজ্ঞতা ও ব্যর্থতা, তাঁদের বড় জোত তৈরী করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছিল। আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে তাঁরা প্রত্যক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে সরে এসে বর্গাচাষকেই উৎপাদনের লাভজনক উপায় হিসাবে

আঁকড়ে ধরেছিলেন। আবার ছোট রায়তরা যত বেশি করে ভূমিহীন হয়ে পড়তে লাগলেন, বর্গাচাষে জমি পাওয়ার জন্য তত বেশি তাঁদের প্রতিযোগিতা বাড়ল, আর সেজন্য বর্গার হারও তাঁদের বিপক্ষে যেতে লাগল। ক্রমশ এইসব সদ্য-ভূমিহীন রায়তরা বীজ, বলদ ও অন্য উপকরণের জন্য বড় রায়তদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে লাগলেন, যার ফলে বাজার সম্পর্কের বিকাশ ঘটা ব্যাহত হতে থাকল। এমন কি কৃষি শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও মজুরি দেওয়া হত প্রচলিত হারে খাদ্য বস্ত্রের মাধ্যমে। সুতরাং ইংরেজ আমলের বর্ধমানে কৃষি উৎপাদন বড় রায়ত বা জোতদারদের ছত্রছায়ায় ছোট-ছোট জোতে শ্রমনিবিড় ও বহুকাল ধরে প্রচলিত পদ্ধতিতেই নির্বাহ হতে থাকল।

তথ্যপঞ্জী ঃ

১. A. C. Banerjee : The Agrarian system of Bengal, Vol. II (P.-87)
২. W. K. Firminger : Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report (P.142)
৩. A. C. Banerjee, Ibid (P-90)
৪. Ibid (P-51)
৫. W. K. Firminger : Ibid (P-56)
৬. Ibid (P-150)
৭. Ratnalekha Roy : Change in the Bengal Agrarian Society (P-84)
৮. W. K. Firminger : Ibid (P-155)
৯. C. Palit: Tensions in Bengal Rural Society (P-1)
১০. Ibid (P-28)
১১. A. C. Banerjee : Ibid (P-326)
১২. C. Palit: Ibid (P-34)
১৩. Ibid (P-22)
১৪. Ibid (P - 43)
১৫. Burdwan District : Statistics by Parganas, Part III
১৬. N. K. Sinha : Economic History of Bengal, Vol. II (P-26)
১৭. C. Palit : Ibid (P-10)
১৮. Ratnalekha Roy : Ibid (P - 100)
১৯. C. Palit : Ibid (P - 15)
২০. W. K. Firminger : Ibid
২১. Floud : Report of the Land Revenue Commission : Bengal. Vol - I (1940)
২২. E. Komorov : New Indian Studies by Soviet Scholars.
২৩. W. W. Hunter : The Imperial Gazetteer of India, Vol. I (1881)
২৪. Floud : Ibid

২৫. Burdwan District : Statistics by Parganas, Part III.

২৬. V. I. Pavlov : Historical Premises for India's Transition to Capitalism (P-344)

২৭. Ratnalekha Roy: Ibid

২৮. C. Palit: Ibid (P - 156)

২৯. Ibid (P - 176)

৩০. Settlement Report on the Burdwan Raj and Certain other Estates in District of Burdwan, Hooghly and Bankura (1891-96)

৩১. Floud : Ibid

৩২. S. Bhattacharyya : The East India Company and The Economy of Bengal (P 13)

৩৩. File No. B 23-24, Oct. 1979, Revenue Department, Agricultural Branch, Govt Of West Bengal

৩৪. Annual Report : Administration of the Bengal Presidency · 1865

৩৫. Report of the Indigo Commissioin (1860)

৩৬. Annual Report : Administration of the Bengal Presidency : 1865

৩৭. W. Firminger : Ibid

৩৮. Particulars Regarding Different Types of Tenants and Cultivation under Raj Khas Mahals (1891-96)

৩৯. Ibid.

৪০. A. C. Mitra · Census, 1951, (District Handbook, Burdwan)

৪১. Ratnalekha Roy : Ibid (P.- 66)

৪২. C. Palit: Ibid (P - 153)

৪৩. W. Hamilton : Geographical, Statistical and Historical Description of Hindostan, Vol - I (1820)

৪৪. অধ্যাপক ভাস্কর দাশগুপ্তের সংগৃহীত তথ্য।

৪৫. A. C. Mitra : Ibid.

বাংলার জমিদার সম্প্রদায় ও তৎকালীন সমাজ

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

অনেক বিষয়েই গবেষণার আগ্রহ আছে এমন মানুষও আগ্রহ চরিতার্থ করতে পারেন না। আগ্রহের সমতুল অধ্যবসায়ের অভাব থাকতে পারে। কিন্তু এও তো সত্য জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনেই হোক বা রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে বিষয়ান্তরে নিযুক্ত থাকার কারণেই হোক সময়ের অভাব ঘটে। ইংরেজ আমলে আরও অসুবিধা ছিল। ইতিহাসের ক্ষেত্রে সরকারী মুহাফিজখানায় রাখা নথিপত্রে প্রবেশের অধিকারই ছিল না। তাছাড়া রাজনৈতিক কর্মীদের ক্ষেত্রে জেল, গোপনবাস, পুলিশ এড়ানোর জন্য ঘন বন বাসস্থান ও কর্মস্থল পরিবর্তন এরকম অনেক কিছু বিঘ্নই ছিল যার সঙ্গে গবেষণার অনুশীলন খাপ খায় না। এখনও এই ধরণের কর্ম যাদের, সর্বদাই গণ সংগঠনের কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের পক্ষে আগ্রহ থাকলেও আলোচ্য ধরণের কাজে মনোযোগই সম্ভব নয়। যে কোন কারণেই হোক নিজেরা যে কাজ করে উঠতে পারিনি অপরকে সে সম্বন্ধে বলতে কুণ্ঠা হয়। তবু আগ্রহটা প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয়; অনুরোধও করতে বাধা নেই।

অনেকেরই আগ্রহ আছে এমন একটা বিষয়ের কথা এখানে তুলবো। জমিদারদের নিগ্রহের কথা আমরা শুনেছি। আমাদের বয়সী অনেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও থেকেছে। আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা জোতদার বা মহাজন প্রভৃতির নানান রকম শোষণ ও নিপীড়ন দেখছেন কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে যে বস্তুটি দেড়শো বছরের অধিক বাংলাদেশের বুকে চেপে ছিল তার নিপীড়নমূলক চরিত্র ভালভাবে তাঁদের জানা নেই। অথচ আগ্রহও আছে। কৃষকের উত্থান যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু তথ্যমূলক ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। এতে কৃষকের সংগ্রাম শক্তি বিদ্রোহ সংগঠনে নিপুনতা কৃষকের বীর সন্তানদের আত্মত্যাগ প্রভৃতির সঙ্গে জমিদারদের অত্যাচারের কথা থাকলেও সামগ্রিকভাবে সমগ্র জনজীবনের উপর যে চাপ প্রতিনিয়ত অনুভূত হতো তার পরিচয় পাওয়া কঠিন। বরং আমাদের সাহিত্যে নাটক প্রভৃতিতে এর কিছু পরিচয় আছে। এক লালবিহারীদের ইংরাজীতে লিখিত "বেঙ্গল প্রেজেণ্ট লাইফে" যা আছে ইতিহাসের বইয়ে কোথাও তা নেই। এমন একটি শক্তি যার ফলে গ্রামের সঙ্গতি সম্পন্ন সচ্ছল শিক্ষিত পরিবারের কর্তাকেও জমিদার বা তার নায়েবের আহ্বানে কাছারিতে হাজির দিতে হতো। গরীবদের হয়তো ডাক মাত্রই ছুটতে হতো। তথাকথিত 'ভদ্রলোক' হয়তো রয়ে বসে যেতেন। কিন্তু যেতে হতই। অবশ্য বিরোধী প্রজা হিসেবে যিনি সব কিছু অত্যাচার বরণ করার সিদ্ধান্ত করেছেন তাঁর কথা আলাদা। সচরাচর যা ঘটতো আমি তার কথাই বলছি। গ্রামে সবারই জমিদার বাড়ী বা কাছারীর নিকট বাধ্যবাধকতা। ফলে অর্থনৈতিক আইনগত আধিপত্য ছাড়া একটা প্রচ্ছন্ন জনবলও কাজ করতো। এমন মানুষও তো ছিলেন যাঁদের স্বাচ্ছল্যের কারণ হয়তো শহরে কাজ কারবার (জমিজমা এমন কিছু নয় সুতরাং প্রত্যক্ষ

বাধ্যবাধকতার কারণও তেমন নয়) অথচ জমিদারের ঐ বাধ্যবাধকতায় সংগৃহীত জনবলের কারণেই হয়তো কিছুটা সমীহ করে চলতে হতো।

বাধ্যবাধকতার কারণগুলি খুব সুস্পষ্ট। গ্রামে গরীবদের বাসস্থান প্রায়ই ছিল স্বত্বহীন কোরফা স্বত্ব। কোরফা স্বত্বের অর্থ হচ্ছে জমিদারের যখন ইচ্ছা খাস করে নেওয়া যেতো। উঠতে বললেই উঠতে হতো। যাদের স্থিতিবান স্বত্ব আইনতঃ হুকুমে তোলা যায় না তাদেরও খাজনা (বিশেষ জমে ওঠা বাকী খাজনা) আদায়ের তরাসে থাকতে হতো। কতকগুলি অসুবিধাজনক বাধ্যবাধ্যকতা ছিল সর্বস্তরের গ্রামবাসীর। ভিটেমাটি সবকিছু সেরেস্তা তো সেই জমিদারের কাছারী। মারা গেলে ওয়ারিশানদের নাম পত্তন করতে নায়েব ও জমিদারের খোসামুদি। জমিদারের কিছু অর্থ-প্রাপ্তি। বিক্রী করতে গেলে প্রথম প্রশ্ন জমিদারের অগ্রাধিকার। জমিদারকে প্রথম কেনার অধিকার দিতে হবে। অন্যথায় বিক্রী হলেও জমিদার সেটা ফিরে নিতে পারবে। ফলে নির্ধারিত মূল্য থেকে একাংশ জমিদারকে দিয়ে ছাড়পত্র নিতে হতো। এই সুযোগে বিক্রয়েচ্ছু প্রজাকে কোন কারণে জব্দ করার ইচ্ছা থাকলে জমিদারের কাছারী থেকে অনেক কিছু কেরামতি করে প্রতিযোগী খরিদ্দারদের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে বিক্রী অসম্ভব করা হতো কিংবা নিতান্ত কম দামে বেচতে বাধ্য করা হতো। অগ্রাধিকার ছাড়া জমিদারের হাতে ছিল নতুন প্রজার নাম পত্তন। জমা ভাগ ছিল আর এক সমস্যা। কয়েক বিঘার একটি জমিকে খণ্ড খণ্ড করে ভিন্ন ভিন্ন জমায় ভাগ করার প্রয়োজন হলে, জমিদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতো। ভাগাভাগি, বিক্রয় এসব কারণ ছাড়াও প্রজার পক্ষে এই জমাভাগের ক্রটি হেতুও থাকতো। প্রজার জমির মোটা অংশ হয়তো বানে হাজা, কোনও ফসলই হয় না। কিন্তু জমিদারেরর জমায় প্রজার সমগ্র চাষের জমি ছাড়া বাস্তু খামার প্রভৃতি সব কিছু হয়তো সেই হাজা জমির সঙ্গে থাকতো। এই হাজা জমি জমিদার আলাদা করে জমা করতে দিত না কারণ আলাদা করে দিলে প্রজা সেই হাজা জমির খণ্ড জমা খাজনা বন্ধ করে জমিদারের খাসে ছেড়ে দিতে পারতো।

জমিদার সেইজন্য বাস্তুর সঙ্গে যুক্ত রেখে তাকে সেই হাজা জমির খাজনা দিতে বাধ্য করতো। বর্ধমানে চকদিঘীর জমিদারির অধীন দামোদরের দক্ষিণে এই রকম হাজামজা জমি অনেক ছিল। তারা প্রজাদের ঘাড় থেকে এইভাবে এসব জমির খাজনা আদায় করতো। তাছাড়া সেচের অধিকার, জলনিকাশের অধিকার। পুকুর মারার অধিকার সব বিষয়েই মালিকের নিকট বাধ্যবাধকতার বেড়াজালে গ্রামবাসীরা ছিলেন বাঁধা। সবক্ষেত্রেই লিখিত আইনে উপায় ছিল। কিন্তু মামলা দেওয়ানী। কয়েক পুরুষ মামলা হয়ে প্রজা সর্বশান্ত হয়েও নিস্পত্তি হতো না। ফলে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে জমিদার কাছারীর নির্দেশ মেনে নিতে হতো।

উপরে বর্ণিত বাধ্যবাধকতাগুলি দূর করার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য রেখে আন্দোলন শুরু হলো ১৯২০-২১ এর অসহযোগ আন্দোলনের পর। জমিদার পক্ষে কংগ্রেসের আনুকূল্য পরিষ্কার হয়ে পড়লো এবং বিকল্প সংগঠনের প্রয়োজনও অনুভূত হতে লাগলো। সোভিয়েতে মজুর চাষীর বিপ্লব ও ক্ষমতা দখলের সংবাদ সাম্রাজ্যবাদের বেড়া টপকেও প্রবেশ করছিল।

পরিষ্কার সব জানতে না পারলেও একটা কিছু ধারণা পৌঁছাচ্ছিল ফলে এসব বিষয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা জ্বলে উঠছিল। নজরুল ইসলাম, হেমন্ত সরকার, মুজফ্‌ফর আহম্মদ প্রমুখের কৃষক আন্দোলনের সূচনা এই সময়। সাহিত্যেও এর প্রতিফলন শুরু হয়েছিল - প্রমথ চৌধুরীর 'রায়ত কথা', শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এ সব এসময়েরই।

প্রত্যক্ষ বিপ্লবী সংগঠন আশু ছড়িয়ে না পড়লেও, এই রকম নানান দিকে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। সংস্কার চিন্তাধারায় প্রভাবিত আন্দোলনও জেগে উঠলো। আমাদের জেলায় একজন প্রাণবান মানুষ এইরূপ আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন। রায়ত সমিতি নামে এক সংগঠন করে তিনি প্রজাস্বত্ব আইনের প্রজাস্বার্থে সংশোধনের প্রচারাদি করতেন। আইনসভার সদস্য ও প্রভাবশালী মানুষদের সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করতেন। জামালপুর থানার নিকট বর্ধমান জেলার সীমানার কাছ ঘেঁসে হুগলী জেলার ধনেখালি থানার মোষগেড়ে বিদ্যুৎপুর গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ী। তাঁর বিশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকায় - বর্ধমান জেলায় ও হুগলী জেলায়। জমিদারদের সঙ্গে বিরোধিতায় এঁকে অনেক নিগ্রহও ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯১৫ সালে কোনও সময় এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বিভিন্ন দিক থেকে প্রজাস্বত্ত্ব প্রজার অনুকূলে সংস্কারের যে আন্দোলন তাতে ব্যক্তিগত আগ্রহে যুক্ত হয়ে পড়ছিলাম। ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ এইসব বিষয়ে কিছু কিছু কাজকর্মেও লিপ্ত হই। এই সূত্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত প্রমুখের স্বাক্ষরিত কিছু হ্যাণ্ডবিল কেশববাবুর কাছ থেকে পেয়েছিলাম মনে আছে এতে কংগ্রেস ও স্বরাজদলের জমিদার শোষণ নীতির তীব্র বিরোধিতা ছিল। (বছর পনর কুড়ি আগে জামালপুরের কমরেড জয়নাল আবেদিন সহ প্রয়াত কেশববাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম। পুরানো সব কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁর পুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। দেখলাম, এখন তাঁদের অবস্থা সচ্ছলই। তাঁরা বললেন, উল্লিখিত বিদ্রোহের কারণে তাঁদের সংসারকে এক সময় নানান ওলটপালটের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। জমিজমা অনেক কিছুই তাঁরা হারিয়েছিলেন। ওরকম ওলটপালটে ঐসব কাগজপত্রও লুপ্ত হয়েছিল)

যাই হোক এই সময় থেকেই গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় জমিদার-বনাম-প্রজার নানান মামলা মোকদ্দমার কথা শুনে আসি। পুরুষানুক্রমে জমিদার বিরোধিতায় মামলা মোকদ্দমায় সর্বশান্ত হয়ে গেছেন এমন এমন পরিবারের কথা শুনেছি। শুনেছি বড়বৈনানের সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মী শ্রীবনোয়ারী মন্ডল ও মুগ্ধকর মণ্ডল মহাশয়ের পূর্বপুরুষদের চকদিঘীর জমিদারদের সঙ্গে ৭০ বৎসর মামলা চলেছিল। রায়না জামালপুর এলাকায় আরও এরকম কাহিনী শুনেছি। আমাদের জীবনেই তো আমাদিকে চকদিঘীর জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে আদমপুরে। আদমপুরের সুপরিচিত কর্মী প্রয়াত আশু ঘোষের কথা এই সূত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বর্ধমান জেলার অন্যত্রও শুনেছি। আমাদের কালেও এসব নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য "দেশভক্ত জমিদার বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সাহায্য নিয়ে কমিউনিষ্ট নেতা বিপদবারণ রায় এবং শিবপ্রসাদ দত্ত (আলুবাবুকে) ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে মন্তেশ্বর থানা থেকে বহিস্কৃত করার ব্যবস্থা করেন।

জমিদার-বনাম-প্রজার সর্ব মামলার নথিপত্রে ইতিহাসের অনেক উপকরণ অপ্রকাশিত হয়ে আছে। এ'পরে বর্নিত প্রজাদের বাধ্যবাধকতাজনিত অত্যাচার উৎপীড়নের অনেক কাহিনী এর মধ্যে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মামলা পর্যন্ত গড়ায়নি। খেশারত দিয়ে প্রজাকে মেনে নিতে হয়েছে। মন্তেশ্বরের এক ক্ষুদে জমিদারের কাহিনী জানি। বিক্রেতা সকাল বেলা গরুরগাড়ীতে রওনা হচ্ছিলেন। জমি বিক্রয়ের উদ্দেশে মন্তেশ্বরে রেজিস্ট্রি অফিস। জমিদারের লোকজন এসে গাড়ীর জোয়াল ঘুরিয়ে জমিদার বাড়ী হাজির করে কম দরে জমিদারের নামে দলিল রেজিস্ট্রি করিয়ে নিল। এইরকম প্রতিটি ঘটনা তো আর নথিতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে দুচারটে মামলা কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল তাতে কিছুটা তথ্য ও কিছুটা ছবি বেরিয়ে আসবে। মাত্র একাংশ দৃশ্যে এলেও বৃহত্তর পটভূমিকার পরিচয় দেবে।

গ্রামে গ্রামে এখনো হয়তো অনেক কিছুই বিস্মৃতির গর্ভে চলে গেছে। কিন্তু এখনও তদন্ত করলে কিছু কিছু খি পাওয়া যেতে পারে। সেইসব খি অবলম্বন করে কোর্ট কাছারীতে নথিপত্র দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

স্মরণে পড়ে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত প্রজাকে ধরে বেঁধে জমিদার কাছারীতে আটকে রাখা মারপিট করার অধিকার আইনে ছিল। লালবিহারী দে'র অমর রচনায় এর কাহিনী আছে। এসব খি আর কোর্ট কাছারীর নথিতে পাওয়া যাবে? তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি বর্ধমান শহরের সুপরিচিত নাগরিক শ্রদ্ধেয় বিনোদী ঘোষ মহাশয় আমাকে 'রিজাম্পশান প্রসিডিংস' এর নথি অনুসন্ধান করার উপদেশ দিয়েছিলেন। বারোয়ারী সাধারণ স্বত্ত্ব কিরূপে জমিদাররা আত্মসাৎ করেছে তার নজির তাতে পাওয়া যাবে বলে তিনি বুঝিয়েছিলেন। বৃটিশ সরকারের কাছে তাঁরা রাজস্ব কমাবার হেতু হিসেবে বারোয়ারী কাজে ব্যবহৃত বলে দাবী করেছে অথচ কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হিসেবে ব্যবহার করেছে এইরকম সব তথ্য। যাই হোক আগ্রহ থাকলেও রাজনীতির কর্মব্যস্ত জীবনে এরূপ দুরূহ অনুসন্ধান ও গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করার উপায় ছিল না। দেড়শ বছর আগের নথিপত্র কোথায় কি আছে তার হদিস যোগাড় করাই সমস্যা। তারপর তথ্য উদ্ধার তো আরও কঠিন। এর মধ্যে কতো কি নষ্টও হয়ে গেল। সুতরাং এধরণের গবেষণার কথা ভাবতেও পারিনি। যাঁদের গবেষণার মনোভাব আছে তাঁদের এসব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লিখছি। পুরানো ভূমি ব্যবস্থার পরিচয় অনেক কিছুই পাওয়া যেতে পারতো রাজ এস্টেটের রেকর্ডে। মোগল আমল থেকে বৃটিশ আমল পর্যন্ত। বর্ধমান জেলার ১৯৩০ সালের সেট্‌লমেণ্ট রিপোর্ট থেকে কিছু বিষয় উদ্ধৃত করছি। 'দি প্রোপ্রাইটারস্' এই শিরোনামায় রিপোর্টে লেখা হচ্ছে- যেহেতু সমগ্র জেলাটাই বর্ধমান জমিদারির মধ্যে ছিল এবং পত্তনি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ঐ এস্টেট ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হওয়া থেকে রক্ষা করা হলো, বর্ধমানের মহারাজা এখনও জেলার অনেক বেশি বৃহত্তর অংশের মালিক। বস্তুতঃ বর্ধমানের তৌজি তালিকায় তাঁর জমিদারির ১৭টি প্রধান এস্টেটের মধ্যে জেলার শতকরা

৭০ ভাগ অংশ। এই তৌজিতে অবশ্য হুগলি এবং মেদিনীপুরের ও বর্ধমানে অন্তর্ভুক্ত উপরে উল্লিখিত জমির পরিমাণের এক তৃতীয়াংশ আছে বর্ধমান জেলার বাকী অংশও বর্ধমান রাজ এস্টেটের পুরানো অংশ যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিবর্তনের অব্যবহিত পর পর রাজস্ব দিতে না পারায় বিক্রীত হয়েছিল এবং রাজস্টেটের হাতছাড়া হয়েছিল।

এছাড়া অনেক খুব ছোট ছোট এস্টেট আছে। এগুলি পুরানো লাখরাজ ও চাকরান জমি। এরই মধ্যে এক ধরণের আছে যার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। এদের "আয়মা" বলে। এগুলি ছোট কিন্তু প্রাচীন নিষ্কর গ্র্যাণ্ট। বিশেষ করে বর্ধমান এবং পশ্চিম-বাংলায় আরও কয়েকটি এলাকায় এগুলি সচরাচর দেখা যায়। মোগল আমলে মিলিটারী কাজের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। (শুধু মিলিটারি নয়, টোডরমলের ফারসী শেখানোর কার্যসূচীর অঙ্গ ছিল বলেও ধরা হয়, তুলনা করুন, কবিকঙ্কনে "মখদম পড়ায় পঠনা" ।- লেখক)। এগুলি প্রথমে মহারাজার নিকট তালুক হিসেবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে প্রমাণিত হলো যে এগুলো স্বতন্ত্র। ফলে, ১৭৭১ সালের জুলাই মাসের একটি নির্দেশে গভর্ণর জেনারেল এগুলিকে আলাদা করতে বললেন...।"

'আয়মা' বা 'ব্রহ্মোত্তরের' পুরাতন তৌজি যে গ্রামে ছিল, সে গ্রামের প্রাচীনত্ব সহজেই বোঝা যেত। আরও ইনটারেসটিং তথ্যও পাওয়া যেতো। সদর থানার 'বলগনা' গ্রামে আয়মা তৌজি ছিল। অথচ মুসলমান বাসিন্দাই নেই। তদন্ত করে কিছু খবর পেলাম। আমাদের বয়সী অনেকে বললেন, তাঁরা ছোটবেলায় কর্তাদের কাছে শুনেছেন যে এককালে নাকি প্রায় দেড়শ' ঘর মুসলমান এই গ্রামে ছিল। তখন তো আর দাঙ্গা ফ্যাসাদ হয়নি। কেবল অর্থনৈতিক কারণ এবং ম্যালেরিয়ায় বর্ধমানের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ধ্বংস হয়েছিল। এও তারি সাক্ষ্য। সে সময়কার হিন্দু-মুসলমান বহু পরিবার হয়তো ধ্বংস হয়েছিল। এমন হতেও পারে এখনকার যাঁরা অধিবাসী তাঁদের পূর্বপুরুষের অনেকে হয়তো ভিন্ন গ্রাম থেকে এসে বাস আরম্ভ করেছেন। আশপাশে নতুন অনেক ছোট ছোট গ্রামও আছে।

এই সব ঐতিহাসিক তথ্যের গবেষণায় লাভ কি? ইতিহাসের কিছু মূল্য থাকলে এসবেরও মূল্য থাকে। রেভারেণ্ড লালবিহারীদের বেঙ্গল পেজেণ্ট লাইফে যে করুণ কাহিনী বর্ণিত আছে তার বাস্তব তথ্য পাওযা যাবে জমিদার বনাম প্রজা মামলা মোকদ্দমায়। জেলার কৃষক সমাজের কিছু অদম্য মানুষের পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁদের স্মৃতি কি আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেবে না?

বর্ধমানের সংস্কৃতির ইতিহাসে কি এইসব দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কাহিনীর কোনও স্থান নেই? যাঁদের গবেষণার দিকে মন থাকে তাঁরা এসব বিষয় নির্বাচন করে কাজ শুরু করলে বর্ধমানের অনেক মানুষের সাহায্য ও সমর্থন পাবেন বলে আমার মনে হয়।

□ 'গ্রাম্য সমাচার' দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক ভজনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটবেলুন ১১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা মে, ১৯৮৮ □

কয়লাখনি অঞ্চলে জনজীবনের সমস্যা

সুনীল বসুরায়

কালো হীরার দেশ

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি ক্ষেত্র বলতে যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে বোঝায় তা বর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা দুটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ বিহারের ধানবাদ জিলার ও সাঁওতাল পরগণার কয়েকটি অঞ্চল এবং পশ্চিমবাংলার দামোদরের দক্ষিণে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার অববাহিকা অঞ্চল ও অজয় নদের উত্তরে অবস্থিত বীরভূম জেলার অববাহিকা অঞ্চল। বীরভূম অবশ্য এখনও কয়লাখনির সক্রিয় মানচিত্রে চিহ্নিত হয়নি।

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি ক্ষেত্র, মগমা হতে দুর্গাপুর, দৈর্ঘ্য ৭৫ কিলোমিটার ও উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থে ৩৫ কিলোমিটার। মোট ক্ষেত্রফল ১৫৬০ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমান আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন অঞ্চলে (বুদবুদ থানা অঞ্চল বাদে আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা)-এর ক্ষেত্রফল ১৬২৫.৯ বর্গ কিলোমিটার, তার মধ্যে ১৩৫৭.৪ বর্গ কিলোমিটার গ্রামীণ ও ২৬৮.৫ বর্গ কিলোমিটার শহরাঞ্চল। ১৯৭১- ৮১ দশকের মধ্যে ১৫৬.১ বর্গ কিলোমিটার গ্রামাঞ্চল শহর এলাকাভুক্ত হয়েছে।

কয়লা খনির শ্রমিক

আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা (১৯৮১ আদম সুমারি) ১৭,৮৫.১৬৭, গ্রামীণ ৬,৬২,৩২২, শহর ১১,২২,৮৪৫। বিগত ৫০ বছরে (১৯৩১-১৯৮১) জনসংখ্যা ৪,৬৩,০৮০ থেকে বেড়ে বর্তমান সংখ্যায় পৌঁছেছে। বৃদ্ধির হার প্রায় ৪ গুণ। জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধির গতি নিচের সারণী থেকে বোঝা যাবে

বৎসর	গ্রামীণঘনত্ব (প্রতি বর্গ মাইল)	শতকরা হেরফের	শহরের ঘনত্ব (প্রতি বর্গ মাইল)	শতকরা হেরফের	মোট ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইল)	শতকরা হেরফের
১৯৪১	৭৯২	—	৫২৩৪	—	৯৭০	—
১৯৫১	৯৪৬	১৯.৪৪	৮০৭০	৫৪.১৮	১২৩৩	২৭.১১
১৯৬১	১২৬১	৩৩.৩০	৬০৬০	২৪.৯১	১৭৪৮	৪১.৭৭
১৯৭১	১৩৮০	৯.৪৪	৬৫৮৪	৮.৬৪	২২১২	২৬.৫৪
১৯৮১	১৩৯৮	১.৩০	৭৪৮০	১৩.৬১	২৮৬১	২৯.৩৪

১৯৮১ আদম সুমারি অনুযায়ী পেশাওয়ারি জনসংখ্যার বিভাজন নিম্নরূপ ঃ (শতকরা)

	পেশা	গ্রামীণ	শহর	মোট
ক)	কৃষি	১৬.০০	১.৮২	৭.০৪
খ)	কৃষি শ্রমিক	১৭.১৩	২.৪৪	৭.৮৫
(গ)	গৃহ শিল্প (ম্যানুফ্যাকচার, প্রসেস, সার্ভিস, রিপেয়ার	২.৩২	৩.৭৯	৩.২৫
(ঘ)	অন্যান্য	৬৪.৫৫	৯১.৯৫	৮১.৮৬
	মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ হিসেবে প্রান্তিক কর্মী	২.৩৩	১৪.৬০	১০.০৪

'অন্যান্য পেশায় নিযুক্তদের মধ্যে বিপুলাংশই হচ্ছে কয়লাখনিতে কাজ করেন এমন শ্রমিক কর্মচারীগণ। তাই দেখা যায় যে গ্রামীণ ক্ষেত্রেও 'অন্যান্য' পেশায় নিযুক্তদের বিপুল সংখ্যাধিক্য।

জনসংখ্যার চাপ, পেশা অনুযায়ী অসম বন্টন জনজীবনের সমস্যা বাড়াচ্ছে। আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলের জমির ব্যবহারের চেহারা থেকে এই সমস্যার অন্য দিকও বোঝা যাবে।

আসানসোল - দুর্গাপুর ঃ গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার (একর)

মহকুমা

ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি	আসানসোল	দুর্গাপুর	মোট	শতকরা
বন	৩৪৩৭	২০,১২০	২৩,৫৫৭	৬.২৯
সেচ-যুক্ত ভূমি	৫৩৮৩	১৬,৬৬৯	২২,০৫২	৫.৮৯
অ-সেচযুক্ত ভূমি	৮৬,০৫৬	৭৫,০৮৮	১৬১,১৪৪	৪৩.০৩
কৃষিযোগ্য পতিত	১৫.৫৮৭	১৯,৩৬৭	৩৪,৯৫৪	৯.৩৩
কৃষির পক্ষে অপ্রাপ্য	৬৭.৩৫৪	৬৫,৩৯৫	১৩২,৭৪৯	৩৫.৪৬
মোট আয়তন	১৭৭,৮১৭	১৯৬,৬৩৯	৩৭৪,৪৫৬	১০০.০০

আসানসোল-দূর্গাপুর অঞ্চলের মোট আয়তনের (৬২০ বর্গমাইল) অর্ধেকই প্রায় কয়লার ভূগর্ভস্থিত স্তর-সমন্বিত -- অর্থাৎ যেখানে হয় কয়লাখনি কাজ করছে বা যেখানে কয়লাখনির কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, কয়লাখনি অঞ্চলগুলি সরকারীভাবে গ্রামীণ অঞ্চলরূপে স্বীকৃত, যা প্রকৃত বাস্তবের সাথে খাপ খায় না।

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি ক্ষেত্র মোট মজুত কয়লা ভাণ্ডারে সারা ভারতের এক তৃতীয়াংশ বা ১২৯০০ মিলিয়ন টন কয়লা রয়েছে। এর ভিতরে ৯৬ শতাংশ তোলা যাবে, এবং পাওয়া যাবে তার ৩৬ শতাংশ প্রথম শ্রেণীর নন-কোকিং কয়লা যা ঝরিয়া কয়লার সাথে মিশ্রণ করে লোহা গলাবার কাজে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া আছে ৪ মিলিয়ন টন ফায়ার ক্লে (চীনামাটি) যা গোন্ডওয়ানা কয়লাস্তরসমূহে পাওয়া যায়। নিম্নমানের ৫০০ মিলিয়ন টন লৌহও (আয়রণ ওর) পাওয়া যায়।

কৃষিক্ষেত্রের মোট আয়তন ৩৭৩ বর্গমাইল, যার মধ্যে, ২৩০ বর্গমাইলে চাষাবাদ হয়। সেচের অভাব, জমির হীনমান (নীরস), ও খনির জন্য জমির জল ধারণে অক্ষমতা কৃষিকে প্রায় অসম্ভব করে তুলছে। কাঁকসা, ফরিদপুর তো প্রধান কৃষি অঞ্চল বটেই, তাছাড়া জামুরিয়া, বরাবনী ও সালানপুর অংশত কৃষি অঞ্চল, যেখানে কৃষি সম্ভাবনাময়। উখরা, অণ্ডাল, রাণীগঞ্জ, হীরাপুর কুলটিতে কৃষির অস্তিত্ব ছিটমহলের ন্যায় হলেও জনজীবনে তার গুরুত্ব তুচ্ছ নয়। জমির প্রশ্ন তাই একটি বাস্তব, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কয়লাখনির প্রসার যে প্রশ্নটিকে সুতীক্ষ্ণ করে তুলেছে।

কালো হীরার কালো সওদাগর

আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে এবং প্রতিবেশী ধানবাদ-হাজারিবাগ অঞ্চলে খনির অস্তিত্ব মোগল আমলে যে ছিল তার প্রমাণ শ্রীইরফান হাবিবের 'মোগল সাম্রাজ্যের মানচিত্র' (হাজারীবাগে হীরার খনি ছিল)। কোল ইন্ডিয়া লি. এর ম্যানেজার (ট্রেনিং) শ্রী অমলেন্দু ব্যানার্জী একটি প্রবন্ধে (৬.২.৮২) বলেছেন যে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আড্ডা গাড়ার আগে থেকেই বাংলায় কয়লা উত্তোলন ও বিপণনের ঘটনা জানা যায়। "গোড়ার সেই দিনগুলিতে মেদিনীপুরের লোকেরা তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে দামোদর বেয়ে নৌকা বোঝাই নুন নিয়ে আসত, পথে ব্যবসায়ীদের কাছে তা বিক্রি করত। ফিরতি পথে, রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা বোঝাই করত, পথে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত।" (থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ রাণীগঞ্জ কোলফিল্ড, ১৬০০ এ ডি টু ১৯০০ এ ডি, সেমিনার অন প্ল্যানিং এ্যাণ্ড রিকনসট্রাকশন অফ্ রাণীগঞ্জ কোলফিল্ড)। এই ইতিহাস কয়লা খনির প্রাচীনতা অন্তত ১৭৫ বছর পিছিয়ে দিল। আমরা এতদিন জানতাম ১৭৭৪-এই প্রথম কয়লা পাওয়া গিয়েছিল। শ্রীব্যানার্জী তাঁর ঐ প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন "বাংলার অর্থনীতির ধ্বংস শুরু হয় পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) সাথে সাথে। কয়লাসহ ভারতীয় শিল্পেরও অবনতি শুরু হয়। এসময় কয়লা কালিপাহাড়ী, ডিসেরগড় ও বরাকরে, যাইহোক, যেমনই হোক, পাওয়া যেত।" ১৭৬৯ থেকে ভারত তথা বাংলা কৃষি নির্ভর হয়ে উঠল। তার শিল্পসমূহ ধ্বংস হয়ে গেল। "অন্যান্য শিল্পের সাথে, তখন যে ক্ষুদ্রায়তন কয়লা শিল্প ছিল, তা সম্পূর্ণ

উচ্ছেদ হয়ে গেল।'' কিন্তু, কোম্পানীর কয়লার চাহিদা ছিল, জনমুখী শিল্পের জন্য নয়, বন্দুক ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জন্য, যা দিয়ে তারা দেশ শাসন করতে চেয়েছিল। ব্রিটেন থেকে আমদানি করতে হত যে কয়লা তার খরচ ছিল খুবই বেশি। ব্রিটেনে অবস্থিত কোম্পানীর পরিচালকরা তাতে প্রশ্ন তুলতো। ফলে ''নোচেৎ ও বীরভূমে কয়লার জন্য হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হল।'' (নোচেৎ এখন পাণ্ডু)।

এই তিনশত বৎসরের ইতিহাস অন্তত এ সাক্ষ্য দেয় না যে কয়লাখনি চালানোর ব্যাপারে কোনও বৈজ্ঞানিক রীতি-নীতি কখনও মানা হত। আজও তা হয় না। কয়লাখনি যে পদ্ধতিতে চলছে তাকে 'জবাই' বা 'স্লটার' পদ্ধতি বলা যেতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার সত্ত্বেও কয়লাখনি-পদ্ধতি আজও সেই পুরাতন 'জবাই' পদ্ধতির স্তরেই আছে। আজ, আসানসোল-দুর্গাপুরের জনজীবনের মূল সমস্যাটি এর থেকে উদ্ভূত।

সর্বনাশের পদধ্বনি

কয়লাখনি অঞ্চলে একটি শব্দ খুবই প্রচলিত। শব্দটি হল 'ধ্বস'। পাহাড়ী অঞ্চলে, বিশেষত দার্জিলিং, যেখানে ভূ-স্তর এখনও অস্থির, অপরিণত, রূপান্তরশীল, সেখানেও ধ্বস একটি বিশেষ সমস্যা। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে এই সমস্যা দৈনন্দিন। ও সব অঞ্চলে যা প্রধানত প্রাকৃতিক (মানুষের দায়িত্বও বাড়ছে) আসানসোল দুর্গাপুর অঞ্চলে তা সর্বাংশে মানুষের লোভের পরিণাম। ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে ভূগর্ভে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের ফলে, বিস্ফোরণ, প্লাবন প্রভৃতির ফলে, দেশটা পোড়ামাটির চেহারা ধারণ করেছে। ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত ধ্বংসের কি করুণ চেহারা। লোভের কি মর্মান্তুদ প্রকাশ।

ভারতের প্রাচীনতম কয়লাখনি ক্ষেত্র, রাণীগঞ্জ কয়লাখনি ক্ষেত্র, আজ দ্রুত ঝরিয়ার পথে। এর ক্ষতি ও ধ্বংসের আয়তন, পরিমাণ ও পরিণাম নিয়ে কোনও সুসংবদ্ধ আলোচনা হয়নি। কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। শুধু গ্রাম নয়, শহরও বিপন্ন। ''দ্রুত শিল্পায়নের ফলে এই অঞ্চলে কয়লার স্তরবিশিষ্ট জমির উপর শহর গড়ে উঠেছে খুব তাড়াতাড়ি।'' এরূপ বিভিন্ন শহর ও তার আয়তন হল : আসানসোল (বার্ণপুরসহ) ২৯.৭ বর্গ কি.মি., উখরা ৪.২ বর্গ কি.মি.; অণ্ডাল ৩.২ বর্গ কি.মি.; রাণীগঞ্জ ৪.০ বর্গ কি.মি.; সীতারামপুর ৩.৬ বর্গ কি.মি.; বরাকর-কুলটি ৯.৫ বর্গ কি.মি.; চিরকুন্ডা ৯.৬ বর্গ কি.মি.; দুর্গাপুর ১২.৬ কি.মি.। মোট এইকটি শহরের আয়তন ৭৫.৯ বর্গ কি.মি., যার মধ্যে বর্ধমান জেলার ৬৬.৩ বর্গ কি.মি.। বহু শহর আছে যার ভূগর্ভে পরিত্যক্ত খনি রয়েছে। ডি জি এম এস (খনি নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ) এরূপ ২৫টি শহর বিপজ্জনক এলাকারূপে ঘোষণা করেছে, যার লোকসংখ্যা লক্ষাধিক। এইসব শহর থেকে লোক সরাতে হবে, তা না হলে সম্পত্তি ও প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া কয়লার স্তর-বিশিষ্ট জমির উপর রয়েছে প্রধান রেলপথসমূহ, ছোট ছোট রেলপথসমূহ, জি. টি. রোড ও অন্যান্য সড়ক, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ-বাহী তার, তেলের পাইপ লাইন। বহু কারখানাও পরিত্যক্ত খনির উপর অবস্থিত, যেমন কুলটি, ইস্কো, কেরুকোং, সেন-র্যালে (সাইকেল কর্পোরেশন) প্রভৃতি।

জনৈক কয়লাখনি বিশেষজ্ঞ বলছেন 'যে কোনও কয়লাখনি ক্ষেত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে খনির কাজের ফলে স্থানীয় পরিবেশ কীভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। স্থানীয় জনগণের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের উপর এর প্রভাব যে কী তা সুস্পষ্ট। জনসংখ্যা পরিবেশ-পরিমণ্ডলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। খনির কাজের ফলে জনজীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তা খনি শিল্পকেই বদনামী করেছে। রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল প্রধানত কৃষি অঞ্চলে অবস্থিত। খনির প্রসার কৃষি এলাকাই সংকুচিত করছে তাই নয়, চিরায়ত কর্মক্ষেত্র থেকে কৃষি শ্রমিকদের স্থানচ্যুতও করছে। জমির উপর চাপ বাড়ছে। জমির নিজ মূল্য থেকে তার সামাজিক মূল্য অনেক বেশি। তাছাড়া, জমির প্রতি যে টান আছে, তা সব মিলে কৃষকের কাছে জমির আকর্ষণ তীব্রতর করছে! কৃষক জমি ছাড়তে চায় না। খনির কাজের পদ্ধতির ফলে পরিবেশগত অন্যান্য যে সব সমস্যা দেখা দেয় তা হল, ধুলো ধোঁয়া শব্দের আতিশয্য। ফলে, জনজীবনে এসবের বিরূপ প্রভাব মারাত্মক। প্রতি বছর খনি ও শিল্পের গ্রাসে ৫০০০ একরেরও বেশি জমি চলে যাচ্ছে। বিশেষত ওপ্‌ন্‌কাস্ট খনির ফলে ক্ষতি হচ্ছে সর্বাধিক।' খোলা খনি, ওভার বার্ডেনের (কয়লার উপরে অবস্থিত মাটি পাথর প্রভৃতি) পাহাড়, প্রচুর জমি নষ্ট করছে। পিট মাইনিং-এ বালি দিয়ে খাদ ভরতির নিয়ম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই না মানার ফলে, ডি-পিলারিং -এর সময় কেভিং -এর ফলে দুর্ঘটনা, ধ্বস, বাড়ি-ঘর নষ্ট, সম্পত্তির সর্বনাশ, এসব হচ্ছে।

বর্তমানে ওপনকাস্ট মাইনিং এর শতকরা হার হচ্ছে ২৫ শতাংশ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সময় তা ছিল ১০ শতাংশ। আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং-এর ৪৫ শতাংশ কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে ডিপিলারিং করে, তার ৬০ শতাংশ হচ্ছে কেভিং পদ্ধতিতে। (অ্যান অ্যাপ্রোচ টু এনভারানমেন্টাল প্রবলেম অফ্ রাণীগঞ্জ কোলফিল্ড -- এ বি শাহ, ডিরেক্টর (টেকনিক্যাল, অ্যাণ্ড ডিরেক্টর ইন চার্জ (ইস্ট ডিভিশন), ই সি এল, পূর্বোক্ত সেমিনার-এ পঠিত) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালে কুলটির মেশিন শপটিকে ধ্বংসের ফলে পাতাল প্রবেশের হাত থেকে বহু অর্থব্যয়ে বাঁচান হয়। তার কিছুদিন পরে, ঐ মেশিন শপ ও কুলটি কেন্দুয়া বাজারের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ এলাকায় যে ফাটল দেখা দেয় তা রেললাইনের নিচে দিয়ে চলে গিয়েছিল (খনি আইনে তা নিষিদ্ধ)।

পাতালের বিষাক্ত নিঃশ্বাস

খনির ফলে যে পরিবেশগত (এনভারানমেন্টাল ও একোলজিক্যল) সমস্যা দেখা দেয় তা নিচের সারণীগুলি থেকে বোঝা যাবে

খনি এলাকায় পরিবেশগত ও একোলজিক্যাল সমস্যা

খনির কাজের ফলে জমির ক্ষতি হয়		
খনির কাজে ও খনিতে আগুনের ফলে ধ্বস নামে।	খনি থেকে বার করা আবর্জনার পাহাড়প্রমাণ স্তূপ।	জল প্রবাহের ধারা নষ্ট হয়, জলের স্তর নেমে যায়, জলাশয় শুকিয়ে যায়।

জনবসতি অপসারণ করতে হয়। জমির ক্ষতি হয়। গাছপালা ও বনের অবসান ঘটে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। আর্দ্রতা কমে যায়। উৎপাদনশীল জমি নষ্ট হয়। জমির পুনরুদ্ধারের সমস্যা সৃষ্টি হয়।

বায়ু দূষণ

ধূলি ও অন্যান্য কণার বায়ুতে প্রাধান্য হেতু —

(১) বিস্ফোরণ

(২) খনিজ পদার্থের স্থানান্তরণ ও শোধন করার প্লান্ট বোঝাই, খনন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পরিবহন

গ্যাস জনিত —

(১) বিস্ফোরক ব্যবহারের ফলে, খনির কাজের প্রাকৃতিক নিঃসরণের ফলে

(২) কয়লা জ্বালান, কোক তৈরী, খনির আগুন প্রাকৃতিক নিঃসরণের ফলে ধোঁয়া, CO_2, CO, নাইট্রোজেন সালফারের অক্সাইড

জল দূষণ

রাসায়নিক ও অন্যান্য নিঃসৃত পদার্থ জলে ও কৃষিজমিতে জমা হওয়া, নদীর দূষণ, ক্ষার পদার্থের ফলে ক্ষয়ে যাওয়া

শব্দের আতিশয্য (গোলমাল ধ্বনি তরঙ্গ হেতু)

(১) যন্ত্রপাতির ব্যবহার- শ্রবণ ক্ষমতার অবসান অবসন্নতা

(২) ব্লাস্টিং বা বিস্ফোরণ- ঘর-বাড়ি ইত্যাদির ক্ষতি, বিরক্তিকর ব্যাপার

সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া, জীব জগৎ ও উদ্ভিদ জগতের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

(উক্ত সেমিনারে শ্রী বি সিং, ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ স্টেশন, কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ একোলজিকাল অ্যাণ্ড এনভারানমেন্টাল প্রবলেম ডিউ টু ডামেজেস্ কজড্ বাই মাইনিং।

অভিশপ্ত রাণীগঞ্জ

সম্প্রতি, রাণীগঞ্জ শহরের প্রশ্নটি সামনে এসেছে। রাণীগঞ্জ শহরটি পৌর এলাকা, আয়তন ১১৯৭ একর। তার মধ্যে ২২৫ একরের-এর অবস্থা বিপজ্জনক, ভঙ্গুর! পৌর এলাকার সংলগ্ন একটি বেশ বড় অঞ্চলও অনুরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। অতীতে বেশ কয়েকবার জমিতে ধ্বস হয়েছে। ১৯৫৬ সাল থেকে খনি নিরাপত্তা দফতর ঐ ধ্বস প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করলেও, এ যাবৎ বিশেষ কিছু হয়নি। তাঁদের প্রস্তাব, শহর উঠিয়ে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে। গত ১৮-২-৮০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের চীফ সেক্রেটারি একটি বৈঠক ডাকেন। বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে শহর সরিয়ে নিতে গেলে খরচ হবে ৭৫০ কোটি টাকা। যে জায়গায় সরানো হবে তার নিচের কয়লাও এর ফলে

আটকে পড়বে। রাজ্য সরকার পরবর্তীকালে প্রাক্তন ডি জি এম এস ও বর্তমান আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান শ্রী এইচ বি ঘোষকে এ বিষয়ে কী করা যায় তা ঠিক করতে বলেন। শ্রী ঘোষ সম্প্রতি জল ও বালি ইনজেকট করে শহরের ভূগর্ভে ভারসাম্য আনবার একটি পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছেন। আশা করা যায় এতে কাজ হবে। আপাতত ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। সফল হলে, সমগ্র প্রকল্পটি রূপায়ণে ২০কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই প্রকল্পটি সফল হলে অনুরূপ ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যাবে। এই পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফল হয়েছে।

কয়লা খনি অঞ্চলের সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের বা কয়লা খনি কর্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্বেগ আছে এমন মনে হয় না। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আগে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ দূরের কথা রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পরে এই ক্ষতির পরিমাণ ও ব্যাপকতা আরও বেড়েছে। ওপ্‌ন্‌কাস্ট মাইনিং, যন্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ, জমির সর্বনাশ আরও বেশি করছে। খনি-প্রকল্প রচনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনগণের প্রশ্নটিকে বিবেচনাই করা হচ্ছে না। রাণীগঞ্জ শহরের নিচে শূন্য গর্ভের তলে প্রচুর কয়লা আছে। রাণীগঞ্জ শহরের সমস্যাটি সমাধানের ব্যয় যেহেতু যে কয়লা তোলা হবে তার মূল্যের থেকে বেশি, সেইজন্য ভারত সরকার এই প্রকল্প পরিত্যাগ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়লা খনি অঞ্চলে শূন্যগর্ভ খনিগুলি ভরাট করা হয়। এর জন্য ব্যয় হয় ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ ডলার, একর প্রতি। খনি-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে কয়লা বা খনিজের দাম বাড়াতে হলেও শূন্যগর্ভ খনি ভরাটের ব্যবস্থা গৃহীত না হলে দারুণ ক্ষতি হবে। ধ্বসে যাওয়া খনি (পিট)-র জমি পুনরুদ্ধার, পুরাতন পরিত্যক্ত খনি ভরাট করা প্রয়োজন। তা না হলে মহকুমার পর মহকুমা জনশূন্যই হবে তা নয়, সকল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, উৎপাদন বিনষ্ট হবে। উৎখাত হওয়া জনসংখ্যা অন্য বসতিক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি করবে, স্বাভাবিক আর্থিক সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হবে, সারা দেশের পক্ষে ভয়াবহ বিপদ সৃষ্টি হবে।

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও, যে খনি- পদ্ধতি এ যাবৎ অনুসৃত হচ্ছে, তা ক্ষতিকর। জল-দূষণজনিত ব্যাধির প্রকোপ খনি অঞ্চলে খুবই ব্যাপক।

রাণীগঞ্জ খনি অঞ্চলে প্রতি বৎসর গড়ে ৩৫০ বিঘা জমি নষ্ট হয়ে যাবে। ১৯৯০ সাল নাগাদ বার্ষিক জমি নষ্টের পরিমাণ হবে ১০৬০ বিঘা। তাছাড়া, বাসস্থানের জন্যও চলে যাবে বছরে ১২০০-১৫০০ বিঘা জমি (১৯৯০ নাগাদ)। অর্থাৎ, মোট ২২৬০-২৫৬০ বিঘা বছরে নষ্ট হবে। এর ফলে গ্রামের লোকেরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমানে আসানসোল মহকুমায় ৩৬৯ মৌজা গ্রামীণ, যেখানে শহরের মৌজার সংখ্যা ৩৭টি মাত্র। চার থেকে পাঁচ লক্ষ গ্রামের মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। সামান্য ক্ষতিপূরণে 'সামান্য ক্ষতি'র পূরণ কী হবে?

আজ আর এই সর্বনাশা প্রবণতাকে বাড়তে দেওয়া চলে না। এই ধ্বংসের গতিরোধ করতেই হবে। খনি থেকে জল অপসারণ বেপরোয়াভাবে করলে যে কি বিপদ হতে পারে

তার একটি প্রমাণ হচ্ছে মহাবীর কোলিয়ারীর ঘটনা। মহাবীর কোলিয়ারীতে বর্ড অ্যাণ্ড পিলার পদ্ধতিতে ৫ মিটার বেধযুক্ত কয়লার স্তরে কাজ হয়েছে, ৬৫ শতাংশ কয়লা উত্তোলিত হয়েছে। অর্থাৎ, খনিটি আর নিরাপদ নয়। এটি একটি পুরাতন খনি। ১৯০০ সালের আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এই খনি থেকে জল অপসারণ করা বিপজ্জনক।

খনিটির এলাকার বেশ একটা অংশ রাণীগঞ্জ পৌর এলাকাভুক্ত। পৌর এলাকা ছাড়িয়ে আরও ১৪০০-৩২০০ ফিট অবধি খনি-এলাকা বিস্তৃত। শ্রী এইচ. বি. ঘোষ (প্রাক্তন ডি. জি. এম. এস ও এ. ডি. ডি.-এর চেয়ারম্যান) তাঁর ৯ এপ্রিল ১৯৮২-র চিঠিতে আসানসোলের অতিরিক্ত জেলাশাসককে এই খনি থেকে জল অপসারণের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছেন। ই. সি. এল. এই বাস্তবতা উপেক্ষা করে খনিটি চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে এক গুরুতর পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছে।

১৯৮১, ৩ অক্টোবর রাজ্য সরকারের চীফ সেক্রেটারি এক চিঠি (ডি. ও. নং ৮২১/৮১-সি. এস.) লেখেন ভারত সরকারের শক্তি দপ্তরের কয়লা বিভাগের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি শ্রী এইচ.পি. খোমলার নিকট। খনি নিরাপত্তা, কয়লা সংরক্ষণ প্রভৃতি প্রশ্নে তিনি রাজ্য সরকারের প্রতিবাদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জানান।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এসব ব্যাপারে কোনো গা-ই করছে না। খনি অঞ্চলে বিপদ বাড়ছে। ধন-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর, জীবন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন--সবই বিপন্ন। এর বিরুদ্ধে আজ সবাইকে রুখে দাঁড়াতেই হবে। শিল্প প্রসারিত হবে, সমৃদ্ধ হবে, তা ঠিক। তবে অপচয় যেন না হয়। যেন কৃষি প্রভৃতির ক্ষতি না হয়। যেখানে জন-জীবনে পরিবর্তন হবেই, সেখানে তা যেন বিপর্যয়কর না হয়। জমি পুনরুদ্ধার, ধ্বসা জমির পুনর্গঠন, ধ্বসরোধ, জল-উৎস ও জল-ধারার প্রবাহ সংরক্ষণ, বিকল্প কর্মসংস্থান —এসবের ব্যবস্থা করতেই হবে।

তিন শতাব্দীর অভিশাপ মোচনের জন্য আজ উদ্যোগী হতেই হবে।

□ 'নতুন চিঠি' বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৪ □

দামোদর নদীপথে কয়লা পরিবহনের জন্য ১৮৩২ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (কার এন্ড টেগোর কোম্পানি) কর্তৃক নির্মিত জেটি

আগুন, গ্যাস, ধ্বস
চিতায় শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গোনা
নিশীথকুমার ঘোষ

রাবণের চিতা জ্বলছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রতিক্ষণে বুকের ভেতর ঢুকছে--ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে ফুসফুস। চিতায় শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে মানুষ।

শ্মশানবন্ধুর রীতি অনুযায়ী একজন মানুষের অন্তিমে চিতার জন্য জমির দরকার হয় দুই বর্গমিটারের মতো। কিন্তু এই গণ-চিতার জন্য জমির আয়তন দাঁড়িয়েছে একহাজার বর্গকিলোমিটারের মতো। বেড়েই চলেছে--প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে এর আয়তন। সারা রানীগঞ্জ ও ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে মাটির তলা ফুঁড়ে লক্‌লক্ করে বেরুচ্ছে এই চিতার আগুন।

পশ্চিমবাংলায় রাণীগঞ্জ কয়লাখনি-অঞ্চলের আয়তন ১৫৩০ বর্গকিলোমিটার। সরকারি তথ্য অনুসারে এই পরিমাণ বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা তিনটি মিলে। রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল বলতে বর্ধমান জেলার বরাকর পেরিয়ে বিহারের নির্শা-মগমা এবং সাঁওতালপরগণার অল্প অংশকেও বোঝায়। বিহারে অবস্থিত এই অংশের আয়তন হচ্ছে মোটামুটি আশি বর্গ-কিলোমিটারের মত।

বিহারের ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলের আয়তন ৫০০ বর্গকিলোমিটারের মতো। যেহেতু বিহারের নির্শা-মগমা ও সাঁওতাল পরগণার অল্পকিছু অংশকে রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যে ধরা হচ্ছে, তাই এই অংশটুকুকে ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চল বলে নথিভুক্ত করা হয়নি। হলে ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলের পরিমাণ বেড়ে হত ৫৮০ বর্গ কিলোমিটার।

ভারতে কয়লাখনির কাজ প্রথম শুরু হয় ১৭৭৪ সালে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছোটনাগপুর বিভাগে নিযুক্ত দুজন কর্মচারী জন সামার এবং এস জি হিটলি বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম গর্ভনর ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে কয়লা কাটা ও বিক্রি করার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করেন। কিন্তু ওঁদের চেষ্টা তেমন সফল হয়নি। মি হামফ্রে-র "দি আরলি হিস্ট্রি অব কোল মাইনিং ইন বেঙ্গল" লেখায় জানা যায় ওই সব দরখাস্তকারীর কয়লাখনি সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। স্থানীয় অধিবাসীদের এই কাজে ছিল নিতান্ত অনভিজ্ঞতা। তাছাড়া ইংরেজ বণিকদের কাছে বিলেত থেকে কয়লা আমদানি ব্যবসা দেশী কয়লা উৎপাদনের প্রতিবন্ধক ছিল। তবুও এই অবস্থার মধ্যেই রাণীগঞ্জ অঞ্চলের দামালিয়া, নারায়ণকুড়ি, এগরা প্রভৃতি এলাকায় প্রথম কয়লা সংগ্রহের কাজ চলে। পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে এই অনিয়মিতভাবে কয়লা খননের কাজ চলতে থাকলে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড ময়রার আমলে উইলিয়াম জন নামে একজন খনি-বিশেষজ্ঞ রাণীগঞ্জে কয়লা সন্ধান ও জরিপের কাজে নিযুক্ত হন। এই কাজে তাঁর যোগাদনের তারিখ ১৬ এপ্রিল ১৮১৪ সাল।

তিনি রাণীগঞ্জের নুনিয়াজোড়ের কাছে প্রথম কয়লাখনির কাজ শুরু করেন। পরবর্তী কয়েক বছর এইভাবে বিদেশী সাহেবরা একক এবং যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে কয়লা উত্তোলনের কাজ চালিয়ে যান। যখন ভারতের এই খনিজ সম্পদ বিদেশী বণিকদের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেই সময় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর 'কার টেগোর এণ্ড কোং' নামে কয়লা উত্তোলন শিল্পে অবতীর্ণ হলেন।

এই সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে আছে : ''১৮৩৪ সালের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর আরও স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সরকারী চাকুরিটি (কাস্টম, সল্ট এবং ওপিয়ম বোর্ডের দেওয়ানী) পরিত্যাগ করিলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই 'কার ঠাকুর কোম্পানী' নামক হৌস স্থাপন করিলেন। কলিকাতা নগরীতে য়ুরোপীয় আদর্শে ব্যবসায়ের কুঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনভাবে বিলাতের সহিত বাণিজ্য দৃষ্টান্ত দেশীয়দিগের মধ্যে ইহাই প্রথম। দ্বারকানাথ, মি. উইলিয়াম কার ও উইলিয়াম প্রিন্সেপ--এই তিনজন 'কার টেগোর' কোম্পানির প্রথম অংশীদার ছিলেন।'' ১৯৬৩ সালে আলেকজান্ডার কোম্পানি মোকদ্দমা করলে দ্বারকানাথ ঠাকুর 'কার টেগোর এণ্ড কোং'-এর পক্ষে ওই কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি নিলামে কিনে নেন।

সেই থেকেই শুরু ভারতের কয়লা শিল্পের ইতিহাস। আজকে ১৯৯৮ সালে এসে ভারতের কয়লা উৎপাদনের বয়স হল ২২৪ বছর। আর ভারতের প্রথম কয়লাখনি রাণীগঞ্জের 'নারায়ণকুড়ি-এগরা' ।

তখন কয়লার মজুতভাণ্ডার সামান্যই তোলা হচ্ছিল। উনিশ শতক পর্যন্ত এইভাবেই চলছিল। আস্তে আস্তে কয়লা উৎপাদনে মাঠে নেমে পড়ল বেঙ্গল কোল কোম্পানি, ম্যাকনিল বেরি, ইকুইটেব্‌ল প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানিগুলি। তখনও পর্যন্ত 'কোল মাইন্স রুল' বলে কিছু ছিল না, তৈরিও হয়নি। ১৯০১ সালে তৈরি হয় এই আইন। এরপর আস্তে আস্তে কিছু ভারতীয় শিল্পপতি কয়লা উৎপাদনের আসরে নামেন। রেলকোম্পানিও তখন তাঁদের নিজস্বভাবে কয়লা তোলার জন্য খনির কাজ শুরু করল। সত্যি কথা বলতে কি, তখন থেকেই কয়লাখনিগুলির প্রতিযোগিতামূলক কাজকর্ম শুরু হয়। ফলে কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণহীন বা বলা যায় 'বল্‌গাহীন' অবস্থার দিকে এগুতে থাকে। ভারতে কয়লাখনি শিল্পে ১৯১৬ সালে প্রথম কয়লাখনিগর্ভে আগুন লাগে।

অবশ্য ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করে কয়লা উত্তোলন পদ্ধতির উন্নতি, অপচয়রোধ, আগুন নিয়ন্ত্রণ জননিরাপত্তা বিষয়ক ব্যবস্থাগুলির দিকে নজর দেন। ওই গঠিত কমিটির নাম হয় 'কোল মাইনিং কমিটি' । এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন ড. এস. এস. কৃষ্ণান ও এইচ. কে. নাগ।

সেইসময় কয়লাখনি-শিল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অজ্ঞতা দরুণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই ঢিলেঢালা ছিল। তাছাড়া কয়লাখনি মালিকদের কয়লা উৎপাদন ও বিক্রিতে 'লাভ'ই ছিল প্রধান লক্ষ্য। শ্রমিকস্বার্থ ও জাতীয় সম্পত্তি রক্ষায় ভারত সরকারের দায়দায়িত্ব এত ক্ষীণ ছিল যে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রথম মহাযুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতের কয়লাশিল্পে ব্যাপক ঘাটতি এসেছিল। বহু খনি-মালিক বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয়, বহু খনিও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নতুন করে ভারতে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইসময় আরও বেশ কিছু ভারতীয় পুঁজিপতি নতুনভাবে কয়লাশিল্পে নেমে পড়ে। তখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোনও নিয়মনীতি না মেনেই কয়লা উত্তোলন চলতে থাকে।

সেই সময় 'কোল মাইনিং কমিটি, তাঁদের লিখিত রিপোর্টে লিখেছেন "কম পুঁজিতে বেশি মুনাফা হচ্ছে প্রথম উদ্দেশ্য। হতভাগ্য শ্রমিকদের নিরপত্তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় যে কোনও শ্রেণীভুক্ত। আর জাতীয় স্বার্থ -- তার কোনও অস্তিত্ব আছে বলেই কেউ মনে করে না।"

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পর কয়লাখনি-শিল্পের মালিকানা পুরোপুরি দেশীয় পুঁজিপতিদের হাতে চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি বড় অংশ কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে ওইসব পুঁজিপতিদের নীতিহীনভাবে কাজ করতে মদত দেয়। ফলে দেশে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিও প্রসারিত হতে থাকে। যত্রতত্র অবৈজ্ঞানিকভাবে কয়লা তুলে নিতে গিয়ে খনিগুলিতে দুর্ঘটনা বাড়তে থাকে। আগুন, গ্যাস, ধ্বস ও দুর্ঘটনাজনিত কারণে বহু খনির কাজ মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়।

পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ রূপ নেয় যে কয়লাখনি-শিল্পের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ১৯৫৪-৫৫ সালে সমস্ত বিষয়টি লোকসভার এস্টিমেটস্ কমিটিতে তুলতে হয়। লোকসভার বিরোধী-সদস্যারা 'কোল কমিশনার' কমিটির লিখিত পেশ করা বক্তব্যের বিষয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন জানতে চান। কমিশনারের রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ছিল যে, উৎপাদকেরা বেপরোয়াভাবে খনিগুলি থেকে কয়লা উত্তোলন করছে। ধ্বস, আগুন, গ্যাস ও দুর্ঘটনায় জীবনহানি নিত্যই ঘটছে।

১৯৫৪-৫৫ সাল থেকেই ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলের খনির অভ্যন্তর থেকে মাটি ফুঁড়ে লক্ লক্ করে আগুন বেরুতে শুরু করেছে। তখনই আনুমানিক তিরিশ বর্গ-কিলোমিটার জুড়ে এই আগুন লোকালয়, কৃষিজমি , মাটির নিচে দীর্ঘ মজুত কয়লার স্তরকে গ্রাস করে ফেলেছে। আগুন ধানবাদ-সিন্ধ্রি পাকা রাস্তা সহ ঝরিয়া বাজারেও ঢুকে পড়েছে।

বিরোধীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকারের তখন ডাইরেক্টর অব মাইন্স্ সেফ্টিকে 'কোল মাইন্স্ রেগুলেশন' -এর নিয়মবিধিগুলি যথাযথ -প্রয়োগ করার নির্দেশ দেন। এই সময়ই করমচাঁদ থাপার কোম্পানির বেগুনিয়া কয়লাখনির ধ্বসে বরাকর অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি হয়। সমগ্র বরাকর বাজার ও লোকালয়টি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও ধ্বসপ্রবণ এলাকাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে ১৯৫৭ সালে বরাকর সাবসিডেন্স কমিটি গঠিত হয়। এই বছরই প্রবর্তিতভাবে কোলমাইন্স্ রেগুলেশন তৈরি হয়। বরাকর সাবসিডেন্স কমিটির দেওয়া রিপোর্টে বরাকর অঞ্চলে বেপরোয়াভাবে কয়লা কেটে নেওয়ার ফলেই যে ধ্বসের সৃষ্টি হয়েছে তা উল্লেখ

করা হয়েছে। এই রিপোর্টে বরাকর অঞ্চল থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোককে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরে যাবারও কথা বলা হয়েছে।

খোলামুখ খনি, নিউকেন্দা

১৯৬৩ সালে তৎকালীন ন্যাশনাল কোল ডেভালপমেন্ট কর্পোরেশন (NC/DC) কয়লাখনিগুলিতে আগুন ও ধ্বস-সংক্রান্ত এক রিপোর্ট পেশ করে। ওই রিপোর্ট ' ফায়ার সাবসিডেন্স এণ্ড প্রবলেম টু মাইন ওয়ার্কিং ইন ইন্ডিয়া নামে পরিচিত। এইসঙ্গে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া খনি-অঞ্চলে আগুন ও ধ্বস নিয়ে ধানবাদের 'সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ স্টেশন' একটি রিপোর্ট তৈরি করে।

ষাটের দশকে ঝরিয়া খনি-অঞ্চল তথা বরাকরের দুটি কয়লাখনি মিলে 'কোকিং কোল' রাষ্ট্রায়ত্ত করে সরকার। সত্তরের দশকে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে জানুয়ারি মাসে 'ননকোকিং কোল' হিসেবে বাকি কয়লাখনিগুলিকেও সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করে। ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলকে 'বি সি সি এল' ও বাকি খনিগুলিকে নিয়ে তৈরি হয় 'ই সি এল', 'সি সি এল', 'ডব্লু সি এল'। পরে কোম্পানিগুলিকে আরও ভাঙাগড়া করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্ণধারগণ তৈরি করেন নর্দান কোলফিল্ডস, নর্থ-ইস্টার্ন কোল ফিল্ডস, সিঙ্গারেনি, আসাম কোলফিল্ডস্ ইত্যাদি। এরপর টাটা কোম্পানির নিজস্ব 'টিস্কো' কয়লাখনি ও বার্ণপুর-এর নিজস্ব 'ইস্কো' খনিগুলিও আছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত হলে এইসব নতুন নতুন সংস্থাগুলি তৈরি হয়। কিন্তু রাণীগঞ্জ কয়লাখনি ই সি এল ও বিহারের ঝরিয়া কয়লাখনি-অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত বি সি সি এল-এর খনিগুলিই পুরানো।

রাণীগঞ্জ কয়লাখনির বয়স ২২৪ বছর। তাছাড়া এই অঞ্চলে শতকরা পঁচাশিভাগ খনিই 'আন্ডারগ্রাউ ন্ড' । ধ্বস ও আগুন গ্রাস করছে গ্রামের পর গ্রাম, লোকালয়, রাস্তাঘাট, কুয়ো, পুকুর।

১৯৭৬ সালের ৫ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেছিলেন একটি তদন্ত কমিটি। নাম দেওয়া হয়েছিল 'গুগনানি কমিটি' -- এই কমিটি তাঁদের তদন্ত রিপোর্ট পাঁচটি পর্যায়ে তৈরি করেন।

এগুলি হল -

১। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ -১ম কিস্তি

২। ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৭ - ২য় কিস্তি

৩। ২৩ নভেম্বর ১৯৭৭ - ৩য় কিস্তি

৪। ২৮ নভেম্বর ১৯৭৮ - ৪র্থ কিস্তি

৫। এবং পরবর্তী পর্যায়ে শেষ কিস্তি

এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে রাণীগঞ্জ খনি-অঞ্চলে পরিত্যক্ত খনিতে মজুত জল, চালু খনিগুলিতে আগুন ও ধ্বসে আক্রান্ত হয়েছে ১৮৯ টি কয়লাখনি ও তৎসংলগ্ন লোকালয়গুলি। অপরদিকে বিহারের ঝরিয়া খনি অঞ্চলে অনুরূপ কারণে আক্রান্ত হয়েছে ১৭৩টি কয়লাখনি ও তৎসংলগ্ন জনবসতিপূর্ণ লোকালয়গুলি।

গুগনানি কমিটিরাণীগঞ্জ ও ঝরিয় খনিঅঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন, 'ধ্বস, আগুন ও জল হচ্ছে দায়িত্বহীন খনি পরিচালন ও ভুল খনন পদ্ধতির ফসল।'

১৯৭৭ সালে গুগনানি কমিটিকে সহায়তা করার জন্য আবার একটি কমিটি গঠিত হয়। এর নাম 'বাগচি কমিটি'। এরপর ১৯৮৬ সালে হয়েছে 'প্রসাদ কমিটি'।

এই রিপোর্টগুলির প্রতিটিতেই দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'কোকিং কোল' এবং 'নন-কোকিং কোল' উভয়ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রায়ত্তের পরেই আগুন, ধ্বস ও গ্যাসের মাত্রা অত্যধিকভাবে বেড়ে গিয়েছে 'আন্ডারগ্রাডন্ড' খনিগুলিতে। এছাড়া ওপেন কাস্ট অর্থাৎ খোলামুখ খনি, যাকে সাধারণভাষায় 'পুকুরে খাদ' বলা হয়, রাষ্ট্রায়ত্তের পরে তার সংখ্যা ১২ শতাংশ থেকে ৩৭ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়ে ওই খনিগুলির উপরের জমি সর্বাগ্রে গ্রাস হয়ে শেষে নিঃস্ব মরুভূমিসদৃশ অবস্থায় পৌঁছায়।

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি-অঞ্চলে ই সি এল কর্তৃপক্ষ খনি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পরবর্তী অধ্যায়ে তাদের হাতে দায়িত্ব নেওয়ার পর 'শুধুই উৎপাদন বৃদ্ধি করো' নীতি নিয়েই চলেছে। এই উৎপাদনের উপরই সংস্থার অফিসারদের প্রমোশন, চাকরি, বদলি ইত্যাদি নির্ভরশীল ছিল। ফলে যেমন করেই হোক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দিনের পর দিন নিরাপত্তাহীন অবস্থায় 'আন্ডারগ্রাউন্ড' খনিগুলির অভ্যন্তরে কয়লার পিলারগুলি নিয়ম ও বিধি ভেঙে কেটে ফেলা হয়েছে। জল ও গ্যাস রোধে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে খনি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার আগে মাটির নিচে খনিতে আগুন যেখানে ছিল ৭০ বর্গ কিলোমিটার, তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে, এই রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পরে। খনি, অভ্যন্তরের আগুন লক্‌লক্ করে বেরুচ্ছে মাটির উপর দিয়ে অমৃতনগর, জে কে নগর, নিমচা প্রভৃতি অঞ্চলে। ই সি এল-এর গৌরাংডি অঞ্চলে সরিষাথলি,

পাহাড়গোড়া প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় আগুন জ্বলছে। আগুনে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে সরিষাথলির সমস্ত বনাঞ্চলটি। অমৃতনগরের নিকট দিল্লি- হাওড়া প্রধান রেলপথটিও আক্রান্ত। যে কোনও সময় তা পরিত্যক্ত হিসাবে ঘোষিত হতে পারে।

কিন্তু এখনও খনি-কর্তৃপক্ষের ধ্বংসাত্মক কাজের বিরামহীন গতি সমানে ধাবমান। ই সি এল-এর সাতগ্রাম এরিয়ায় জে কে নগর প্রোজেক্টে কাজ হচ্ছে তিনটি কয়লা-স্তরে। প্রথম স্তরের প্রায় দু'শ ফুট নিচে 'নিগা' নামে কয়লা কমি, দ্বিতীয় স্তরে প্রায় ৪০০ ফুট নিচে, 'বোগড়া' সিম এবং তৃতীয় স্তরে প্রায় ৭০০ ফুট নিচে 'সাতগ্রাম' সিম। অমৃতনগর, নিমচা, জে কে নগর প্রভৃতি অঞ্চলে 'নিগা' সিমের গভীরে আগুন জ্বলছে। পুর্বতন তদন্ত কমিটিগুলির রিপোর্ট ও মাইন্‌স্ সেফটির নির্দেশমতো নিগা সিমটিকে জলভর্তি করে আগুনকে কোথাও কোথাও নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই জলের গতি নিম্নগামী। ফলে ওই স্থানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর যথাক্রমে বোগড়া ও সাতগ্রাম সিমে কয়লা তুলে নিলে উপরের 'নিগা' সিমের মজুত জল ওই নিচের স্তরদুটিতে চলে এসে নিগা সিমকে শুকনো করে দিলেই সেখানে আগুনের মাত্রা ব্যাপক হয়ে উঠবে।

'নিমচা' এখানকারই একটি গ্রাম। আগেই বলেছি, এটিও আগুনে আক্রান্ত। এই বর্ধিষ্ণু গ্রামটিতে সতেরোশ পরিবারের বাস। শতকরা দশজন কয়লাখনিটিতে কাজ করলেও বাকি নব্বই জন কৃষিজীবী। এই গ্রামটির চারপাশে চাষের জমিগুলিতে পাতাল ফুঁড়ে আগুন বেরুচ্ছে। পাশের পরিত্যক্ত খনিগুলির আগুন। এই গ্রামটির রাতের চেহারা যেন আগুনের দ্বীপ। পুকুর-কুয়ো শুকিয়ে কাঠ। জমিতে চাষ হয় না। গ্রামটির চারপাশের খনিগুলির শ্রমিক-বস্তিগুলি পরিত্যক্ত, মানুষ নেই। পরিবর্তে সেখানে সমাজবিরোধীদের আড্ডা। দিনেরবেলায় মানুষ সে পথ পেরোতে ভয় পায়। চিকিৎসার জন্য গ্রামে ডাক্তার যেতে ভয় পায়। গ্রামের মেয়েরা পথের ভয়ে স্কুল-কলেজ যেতে পারে না। গ্রামের সুভাষ তফাদার, শঙ্কর সিং, রাজেন তফাদারের মতো মানুষেরা এখন অসহায়।

তেমনি আবার গৌরাংডি অঞ্চলের সরিষাথলিতে আগুনের প্রকোপে সরকারি বনাঞ্চলটি যেমন বিপন্ন তেমনি তার লাগাও রসুলপুর গ্রামটি। অজয়নদের তীরে অবস্থিত এই গ্রামটি থেকে আসা যাওয়ার মূল রাস্তা ওই বনাঞ্চল দিয়ে। আগুন এগিয়ে আসছে। আজ হোক, কাল হোক গ্রামবাসীদের মূল রাস্তা আক্রান্ত হবেই। তাছাড়া চাষের জমিগুলিও শেষ। গ্রামের ষাট বছর বয়সী ভূষণ মণ্ডলের করুণ চোখ কেবলই আকুতি জানাচ্ছে, এরপর ঘর সংসার নিয়ে খাব কি? থাকব কোথায়?

এমনি আরও অনেক আছে। কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত হবার আগে রাণীগঞ্জ খনি অঞ্চলের আগুনে আক্রান্ত জনবসতির সংখ্যা ছিল পঁচিশ। এখন তা ই সি এল-এর দৌলতে বেড়ে হয়েছে নব্বই। ধ্বসে আক্রান্ত জনবসতির সংখ্যা একশ তেতাল্লিশ। পূর্ণ তদন্ত হলে আরও হয়তো বেড়ে যাবে। অন্যদিকে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ঘনমিটার জমিতে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। চাষের জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রায় ষাট বর্গ কিলোমিটার।

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি শিল্পাঞ্চলে ১৯৮১-র আদমসুমারি অনুসারে জনসংখ্যা ছিল আঠারো লক্ষ। এখন তা বেড়ে হয়তো তেইশ লক্ষ পেরিয়ে গিয়েছে। ঝরিয়া অঞ্চলে আরও বেশি।

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি-অঞ্চলের পাতালের আগুন প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার করে বাড়ছে। ঝরিয়া কয়লাখনির পাতালের আগুন বাড়ছে আরও বেশি। ফলে ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জ অঞ্চলের পাতালের আগুন বিশ, পঁচিশ কিংবা ৫০ বছরের মধ্যে সমগ্র শিল্পাঞ্চলটি গ্রাস করবে। এই শিল্পাঞ্চল এখন অগ্নিগর্ভের উপরে। গাছপালা তো দূরের কথা পতঙ্গের পাখনাও নজরে আসবে না। আগুন, গ্যাস ও ধ্বসের উপর চিতায় শুয়ে শুয়ে তখন এলাকার মানুষ রোম জ্বলাকালীন নিরোর বাঁশির মতোই বাঁশির আওয়াজ শুনবে।

□ 'নতুন চিঠি', শারদ সংখ্যা, ১৯৯৮ □
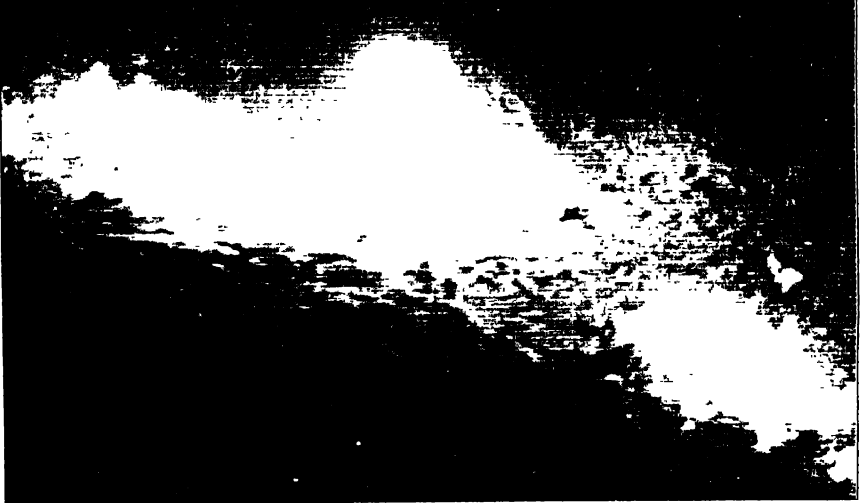
চিতায় শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে মানুষ

কালোহীরার মাটিতে জমিহারাদের লড়াই
বিকাশ চৌধুরী

ঢোল-শহরত

ডুগ ডুগ ঢপ ঢোল বাজিয়ে সুতো-বাঁধা চশমা পরা এক বয়স্ক লোক গ্রামের মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটি ময়লা চিটচিটে কাগজ বার করে গলায় শিরা ফুলিয়ে বলতে শুরু করে— "গেরামবাসীদেরকে জানানো যাইতেছে--অদ্য গেরামের মনসামন্দির আটচালায় সন্ধ্যা সাতটায় সভা হবেক। সভায় সকলকে যাইবার জন্য জানানো যাইতেছে।" বলে ঘোষক চুপ করে মোড়ে উপস্থিত সকলের দিকে লক্ষ্য করল। এই সময়ে চায়ের দোকান থেকে কে বলে উঠল, "আরে পটলদা, কিসের জন্য মিটিং হবেক--বলতে কি ভুলে গেলে?" পটলদা ওরফে ঘোষকের মনে পড়ে যায় এ কথাটা বলা হয়নি। "হঁ হঁ বলতে ভুলে গ্যাছি। তা হঁ সভায় কলিয়ারির মালিকের জমি দখলের আলোচনা হবেক।"

ডুগ ডুগ ঢপ --- কোন্ অদ্যিকালের ঢোল বাজিয়ে দিয়ে দোকানের কাছে গিয়ে পটল বলে, "ও নটবরদা, একটি বিড়ি দাও তা।" "হঁ, বিড়ি কি সস্তা হইন্ছে যে দিতে হবেক" -- বলে অবশ্য সে একটি বিড়ি পটলদাকে দেয়। নটবরদাকে ঘিরে কিছু চাষী-যুবকরা দাঁড়ায়—নটবরদার মুখ থেকে শোনার জন্য একজন যুবক জিজ্ঞেস করে, "ও খুড়ো, বলোনা কী ব্যাপার।" নটবর মণ্ডলকে একজন জমি-জমা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলে গ্রামের লোক মান্য করে। আবার সেরেস্তাদারের চৌকিদার বলে তাকে তোশামোদও করে। নটবর মণ্ডলের সাথে সকল সময় একটি লম্বা লাঠিও থাকত। স্বাভাবিকভাবেই সচ্ছল লোকদের সঙ্গে তার জানাশোনা ছিল। সেই সুবাদে তাকে অনেকে ভাল চোখে দেখত না।

কাঁকড়ডাঙার কড়চা

গ্রামের নাম কাঁকরডাঙা--গ্রামের নিকটবর্তী দুটি কয়লাখনি যাওয়ার রাস্তা এই গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে। ট্রাক-লরি ধুলো উড়িয়ে চলে যেত--আর মালিক ও সাহেবদের গাড়ি যেত। কয়লাখনির খুনি-গুণ্ডারা মালিক ও সাহেবদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত। গ্রামের বেশ কয়েকজন কয়লাখনিগুলিতে কাজ করত। ভাল সংখ্যক লোক চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করত। আবার বেশ কিছু লোক রাণীগঞ্জের লালকুঠিতে ও বল্লভপুরের কাগজকলে কাজ করত। ১৯৬৫-'৬৬ সালে কৃষকসভা সংগঠিত করার জন্য কাঁকরডাঙা, আমকুলা, ডামালিয়া, মুর্গাথোল প্রভৃতি গ্রামে যাওয়া শুরু হয়ে যায় কৃষকসভার কর্মীদের। সাহেবগঞ্জের জটালি ঠাকুর ওরফে জটালি চক্রবর্তী, সাথে ধরণীবাবু -- গ্রামগুলিতে যেতে শুরু করে। গ্রামগুলির ভৌগলিক অবস্থার কারণে ও কয়লাখনি থাকার জন্য চাষজমির ব্যবস্থা ও সমস্যাগুলিও অন্য ধরনের। এই সমস্যাগুলির অন্যতম সমস্যা হচ্ছে--কয়লাখনি কর্তৃপক্ষের জোরপূর্বক চাষীর জমি গ্রাস। এর বিরুদ্ধে লড়াই করা অনেকে ভাবতে পারে না। কয়লাখনির মালিকই গ্রামের জমিগুলিরও মালিক। তার ইচ্ছার অন্যথা হলে মালিকের সুন্দর হাসিতে চাষীর দেহ ও প্রাণ নন্দনকাননে চলে যেত। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগেও এই ধরনের সুন্দর প্রণালীতে কয়লাখনির মালিকরা চাষীদের দেহনিঃসৃত লোহিত রং-এর খুন বার করে খুনের

সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভালবাসতেন। পুলিশও মালিককে ভালবেসে গ্রামবাসীদের দাপটে দমন করত। অত্যাচার ও নিষ্পেষণ মানুষদেরকে বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী করে তোলে। তবে এই প্রতিবাদিতা অর্থহীনভাবে দুর্বল থেকে যায়, যদি না একে সংগঠিত করা যায়।

সারা পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির তালে তালে এখানকার কৃষকরা সংগঠিত হতে শুরু করে। অবশ্যই লালকুঠি ও কাগজকলের শ্রমিকরা গ্রামের লোকদের কাছে লালঝাণ্ডার লড়াই-এর কথা বলত। তা সত্ত্বেও গ্রামগুলিতে সেই সময় কৃষকসভার সংগঠন করা খুব সহজ ছিল না। প্রথমত, কলিয়ারিগুলিতে লালঝাণ্ডার ইউনিয়ন না থাকার মতো। খনিতে শ্রমিক সংগঠন করতে গেলে গোপনে--মালিক, সাহেব ও গুণ্ডাদের প্রখর দৃষ্টির আড়ালে করতে হত। দ্বিতীয়ত, গ্রামের স্বচ্ছল মানুষরা খনি মালিকদের অনুগত হয়ে থাকত এবং জমি জায়গা খনি মালিককে উপঢৌকন দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ ও সুকৌশলী ছিল। গ্রামের লোক এই সমস্ত পদলেহী দালালদেরকে অনন্যসাধারণ মাতাল বলে গণ্য করত এবং তাদিকে কেউ নমস্কার করতে সাহস পেত না। সারা পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধাক্কায় এদের পৈশাচিক দাপটে চিড় খেতে শুরু করে।

গেরাম সভা

১৯৬৮ সাল সেপ্টেম্বর মাস হবে। সবে বর্ষা শেষ হয়ে শরৎ-এর প্রকাশ ঘটেছে। পটলদার ঘোষিত গেরামের গেরামসভা সন্ধ্যা ৭টায়। মনসা মন্দিরের আটচালায় গ্রামের মানুষের জমায়েত। তবে খুব বেশি মানুষের জমায়েত নয়। বরং বলা যেতে পারে নিকট দূরে সিঁড়িতে, দোরগড়ায়, দূরে অবস্থিত গরুরগাড়িতে বেশি লোক ছিল। অর্থাৎ ইচ্ছেও আছে আবার কী হয় কী জানি ভবিষ্যতে কী আছে--এই সমস্ত আশঙ্কা সেই সমস্ত মানুষের চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক সেই সময় দুটি সাইকেলের ক্রিং শব্দ শোনা গেল। গ্রামের যাদেরকে মুখিয়া মনে করা হয় তারা তাকিয়ে দেখল জটালি ঠাকুর আর ধরণীবাবু সাইকেল থেকে নেমে সভার একপাশে এসে বসলেন। ধরণীবাবু ভোলাকে বললেন দূরের মানুষগুলো যাতে মিটিং-এ এসে বসে। কিন্তু তারা আসতেই চায় না। বোঝা গেল, মালিকের ভয় থেকেও মিটিং-এ বসা আর শোনার ভয় বেশি।

সভা শুরু হয়। হরিপদ মণ্ডল, কাগজকলের শ্রমিক, সভার সভাপতি। সভার বিশেষত্ব হচ্ছে--সভায় সাঁওতাল, কোড়া ও অন্যান্য গরিব শ্রেণীর মানুষ বেশি করে উপস্থিত ছিল। সভায় ভলু মণ্ডল, দুগাই মণ্ডল, বাবলু বাউড়ি বলল, কয়লাখনি-মালিকের জমি-গ্রাসের শুভ ইচ্ছাকে তারা বরদাস্ত করবে না। মালিক গুণ্ডাদের সাহায্যে সমস্ত জমিগুলিকে বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করে দিয়েছে। ঐ জমিগুলিতে কয়লা রাখা হবে। নটবর পাল যখন বলল, "জমিগুলিকে আবার দখল নিতে হবে", তখন অনেকে অবাক হয়ে গেল তাঁর কথা শুনে। নটবরদা এধরনের কথাতে অভ্যস্ত ছিল না। শুধু শুধু ভাষণ হচ্ছিল না -- মধ্যে মধ্যে আলোচনাও চলছিল। সভার মধ্যে তিনটি হারিকেন রাখা হল। রাত বাড়ার সঙ্গে অন্ধকার ঘন হচ্ছিল। দূরে মধ্যে মধ্যে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। জটালি ঠাকুরের প্রভাব এই এলাকার মানুষগুলির মধ্যে প্রবল। বিশেষ করে গোপ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে মান্য

করে থাকে। তিনি বললেন, "এই ছোট গ্রামের সমস্ত লোক এক হতে পেরেছি। জিত যদি হাসিল করতে হয়, লড়াই ছাড়া সম্ভব নয়।" তিনি বিস্তৃত উদাহরণ দিয়ে বললেন, "কয়লাখনি-মালিকরা বরাবর অত্যাচার করে, জুলুম করে জিতে এসেছে। কারণ আমাদের মধ্যে একতা ছিল না। মালিকদের সন্ত্রাসের ভয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পরপারের দিন গুনছি। পেছোবার আর জায়গা নেই। পেছনোর জায়গা করার জন্য এগোতে হবে। দরকার হলে আশেপাশের গ্রামের মানুষরা এ লড়াই-এ সাথ দেবে। এই অনুকূল পরিস্থিতি আগে ছিল না। এই লড়াই কীভাবে করতে হবে —তারই কার্যক্রম আজকেই ঠিক করতে হবে।" জটালি ঠাকুরের বলার পর আলোচনা শুরু হয়। ঠিক হল, সাত দিনের পরের দিন, অর্থাৎ সোমবার, জমি-মালিকের দখলীকৃত জমি পুনর্দখল করতে হবে। ১৪/১৫টা হাল বার করতে হবে। সভার সকলকে জিজ্ঞেস করা হল--কে কে হাল নিয়ে যাবে। নটবরদা প্রথমেই হাল-বলদ নিয়ে জমিতে যাবে বলে ঘোষণা করল। দুর্গাপদ গোপ, লক্ষ্মীনারায়ণ গোপ, প্রভাকর গোপ, ভোলানাথ গোপ, জ্যোতি গোপ, মুরলী গোপ, বাবুয়া মাঝি, বংশী গোপ, লালু গোপ, আরও ৪/৫ জন হাল-বলদ নিয়ে যাবে বলে ঘোষণা করল। সোমবারে সকাল ছয়টায় দখলীকৃত জমিতে বেড়া ভেঙে হাল দিতে শুরু করবে। পঁচিশ গজ দূরে একটা ডাঙা জমিতে গ্রামের সবাইকে জমায়েত থাকতে হবে। অবশ্য লাঠি ও ডাণ্ডা সহ। এর পর ধরণীবাবু গ্রামের লোকদের হুঁশিয়ার করে দেন : "এই কয়দিন গ্রামের লোককে দিনে রাতে সজাগ থাকতে হবে। শত্রু অত্যন্ত শক্তিমান—যে কোনও সময় গ্রামের অর্জিত একতাকে ধ্বসিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। আমাদের এই সভার খবর দুষমনরা পেয়ে যাবেই। এইজন্য নজরদারি অটুট রাখতে হবে।" ঠিক হল ঐ দিন ধরণীবাবু সকালে চলে আসবেন।

রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। গ্রামের লোক রাতে থাকতে বলে। কিন্তু জটালি ঠাকুর ও ধরণীবাবু গ্রামের লোককে আশ্বস্ত করে সাইকেলে চলে যান।

হারিয়ে পাওয়ার লড়াই

এই কয়দিনের মধ্যে খনি-মালিকের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জানা গেল যে পরদিন ভোর সকালে খনির একজন দারোয়ান আবার গুণ্ডাও বটে — নটবর গোপের বাড়িতে গিয়েছিল, কিন্তু নটবর গোপকে ঘরে পায়নি। রাস্তায় নটবরকে দেখতে পেয়ে খনি-মালিকের কাছে যেতে বলে। নটবর গোপ যেতে অস্বীকার করে। 'এর পর গ্রামে যদি তোকে দেখি তোকে খুন করে দেঙ্গা' বলে হুমকিও দেয়। আশেপাশের লোকেরা ভাবতে থাকে, তাহলে দিনকাল পালটে গেল। পরে জানা গেল গ্রামেরই লালু গোপ, যে ঐ মালিকের খনিতে চাকুরি করত, তাকে ও বসিয়ে দেয়। লালুর রাগ আরও বেড়ে গেল। এইভাবেই জমি পুনর্দখলের লড়াই সংগঠিত হতে শুরু হয়ে যায়।

এর মধ্যে ধরণীবাবু আবার গ্রামে আসেন খবর নেবার জন্য। গ্রামের লোক পূর্বের তুলনায় আরও ঐক্যবদ্ধ আরও সংগঠিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সোমবার চলে আসে। ধরণীবাবু ঠিক ছয়টায় হাজির হয়ে দেখেন গ্রামের লোক লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে মিছিল করে যাচ্ছে রণাঙ্গনে। ধরণীবাবুও ঐ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব-নির্দিষ্ট জায়গায় মিছিলের সমস্ত

লোক জমায়েত হয়। অন্য দিকে বলদ-লাঙল সহ খনি-মালিকের দখলীকৃত জমির সামনে প্রায় কুড়ি জন চাষী চলে যায়। খনি মালিক গ্রামের চাষীদের জমি জোরপূর্বক দখল করে বাঁশের বেড়া দিয়ে রেখেছিল। সেই বেড়ার অপর দিকে প্রায় চল্লিশ/পঞ্চাশজন লোক কাজ করছিল। তাদের সাথে তিনজন মালিকের দারোয়ন গোছের লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজনের হাতে বন্দুকও ছিল। তারা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে গ্রামবাসীদের স্পর্ধা দেখছিল। তাদেরকে জীবনে এই ধরনের অস্বস্তিকর দৃশ্য দেখতে হবে--কোনওদিন তারা কল্পনাও করেনি। দারোয়ানদের মধ্যে একজন বন্দুক উঁচিয়ে গ্রামবাসীদের দিকে তাকও করেছিল। গ্রামের চাষীরা যখন বেড়া ভেঙে বলদ লাঙল নিয়ে ঢুকছিল তখন বেশ দশ-বারো জন লোক তাদের দিকে ছুটে আসে বাধা দেওয়ার জন্য। প্রথমেই নটবর গোপ হাতে শক্ত লাঠি নিয়ে ছুটে গেল। সামনে একজনকে পেয়ে বেদম মার দেয়। বন্দুকওয়ালা তো এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে--যদিও বন্দুক উপরে তাক করে চালাচ্ছিল। জমায়েতের প্রায় পাঁচশ লোক জোয়ারের মতন অকুস্থলে ছুটে যায়। শুধু ধরণীবাবু ও কয়েকজন জমায়েতের জায়গায় স্থির হয়ে ঘটনাগুলো নিরীক্ষণ করছিলেন। আর লক্ষ রাখছিলেন, দূরে পাশের চানক (খনি) থেকে মালিকের গুণ্ডাবাহিনী আসছে কি না। খনি-মালিকের দখলীকৃত জমির বাঁশের বেড়া ভেঙে দেওয়া হয়। দারোয়ান সহ সমস্ত লোকগুলি পালাতে শুরু করে। অগুনতি শ্লোগানের মধ্য দিয়ে চাষীরা হাতছাড়া জমিতে লাঙল দিতে শুরু করে। অন্যান্যরা শ্লোগানের তালে তালে নাচ না লম্ফঝম্ফ বলা যাবে না, তাই শুরু করে দেয়।

পুলিশ আসে, পুলিশ যায়

মালিকের গুণ্ডারা তো পালিয়ে গেল। কিন্তু পুলিশ বাকি থাকবে না। মালিকের খবরে তারা গাড়ি করে চলে আসে সেই অকুস্থলে। চাষীরা হাল বন্ধ রাখে নি। বলতে গেলে সেই দিকে নজরও দেওয়ার দরকার মনে করছিল না। তবু পুলিশের একজন অফিসার জিজ্ঞেস করে, "এখানে কী হচ্ছে"? উত্তর এল, "আমাদের গ্রামের জমি, আমরা গ্রামের লোক, আমরা আমাদের জমি চাষ করছি।" পুলিশ অফিসার আবার জিজ্ঞেস করে "খনি-মলিক জমিগুলি খরিদ করেনি?" সমস্বরে উত্তর এল, "শালুরা কবে কখন জমি কিনেছে?" পুলিশ অফিসার বলল, "তাহলে জমির দলিল দেখতে হয়।" আবার উত্তর, "মালিকের কাছে যান—বিক্রির কোবলা মালিকের কাছে আছে কি না জেনে নিন।"

এত লোক দেখে পুলিশ প্রথমে তো ঘাবড়ে গিয়েছিল। 'ঠিক আছে' বলে পুলিশ তো গাড়িতে উঠে খনি-মালিকের আস্তানার দিকে রওনা হল। পথে ধরণীবাবুকে দেখে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি এদের লিডার?" সাথের চার-পাঁচজন বলে ওঠে, "ইয়ার নাম ধরণীবাবু-আমাদের লেডার।" অফিসার বলে, "খনির মালিক মনে হয় জমিগুলি খরিদ না করেই খনির কাজ শুরু করে দেয়?" ধরণীবাবু বলেন, "খনি-মালিকের এটা বরাবরের অভ্যেস। জমিগুলো প্রথমে জোর করে দখল নিয়ে, পরে জমির মালিকদেরকে তাদের অফিসে ডেকে পাঠিয়ে, দলিলে টিপসই নিয়ে নেয়। দয়া হলে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা জমির মালিকের হাতে ধরিয়ে দেয়।" অফিসার 'আচ্ছা, মালিকের সাথে কথা বলে দেখি' বলে চলে গেল।

কে জাগে

মালিকের এলাকা থেকে দূত এসে খবর দিল, শত্রু শিবির শুনশান--একেবারে ফাঁকা। যদিও খবর শুনে ভালই লাগল, তবুও ধরণীবাবুর মনে সন্দেহ থেকেই যায়। ঘণ্টাখানেক পরে, যখন চাষ শেষ হয়ে যায়, সবাই পূর্ব-নির্দিষ্ট জমায়েতের জায়গায় চলে আসে। বিরাট লাল পতাকা পত পত করে উড়ছে—লড়াই-এর বিজয় পতাকা। নটবরদাকে সভাপতি করে সভা শুরু হয়। পড়ন্ত রোদে--ভাদ্র মাসের গরমে ঘামে সবাই জেরবার। পরবর্তী কর্মসূচী তৈরি করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অত্যাচারীকে পদদলিত করা যায়--আজকের অভিজ্ঞতায় বেশি বেশি করে প্রমাণিত হল। আগামীকাল হাল-দেওয়া জমিতে বীজধান ছড়িয়ে দেওয়া হবে। নজরদারি আরও বেশি করে বাড়াতে হবে। শত্রুকে বিশ্বাস করতে নেই। এর মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য মালিক কথাবার্তা বলতে ভদ্রলোকদেরকে পাঠাতে পারে। ওদের মিষ্টি কথায় না ভুলে যেন স্থানীয় কৃষকসভার নেতারা এক সঙ্গে যায়। গ্রামে বা গ্রামের আশেপাশে যদি কোনও ঘটনা ঘটে, তাহলে সবাইকে ঘটনাস্থলে চলে আসতে হবে।

তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। আবার গ্রামের মানুষ মিছিল করে বলদ লাঙল নিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে গ্রামের মনসামন্দির প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। জমায়েতে আবার বলা হল, আজকের পরিশ্রমে যেন গা এলিয়ে না যায়। রাত নটায় আবার আসতে হবে। সকলের মনে ফূর্তির আবেগ ---যেন বিরাট জয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছে। কিছু লোকের মধ্যে যে হতাশা জন্মেছিল, আজকের সংগ্রামে তা দূর হয়ে গেছে। এই অবস্থার মধ্যে ধরণীবাবু, ফিরে চলে যান সাইকেলে। জটালি ঠাকুরকে খবর দিতে হবে। জটালি ঠাকুর নিশ্চয়ই উদ্বেগে আছে-আজকের লড়াই-এ কী অবস্থা দাঁড়াল। ধরণীবাবু নিজেই জটালি ঠাকুরকে এই খবর দিয়ে দেবেন বলে গ্রামের লোককে জানিয়ে দেন।

খনি-মালিকের পাঁয়তারা

দশ-বারো দিনের পর ধরণীবাবুর কাছে খবর গেল, মালিক নাকি গ্রামের জমির মালিকদের নিয়ে কথাবার্তা বলতে চায়। অতএব ধরণীবাবুকে কাঁকরডাঙা গ্রামে যেতে হবে। চার-পাঁচ দিন পর কাঁকরডাঙা গ্রামে সবাইকে নিয়ে সভায় আলোচনা শুরু হয়। সংগ্রামের জয়ের ঘোর কাঁকরডাঙার মানুষের মনে তখনও বেশ রয়ে গেছিল। সাধারণ গরিব মানুষের গলার আওয়াজ যেন জোরদার হয়ে উঠেছে। রাঢ় এলাকার ভাষার কর্কশতা উচ্চগ্রামে উঠেছে। আলোচনা শুরু হল। গ্রামের লোক দেখল যে চানকের সন্নিহিত জমিগুলির উর্বরতা কমে যাবে ও তার সাথে জমিগুলির জল ধারণ করার ক্ষমতা হারিয়ে যাবে। যদি সঠিক জমির দাম নির্ধারিত হয় তবে মালিকের সাথে কথাবার্তা বলতে পারা যাবে। কারা কথাবার্তা বলতে যাবে তার জন্য একটি কমিটিও ঠিক হল -নটবর গোপ, ভোলানাথ গোপ, দুর্গাপদ গোপ, লক্ষ্মীনারায়ণ গোপ ও বাবু বাউড়ি, এরা কমিটিতে থাকবে।

লক্ষ্মীনারায়ণ গোপ বলে উঠল, খনি-মালিক যে জমি খরিদ করবে জমিহারা মালিক অথবা তার ছেলেদেরকে কাজ দেবে কি? সম্পূর্ণ নূতন দাবি। এর আগে জমিহারারা কাজের দাবি উঠিয়েছিল কি না, এখনও তা জানা যায় নি। অবশ্য কিছু কিছু গ্রামের লোক

মালিককে তোষামোদ করেই কাজ বা চাকুরি বাগিয়ে থাকে। তা কখনও দাবিতে রূপান্তরিত হয়নি। অনেকের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কাজের দাবি সভায় গৃহীত হয়। এই গ্রামে ভদ্রলোক বলতে কেউই ছিল না-- সেজন্য বিদ্যুতায়নের দাবি কেউ করেনি। দাবিগুলিকে সভায় জানিয়ে দেওয়া হয়।

গ্রামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার পর তিন মাসের মধ্যেও খনি-মালিক কোনও মীমাংসায় আসে নি। বিশেষ করে জমির দামের বিষয়ে। গ্রামের কৃষকসভার নেতৃত্ব গ্রামের লোকদের বোঝাল যে এটা হচ্ছে খনি-মালিকের চাল ---এইভাবে দিনক্ষণ ক্ষয় করে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। অন্যদিকে মুক্ত করা জমিতে ধান পাকতে শুরু করেছে। যদিও ভাল ধান হয়নি।

Calcutta Office:
[illegible] Row,
Calcutta-1
Phone: [illegible]

Registered Office.
P.O. Raniganj
Dist. Burdwan

Colliery Office.
DAMODA COLLIERY
P.O. Raniganj, Burdwan
Phone: [illegible]

Dated, 22.2.71.

To
Sri Lakhi Narayan Gope,
S/o Late Binod Gope,
Vill:- Kakardanga,
P.O. Raniganj,
Dist: Burdwan.

Dear Sir,

Re: Appointment letter dated 20.7.70.
Ref: Your letter dt. 22.2.70

Your appointment period is hereby extended by another 3(Three) months w.e.f. 22.2.71.

The other terms of your appointment will remain the same.

Yours faithfully,

(H. S. Saini)
Manager
Damoda Colliery

Lakhi Narayan Gope

গ্রামের মানুষের কাছে আর একটা লড়াই সামনা সামনি চলে আসে। নির্বাচনী লড়াই। লালঝাণ্ডার প্রার্থীকে জেতাতে হবে। আবার যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি করতে হবে। মালিককে আবার ধাক্কা দিতে হবে। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হয়। কাঁকরডাঙার লোকেরা আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। মালিক নিজের অসুবিধা বুঝে ডেকে পাঠাল কাঁকরডাঙার কৃষক নেতৃত্বকে। কথাবার্তা হল। জমির দাম সম্বন্ধে দাবি মোটামুটি মালিক মেনে নেয়। কিন্তু কাজের অথবা চাকুরির দাবিতে খনি কর্তৃপক্ষ বেঁকে বসে। খনি-মালিকের দালাল ধরণীবাবুর ঘরে যায় এবং হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তাও বলে। দালাল ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করে, "আপনার স্ত্রী কি ঘরে নেই"? ধরণীবাবু মুচকি হেসে বলেন, আমার স্ত্রীকে দরকার? ভদ্রলোক বলে উঠল, 'না, না এমনি জিজ্ঞেস করছি। ঘর তো খালি দেখছি।' ধরণীবাবু ভদ্রলোককে বললেন, "আমার তো বিয়ে হয়নি এখনও। তবে গাড়িতে কিছু জিনিসপত্র আছে না কি?" ভদ্রলোকের মুখ বেজার হয়ে গেল। ধরণীবাবুর বিয়ে হয়নি। পরে বলল, "খনি-মালিক গোয়েঙ্কা সাহেব বললেন কাঁকরডাঙার বিষয়টাকে মীমাংসা করে নিতে।" বলেই চলে গেল।

মানতে হল দাবি জমির বদলে চাকরি

কাঁকরডাঙার লোকেরা স্থির করল, রাস্তা অবরোধ করা হবে। কয়লার ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ল। যথারীতি পুলিশ এল, আবার চলে গেল। পুলিশ ধরণীবাবুকে বলে, "মালিক আবার কথা বলতে চাইছে। রাস্তা অবরোধ তুলে নিতে বলে দিন।" যুক্তফ্রন্ট সরকার রয়েছে—খনি মালিক পুলিশকে নিজের করাতে পারছে না। অবরোধ তোলার পর গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে মালিক অবশেষে তাদের দাবি মেনে নিল--চার জনের কাজ দেওয়া হবে। যে-কোনও দিন কাজ শুরু করে দিতে পারে। নিযুক্তিপত্র নিয়ে কিছু দিন এদিক-ওদিক হয়ে গেল। মালিক বলছিল, "নিযুক্তিপত্র দিয়ে কী হবে? কাজে যোগ দিলেই হয়।" কৃষকসভার নেতৃত্বের বক্তব্য, না নিযুক্তিপত্র দিতে হবে। খনি-মালিক মানতে বাধ্য হয়।

দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলে যতদূর জানা যায় এই প্রথম জমিহারাদের খনি-মালিক নিয়োগপত্র দিয়ে চাকুরি দিতে বাধ্য হয়। এর আগে জমিহারারা যদি চাকুরি পেয়ে থাকে- লেখককে জানালে লেখক অতীব কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণে রাখবে। চাকুরি যারা পেয়েছিল তাদের প্রথম নিয়োগপত্র হারিয়ে যায়। অবশ্যই এটা জানানো উচিত যে খনি-মালিক তিন মাস করে নিয়োগ দিতে থাকে। তারই একটি প্রতিলিপি এখানে ছাপানো হল।

ব্যক্তিগত মালিকানার সময়ে এই সংগ্রাম কী কঠিন ছিল তা বর্তমান জমিহারাদের অবগতির জন্য এই লেখা। সেই জন্যই বলা হয়—সঠিক বিষয়ে সঠিক সংগ্রাম ব্যর্থ হয় না।

□ 'নতুন চিঠি' শারদ সংখ্যা, ১৯৯৮ □

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বর্ধমানের মানুষ

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

সময়টা ১৯৪২ সালের মে মাস।

কংগ্রেসের যে আন্দোলন '৪২-এর আন্দোলন বলে পরিচিত তা তখনও ঘোষিত হয়নি। তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ছিল জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হলে দেশবাসীদের নিজেদের চেষ্টায় আত্মরক্ষা করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত ছিল এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, সুতরাং তার বিরোধিতা করতে হবে। কিন্তু হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল। সারা জগৎ জুড়ে শ্রমিক, কৃষক ও সমস্ত জনগণের দৃঢ় পণ হয়ে উঠল—ফ্যাসিজমকে পরাজিত করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষুণ্ণ করে উৎপীড়িত জাতিসমূহকে স্বাধীন করা যাবে। যাঁরা পিছনদিকে তাকিয়ে অতীতের ইতিহাস একটু দেখবেন, তাঁরা বুঝবেন আমাদের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আমরা তখন এই সিদ্ধান্তকে জনগণের মধ্যে প্রচার করছি। কংগ্রেসের আত্মরক্ষার প্রয়াসের প্রস্তাব যাতে প্রসারিত হয়ে ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধের অনুকূলে নির্দেশিত হয় তার চেষ্টা করছি।

কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য গ্রামে ও শহরে পল্লীতে-পল্লীতে জনরক্ষা কমিটি গঠন করার চেষ্টা করছি। এই উদ্দেশ্যে সভা, সমিতি, প্রচার ইত্যাদি করছি। জেলা কংগ্রেস কমিটি তখন অন্যান্য বামপন্থীসহ আমাদেরই নেতৃত্বে পরিচালিত।

আমরা পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের নীতি ব্যাখ্যা করে সভা ইত্যাদি করেছিলাম। কংগ্রেসের জনরক্ষা কমিটির সভা হয়েছিল, কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। আমি কমিটির আহ্বায়ক ছিলাম। এখানে একটা সভা করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, আমাদের কর্মসূচীর সঙ্গে যার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। মেমারি থানার উত্তরাংশে বড়-পলাশন অঞ্চলে মণ্ডলগ্রাম একটি সুপরিচিত বড় গ্রাম। জেলার বিভিন্ন স্থানে সভা করার সিদ্ধান্ত হয়। কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে মণ্ডলগ্রামে একটি সভা করা স্থির হয়। শেষোক্ত সভা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত লিখতে হবে। কারণ আমরা উভয়ে একটা বৃহত্তর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। কথা ঠিক হয় যে সভার আগের দিন কমরেড হেলারাম সড্যা, ফরিদপুর, ন্যাড়াগোয়াল, নিতিনপুর হয়ে ভগবানপুর—মণ্ডলগ্রাম পৌঁছাবেন। আর আমিও ঐদিন মাঝের-গাঁ (বিনয় চৌধুরীদের গ্রাম), সিহিগ্রাম, বড়-পলাশন হয়ে মণ্ডলগ্রাম-ভগবানপুর পৌঁছাব। ভগবানপুরেই আমাদের সাময়িক থাকতে হবে। ওখানে বিনয়দার পিসতুতো ভাই (এখন কলকাতায় সুপরিচিত ডাক্তার ও কমিউনিস্ট পার্টির পুরাতন সভ্য ছিলেন। পার্টি ভাগ হবার পর তিনি আমাদের সাথে সি. পি. আই. (এম)-এর সমর্থক হিসাবে আছেন।) সমর চৌধুরীর নেতৃত্বে ছাত্র-ফেডারেশন সংগঠিত হয়েছে। আমি সমরকে আগে জানিয়ে দিলাম যে রাত্রে আমি সিহিগ্রামে থাকব। সমর যেন সন্ধ্যায় সিহিগ্রামে আসেন। সকালে উভয়ে একসঙ্গে মণ্ডলগ্রাম আসব। সন্ধ্যারাত্রে সমর এলেন না। চিন্তিত হলাম। কিন্তু পরদিন

ভোরেই তিনি উপস্থিত। অত্যন্ত চিন্তাদায়ক সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, "মিটিং তো হবেই না, এখন কী করা যায় তাই ঠিক করুন।"

আগের দিনই হাটতলায় মেলার মাঝে কিছু স্থানীয় হিন্দু ও কিছু স্থানীয় মুসলমানের কথা কাটাকাটি শেষ পর্যন্ত মারামারিতে পর্যবসিত হয়। হাটতলায় মেলার বাজার। এখানে একজন মুসলমানের মিষ্টি ও খাবারের দোকান থেকে কিছু মিষ্টি বা খাবার বিক্রি করা নিয়ে ঝগড়া হয়। আবার কারও কারও মতে, বলির স্থানে একজন মুসলমানের গায়ে রক্ত লাগায় তা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হয়। এ ধরনের ঝগড়াঝাঁটি শেষ পর্যন্ত মারপিটে পর্যবসিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় পর্যবসিত হয়। উত্তেজনা খুব বাড়তে থাকে। স্থানীয় গ্রাম্য রাজনীতির কিছু ধুরন্ধর জোটেন এবং দাঙ্গা আরও বিস্তৃত করার জন্য ঘোট পাকাতে থাকেন। কিন্তু সুস্থবুদ্ধির মানুষ হিন্দু-মুসলমান যথেষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে স্থির হয়, পরের দিন সকালে হাটতলায় বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিরা মিলে একটা মিটমাট করা হবে। সেইরূপ উদ্দেশ্যে সকালে সমাবেশও হয়েছিল। ইতিমধ্যে আলোচনা চলছে এবং সব চুকে যাবে বলে ভরসাও এসেছে, এমন সময় হাটতলার মধ্যে একটা কিছু নতুন উপলক্ষ ঘটে চিৎকার, গালাগালি, মারপিট শুরু হয়ে যায়। এবার কিন্তু শান্তির চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যায় এবং মেলাতলা ধরে মারপিট ছড়িয়ে যায়। জমায়েত মানুষ নিরাপত্তার জন্য নিজ নিজ গ্রামে চলে যান। যা মারপিট হয়েছে তার কথাবার্তা উত্তেজনার সঙ্গে আলোচনা হতে থাকে এবং সেইদিনই চতুর্দিক থেকে মানুষ জড়ো করে শক্তি সংগ্রহ করে শত্রুর অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের আর মুসলমান হিন্দুর মোকাবিলা করতে হবে। উভয়েই আতঙ্কিত। অথচ উভয়েই এই আতঙ্কের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে শক্তি সংগ্রহ করে পরস্পরকে আক্রমণ করতে উদ্যত। উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে বিভিন্ন মুসলমান গ্রামের অনেকদূর পর্যন্ত চিঠি ও রোকা চলে গেছে। মুসলমান গ্রামকে বাঁচাতে হবে, সেজন্য মণ্ডলগ্রামের হিন্দুদের আক্রমণ করে প্রতিরোধ করতে হবে। হিন্দুরাও অনুরূপ পত্র দিয়েছেন বর্ধমান সদর, মন্তেশ্বর ও ভাতারের কোল পর্যন্ত। এইবার উভয়েই মণ্ডলগ্রামের চারপাশে জড়ো হচ্ছেন। মুসলমানরা গয়েশপুর ও তার চারপাশে এবং হিন্দুরা মণ্ডলগ্রাম, ভগবানপুরের ভিতরে ও তার আশপাশে জড়ো হতে থাকেন। সমরে আমাতে আলোচনা হল। ঠিক হল আমাদিগকে হস্তক্ষেপ করতে হবেই। এমনকি প্রাণের ভয় থাকলেও দাঙ্গা যে-কোনভাবে ঠেকাতে হবে এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। উভয়পক্ষে হাজার হাজার লোক সমবেত হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। (পরে নির্ভরযোগ্য তত্ত্বে জানা যায় বা বোঝা যায় যে প্রতি পক্ষে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজারের মত লোক সমবেত হয়েছিল)। অথচ আমরা তো মাত্র দুজন। একটি স্কুলের ছেলে, কিশোর মাত্র। আর আমি একজন বছর-তিরিশের যুবক। সমর নিজের গ্রাম-এলাকার লোক ছাড়া বাইরে কাউকে জানেন না। আমি তখন পর্যন্ত যা জানি, সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন। কংগ্রেসের কর্মী ছাড়া আমরা তো কোন পরিচয় দিতে পারব না (পার্টি তখনও বে-আইনী।

অবস্থা বুঝতে হলে তখনকার আবহাওয়াটা বুঝতে হবে। সামান্য সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করে এত উত্তেজনা কেন হচ্ছিল? আসলে হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণী

সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-বিদ্বেষ গোটা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইন্ধন জুগিয়ে চলছিল হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়া পত্রিকাগুলো। সামগ্রিক দেশের এই পরিস্থিতি, এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা সম্ভব নয়, কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন। এত প্ররোচনা সত্ত্বেও সাময়িক বিচলিত হলেও দেশের সাধারণ মেহনতি মানুষ আসলে শান্তিতেই থাকতে চায়। আমার জীবনে বারবার এই উপলব্ধি করেছি।

যাইহোক, আমাদের (আমি, সমর চৌধুরী ও অমল চৌধুরী বা ফড়িং) তখনই চারটি খেয়ে রওনা দিলাম। চললাম মণ্ডলগ্রামের পাশে, মাঝে মাইল তিনেক পর বড়পলাশন। ঠিক করলাম ওখানে আর একজনকে সঙ্গী করব--কংগ্রেসের কর্মী ভক্ত রক্ষিত। মাঝে মাঝে সমরের সঙ্গে কথা কইছিলাম, বেশিরভাগ সময়ই কী করে এই অবস্থাকে ট্যাকল্ করা যায়, আয়ত্তে আনা যায়, তাই নিয়ে নানান রকম চিন্তা করছিলাম। কিন্তু সমস্যা যেমন গভীর তাতে থইও পাচ্ছিলাম না এবং ব্যাপক অপরিচয়ের কারণে খেইও ধরতে পারছিলাম না।

এইরূপ অবস্থায় বন্ধুবর ভক্ত রক্ষিতের কাছে পৌঁছালাম। তিনি যা বললেন, ঘাবড়ে যাবার কথা। অবশ্য আমরা ঘাবড়াইনি। ঘটনাস্থলের এদিকটায় গয়েশপুর বা মুসলমান পাড়া। সুতরাং এদিক থেকে মুসলমানরাই জমা হয়েছে। রক্ষিত বললেন, ''ঘটনাস্থল গয়েশপুর বা মণ্ডলগ্রাম যাওয়া চলবেই না। শান্তির কথা তুলবেন কখন? তার আগেই তো আমাদের উপর লাঠি চলে যাবে। এখনও আমাদের গ্রামের মধ্যে কিছু হয়নি, কিন্তু আমাদের গ্রামের মুসলমানরা সব গিয়েছে। আমাকে একজন বড়পলাশনের হিন্দু দেখলে, ওখানকার দাঙ্গা এখানে ছড়িয়ে পড়বে।'' আমি বললাম, ''আমাকে তো যেতেই হবে। আমি কী করে এর মধ্যে প্রবেশ না করে শুধু হাতে ফিরে যাই? এদিকটা তো মুসলমান বলছেন, আমি তো মুসলমান, এদিক দিয়েই প্রবেশ করে দেখি।'' ভক্ত বললেন ''আপনাকে মুসলমান বলে চিনছেই বা কে (কারণ আমার পরনে ছিল ধুতি পাঞ্জাবি) আর চিনলেই বা কংগ্রেসী মুসলমানকে পাত্তা দেবে কেন? তার আগেই লাঠি চলে যাবে।'' আমি তখন সরলভাবেই বললাম, ''আমাকে যেতেই হবে।'' কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, এরূপ অবস্থায় সমরকে ও ফড়িংকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। সমর অবশ্য আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুতই ছিলেন। অচেনা জায়গায় অচেনা লোকের মধ্যে আমাকে একা যেতে দিতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। আমি বললাম, ''তোমাকে বরং আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিচ্ছি।'' এই বলে ঠিক করলাম, সমর চিঠি নিয়ে বর্ধমান যাবেন। কাজটা আলোচনার পর ভক্তবাবুও সমরের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। আমি বিজয়দাকে (অর্থাৎ শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্যকে) একটি চিঠি লিখলাম এবং শিবশঙ্কর চৌধুরীকে (পরে শহীদ) একটি চিঠি দিলাম। একজন শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা ও আমাদের গুরুজন, এবং অপরজন জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। পত্রগুলিতে আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে উদ্বেগজনক অবস্থা বর্ণনা করে লিখলাম, এ ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশের হস্তক্ষেপ ছাড়া বোধহয় গত্যন্তর নেই। হাজার হাজার মানুষকে বুঝিয়ে ঘরে ফেরানোর সময়ও নেই, সুযোগও নেই। পুলিশকে দিয়ে যদি আশু-দাঙ্গা প্রতিহত করা যায়, তার সঙ্গে সহজেই শান্তির প্রচার চলতে থাকবে এবং শান্তি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা

করা যাবে। শতশত লোকের প্রাণহানি, গৃহদাহ প্রভৃতি ঘটলে সুস্থ মন জাগিয়ে তোলা কঠিন হবে। বিজয়দাকে ও কালোকে আরও লিখলাম, "আপনারা যদি হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ প্রভৃতির নেতাদের আনতে পারেন ভালো হয়। আর আমাদের সকলের সাহায্যের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের একান্ত প্রীতিভাজন টোগোদা'কেও যদি আনতে পারেন, তাহলে ভালো হয়।"

বর্ষার সময় ক্যানেলের পিছল পথ ও গো-খুরো বা গরুর পাঁন্‌জ্ থাকায় বাঁধে চলা দুষ্কর ছিল। লণ্ঠন, ছাতা, লাঠি ইত্যাদি যোগাড় করে তাঁরা ক্যানেলের বাঁধ হয়ে উন্টে (উন্টেগ্রাম) হয়ে বর্ধমানের পথে রওনা হলেন। আর আমি নিজের ছাতা ও থলি হাতে করে গয়েশপুর-মণ্ডলগ্রামের দিকে রওনা হলাম। পথে এগোতেই দূরে রাস্তার ডান দিকে গয়েশপুর গ্রামের কোলে বেশ কিছু লোকজন জড়ো হয়েছে মনে হোল। আড়াই মাইল দূর থেকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না, শব্দও শোনা যাচ্ছিল না, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য রয়েছে, অস্পষ্ট হলেও, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কাছাকাছি আসতে আসতে কিছু হৈ-হামারি শব্দ পেলাম। এইবার এগোতে হবে, সোজাসুজি ভিড়ের দিকে। পরনে সাধারণ বাঙালী পোশাক, ধুতি-পাঞ্জাবি। মুসলমান পরিচয়ের কোন ইঙ্গিত নেই। সুতরাং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় মথিত জনতা (এদিকটায় মুসলমান) একজন অজ্ঞাত এরূপ মানুষকে ভালো চোখে দেখবে না, এটা বর্ণিত অবস্থায় স্বাভাবিক। একটা উপায় শট্ করে আমার মনে এল। আমি সুরাহ্ 'ফাতেহা' কোরানের প্রথম পরিচ্ছেদ আর সুরা 'এখ্‌লাস্' কেরাতের সুরে (অর্থাৎ কোরান পাঠের চর্চিত শিল্পরীতির সঙ্গীতের সুরে) পড়তে শুরু করলাম। একটু উঁচু স্বরেই এবং আগে থেকেই করতে লাগলাম। যাতে আমাকে দেখামাত্রই শব্দটা সেই মানুষের কানে যায়। ইতিমধ্যে দেখলাম ভিড় ভেঙে বেশ কিছু মানুষজন পিছন দিকে (সুতরাং আমার দিকে) দৌড়ে পিছিয়ে আসছে। ক্রমাগত আল্লাহ-হো-আকবর বলে চিৎকার করছে। (আল্লা-হো-আকবর মানে আল্লা সবচেয়ে বড়। প্রসঙ্গত উল্লিখিত সুরা বা পরিচ্ছেদ নামাজের কারণে প্রায় প্রত্যেক মুসলমানের জানা)। সবচেয়ে পিছনে যারা ছিল তাদের মধ্যে একজন চমকে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে বলল, "এই যে চাচাজী এসেছেন।" এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার সেই মাঝমাঠে উপস্থিতি তাকে মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই তার মনে জেগেছিল, "একজন নেতা গোছের মানুষ যখন পেয়েছি, আর ভাবনা কি ?" তার দেখাদেখি অন্যেরাও আমার কাছে জড়ো হতে লাগলেন এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে এগোতে লাগলেন। ইতিমধ্যে রশিদ আমার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে আর আমাকেও ঘটনা বলে যাচ্ছে। রশিদের পরিচয় কিছু দিয়ে দিই।

আমাদের বাড়িতে বেশ কিছু আশ্রিত ব্যক্তি ও পরিবার থাকতেন। রশিদের বাবা গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের। ওর দাদি (ঠাকুরমা) ছেলের হাত ধরে আশ্রয় নিয়েছিলেন (সে আমার জন্মের পূর্বে)। ছেলে খানিকটা লেখাপড়া করল। আরদালির চাকরি হল। বিয়ে করল। কিছুদিন পর মরে গেল। ইতিমধ্যে রশিদের জন্ম হয়েছে। সে আবার আমাদের বাড়িতেই বড় হল। নিকটস্থ বড়পলাশন গ্রামে ওর ফুফু (পিসী) থাকতেন। রশিদেরও পৈত্রিক গ্রাম সেই একই গ্রাম। রশিদ বেশ বড় জোয়ান হল। তখন ওর বিধবা ফুফু ওকে

নিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে যায় আসে, দেখা-সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু এইরকম মুহূর্তে হঠাৎ গয়েশপুরে আমি আবির্ভূত হব এতে তার হতভম্ব হবারই কথা। যাইহোক, যা বলছিলাম। ওর কাছে সব কথা শুনতে শুনতে একেবারে জমায়েতের মধ্যে এসে উপস্থিত হলাম। কুসুমগ্রাম অঞ্চলে কুলুটগ্রামের দু'একজনকে ভিড়ের মধ্যে চিনলাম। অনেক পরে জানলাম, আশপাশের এবং মন্তেশ্বর থানার বেশ কিছু জানাশুনা লোকও ছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁরা কেউ সামনে আসেননি। পারিবারিক সূত্র ধরে আমার পরিচয়টা ইতিমধ্যে জমায়েত মানুষের জানা হয়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি কোন বাড়ি থেকে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার আনা হল। একটি হ্যাজাক্ লাইটও ছিল, আমাকে বসতে অনুরোধ করা হল। এইবার আমাকে কিছু বলতে হবে।

আমি মৃদুভাবে শুরু করলাম, "আমি তো কিছু জানতাম না। আমি আমার সাধারণ কাজে এখানে এসেছিলাম। এসে দেখি এই দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু যা হয়েছে হয়েছে, শান্তি তো একটা করতে হবে।"

শান্তির কথা শোনামাত্রই সমস্ত জনতা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করতে লাগল, "না, না না--শান্তির কথাতেই মার খেয়েছি; আবার মার খাব। আমরা দূর দূর গ্রাম থেকে এসেছি। আমরা আর শান্তির ধাপ্পায় ভুলে মার খাব না। আপনি জানেন না ওরা ওধারে হাজারে হাজারে জড়ো হয়েছে এখানকার মুসলমানদের শেষ করার জন্য। আমরা এখানকার মুসলমানদের বাঁচাব। আর ওদেরও শিক্ষা দিয়ে যাব যাতে ভবিষ্যতে এরকম না করে।" কথাটা গুছিয়ে গাছিয়ে একবারে বলেছে তা নয়। আর শুধু একজন ব্যক্তি, তাও না। সবাই উত্তেজিত অবস্থায় আছে আর সেই অবস্থায় সবাই বলার চেষ্টা করছে। ওরই মধ্যে সব কথা জুড়ে মুড়ে আমাকে বুঝে নিতে হচ্ছে! নিকটস্থ গ্রামের দু'একজনের জখম বাঁধা ছিল। তাদের কাছ থেকে সব শোনার জন্য অন্যদের কোনরকমে স্থির রাখলাম। এদের মুখে যা শুনলাম ঘটনাটা এইমতো : সকালবেলা জমিদারের কাছারিতে মুসলমানরা তাদের গ্রাম থেকে এসেছিল মিটমাট করার জন্য। কথা চলছে এমন সময় বাইরে হাটতলায় (এখন মেলাতলায়) মুসলমানদের উপর মার শুরু হল। চিৎকারে বৈঠকের মধ্যে যারা বসেছিল তাদেরও বেরোতে হল। বেরিয়ে তারাও আক্রান্ত হল ও মার খেল। শেষে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। (বলা বাহুল্য, পরে এই একই কাহিনীর বিপরীত ছবি পেয়েছিলাম হিন্দুদের কাছ থেকে। তাঁরা বললেন, "বসেছিলাম মিটমাট করতে। বাইরে থেকে চিৎকার হচ্ছে, হিন্দুদের উপর মার হচ্ছে। সুতরাং আমরাও বাইরে বেরিয়ে এলাম।")

পরে বুঝেছিলাম, উভয়পক্ষেরই কিছু মাতব্বর শ্রেণীর মানুষ আন্তরিকভাবেই মিটমাটের জন্য বসেছিলেন এবং আলোচনা চলছিল। মেলাতলায় তখন প্রচুর লোক-- হিন্দু-মুসলমান উভয়ই। উত্তেজনার পরিস্থিতিও প্রাচীন পুজোর মেলার আনন্দকে স্তব্ধ করতে পারেনি। যাইহোক, হাটতলায় একটা কিছু বেধে পুনরায় গণ্ডগোল লেগে যায় এবং উভয়পক্ষে বেশ কিছু মারপিট হয়। তারপর উভয়পক্ষ গ্রামে গ্রামে ফিরে বিরোধী পক্ষের আক্রমণের আতঙ্কে নিজেরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। পূর্বেই বলেছি এরূপ আতঙ্ক প্রচার ও আহ্বানে উভয় পক্ষের মানুষ জমায়েত হয়।

এরপর দুইদিকে জমায়েত আড়ালে আড়ালে থাকছে। আবার সামনে দু'চারজনকে দেখলে মারপিটের চেষ্টাও হচ্ছে।

আমি এইরকম উত্তেজনার ক্ষেত্রে পৌঁছে মনে মনে খুব ভাবিত আছি। যদি সামলাতে পারি তো ভালোই। আর সামলাতে যদি না পারি তাহলে?

দেখলাম, দাঙ্গার উত্তেজনায় সকলেই উত্তেজিত। আমি তখন এক মুহূর্তের মধ্যে বাইরের ব্যবহারে ভূমিকা পরিবর্তন করে ওদের উত্তেজনার মোড় ঘোরাব ঠিক করলাম। চতুর্দিক থেকে চিৎকার হচ্ছিল, "আপনি আমাদের নেতা হন।" তখন আমি বলে উঠলাম, "বেশ, তাই হবে। আমিই না হয় নেতা হলাম। কিন্তু নেতার কথা তো শুনতে হবে। এত মানুষ চারিদিকে এলোমেলো করে ছড়িয়ে থাকলে আমি সামলাব কি করে? মাঝে এক বা একাধিক জায়গায় জড়ো হন আর বিশ্রামনিন। শ'দেড়েক লোক স্বেচ্ছাসেবক হন। তাঁরা চতুর্দিকে পাহারা দেবেন। আমার নির্দেশ ছাড়া কেউ কিছু করবেন না।" তখন আমার উদ্দেশ্য জমায়েত লোকের অস্থিরতা এবং উত্তেজনা প্রশমিত করে থিতিয়ে দেওয়া। ভ্রাম্যমাণ লোকের সংখ্যা কমিয়ে নিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাসেবকের দলে আটকাতে পারলে সামলানোর উপায় পাওয়া যেতে পারে। আমি তো অপর পক্ষের কথা কিছু বুঝতে পারছি না। স্থানীয় পথঘাটের ভৌগোলিক স্থিতিও জানি না। রাতের অন্ধকারে জানার বা বোঝার কোন উপায় নেই। ছড়িয়ে পড়া উভয় পক্ষের ছাড়া-ছাড়া মানুষের মধ্যে কোন জায়গায় আচম্বিতে কোন অঘটন ঘটলে উত্তেজিত মানুষ পরস্পরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃহৎ দাঙ্গায় পরিণত না করে ফেলে এই ভাবনা আমার মনে তখন ছিল। হিন্দু পক্ষে কী ঘটছে কিছুই জানি না। হেলারামবাবু তখনও পৌঁছেছেন কিনা এবং পৌঁছে থাকলে কী করছেন তা-ও জানি না। যাইহোক, আমার দিক থেকে যতটা সম্ভব একপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করবো—এই কৌশলই ধরে থাকলাম। জমায়েতের জায়গা থেকে গয়েশপুর গ্রামের মাতব্বরশ্রেণীর মানুষেরা আমাকে গয়েশপুর মসজিদের মধ্যে নিয়ে এলেন। বেশ কিছু মানুষ আমাদের সঙ্গে মসজিদ পর্যন্ত এল। মসজিদের বারান্দার মেঝেতে কিনারের দিকে কিছুটা ভাঙা। চোট্ দিয়ে ভাঙার চিহ্ন। অবশ্য বড় ধ্বংসের চিহ্ন নয়। কিন্তু মনের ব্যাপার, সেন্টিমেন্টের ব্যাপার আছে। গ্রামে ঢুকে মসজিদ আক্রমণ করেছে-তার সাক্ষ্য-প্রমাণ এইভাবে উপস্থিত করলে তার জবাবে সেই মুহূর্তেই কোন মন্তব্য করা কঠিন। আমি চুপ করে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলাম। জমায়েতেই বলে এসেছিলাম, দাঙ্গা যদি করতেই হয় তো দিনের আলোয় তা হবে। রাতে তো কিছু দেখা যাবে না। মসজিদের ভিতরে এসে বসে বোঝালাম, রাতটা বিনা হাঙ্গামায় কাটে এটা আমাদেরই স্বার্থ। আমাদের বলতে তখন এখানে জমায়েত সরজমীন অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। উপস্থিত সকলেই, বিশেষ করে গ্রামবাসীরা, সমর্থন করলেন। আমি তখন বললাম, তাহলে পাহারা ৪০-৫০ জনের মধ্যেই সীমিত থাকুক, আর আমি তো এখানে জেগে বসে আছি।

রাত্রের মধ্যে আর কিছু ঘটেনি। ভোরের দিকে তখনও অন্ধকার কাটেনি, পাঁচ-ছ জনের পাহারার এক গ্রুপ একজন হিন্দুকে নিয়ে এসে উপস্থিত হল। দেখেই বুঝলাম, নিরীহ

ব্যক্তি। কিন্তু মুখের ভাব নরম না করে গম্ভীর রাখলাম। ইতিমধ্যে হিন্দু ধরা পড়েছে খবরে এক উত্তেজিত জনতা জড়ো হয়েছে। আমি জেরা করতে লাগলাম। ধৃত-ব্যক্তিটি বোধহয় করন্দা গ্রামের। বড়পলাশন ও গয়েশপুরের কোল দিয়ে নবস্থা যাচ্ছিলেন বাস ধরতে। জানালেন তাঁর মেয়ের ডেলিভারির কথা। এই আতঙ্কের খবর পেয়ে তাঁর মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবরই তিনি রাখেন না— ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার জেরাকে ডুবিয়ে দিয়ে উত্তেজিত জনতার কাছ থেকে আওয়াজ আসছে, "গুপ্তচর, গুপ্তচর, ওঁর কথা বিশ্বাস করবেন না।" উত্তেজনার অবস্থা দেখে আমি তাড়াতাড়ি লোকটিকে নিরাপত্তা অবস্থায় সরাবার চেষ্টা করলাম। পাশে ইমামের ঘর খালি ছিল। গ্রামবাসীদের বললাম, "এখন কোন অ্যাকশন নেওয়া হবে না। যা করার সকালে করব। এখন এই ঘরে তালা দিয়ে আটকে রাখ।" তাঁকে খুব গম্ভীর হয়ে বললাম, "আপনি এ রাস্তায় এ সময়ে এলেন কেন? আপনার কথা এরা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না! সুতরাং আপনি এখন আটক থাকুন।" আস্তে আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল ঘণ্টা-দেড়েক পর। গ্রামের মাতব্বরা এবং উপরে উল্লিখিত আমার চেনা-মানুষরা জেগে আছেন। তখন ভোরের আলো মাত্র দেখা দিয়েছে। আমার সঙ্গীদের বললাম, "মানুষটা তো নির্দোষী বলে মনে হচ্ছে। ওঁকে আটকে রেখে লাভ কি ? আটক রাখাও তো দায়িত্ব। ওঁকে ছেড়ে দেওয়া যাক্।" যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই সোচ্চারে সমর্থন করলেন। গ্রামবাসীদের বললাম, "আপনাদের খুব বিশ্বস্ত কিছু জোয়ান ছেলে ডেকে দিন।" পাঁচ-ছ'জন জোয়ানকে তাঁরা নিয়ে এলেন। লোকটিকে তালা খুলে বের করে আনা হল। তাঁকে বললাম, "আপনি খুব ভুল করেছেন। পথঘাটের খবর নিয়ে বেরোন উচিত ছিল। এ-মুখে না গিয়ে মাঝের-গাঁ দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এখন এদের সঙ্গে আপনি যান।" জোয়ানদের বললাম, "শান্তির যেমন নিয়ম আছে যুদ্ধেরও তেমনি নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। যেহেতু আমরা নেতারা বলে দিয়েছি সেইহেতু তোমাদের কর্তব্য হল একে নিরাপদে আমাদের এলাকা থেকে পার করে দেওয়া। এঁর গায়ে কেউ যেন আঘাত করতে না পারে। নিজের প্রাণ দিয়েও তোমাদের দেখতে হবে। গ্রামবাসী একজন মাতব্বরকে জমায়েতের মধ্যে পাঠিয়ে দিলাম বিষয়টা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে। জোয়ানকেও ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম, আশ্রিতজনকে রক্ষা করা হচ্ছে কর্তব্য। তাঁরা একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছে এই ভেবে খুব উৎসাহিত হল, একস্বরে বলে উঠল, "আমাদের জান থাকতে ওঁর গায়ে আঁচড় লাগবে না।" ঘুরে এসে কর্তব্য-পালনের রিপোর্ট করল।

দিনের আলো ফুটেছে মাত্র। এমন সময় দু'তিনজন লোক প্রায় ছুটে এসে খবর দিলেন -সশস্ত্র পুলিশ এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মাতব্বরও দু-তিনজন এলেন। বললেন "পুলিশ বলেছে, তদন্ত শুরু করছি। যার যা বলার আছে এসে বলুন।" আমি বললাম, "ঠিকই আছে। নিজের হাতে আইন নেবেন কেন? এখন তো আর ওদের আক্রমণ করার প্রশ্ন নেই। সশস্ত্র পুলিশ যখন এসেছে তারা বাধা দেবেই। না দেয় পুলিশের মনোভাব দেখলেই বোঝা যাবে। তখন যা হয় করা যাবে। এখন আপনাদের যা অভিযোগ আছে, পুলিশকে বলুন। ওঁদের (অর্থাৎ হিন্দুপক্ষের) যা অভিযোগ আছে, ওঁরা বলবেন।" চিৎকার

উঠল, ''মসজিদ ভেঙেছে'' আমি বললাম, ''সেও তো আপনাদের একটা অভিযোগ। নিজেরা খুনোখুনি করে ঘর-জ্বালিয়ে ফয়সালা তো হবে না।'' সারারাত ধরে ক্লান্তি আর দুর্ভাবনা গ্রামের মুরুব্বি-মাতব্বরদের চিন্তিত করেছিল। যদিও সাধারণ সভায় তখনও খুব উত্তেজনা। তবু সারারাতের অভিজ্ঞতায় আমার তখন কিছু ভরসা এসেছে। ভাবছি দুপক্ষকেই যদি পুলিশের কাছে বসিয়ে দেওয়া যায়, বিচার একটা হবে এই ভরসায় জড়ো হওয়া মানুষকে যদি বিদেয় করা যায়, পুনরায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় গড়ানো ঠেকানো যায়, মামলা-মোকদ্দমা মিটিয়ে নেওয়ার তবু চান্স থাকে। আমি সেই মতোই কথা বলে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে একজন এসে বলল, ''পুলিশ তাগাদা দিচ্ছে। জমায়েত মানুষরা সকলে যে খুশী তা নয়। দুর্ভাবনা আছে, উত্তেজনাও আছে। পুলিশই বা ভরসা কোথায়? তারা পক্ষাপক্ষি করে হাঙ্গামা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।''

পুলিশ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা আমারও ছিল। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে যা ইচ্ছা করতে পারে। আবার যে-রকম উত্তেজনা দুই-পক্ষে বজায় রয়েছে, আর দুই-পক্ষেই দূর হতে আগত লাঠি হাতে মানুষ এত জড়ো হয়েছে যে তাদের ঠেকানো পুলিশের ক্ষমতার বাইরেও চলে যেতে পারে। আমার ভয় ছিল কম বয়সের জোয়ানদের সম্বন্ধে। বলা বাহুল্য উভয়পক্ষেই এরাই প্রধানত উত্তেজনার খোরাক। সুতরাং আমিও খুব চিন্তিত।

তাছাড়া তখন ইংরেজ আমল। পুলিশকে তখন আমরা ইংরেজের পুলিশ বলেই দেখি। সুতরাং সাধারণের কাজে পুলিশের মুখাপেক্ষী হওয়াটাই এক সঙ্কোচের বিষয় ছিল। তাই কালোকেও বিজয়দা (শ্রদ্ধেয় শ্রী বিজয়কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়)-র সঙ্গে পুলিশের হস্তক্ষেপ ছাড়াও সমস্ত বিষয়টা আলাপ করে নিতে বলেছিলাম। যাইহোক, এটাই এখন সঠিক পথ বলে মনে হল।

গ্রামবাসীরা বললেন, ''পুলিশের কাছে কী বলব, না বলব--আপনার কাছে এসে পরামর্শ করে যাই।'' আমি অস্বীকার করলাম। আমি বললাম, ''ঘটনা আমি কিছু প্রত্যক্ষ দেখিনি। তাছাড়া মামলা-মোকদ্দমায় তোমরা অভিজ্ঞ বেশি এবং বোঝ বেশি। সুতরাং নিজেরা আলাপ করে যা বলবার বল।'' আমি তখন মসজিদেই বসে থাকলাম। ওরা আমার কাছ থেকে চলে গেল। এক জায়গায় বসে মাতব্বররা ব্যাচের পর ব্যাচ সাক্ষী-সাবুত পাঠাতে লাগল। আমি সোজা গ্রামের বাইরে যেখানে গাছতলায় পুলিশ বসেছিল, সেখানে গিয়ে বসলাম। অবশ্য আলাপ-পরিচয় করার পর তাদের নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেবার জন্য বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে দূরে সরেই বসলাম। চতুর্দিকে মানুষের ভিড়। অবশ্য তারা দূরে সরেই আছে। সব মানুষ জড়ো হয়েছে, ভিড় তো দেখা যাবেই। তাদের শুধু আমি অনুরোধ করলাম, ''শান্ত হয়ে থাকুন, পুলিশের কাজে যেন বিঘ্ন না হয়।'' বেলা বাড়তে লাগল। সাক্ষী-সাবুত চলতে লাগল। শুনলাম ঐ পক্ষেও সশস্ত্র পুলিশসহ একজন অফিসার তাঁরা রেখেছেন। ও-পক্ষের সাক্ষী-সাবুত নিচ্ছেন। আমি বসে চতুর্দিকে নজর রাখলাম। ভিড়ের মধ্যে কোথাও চাঞ্চল্য দেখলে উঠে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে আবার এসে বসছিলাম।

এখান থেকে কুসুমগ্রাম বেশিদূর নয়, মাইল আট নয়। ওখানে জমিদার বদু মিঞার বাস। একজন গ্রামবাসী ঘোড়া দৌড়ে এসে হাজির। তাকে ঘিরে চাঞ্চল্য দেখে আমি সেখানে গেলাম। ঘোড়ায় চড়ে আসা লোকটি বলল, "বদু মিঞা বললেন, পুলিশ এসেছে তো কী হয়েছে? তোমরা লাগিয়ে দাওগে।" এক মুহূর্তেই বুঝলাম এটা কোন চক্রান্তের অংশ। সত্যাসত্য বিচারের কথা ভাবলাম না। বুঝলাম এখানে মিঞাত্বকে তুচ্ছ না করলে চলবে না। আমি বললাম, "এই হুকুমের জন্য এখানে গ্রামের মাতব্বর নাই? তোমাকে বদু মিঞার কাছে যেতে হবে কেন? তার আস্তাবলে তো ঘোড়া বাঁধা। তোমার সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলে না তো? একগ্লাস পানি দিয়েছিল? না তাও দেয়নি? বদু মিঞা কোনদিন এ গ্রামে এসে বসেছিল?" আরও কিছু বললাম, জিনিসটাকে খেলো করে দেবার চেষ্টা করলাম। উত্তেজনা থাকলেও সাধারণ মানুষের শান্তির কামনা লুপ্ত হয়নি। সুতরাং আমার কথা সহজেই জমায়েত মানুষের কাছে সায় পেল।

অনেকক্ষণ সাক্ষী-সাবুত চলছে। স্বভাবতই শোনার জন্য মানুষের আগ্রহ। সেজন্য মাঝে মাঝে ভিড়ের কিছু অংশ এগিয়ে আসছে। আর আমাকেও উঠে গিয়ে বুঝিয়ে সরিয়ে দিতে হচ্ছে। তখনও বুঝিনি, কিছু ভিন্ গাঁয়ের লোক গণ্ডগোল বাধাবার জন্য নিয়ত সক্রিয় ছিল। কিন্তু অশান্তির পক্ষে পদক্ষেপে উত্তেজিত মানুষেরও বিবেকে বাধে এবং সংযম নিয়ে আসে। আমি এই স্বাভাবিক শক্তিকে জাগ্রত রাখার চেষ্টা করছিলাম। যার ফলে মুষ্টিমেয় চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হচ্ছিল। অনেকক্ষণ এইভাবে চলেছে। এমন সময় আচম্বিতে একটা ঘটনা ঘটল।

পুলিশ ও আমরা যেখানে গাছতলায় বসেছিলাম, সেটা একটা চতুষ্কোণ দিঘির এক কোণ। এই কোণটা গয়েশপুর গ্রামের কিনারার সংলগ্ন। পাড় ধরে সোজাসুজি পশ্চিমের কোণটা মোড়লগাঁয়ের দিকে। আমি ঐ কোণের দিকেই মুখ করে বসেছিলাম। এইসময় হঠাৎ কিছু আওয়াজ পিছন থেকে পুকুরের ওপারের পাশ থেকে এল। শত শত মানুষের ছুটে চলার পদশব্দ। ঘুরে তাকিয়ে দেখি বিরাট জমায়েত মানুষ যা ছিল তারা সব জড়ো হয়ে আমাদিকে এড়িয়ে পুকুরের ওপার দিয়ে মোড়লগাঁ অভিমুখে ছুটতে আরম্ভ করেছে। দেখে মনে হচ্ছে জমাট বাহিনী। আমি দেখামাত্রই ছুটে পাড় ধরে পশ্চিমের কোণ হয়ে পশ্চিম পাড়ে তাদের সম্মুখীন হলাম। আটকালাম। বললাম, থামতেই হবে। পিছনে পুলিশ ছুটে এসে বন্দুক উঁচিয়ে শুয়ে পড়ল। উত্তেজিত কিছু ছেলে তখন আমাকে গাল দিচ্ছে 'হিন্দুর গুপ্তচর'। আমার ধমকের স্বরে বিরোধিতায় জমায়েত মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন অপরিচিত বয়স্ক মানুষ এসে আমার পাশে দাঁড়াল। তার যেমন বিশ্বাস সেও চিৎকার করে বলতে লাগল, "কাকে কী বলছিস? বুঝতে পারছিস্ না, মুখে পোকা হবে।" আমি বললাম, "আমার লাশ্ থাকবে এখানে। লাশের উপর দিয়ে তোমাদিকে যেতে হবে, কিন্তু আমি নড়ব না। বয়স্ক ব্যক্তিটিও আমার সঙ্গে সায় দিলেন। ইতিমধ্যে পিছন থেকে আওয়াজ এল ওয়ান ... টু ... সঙ্গে সঙ্গে ডি. এস. পি. বঙ্কিমবাবুর জোর গলার আওয়াজ 'শাহেদুল্লাহ্ সাহেব সরে যান, গুলি চালাচ্ছি।' প্রকৃতির নির্দেশে স্বতই পা-টা পিছিয়ে

যাবার মতো হয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত দৃঢ় হল, যা হবার হবে, নড়া চলবে না। আরও একজন মানুষ পাশে এসে দাঁড়াল। পূর্বে উল্লিখিত মীরের ডাঙ্গার আব্দুল খালেক মিঞা। আমি সমানে চিৎকার করে বলে যাচ্ছি "এক পা এগোলে চলবে না।" আর কাঙালী ভাই (যে আমার পাশে আগেই এসে দাঁড়িয়েছিল) সেও অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে। আর খালেকমামুও (তাঁকে আমি মামুই বলতাম) ওদের বারণ করছেন। বলতে এতক্ষণ লাগল, কিন্তু মুহূর্তকয়েকের ঘটনা। আমি ছুটে এসে দাঁড়ানোতেই দ্বিধাগ্রস্ততা এসেছিল। কাঙালী ভাই-এর বিরতিহীন অভিশাপ সেই দ্বিধাগ্রস্ততাকে বাড়িয়েছিল। খালেকমামু এসে দাঁড়ানোতেও সেটা একটু জোর হল। নয় জন সশস্ত্র পুলিশের শুয়ে উঁচিয়ে বন্দুক এবং ডি. এস. পি.-র সজোর আওয়াজ 'গুলি চালাব'-শুধু এতেই নিরস্ত হত না এটা সত্য। কারণ উত্তেজনায় মানুষ তখন পাগল। মসজিদ ভেঙেছে তার ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু আমি সামনে পড়ে থিতিয়ে দেওয়াতে মানুষ ভাববার অবসর পেল। সবে মিলে জমাট ভিড় শিথিল হয়ে গিয়েছিল। পিছনকার মানুষরা একেবারে সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে গেছে। একেবারে সামনে দু-তিন লাইন বাদ দিলে বড় ফাঁক হয়ে গেছে। আর একেবারে পিছনকার মানুষ তখন পিছন দিকে মুখ ফিরিয়েছে অর্থাৎ ফিরে যাচ্ছে। কিছু ছেলে-পিলে হাঙ্গামা-বাজদের দ্বারা উত্তেজিত হয়েছিল, তাদের তপ্তস্বর কমেনি। উচ্চৈস্বরে কিছু বলতে বলতে সম্ভবত গাল দিতে দিতে ফিরল (অবশ্য এদের মধ্যে অনেকেই পরে আমার সঙ্গে দেখা করে অনুতাপ প্রকাশ করেছিল।)

ডি. এস. পি-র সাক্ষী নেওয়ার পালা শেষ হল। এখন অবস্থা বেশ শান্ত হয়ে এসেছে। মোড়লগাঁ থেকে পুলিশের সঙ্গে দু-চারজন এসেছেন। কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ও এসেছেন। তাঁর কাছে শুনলাম, তিনিও আমার মতো অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন। তবে তিনি রাত্রে এসে পৌঁছাতে পারেন নি! ঘণ্টা কয়েক আগে সকালের দিকে পৌঁছেছেন। এমন সময় এস. পি. এবং এস. ডি. ও. এসে পড়ল। অনেকেই সামনে এসে জড়ো হল। এস. পি. বক্তব্য রাখলেন। বললেন, "পুলিশ তার কর্তব্য করবে। আপনারা যে নিরস্ত হয়েছেন, ভাল কাজ করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।" এস. পি. আমাকে একটু সরিয়ে নিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমার বিশেষ কিছু বলার আছে কিনা। আমি বললাম, "এখন পর্যন্ত আমার কোন অভিযোগ নাই। পুলিশ তাঁর কর্তব্যই করুন। অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার করে ন্যায়ত যা করা উচিত তাই করুন, কিন্তু পুলিশ যাঁরা এখানে থাকছেন তাঁরা যেন এখানে নতুন সংকটের সৃষ্টি না করেন। তাঁরা যেন শান্তি বজায় রাখার দিকে সহায়তা করেন।"

এস. পি. যাবার সময় পুলিশ অফিসারদের ডেকে আমার শান্তি বজায় রাখার চেষ্টায় সাহায্য করতে বলে গেলেন। এতে সেই সময় খানিকটা ফল ভালো হয়েছিল। কমরেড হেলারামকে আমি বললাম , "আপনি মোড়লগাঁ ও ভগবানপুরে থেকে শান্তি প্রয়াস চালিয়ে যান। আমিও এদিকটার গ্রামগুলোতে তাই করতে থাকি।"

এইবারে হাঙ্গামার ক্ষেত্র থেকে ফিরে গ্রামে এলাম। প্রথমে মির্ধাদের বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ বসলাম। পরন্ত বেলায় খাওয়া-দাওয়া ওখানেই হল। এমন সময় কালো (শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী) সমরকে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি খবর দিলেন তিনি, বিজয়দা, রশিদসাহেব প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে মোড়লগাঁ এসেছেন। শ্রীকুমারদা (হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীকুমার মিত্র) আগেই এসে গেছেন। এখন মোড়লগাঁয়ে কথাবার্তা হয়ে ওঁরা সব সন্ধ্যার পর গয়েশপুর আসবেন। আমি কালোকে বললাম, "দু-চারজনের মারামারির ঘটনা হয়েছে। এর দরুণ দুঃখ ও ক্ষোভ কোনরকমে হয়তো মেটানো যাবে, কিন্তু মসজিদ আক্রমণের ব্যাপারটা খুবই শক্ত দাঁড়িয়েছে। ওই টার কি করা যায় এখনও ভেবে পাইনি। আপাতত দাঙ্গা তো ঠেকানো গেল। দেখা যাক পরে-পশ্চাতে কি করা যায়।" কালো বললেন, "উভয় গ্রামে দেখে বুঝছি মিটবেই এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হবেই। তবে উত্তেজনার উত্তাপে এখন খী ধরা যাচ্ছে না। সমাধান কিছু সময়সাপেক্ষ।" কালো সমরকে নিয়ে মোড়লগাঁ ফিরে গেলেন। যাঁরা বর্ধমান থেকে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন বললেন। আমি গ্রামবাসীদের নির্দেশে তখন সেখদের বৈঠকখানায় গেলাম। পরবর্তীকালে দু-এক ক্ষেত্র বাদ দিলে এটাই আমার স্থায়ী থাকার জায়গা ছিল। বৈঠকখানাটায় বসার জন্য খোলা-মেলা অনেকখানি জায়গা ছিল। ওখানে বসে আছি, লোকজনের ভিড়, কথাবার্তা চলছে। এ. এস. আই. করিম সাহেব এলেন। এঁরা ছোট-খাট অফিসার। একটুকুতে কতটা বেশি মনে করে নেয় তার একটি নিদর্শন পেলাম। এস. পি. ডেকে নিয়ে আলাদা করে কথা কওয়ায় উনি ধরে নিলেন এস. পি.-র সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা বেশি। সুতরাং ওঁর চাকরির ক্ষেত্রে, ওঁর প্রমোশনের দাবীর পক্ষে যদি আমি কিছু বলি তাহলে তাঁর উপকার হবে। কি আর করব? গণ্ডগোল যাতে আবার না বাধে সেজন্য এদের সবারই সাহায্যের দরকার। বললাম, "কথা তো দিতে পারি না। সুযোগ পেলে চেষ্টা করবো।" কিন্তু ভদ্রলোক আশু সমস্যায় একটা উপকার করলেন। গ্রামবাসীরা এবং অন্যান্যরা আমার কথা শোনায় কী উপকৃত হয়েছেন তা বুঝিয়ে বললেন। সেদিন গুলি চললে ও দাঙ্গা চললে কিরকম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তার একটা ভয়াবহ ছবি গ্রামবাসীদের সামনে রাখলেন। তিনি চলে যাবার পর মনোরঞ্জন আই. বি. এসে হাজির। জিজ্ঞেস করল, "আপনার কি মিটিং হবে?" যুদ্ধের সময় এস. পি.-র কাছ থেকে মিটিং-এর অনুমতি নিতে হত। সেই মিটিং-এর চিঠি উল্লেখ করছিল। আমি রগড় করে বললাম, "আমি যদি উত্তর না দিই কী হবে?" বলল, আপনার কিছু হবে না, কিন্তু আমার খাওয়া-দাওয়ার জায়গা ঠিক নেই। থাকার জায়গা নেই। আমার খুব দুর্গতি হবে।" যাইহোক, ওর অনুরোধের পীড়নে, 'অবস্থার পরিবর্তনে মিটিং আর হবে না।', এটা লিখে দিলাম।

বিজয়দা-টোগোদাদের আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাঁরা ময়না চৌধুরী প্রমুখ মোড়লগাঁয়ের কয়েকজন মাতব্বরশ্রেণীর ভদ্রলোকদের নিয়ে এসেছিলেন। টোগোদা ঢুকেই বললেন, 'ইচ্ছা করেই এঁদের নিয়ে এলাম। এ গ্রাম থেকেও আজ রাত্রেই মোড়লগাঁয়ে নিয়ে যাব। এঁদের যাওয়া-আসা আবার শুরু করে যেতে হবে। যাওয়া-আসা চলতে থাকলে আপনিই

শান্তি হয়ে যাবে।'' ও গ্রামেও ওঁদের যেমন শুনতে হয়েছে, এ গ্রামেও সব কথা শুনতে হল। টোগোদা আমার কানে কানে একটা কথা বললেন, ''দেখ, হিন্দুর ছেলে মসজিদে আঘাত করতে পারবে না। আমাদের হিন্দুরা ঢেলার মধ্যে ভগবান আছে বলে পুজো করে। মুসলমানরা উল্টো। এরা মসজিদকে ইমারত ছাড়া কিছু মনে করে না। মামলাটাকে জোর করার জন্য এটা মুসলমানেরই করা হতে পারে।'' আমি পরে জেনেছিলাম টোগোদার কথাটাই সত্য। ঘটনাচক্রে পরের দিনই শুনলাম। আমি যখন এসে জমায়েতে পৌঁছেছিলাম তখন আমি না চিনলেও জমায়েতের অনেক লোক আমাকে চিনেছিল। তাদের মধ্যে কেউ পরামর্শ দিয়েছিল, ''মসজিদে এখনই শাবল চালা। না হলে 'এ' (আমার নাম করে বলেছে) যখন এসেছে এখনই শান্তির কথা বলবে। মসজিদের কথা তুললে এরও মুখ বন্ধ হবে আর এতগুলো মানুষকে যে জমা করা হয়েছে তাদেরও গরম রাখা হবে।'' কিন্তু মিটমাট করতে বসে কেন যে এমন গণ্ডগোল হল তার কৈফিয়তটা খুব পরিষ্কার হয়নি। টোগোদা'রা সেদিনই গয়েশপুরের কিছু লোককে মোড়লগাঁয়ে নিয়ে গেলেন এবং মেলামেশার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়ে বর্ধমান ফিরে গেলেন। আমাকে কয়েকদিন থাকতে হল।

শান্তির পক্ষে শক্তি বৃদ্ধির জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরছি। এর মধ্যে একদিন পর মূলগাঁয়ের কাঙালীভাই-এর বাড়ি নেমন্তন্নে গেলাম। শান্তিরক্ষার পক্ষে আলাপ-আলোচনা গ্রামের লোকদের সঙ্গে হল। নাস্তা করা হল, কিন্তু খাওয়া পর্যন্ত আর থাকা গেল না। মনে খুব দুঃখ হল, ঐ গ্রামে প্রথম গেছি অথচ নেমন্তন্ন রক্ষা করতে পারলাম না। তাছাড়া যাঁর আমি অতিথি, তাঁর প্রতি আমার তখন যথেষ্ট শ্রদ্ধা। গুলি-চালনায় যখন পুলিশ প্রস্তুত, আর দাঙ্গাবাজরাও যখন আমার পরোয়া করছে না, তখন তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে শুধু সদিচ্ছা নয়, সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলে উঠলাম কেন? গয়েশপুর থেকে একজন লোক আমাকে ডাকতে এসেছিলেন। বললেন, ''অমরবাবু পুলিশ ইন্সপেক্টরের সাথে বসে সব মিটমাটের কথা হয়ে গেছে। আমাকে এখনই যেতে হবে। আমি গেলেই মিটমাট হয়ে যাবে।'' আমি বললাম, ''বেশ তো, কথা হয়েছে, কাল হবে?'' তিনি আবার বললেন, ''সকলকে ডাকা হয়েছে, আপনিও যাবেন। একবারে সব চুকে যাবে।'' আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বুঝলাম, গণ্ডগোলকে জিইয়ে রাখার জন্য কোন ফাঁদ পাতা হচ্ছে। কিন্তু সেরকম চক্রান্ত কিছু থাকলে তা ঠেকাতে হলেও না গিয়ে উপায় নেই। মুখের ভাত ছেড়ে দিয়ে রওনা হতে হল। প্রথমে ইন্সপেক্টরের কাছেই গেলাম। গিয়ে যা শুনলাম তাতে আমার মেজাজ আর খারাপ হয়ে গেল। ইন্সপেক্টর মশায়ের শর্ত হচ্ছে মুসলমান মাতব্বরদের এলাকার সমস্ত মুসলমানদের হয়ে লিখে দিতে হবে, পুজোর কয়েকটা দিন মুসলমানরা মেলাতলায় যাবে না। অমরবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, ''এটা মিটমাটের শর্ত না, ভবিষ্যতে হাঙ্গামা চালিয়ে যাবার শর্ত? এখানকার মুসলমানরা বাইরের মুসলমানের হয়ে গ্যারান্টি দেবে কি করে? তাছাড়া মাতব্বর, সে হিন্দু গ্রামের হোক আর মুসলমান গ্রামের হোক, নিজের গ্রামেরই অপর লোকের কি গ্যারান্টি দিতে পারে? সুতরাং এটা মিট-মাটের শর্তই নয়। মিটমাটের কোন শর্তের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এ মেলার একটা ঐতিহ্য আছে। জাতি, ধর্ম,

সম্প্রদায় নির্বিশেষে আনন্দ ও সম্প্রীতির সমাবেশ। একটা সাময়িক ঘটনায় সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে উড়িয়ে দেবে কেন? সম্প্রীতির ক্ষেত্র যদি লুপ্ত হয়, এখানকার মানুষের সৎবুদ্ধির অভাবের জন্যই হবে। আমরা উপলক্ষ হব কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখানকার মানুষের সৎবুদ্ধির অভাব নেই। এখানকার মানুষ মিলেমিশে থাকতে জানে, থাকতে অভ্যস্ত এবং থাকতে পারবে। আপনার কর্তব্য পুলিশের যা কাজ। সুতরাং আপনি নিজের কাজ করে যান। আমি হালে বর্ধমান যাচ্ছি। আপনাকে এই ধরনের কাজে লিপ্ত করে গেছেন কিনা তা বঙ্কিমবাবু এবং এস. পি.-র সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করব। ভদ্রলোক খুব ঘাবড়ে গেলেন। কাচুমাচু করতে লাগলেন এবং এস. পি. ডি. এস পি.-কে না বলতে অনুরোধ করলেন। আমি বলালম, "আপনার যদি কোন প্রয়োজন হয় আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমায় ডেকে পাঠাবার আপনার কোন অধিকার নেই।" মোড়লগাঁয়ের বিশিষ্ট মাতব্বর ময়না চৌধুরী চলে গেলেন। তাঁকে বললাম "আপনি এ অঞ্চলের যে কোন মিটমাটের জন্যে বা জনস্বার্থে কোন কাজে যখন ইচ্ছা তলব দিতে পারেন -- রাত্রি চারটেয় হোক, যখন ইচ্ছা। কিন্তু পুলিশের নির্দেশে আমাকে ডাকবেন না।"

আর বেশি ডিটেলস্ এর প্রয়োজন নেই।

চারিদিক ঘুরে ভগবানপুরে সমর প্রমুখ স্নেহভাজনদের সঙ্গে আলাপ করে মোটামুটি সাময়িক নিশ্চিন্তি পেয়ে বর্ধমান ফিরে এলাম। পুলিশ দ্'পক্ষেই আসামী করেছে। চোদ্দদিন অন্তর অন্তর তাদের আসতে হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সঙ্গেই দেখা হয়। আমার নিজের মনে বেশ উদ্বেগ হয়। আমি তো পুলিশের কাছে বলতে বলেছি, দাঙ্গায় যদি খুনোখুনি করতো সে দায়িত্ব তাদের নিজেরই। কিন্তু উভয়পক্ষের মানুষদের জেল হলে তাদের মনে তারা নিজেদের অপরাধকে দায়ী করবে না, দায়িত্ব চাপাবে আমার ঘাড়ে। তাছাড়া সব মিটমাট করে গুটোতে না পারলে, ব্যর্থতার গ্লানি একটা থেকেই যাবে। বর্ধমানে বিজয়দাকে আমার উদ্বেগের কথা বললাম। উনি বললেন, "ভাবছ কেন?" ভাদ্রমাসটা আসতে দাও। দু'মাস ধরে চাষের ব্যাঘাতে ওরা উভয় পক্ষ মামলার ঝঞ্ঝাটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। মামলার খরচও তো আছে। সুতরাং উভয় পক্ষই মিটমাট করতে চাইবে। তখন 'মিটিয়ে দেবে।" শেষে ঘটলোও তাই। তাঁর অব্যর্থ বাণী সফল হল। শ্রীভোলা হাজরা একদিন আমায় বললেন, "আমার যে ডাবল্ দণ্ড হচ্ছে। এপক্ষে আমাকে আসামী করেছে। এদের কাছে তো দণ্ড দিতেই হচ্ছে। সে উদ্দেশ্যেই তো আমাকে আসামী করানো। ওদিকে ওপক্ষেও আমাকে দিতে হচ্ছে। কারণ আমার ভাগচাষীরা সব আসামী।" সিজ্নের গোটু ঘোষাল বললেন, "কোনরকমে মিটিয়ে দেন মশায়, হয়রান হয়ে পড়েছি।" শেষে যোগ দিলেন, "আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার করে নিন না।" মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই যেমন বস্তে গ্রামের মক্সেদ মিঞা প্রমুখ কয়েকজন প্রায় আমার সঙ্গে দেখা করে মিটমাটের জন্য বলতে শুরু করলেন। অনুকূল অবস্থা বিবেচনা করে আমি ও বিনয়দা ভগবানপুর গেলাম। মিটমাটের কথাই যখন উদ্দেশ্য তখন আর একজন কর্মী থাকা ভাল। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলেরই এক গ্রামে, সিহিগ্রামে বিনয়দার বাড়ি এবং মণ্ডলগ্রাম, ভগবানপুরে তাঁর অনেক আত্মীয়স্বজন।

সেখানে শ্রীভোলা হাজরার উদ্যোগে সমরদের বৈঠকখানায় উভয় পক্ষের প্রতিনিধি মিলে শর্তবিহীনভাবে মিটমাটের কথা স্থির হয়ে গেল। কেবল একটি অলিখিত শর্ত হল, যার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। আমাকে কথা দিতে হল প্রত্যেকবার পুজোর সময় মোড়লগাঁয়ে আমাকে আসতে হবে। তাহলে, তাদের মতে, শান্তিতে কোন বিঘ্ন হবে না। শান্তির স্বার্থে অগত্যা আমাকে কথা দিতে হল। (বৎসর তিনেক আমি কথা রেখেছিলাম। কিন্তু এই তিন বৎসরই প্রত্যেকবার আমি উপস্থিত হলেই পুরনো দাঙ্গার কথাগুলি উঠে পড়ে এবং আলোচনা হতে থাকে। এই অভিজ্ঞতায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বুঝিয়ে বললাম, পুজোর সময় আমার আসাটা আর সমীচীন নয়। দাঙ্গার পুরনো অসুখকর কথাগুলো ভুলে যাওয়াই ভাল। আমার পুজোর সময় আসায় বরং তার উল্টোই হচ্ছে। এই বলে আমি অব্যাহতি নিলাম।)

এই মিটমাটের ব্যাপারেও আরও দু'চারটি কথা বলতে হয়। মিটমাট তখনও হয়নি, ইতিমধ্যে আগস্ট আন্দোলন শুরু হল। আগস্ট আন্দোলনের কর্মসূচী অনুযায়ী কিছু কিশোর ও যুবক কংগ্রেসকর্মী যাঁরা দাঙ্গার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বরং তার বিরোধী, মণ্ডলগ্রাম পোস্ট-অফিসে আগুন দিয়ে দেন। যখন আমরা মিটমাটের ঠিক করলাম তখন মামলার স্তর অনেকদূর এগিয়ে গেছে। দুটি মামলারই--হিন্দুর বিপক্ষে মুসলমানের মামলা, মুসলমানর বিপক্ষে হিন্দুর মামলা-- চার্জশীট দেওয়া হয়ে গেছে, কিছু শুনানিও হয়ে গেছে। (উভয় পক্ষের মোক্তারের নিকট শুনলাম পুলিশ যেভাবে কেস্ সাজিয়েছে এবং উভয় পক্ষেরই সাক্ষ্য এমনভাবে হয়েছে যাতে উভয় পক্ষের বেশির ভাগ আসামীর জেল হবে।) এই স্টেজে মিটমাট করে মামলা প্রত্যাহার করতে হলে কোর্টের অনুকূল অর্ডারের জন্য পুলিশেরও সম্মতির প্রয়োজন। গোড়ায় গোড়ায় আমি দেখেছিলাম এস. পি.-র অভিমত মিটমাটের অনুকূলে। উভয়পক্ষের মোক্তার ও প্রতিনিধিদের নিয়ে আমি এস. পি.র কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম এস. পি.-র মনোভাব সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে। হেতু হল মোড়লগাঁয়ের পোস্ট-অফিস পোড়ানো। যাইহোক, আমি দেখলাম এক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ করে কোন লাভ হবে না। সুতরাং, দুটি ঘটনার পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই -- এটার উপরেই আমরা জোর দিলাম। শেষে অবশ্য সম্মতি পাওয়া গেল। যাইহোক, মিটমাট, মামলার প্রত্যাহার হয়ে গেল।

□ 'নতুন চিঠি', শারদ সংখ্যা, ১৯৮৬ □

স্বাধীনতা সাধনায় বর্ধমান

বলাই দেবশর্মা

ইতিহাস রচনার রীতি আমাদের দেশে স্বতন্ত্র। এখানে সমগ্রকে না জানিলে ইতিহাস রচনা করা যায় না। ঊর্ধ্বমূলের সহিত সংযোগ থাকিলেই তবে অধঃশাখের পরিচয় পাওয়া সম্ভব ও সার্থক হয়। দৃষ্টি না থাকিলে অর্থাৎ পূর্ণকে সমগ্রভাবে দেখিতে না পাইলে ঘটনার বিবরণে প্রতি পদে ভুল ভ্রান্তি হয়।

বঙ্গভঙ্গ যাহা খ্রিস্টীয় ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট সংঘটিত হইয়াছিল, সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলন ও তাহা হইতে রূপান্তরিত স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা ও আয়োজন উদ্যোগ--যাহার সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, যাহার সহিত সংযুক্ত ছিলাম, যাহা দেখিয়াছি, সেই সব বিগত দিনের ইতিবৃত্তই বিবৃত করিতেছি।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট তদানীন্তন দিনের বড়লাট লর্ড কার্জন-এর আদেশে অখণ্ড বঙ্গকে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ঐ বঙ্গভঙ্গ বা পার্টিসন অব্ বেঙ্গল উপলক্ষ্যে যে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই স্বাধীনতা সংগ্রামের সমারম্ভ। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে যে কংগ্রেসী আন্দোলন, তাহা স্বায়ত্তশাসনের ঊর্ধ্বে যাইতে পারে নাই। এখন যেমন বৃটিশ কমনওয়েলথের ছত্রছায়ে শাসনাধিকার বা স্বাধীনতা, প্রাথমিক কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল তেমনই সেলফ্ গভর্নমেন্ট। ঐ হোমরুলও বৃটিশ কর্তাদের অধীনে। অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব হইতেই বাঙালী জাতির মনে রাজনৈতিক আত্মকর্তত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি করিতে করিতে যে আনন্দমঠ রচনা করিলেন, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ব্রহ্মবোধি সম্বুদ্ধ হইয়া গদগদ কণ্ঠে যে কহিলেন --ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ইহার কারণ অনুসসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাই বাংলার অধিদেবতা অন্তর্যামী স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহিতেছেন বলিয়াই ইংরেজদের চাকুরিয়া দিব্যশক্তি সম্পন্ন বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী -ওঁ তৎ সৎ যাঁহার মহামন্ত্র, তিনি উদাত্তকণ্ঠে তাঁহার স্বদেশবাসীকে এই নব মন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন--তুমি যে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত হইয়াছ।

স্বাধীনতা সাধনায় বর্ধমান কি করিয়াছে, তাহা বলিতে হইলে প্রাক্ ঘটনা সমূহকে অতিক্রম করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিকতা হইতে সমারম্ভ কাল ধরিয়া লইতেছি। খ্রিস্ট ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী বলিলে কলিকাতা টাউন্ হলের এক বিরাট সভায় স্যার রাসবিহারী ঘোষ বিলাতী মিথ্যাবাদিত্ব ও ভারতীয় সত্যবাদিতা সম্বন্ধে এক ওজস্বী ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাহাতে ইংরেজ শাসকবৃন্দকে যেমন হেটমুণ্ড হইতে হইয়াছিল, তেমনি ভারতবাসীর তথা বাঙালীর শির গর্বোন্নত হইয়াছিল।

পরবর্তী ঘটনা বঙ্গভঙ্গ । ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বাঘনাপাড়ার কয়েকটি কিশোর ও যুবক বিলাতী বস্ত্র লুণ্ঠন ও পোড়াইবার অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। ইহাই বর্ধমান তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজনৈতিক অপরাধ। ইহার অব্যবহিত পরে শান্তিপুরের বিখ্যাত পাদরী

মারার মামলা আরম্ভ হয়। বাঘনাপাড়া ঘটনার বিশেষত্ব--অভিযুক্ত পাঁচজন চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসর বয়সের। ইহাদিগের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলে আসামী তাহাতে তীব্রভাবে অসম্মতি জানায়। ঐ সময় এডি সাহেব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে "সন্ধ্যায়" ঐ কিশোরের প্রশংসা করিয়া লেখা হয়--"ধানি লঙ্কার ঝাল"। এক ফোঁটা ছেলের যখন এতখানি তেজ, তখন ফিরিঙ্গীকে এদেশ হইতে পাততাড়ি গুটাতেই হইবে। "যুগান্তরে" উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন "অগ্নিশর্মার অগ্ন্যুদগার।" বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিপ্লবপন্থী অদ্যাবধি ইহাকে ধানিলঙ্কার ঝাল বলিয়া সম্বোধন করেন।

জাতীয় আন্দোলন একটা নির্দিষ্ট আকার গ্রহণের অনেক পূর্ব হইতেই ভারত উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা বর্ধমানের এক এক সুধন্য সন্তানের মনে জাগ্রত হইয়াছিল। তাঁহার নাম আজ সসম্ভ্রমে স্মরণ করিতেছি। তিনি ব্রহ্মলোকগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর কালে সন্ন্যাস লইয়া ইনি স্বামী নিরালম্ব নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ শক্তিমান যোগী সোহং স্বামীর নিকট যতীন্দ্রনাথ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে যতীন্দ্রনাথ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের--ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য গোয়ালিয়র সৈন্য বিভাগে যোগদান করেন। ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার ভারত উদ্ধারের ইতিহাসে লিখিয়াছেন--কলেজে পড়িতে পড়িতে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডীর বীরত্ব কাহিনী পড়িতে মনে হইল--কলমবাজীর দ্বারা নহে, পরন্তু অসি মুখে দেশ উদ্ধার করিতে হইবে ---not through pen, but through sword.

এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে ভবানীচরণ গোয়ালিয়রের রাজার সৈন্য বিভাগে যোগদান করিলেন। তাঁহার সম-উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া যতীন্দ্রনাথও গোয়ালিয়র গিয়াছিলেন। এই ঘটনা স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বেকার। যতীন্দ্রনাথকে সমগ্র বিপ্লবের আদি প্রবর্তক বলিলে ঐতিহাসিক সত্যকে মর্যাদা দান করাই হয়।

বিদেশী বর্জনের আরম্ভকাল হইতে বর্ধমান জেলার নানা স্থানে বয়কট আন্দোলন অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। বিলাতী বস্ত্র পোড়াইবার জন্য ও লিভারপুলের লবণ ফেলিয়া দিবার জন্য মানকরের অনেক ব্রাহ্মণ জমিদার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কালনায়, বেলেরহাটে, পাঁচরকিতে, অকালপৌষে, বৈদ্যপুরে, বাঘনাপাডায়, ধাত্রীগ্রামে স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল। বয়কট আন্দোলন ও স্বদেশী ব্রত শক্তিশালী করিবার জন্য কালনার প্রসিদ্ধ কবিরাজবংশীয় উপেন্দ্রনাথ সেন ও দেবেন্দ্রনাথ সেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ললিত মোহন ঘোষাল, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ প্রভৃতি নেতৃপুরুষকে কালনায় আমন্ত্রণ করিয়া এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান করিলেন। গ্রাম্য বালক ও যুবকেরা স্বদেশী বস্ত্র মাথায় লইয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। বস্ত্র বিক্রয় হইত কিনা মনে নাই। কিন্তু তাঁহারা ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত হইতেন।

সর্বপ্রথম স্বদেশী বস্ত্রের দোকান খোলেন--শ্যামলাল গোস্বামী। তিনি একজন গ্র্যাজুয়েট ও বিত্তবান ব্যক্তি। তাহার পর অম্বিকা কালনার পাথুরিয়া ঘাটায় স্বদেশ ভাণ্ডার নামে স্বদেশী দ্রব্যের এক দোকান খোলা হইল। স্বদেশী ভাণ্ডারটিতে কেবল স্বদেশী দ্রব্যই

বিক্রয় হইত না। ইহা প্রকৃত পক্ষে ছিল স্বদেশী প্রচারের একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। স্বদেশী ভাণ্ডার পরে বিপ্লব কেন্দ্রে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

কালনার অন্যতম স্বদেশ সেবক ভগবানপুর নিবাসী মোক্তার উপেন্দ্রনাথ হাজরা চৌধুরী ও উকিল পূর্ণচন্দ্র দত্ত সেই সময় তাঁত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বস্ত্র-বয়ন উদ্যোগে আর একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির কথা মনে পড়ে, তিনি সিয়াড়সোল রাজস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আশী বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁত প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশী কাপড় বোনাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহার নাম কৃষ্ণধন রায়। এই বর্ষীয়ান পুরুষ ছেলেদের সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে গ্রামে গ্রামে স্বদেশী প্রচার করিতে যাইতেন। সমগ্র বর্ধমান জেলায় ইহাই প্রথম বস্ত্র বয়নের প্রচেষ্টা।

উপেন্দ্রনাথ হাজরা চৌধুরী প্রথম হইতেই স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি শুধু স্বদেশী প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, উত্তর রাঢ়ে তিনি অন্যতম বিপ্লববাদের প্রচারক। এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম মনে পড়িতেছে, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বীরেন্দ্র কুমার মল্লিক। বীরেন্দ্রকুমার কার্তিক দত্তের নেতৃত্বে 'যুগান্তর' কেন্দ্রে যোগ দিয়াছিলেন এবং বিঘাদি ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইংরেজ শাসনকালের রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রচেষ্টায় বর্ধমান অগ্রবর্তীই ছিল। বর্ধমান শহরে দুইবার প্রাদেশিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। যাহার উৎসাহ ও অর্থব্যয়ে এই অনুষ্ঠান সম্ভব ও সার্থক হইয়াছিল, তিনি প্রসিদ্ধ আইনজীবি নলিনাক্ষ বসু। প্রাদেশিক সম্মেলনের দ্বিতীয় বারের অধিবেশনের সভাপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সেই বিখ্যাত উক্তি "পরাধীন জাতির কোনও রাজনীতি নাই" A subject nation has no politics.- বর্ধমানে টাউনহলে উচ্চারিত হইয়া রাষ্ট্রপরাধীনতার প্রতি ও আবেদন নিবেদন রাজনীতির প্রতি জনচিত্তকে বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল।

বর্ধমানের স্বদেশী ব্রত এবং স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ়মূল করিবার জন্য যাহারা ভগীরথ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করিতে হয় অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের। অরবিন্দপ্রকাশ এম্. এ. পাশ করিবার পর গভর্নমেন্ট শিক্ষা বিভাগে কার্য গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি প্রসিদ্ধ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও শশিভূষণ রায়চৌধুরীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া দেশসেবা ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। অরবিন্দপ্রকাশ 'ডন' সোসাইটির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযুক্ত ছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ন্যাশানাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি হিন্দুস্কুলের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগদান করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বের অসহযোগী অরবিন্দপ্রকাশ। যে বর্ধমান সম্মিলনীর "সুবর্ণ জয়ন্তী" উপলক্ষে এই ইতিবৃত্ত কথা কহিতে হইতেছে, তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অরবিন্দপ্রকাশ। সম্মিলনী কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তবে ১৩১২ সালে যখন বর্ধমান ও বরিশালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, তখন এই

প্রতিষ্ঠানটি অন্নপূর্ণা ব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন বর্ধমান সম্মিলনীর সভাপতি অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু। অরবিন্দপ্রকাশ, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, কবিরাজ রাখালদাস কাব্যতীর্থ, ভূপতি গোস্বামী ইহার প্রাণস্বরূপ। এই সময় স্বদেশ-সেবা কেবল-মাত্র রাজনীতিক কার্যাবলীতে সীমাবদ্ধ ছিল না, লোকসেবা, জনহিতকর কার্য ছিল তাহার অন্যতম প্রকরণ।

বর্ধমানের আর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের এই সঙ্গে নাম করিতেছি। ইঁহারা শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়--স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ, অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং ডা. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠরত্ন হইয়াও নামমাত্র বৃত্তিতে ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনাব্রত গ্রহণ করেন। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ অসহযোগ যুগে সার্ভেন্ট পত্রের সম্পাদকতা করিয়া কারাবরণ করেন। স্বামিজী "ইতিহাস ও অভিব্যক্তি" "জপসূত্রম্" ও "Jantram" গ্রন্থ লিখিয়া অধুনা দিনের জগতে বাঙালী মনীষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্যর জন উড্রফ ইঁহাকে ঋষি অধ্যাপক বলিয়াছেন। ডা. রাধাকুমুদের "ইন্ডিয়ান শিপিং" ভারত নৌশিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে এক প্রামাণ্য পুস্তক।

বর্ধমানের যে সকল বিদ্যার্থী ফিরিঙ্গির গোলামখানা ছাড়িয়া জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, রমাপতি রায় ও বলাইচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম হইতেই বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে নানা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে স্বদেশী প্রচারের উদ্দেশ্যেই সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠা; ক্রমে ক্রমে তাহা গুপ্ত সমিতিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। দুই একটি সমিতির নাম বান্ধব সমিতি, মহামায়া সমিতি, অনুশীলন সমিতি (শাখা)। কলিকাতা অনুশীলন সমিতির অন্যতম কর্মী-পুরুষ ছিলেন প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি কলিকাতাবাসী হইলেও বর্ধমান জিলায় ইহার মাতুলালয় বলিয়া এখানে তিনি কয়েকটি শাখা সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম হইতেই নুন-চিনির স্বদেশী কট্‌ককটে্ স্বদেশীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কট্‌ককটে্ অর্থাৎ উগ্র। শব্দটা ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার "সন্ধ্যায়" ব্যবহার করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়র ও বরোদা প্রত্যাগত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী বিদ্যানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী (কাটোয়ার মুন্সেফ) জেলার নানা স্থানে বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। ঐ সময় অরবিন্দের ভবানীমন্দির মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু বর্ধমানের বিপ্লবী নেতাগণ স্বাধীনতা মন্ত্রের প্রচারের জন্য একখানি পুস্তিকা গোপনে মুদ্রিত করিয়া জেলার সর্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

এই সময় বাংলার মানসিক আকাশ হইয়া উঠিয়াছিল বজ্রগর্ভ। "সন্ধ্যা" ও "যুগান্তর" তারস্বরে অগ্নিমন্ত্র প্রচার করিতেছিল। "কালী মায়ী কি বোমা" মায়ের খর্পর করবালের সহিত শোভা পাইতেছিল। মানবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবের ভাবশিষ্য। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি কাটোয়া মহকুমার অধিবাসী। তিনি "সন্ধ্যা" সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। "যুগান্তরের" সম্পাদকীয় সঙ্ঘের কেহ কেহ বর্ধমানের অধিবাসী। বিখ্যাত আইনজ্ঞ শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আদলতে যে বিখ্যাত উক্তি

করিয়াছিলেন, তাহার খসড়া করিয়া দিয়াছিলেন। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু বিপ্লবকার্যে মুক্তহস্তে দান করিতেন। সেই জন্য তাঁহাকে একবার নির্বাসিত করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। এমন কি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ পর্যন্ত বিপ্লব প্রচেষ্টায় সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। চক্‌দীঘির রাজা মণিলাল সিংহরায়ও প্রচ্ছন্ন দেশভক্ত ছিলেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একবার স্যার রাসবিহারীর নিকট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলে ঘোষ মহাশয় একখানি ব্ল্যাঙ্ক চেক সহি করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন আপনাদের প্রয়োজন মত টাকার অঙ্ক বসাইয়া লইবেন।

নুন-চিনির রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ একটা বক্রগতি গ্রহণ করিল। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় বৈপ্লবিকতা। এই স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় রাসবিহারী বসু, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী বিদ্যানন্দ, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। রাসবিহারী বসু ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বর্ধমান সুবলদহের অধিবাসী এবং জ্যোতিষবাবুর পিতৃভূমি বিখ্যাত কুলীনগ্রামের উপকণ্ঠস্থিত দত্তপাড়া।

বৈপ্লবিক আদর্শ ছিল মন্ত্রগুপ্তি। বিপ্লবীরা তন্ত্রমত অবলম্বনে বলিতেন--গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ। সেইজন্য স্বাধীনতা অর্জনের বাহ্য প্রকাশ ছিল লোকসেবা। ১৩২০ বঙ্গাব্দের প্রলয়ঙ্কর দামোদরের বন্যায় বর্ধমানের অশেষ প্রকার ক্ষতি হইলে বঙ্গের তরুণগণে সেবা কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৩১২ সালের অর্ধোদয় যোগ ও দামোদরের বন্যায় তরুণগণের সেবাকার্য দেখিয়া ইংরেজ শাসক-শক্তি আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখনকার দিনের তরুণ মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতার বন্যাত্রাণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, "বঙ্গবাসীর" যোগীন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা প্রচারে ও শাস্ত্র প্রচারে অখণ্ড বঙ্গের জাতীয়তাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। "বঙ্গবাসী" ও "হিতবাদীর" শাস্ত্র গ্রন্থ প্রচারে জাতির যথেষ্ট কল্যাণ হইয়াছে। বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত ১৩২০ সালের সাহিত্য সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভবের পর জেলায় কয়েকটি জাতীয় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কালনা ও উপ্‌লতি গ্রামের নামই প্রথম উল্লেযোগ্য। অসহযোগ যুগে বর্ধমান সদরে এবং বৈকুণ্ঠপুর পল্লীতে "বাণীকুঞ্জ" নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মনীষী ও পূতচরিত্র মহেন্দ্রনাথ দত্ত শাঁখারী গ্রামে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়া স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাবিধ বক্তৃতা দিতেন। ঐ সময় তিনি রাঢ়ের মৃৎপ্রতিমা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন জাতীয় কংগ্রেসের পরিপুষ্টি-কার্যে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। আর একজন মনীষী স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত। সাত-দেউলে আঝাপুরে তাঁহার পিতৃভূমি। তাঁহার "জীবন প্রভাত", "জীবন সন্ধ্যা" ও অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস রাজনৈতিক চেতনাকে প্রতিবোধিত

করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র রায়, বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দের আদি বাসভূমি বর্ধমান জেলায় -- সুরেন্দ্রনাথের মেমারির নিকট ডেয়ে মগড়ায় এবং বিপিনচন্দ্রের কাটোয়া মহকুমায় এবং নরেন্দ্রনাথের অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কালনা মহকুমার দত্ত ডেরোটোন গ্রামে। সরোজিনী নাইডুকে বর্ধমানের বলিলে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করাই হয়। তাঁহার পিতা অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব নিবাস ছিল কাটোয়ায়।

সংবাদপত্রের ভাব পরিবেশনে যদি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে বর্ধমান তাহাতে তাহার বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াই চলিয়াছে। "বঙ্গবাসী" বর্ধমানেরই। জাতীয় স্বাধীনতা সাধনায় "হিতবাদী" ও বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। "হিতবাদীর" পরিচালক ছিলেন কালনার সেন-ভ্রাতৃদ্বয়। ব্রহ্মবান্ধবের আকস্মিক দেহত্যাগের পর "সন্ধ্যা" সম্পাদনার ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা বর্ধমানেরই সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বৈপ্লবিক। মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের পর প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা কার্তিক দত্ত ও কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং নিখিলেশ রায় মৌলিক "যুগান্তর" সম্পাদনার ভার যাঁহাকে দিয়াছিলেন, তিনিও বর্ধমানের বিপ্লবী। মাণিকতলা বোমার বাগান আবিষ্কৃত হইবার পর "যুগান্তরের" যে শেষ সংখ্যা প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহাতে সেই প্রসিদ্ধ কবিতা "বোধন" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মূল্যস্বরূপ শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র বসু এক সহস্র করিয়া টাকা দিয়াছিলেন। উহা যুগান্তরের সাহায্য ভাণ্ডারে দানস্বরূপ।

বঙ্গভঙ্গ কাল হইতে বর্ধমান দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য যাহা করিয়াছে, তৎসমুদয়ের পরবর্তী অধ্যায় অসহযোগ রাজনীতি। এই আন্দোলনে যাঁহারা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন সাহেবের নামই সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

গান্ধী রাজনীতির অন্যতম অগ্রণী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র। কাটোয়া মহকুমার ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালনার ডা. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রাণীগঞ্জের সরস্বতী কর্ম-মন্দিরের তরুণ কর্মীবৃন্দ দেশের স্বাধীনতা সার্থকতা মণ্ডিত করিবার জন্য অশেষ প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডা. কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত সরস্বতী কর্মমন্দিরের অন্যতম সেবক। মাদক বর্জন আন্দোলন সফল করিতে ইনি রাজরোষে পড়িয়াছিলেন, ইনি জাতীয় কবি। কালীকিঙ্কর বাবুর "মন্দিরের চাবি" রাষ্ট্ররোষে পড়িয়াছিল। ইনি বর্ধমান সম্মিলনীর অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। বর্ধমানের আর কয়েকজন কংগ্রেস নেতা ও কর্মীর নাম করা প্রয়োজন। ইহার মধ্যে প্রথম অমরনাথ দত্ত। অমরবাবু এসেমব্লিতে কংগ্রেসী সদস্য ছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু, প্রভাসচন্দ্র বসু, এবং ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের কাউন্সিল প্রবেশ নীতিতে সরকারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া কংগ্রেসকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

আসানসোলের আর একজন দেশভক্ত শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক। তিনি ও তাঁহার মাসীমাতা শ্রীমতী ছ'কড়ি দেবী বিপ্লব-আন্দোলনে সংযুক্ত থাকিয়া নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। সিয়াড়সোলের রাজাসাহেব প্রমথনাথ মালিয়া জাতীয় আন্দোলনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার শ্রীপশুপতি মালিয়া ১৩৩৪ সালের বর্ধমান দুর্ভিক্ষ সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বর্ধমানের তথা অখণ্ড বঙ্গের গর্বের বস্তু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁহার বিদ্রোহভাবোদ্দীপক কবিতাসমূহ ও 'ধূমকেতু' (দ্বিসাপ্তাহিক পত্রিকা) স্বাধীনতার আকঙ্খাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল।

খাদি ও চরকা প্রচলনের জন্য গান্ধীজী যে তিলক স্বরাজ্য ফান্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ সংগ্রহের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বর্ধমানে আসিলে বর্ধমানবাসী মুক্ত হস্তে সেই ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিয়াছিল। তিলক স্বরাজ্য ফান্ডে বর্ধমানের দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজী বর্ধমানে আগমন করিলে বর্ধমানবাসী তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করিয়া তাঁহার তিলক স্বরাজ্য ফান্ডে প্রচুর অর্থ দান করেন। এইখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি গান্ধীজীর কলিকাতা যাত্রা ও প্রত্যাবর্তনের পথে এই স্থানের সংগৃহীত ছাগীদুগ্ধ খাইতে ভালবাসিতেন। যিনি এ ছাগীদুর্গ্ধ সংগ্রহ করিয়া দিতেন, তাঁহার নাম কচি মিঞা। ইনি নিরলস কংগ্রেস সেবক ছিলেন।

দুর্গাপুরে এখন যেখানে লৌহশিল্পের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানে ১৯৩০/৩১ খ্রিস্টাব্দে একটি তাঁতশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্গাপুর, সগরভাঙ্গা প্রভৃতি পল্লীগ্রামে এককালে বহু তাঁতির বসবাস ছিল। বৃটিশ শাসনকালে সেই সকল তন্তুবায়ের দুরবস্থার পরিসীমা ছিল না। এই লুপ্ত তাঁত শিল্পের উদ্ধারের জন্য সেখানে বহু তাঁত বসাইয়া বস্ত্র ও খাদিবস্ত্র বয়ন করানো হইত। এই বস্ত্রযজ্ঞের যিনি যাজ্ঞিক, তাঁহার নাম জ্যোতিষচন্দ্র পাল। গ্রামের বর্ষীয়ান তন্তুবায় ঈশ্বর তাঁতিকে এই তাঁতশালার অধ্যক্ষতা দান করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গান্ধীজী প্রচারিত যুদ্ধ বিরোধী ধ্বনি উচ্চারণ করিতে যে সত্যাগ্রহ হইয়াছিল, তাহাতে শ্রী বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন। বিজয়বাবু অক্লান্ত দেশ সেবক। যুদ্ধ বিরোধী সত্যাগ্রহে সর্বপ্রথম ছাত্র সত্যাগ্রহী শ্রীসনৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। যখন ইনি সত্যাগ্রহ করেন, তখন ইহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ভাগে এখানে একখানি জাতীয়ভাব প্রচারক সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুভূত হইলে ভোলানাথ ভঞ্জ বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'বর্ধমান' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা কিছুদিন পরে বন্ধ হইলে দুর্লভকিশোর মিশ্রের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে "শক্তি" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৩৩২ সালের জন্মাষ্টমীর দিন 'শক্তির' প্রকাশ হয়। তদানীন্তন দিনে অখণ্ড বঙ্গের সর্বত্র 'শক্তি' তাহার শক্তি সাধ্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। বাংলার দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রগুলি 'শক্তির' সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেন। বর্ধমানের একজন সুপরিচিত সাহিত্যিক ও বিপ্লবপন্থী দেশসেবক 'শক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভকালে সভায় সভায় গান গাহিবার জন্য দাঁইহাটের হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়া দেন।

বর্ধমানের সর্বত্র জাতীয় ভাব উদ্দীপনার জন্য এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করিবার জন্য যাঁহারা ভগীরথ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আর কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহারা যোগাখ্যাপা, স্বামী কমলানন্দ, গৌরহরি সোম, পশুপতি গঙ্গোপাধ্যায় এবং জয়দেব রায়। ইঁহারা অন্তরালে থাকিয়া জাতিকে সেবা করিতেন।

কয়েকটি দেশ-সেবিকা মহিয়সী মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছ-কড়ি দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার স্বদেশসেবার কার্যে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে সোনামণি দেবী স্বদেশসেবক তরুণ সম্প্রদায়কে নানারূপে সাহায্য করিতেন।

আর একজন বউদিদি। ইনি তরুণী ও পুরমহিলা। পুরমহিলা বলিয়া ইহার নাম অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। ইঁহাকে বউদিদি বলিয়াই সকলে সম্বোধন করিতেন। সমুদ্রগড়ে ইহার পিতৃভূমি। বউদিদির বয়ঃক্রম যখন যৌবনের প্রথম কোঠায়, ইনি তখন তাঁহার যাবতীয় অলঙ্কার বৈপ্লবিকদিগের অস্ত্র সংগ্রহের জন্য দান করিয়াছিলেন। আর এক মহিয়সী খুড়িমা। খুড়িমা ধাত্রীগ্রামের মেয়ে, প্রৌঢ়। ইনি ছিলেন অন্নপূর্ণা ব্রতধারিণী। শ্রান্ত ক্লান্ত দেশ সেবকগণ খুড়িমার মাতৃস্নেহে স্নিগ্ধ হইতেন। অপরাকে দেশ হিতব্রতী যুবকেরা বলিত "নারী-বাঘিনী"। বৈপ্লবিক পত্রিকাতে ইঁহার রচনাদি প্রকাশ হইত। লেখাগুলি ইনি স্বয়ং লিখিতেন বা অন্যে লিখিয়া দিত, তাহা জানি না। সেই সকল রচনায় নাম থাকিত কমলা দেবী। স্বাধীনতা সাধনায় যে সকল তরুণ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ইনি মাতৃসমা ছিলেন। 'নারী-বাঘিনী' বর্ধমান জেলার রঘুনাথপুরের এক প্রসিদ্ধ বংশের কুলবধূ। ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী ও ডা. সন্তোষকুমার ঘোষের পত্নী স্বামীর সহিত অসহযোগ যুগে দেশ সেবায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অতঃপর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এই আন্দোলনে এই জেলায় প্রলয় প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল। এই চলন্ত ও বহন্ত দিনের ইতিহাসকথা কহিবেন অন্যে।

স্বাধীনতা অর্জনে কে যোগ দিয়াছিলেন, আর কে দেন নাই, তাহা বলিতে পারি না। ১৯৪৭-এ শাসনাধিকার লাভ করিবার পর রাজাবাহাদুর মণিলাল সিংহরায় কতকগুলি 'যুগান্তর', যে যুগান্তরগুলি রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল, সেইগুলি আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয় স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার যৌবন জলতরঙ্গ প্রায় সকলকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

□ 'বর্ধমান সম্মিলনী' হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৯৭৪ □

স্বাধীনতা আন্দোলনে রানীগঞ্জের বীর সংগ্রামীরা

পূর্ণেন্দু সিংহ

বিংশ শতাব্দীব শুরু থেকে রাণীগঞ্জ তার জঠরে নানা ছোট বড় শিল্প ধারণ করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে আছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চা অতীতে রমরমা ছিল। আজও প্রবল আছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫০ বছর পর এই পুরানো নগরীর সৌন্দর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও স্বনামধন্য সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবনের সুবর্ণ দিনগুলি এখানে অতিবাহিত হয়েছে। স্বাধীনতা উৎসব উদ্‌যাপনের পশ্চাতে যাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও শৌর্যের বিশেষ অবদান ছিল, আজ তাদের কথা ভাবলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যে অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন ও দেশের প্রতি তাঁদের যে অকুণ্ঠ ভালোবাসা মূর্ত হয়েছিল, তার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গের এই ছোট শহর রাণীগঞ্জের কয়লা অধ্যুষিত অঞ্চলেও আছড়ে পড়েছিল।

রাণীগঞ্জ বড়বাজারে বর্তমানে হরিসভার পাশে একটি বাড়ির দোতলায় বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতি ছিল। সেখানে স্থানীয় কিছু তরুণ বিভিন্ন সংগ্রামী বিপ্লবী গোষ্ঠীর অ্যাকশন কমিটির সাথে সবসময় যোগাযোগ রেখে কর্মপদ্ধতি স্থির করতেন। 'সরস্বতী কর্মমন্দির' নামে একটি গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশের গুপ্তচরদের ফাঁকি দিয়ে জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতেন। সেখানে নানা প্রকার গোপনীয় পত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখা হত। সেই গুপ্ত সমিতির সদস্যদের মধ্যে ভীমাচরণ রায়, অমূল্য ঘোষ, ক্ষিতীশ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সিংহ, বৈদ্যনাথ দাস, কাশীনাথ সিং, মতিলাল দাস, কামাখ্যা সেনগুপ্ত, শেখ কাল্লু, শান্তি ঘোষ, হেম ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সকলে প্রয়াত।

ভীমাচরণ রায় অকৃতদার ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে রাণীগঞ্জে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর অন্তর্ধান ও তার সুস্পষ্ট আত্মপরিচয় আজও অজ্ঞাত। অমূল্য ঘোষ ও শান্তি ঘোষ আগ্নেয়াস্ত্র ও প্রচারপত্র বন্টনে সহায়তা করতেন। অমূল্য ঘোষ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় প্রায়ই তাঁর নিকট আসতেন। অমূল্য ঘোষ দীর্ঘদিন কারাবরণ করেন।

প্রফুল্লকুমার সিংহের কবিতার খ্যাতি ছিল। তিনি বিদ্রোহী কবিতা লিখে সেই যুগের স্বাধীনচেতা সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করতেন। শেখ কাল্লু অতি সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি খদ্দর পরিধান করতেন এবং সি. আর. রোডে একটি ছাপাখানা ও পুস্তক বাঁধাইয়ের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। এখানে সরস্বতী কর্মমন্দিরের সদস্য বিদ্রোহী বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'তরুণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। ব্রিটিশ

সরকার নানা অজুহাতে পরে ঐ প্রেস বন্ধ করে দেয়। শেখ কাল্লু গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর কারাবাস হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি বরানগরে জুতোর কারখানা করেন এবং সেখানে দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত হন।

রাণীগঞ্জে সেই সময়ে পুরোনো হাটতলা, কমলালয় বস্ত্র বিপণির ঠিক পেছনে অবস্থিত ছিল। সেখানে ছেদীলাল সাও সব্জী বিক্রি করতো। এক ইংরেজ সাহেব তাকে ইউ ব্লাডি জলদি করো বলায় ওজন করার বাটখাড়া দিয়ে মেরেছিলেন। সেই বিপ্লবীরা একের পর এক প্রতিবাদের ঝড় তুলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিপ্লববাদের রেকর্ড সংখ্যক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে দৃষ্টান্ত স্থাপনের নজির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্যামলাল ঝুনঝুনওয়ালা অ্যাকশন কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। অণ্ডালে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের পোস্ট উপড়ে ফেলাকালীন তিনি গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘকাল কারাবরণ করেন। ভারত সরকার পরে তাঁকে তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

বানোয়ারীলাল ভালোটিয়া রাণীগঞ্জের প্রাক্তন পৌরপিতা ও নানান শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। রাণীগঞ্জের গোয়েঙ্কা লেনে বৃটিশবিরোধী বক্তৃতা দেওয়াকালীন প্রহৃত হন ও পরে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

সরস্বতী কর্মমন্দিরের অন্যতম সদস্য হেম ভট্টাচার্য। তিনি বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তারকেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তাঁর তিন মাস জেল হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহায়তায় তাঁর কারাবাস দেড় মাস রদ হয়। তাঁর অণ্ডালের বাড়িতে হরিনামের ঝুলিতে তিনি পিস্তল ইত্যাদি লুকিয়ে রাখতেন এবং বিপ্লবীদের মনোবল অটুট রাখার জন্য উৎসাহ দিয়ে ও নানাভাবে সাহায্য করতেন।

প্রবীণ বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী দীর্ঘ ৭/৮ বছর রাণীগঞ্জের নিকট সিহারসোলে কুমার সাহেবের বাড়িতে গৃহশিক্ষকের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ইনি বার্ণ অ্যান্ড কোম্পানীর সিরামিক রিফ্রাক্টরি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জেলত্যাগের পূর্বে ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী ও সংগ্রামী রাণীগঞ্জের দুর্গাদাস হালদারের নিকট এসে অন্যান্য কর্মীদের উদ্দেশ্যে সরকারি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভাষণ দিয়ে বিপ্লবের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেন। দুর্গাদাস হালদারের আত্মবিশ্বাস ছিল নজিরবিহীন। তাঁর বাড়িতেই বিপ্লবীদের গুপ্ত কেন্দ্র ছিল। সিউড়ি কারাগার থেকে সতীর্থদের মুক্ত করার সময় ধরা পড়েন এবং দীর্ঘদিন তাঁর কারাবাস হয়। ডা. জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ রাণীগঞ্জ পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপিতা ছিলেন। ইনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সেখানে সুভাষচন্দ্র রাত্রিবাসও করেন।

রাণীগঞ্জ শহর ছিল স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বিপ্লবীদের প্রাণকেন্দ্র। ডা. বিপিনবিহারী ব্যানার্জী এবং রাসবিহারী নন্দী মহাশয় অকাতরে বিপ্লবীদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে প্রকারান্তরে বিপ্লবদের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন। উখরার প্রয়াত ডা. কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'মন্দিরের চাবি' নামে একটি

বিদ্রোহী কবিতার বই লিখে কারাবরণ করেন। প্রয়াত আনন্দগোপাল মুখার্জী ও সুশীল ঘটক, আবদুস সাত্তার এবং উখরার সুকুমার ব্যানার্জী মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কারাবারণ করেন।

অজ্ঞাত ও প্রচারবিমুখ বহু তরুণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে মর্মস্পর্শী অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের বীরত্ব ও সৌরভ রাণীগঞ্জের কালো ধুলোয় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেই সকল মূল্যবান স্মৃতিরক্ষার্থে আমাদের সর্বতোভাবে সজাগ ও সক্রিয় হতে হবে। না হলে নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা কি জবাব দেব?

□ 'আজকের যোধন' শারদ সংখ্যা, ১৪০৬ □

বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির প্রথম ২৫ বৎসর
বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী

বাংলার কৃষকের সংগ্রামী ঐতিহ্য ইতিহাস বিশ্রুত। মোগল বাদশাহের আমলে বাংলা 'বুলগাখানা' বিদ্রোহের ভূমি আখ্যা পাইয়াছিল। ইংরেজ আমলেও "সন্ন্যাসী বিদ্রোহ" "নীল বিদ্রোহ" "তিতুমীরের বিদ্রোহ", উত্তর বাংলার জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম, ইতিহাসের পাতায় রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু কৃষকদের নিজস্ব শ্রেণী প্রতিষ্ঠান কৃষক সমিতি গড়িয়া উঠিতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে।

১৯২৯-৩০ সালের ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় যে ব্যাপক ও গভীর আর্থিক সমস্যা দেখা দেয় তাহার চাপে উপনিবেশিক দেশগুলির কৃষক শ্রেণীর জীবন অসহনীয় হইয়া ওঠে। এই অবস্থায় যখন ১৯৩০-৩২ সালে জাতীয় আন্দোলনের আহ্বান আসে তখন কৃষক শ্রেণীর বেশ একটি অংশ আন্দোলনে যোগ দেয়। এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে স্থানে স্থানে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়। চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন শুরু হওয়ায় কৃষকদের ভিতর স্বাভাবিকভাবে জমিদারী খাজনা ও মহাজনের ঋণ পরিশোধ বন্ধ করার দাবী ওঠে। সেই সময় জমিদারী খাজনার সহিত তহুরী, মাথোট প্রভৃতি নানারূপ বাজে আদায় লওয়া হইত এবং মহাজনের ঋণের ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের প্রচলন ছিল। তাই খাজনা ও ঋণের পীড়ন কৃষকেরা তীব্রভাবে অনুভব করিত। মন্দার সময় বলিয়া ধানের দর বহু পরিমাণে নামিয়া যায়। ফলে খাজনা ও ঋণের বোঝা আরও অসহনীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি বড় অংশ জমিদার শ্রেণী হইতে আসায় তাহারা কৃষকদের এই স্বাভাবিক দাবির বিরোধিতা করে। কৃষক শ্রেণীর শ্রেণীচৈতন্য উদয় হইতে থাকে। এই শ্রেণী-চেতনা উন্মেষের ব্যাপারে ১৯২৪ সালে ওয়ার্কস্ গ্র্যান্ড পেজান্ট পার্টি গঠন, কাজী নজরুল ও মুজাফর আমেদ কর্তৃক প্রকাশিত 'লাঙ্গল' পত্রিকা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি প্রভূতভাবে সাহায্য করে। এইসব ঘটনার আদর্শগত প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ১৯৩১ সালে বর্ধমানে আহুত বর্ধমান বিভাগীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে কৃষকেরা তাহাদের স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থ লইয়া সংগ্রাম করিবার জন্য নিজস্ব পৃথক গণপ্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কৃষক সমিতি গড়িয়া উঠিতে শুরু করে। বাংলায় যে কয়টি জেলায় এই সময়ে কৃষক কমিতি গঠিত হয় বর্ধমান তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৩ সালের মে মাসে ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে হাটগোবিন্দপুরে বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাপারে যাঁহারা উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীহেলারাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসরোজ মুখার্জী, শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা; শ্রীতারাপদ মোদক, শ্রীচন্দ্রশেখর কোঙার, শ্রীভোলানাথ কোঙার (হাটগোবিন্দপুর), শ্রীভোলানাথ কোঙার (সড্যা), শ্রীগোপীকৃষ্ণ রায় (নাশিগ্রাম) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীহেলারাম চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সময়ে কৃষক সমিতি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া ওঠেনি। কোন সুনির্দিষ্ট

গঠনতন্ত্রও ছিল না। সদস্য সংগ্রহ ও প্রাথমিক ইউনিট গঠনের প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্ট হইয়া ওঠেনি। কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা ও তাহা লইয়া সংগ্রাম করিবার দৃঢ় সংকল্পই ছিল তখনকার কৃষক সমিতির প্রধান পাথেয়। জাতীয় জীবনের সাধারণ সমস্যায় অপরাপর অংশের সহিত একযোগে যথাযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করিতে কৃষক সমিতি সেদিন পশ্চাৎপদ হয় নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই ১৯৩৫ সালে দামোদরের যে বন্যা হয় তাহার ত্রাণকার্যে কৃষক সমিতির কর্মীরা উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩৬ সালে মন্তেশ্বর থানার একটি ব্যাপক অঞ্চলে যে নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয় তাহার প্রতিকারের জন্য কমরেড মনসুর হবিবের নেতৃত্বে একটি ভুখা মিছিলের আয়োজন করা হয়।

১৯৩৬ সালে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান সারা ভারত কৃষক সভা গঠিত হয় এবং বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতি তাহার শাখা হিসাবে কাজ করিতে শুরু করে। এই সময় হইতেই সদস্য সংগ্রহ ও প্রাথমিক ইউনিট গঠনের কাজ শুরু হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কৃষক সমিতি গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই দামোদর ক্যানেলের করের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রশ্ন কৃষক সমিতির সম্মুখে উপস্থিত হয়। কৃষক সমিতি সাহসের সহিত সরকারী রাজস্বের বিরুদ্ধে বোধহয় বারদৌলীর পর দ্বিতীয় বৃহৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আগাইয়া আসেন। দামোদর ক্যানেল করের বিরুদ্ধে বর্ধমানের কৃষকদের সংগ্রাম কৃষক সভার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

১৯৩৪ সালে দামোদর ক্যানেলের কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং সেচের জল, সেচ আইন অনুযায়ী লংলীজ ও শর্টলীজ বণ্ডে সই করাইয়া যথাক্রমে একর প্রতি তিন টাকা ও চার টাকা আট আনা জলকরে সরবরাহ শুরু হয়। জলকরের এই অত্যধিক হারের জন্য কৃষকেরা লীজ বণ্ডে সহি করিতে অস্বীকার করে। মুখ্যা নিয়োগ করিয়া নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া ক্যানেল অঞ্চলের কৃষকদের মনোবল ভাঙ্গিতে না পারিয়া সরকার ১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় উন্নয়ন আইন পাশ করেন এবং সেচ এলাকায় জল লওয়া বাধ্যতামূলক করেন এবং জলকর একর প্রতি পাঁচ টাকা আট আনা ধার্য করা হয়। সরকারের এই মনোভাবে কৃষকদের বিক্ষোভ বাড়িয়া যায়। আন্দোলন আরও জোরদার হইয়া উঠিতে থাকে। এই অবস্থায় ১৯৩৭ সালে আলুটিয়া গ্রামে জেলা কৃষক সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ের কিছু আগেই কমরেড দাশরথি চৌধুরী কৃষক সমিতিতে যোগ দেন। আলুটিয়া সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে শ্রীশিবপ্রসাদ দত্ত, দাশরথি চৌধুরী, অশ্বিনী মণ্ডল, সুকুমার ব্যানার্জী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৭ ও ১৯৩৮ দুই বৎসর ধরিয়া ক্যানেল আন্দোলনের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই আন্দোলন ব্যাপক সত্যাগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করে। ক্যানেল কর্তৃপক্ষ জোর করিয়া ক্যানেলকর আদায় করিবার জন্য প্রায় ১৭,০০০ সার্টিফিকেট জারি করেন। এই সার্টিফিকেটের বলে ক্যানেল কর্তৃপক্ষ ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে কাদ্‌রা গ্রামের শ্রীমনীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গরু ক্রোক করে। এই ক্রোকের সংবাদ পাইয়া এই অঞ্চলের

গ্রামবাসীগণ সমবেত হইয়া সেই ক্রোক করা গরু আউশা খোঁয়াড়ে আটক করে এবং আউশা গ্রামে সত্যাগ্রহী শিবির স্থাপন করিয়া সত্যাগ্রহ শুরু করে। আউশা সত্যাগ্রহ শিবির পরিদর্শন করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের তৎকালীন সম্পাদক কমরেড রবি মজুমদার আনন্দবাজার পত্রিকায় যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন "আউশা গ্রামে আমি এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি। স্থানীয় খোঁয়াড়ে ২০টি গরু ক্রোক করিয়া নীলাম করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। নিকটেই সত্যাগ্রহীদের শিবির। সেখানে ৫০জন স্বেচ্ছাসেবক সর্বদা মজুত রহিয়াছে। ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক সব সময়ে পালাক্রমে খোঁয়াড় পাহাড়া দিতেছে। একজন দারোগা, কয়েকজন সহকারী ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী ৩০/৩৫ জন চৌকিদার ও দফাদারসহ সেখানে হাজির আছে। যখনই খোঁয়াড় হইতে গরু বাছুর বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা হয় তখনই ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া খোঁয়াড় ঘিরিয়া ফেলে। ২জন সাইকেল আরোহী স্বেচ্ছাসেবক নিকটেই হাজির থাকে। তাহারা সংবাদ দিলে ২/১ ঘণ্টার ভিতর এক হাজার কৃষক সত্যাগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসে। ৪/৫ ঘণ্টার ভিতর অন্ততপক্ষে ৫০০০ কৃষক জমা হইতে পারে।" এই বর্ণনা হইতে কৃষকদের সংগ্রামী মনোভাবের ও তাহাদের সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে সড্যা গ্রামের কৃষক নেত্রী শ্রীযুক্তা নলিনী বালা সামন্তের নেতৃত্বে প্রত্যহ প্রায় ৩০০ কৃষক মহিলা মার্চ করিয়া বেড়াইতেন। পরে ইহাদের সহিত ওই অঞ্চলের প্রায় ১০০০ মহিলা যোগ দেন।

তৎকালীন সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ ধারা প্রয়োগ করেন। গুর্খা, গারোয়ালী ও গোরা সৈন্য প্রায় ২০০০-এর মত আমদানী করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বর্ধমান শহরে যে কৃষক সমাবেশ আহ্বান করা হয় তাহা মাত্র ১২ ঘণ্টা আগে ১৪ই ফেব্রুয়ারি বৈকালে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

এসব সত্ত্বেও ক্যানেল অঞ্চলের কৃষকেরা বীরত্বপূর্ণভাবে তাহাদের সংগ্রাম চালাইয়া যায়। ১৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীসন্তোষ মণ্ডল ও মহানন্দ খাঁ প্রমুখ ১৮জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু ক্রোক করা গরু নীলাম করা সম্ভব হয় না। শেষে বর্ধমানে একজন সরকারী পিয়ন নামমাত্র মূল্যে তাহা ডাকিয়া লন। এই আন্দোলনে সড্যা গ্রামে কমরেড তারাপদ মোদক পুলিশ কর্তৃক ভীষণভাবে প্রহৃত হন এবং গ্রেপ্তার হন। এই আন্দোলনে মোট প্রায় ৩৫০ জন গ্রেপ্তার হন। শেষ পর্যন্ত সরকার নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং ক্যানেল কর ৫ টাকা আট আনা হইতে কমাইয়া ২ টাকা ৯ আনা করা হয়। ক্যানেল আন্দোলনের সাফল্য কৃষক সভাকে জেলায় জনপ্রিয় করার ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় নেতৃস্থানীয় কৃষক কর্মীদের উপর জেলা হইতে বহিষ্কারের আদেশ জারী হয়। এই আদেশ সত্ত্বেও কৃষক নেতারা আত্মগোপন করিয়া জেলায় কৃষক সভার কাজ চালাইয়া যান। ১৯৪০-৪২ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কাইগ্রামের জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমরেড বিপদবরণ রায় ও শিবপ্রসাদ দত্তের নেতৃত্বে

সংগ্রাম এবং চক্‌দিঘির জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদমপুরের কৃষকদের কমরেড বিপদবরণ রায়, পাঁচু গুহ ও বিমান মণ্ডলের নেতৃত্বে সংগ্রাম চলে।

১৯৪২ সালের শেষাশেষি কৃষক সভায় নেতৃস্থানীয় কর্মীদের উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উঠাইয়া লওয়া হয়। আবার প্রকাশ্যভাবে কাজ করিবার সুযোগ ইঁহারা পান।

১৯৪৩ সালে মাণিকহাটির কাছে দামোদরের বাঁধ এবং শক্তিগড়ের কাছে রেল লাইন ভাঙ্গিয়া যায়। জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই একই বৎসরে মন্বন্তরের করাল ছায়া বাংলাকে গ্রাস করে। তাই বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত এলাকায় সেবা কার্য এই সময়ে কৃষক সমিতির প্রধান কাজ হইয়া ওঠে। কৃষক সমিতির কর্মীরা এই উভয়বিধ কাজই অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া জেলাবাসীর সবিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হন। এই ব্যাপারে কমরেড শাহেদুল্লাহ, হরেকৃষ্ণ কোঙার, শিবশঙ্কর চৌধুরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। ইহার পর জেলা কৃষক সভার উল্লেখযোগ্য কাজ ১৯৪৫ সালের অজয় বাঁধ আন্দোলন, আউসগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার ১০টি ইউনিয়নের ১৬৭টি গ্রাম অজয়ের বন্যায় প্রায় প্রতি বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইত। একদা যে অঞ্চল জনাকীর্ণ ও সম্পদশালী ছিল ক্রমাগত বন্যার ফলে তাহা জনশূন্য বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। ১৯৪৩ সালের বন্যায় অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হওয়ায় জনসাধারণ কৃষক সমিতির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিমূলক বাঁধ কমিটি গঠন করে। এই বাঁধ কমিটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অজয়ের বাঁধ বাঁধিবার ও মেরামত করিবার প্রয়োজন বোঝান। জেলা কৃষক সমিতি ওই অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করিয়া এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন।

১৯৪৪ সালে গোবিন্দপুরে বর্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে বাঁধ মেরামতের জন্য আন্দোলন চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত হয়। কৃষক সমিতির কর্মীদের আন্দোলনের ফলে তৎকালীন গভর্নর মি. কে. সি. ১৯৪৫ সালের ৮ই জুন বাঁধ মেরামতের আদেশ দেন। মেরামতের কাজ ১৭ই জুন হইতে শুরু হয়। বর্ষা তখন আরম্ভ হইয়াছে। সপ্তাহ দুই-এর মধ্যে বাঁধ বাঁধিতে না পারিলে অজয়ের বন্যা নামিয়া আসিলে বাঁধ বাঁধা অসম্ভব হইবে। ইঞ্জিনীয়ার, কন্ট্রাক্টর ও সহকারী কর্মচারীরা এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ধরনের বাঁধ নির্মাণ একরূপ অসম্ভব বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সমিতির কর্মীরা দমিলেন না। প্রকৃতির সহিত পাল্লা দিয়া এই বাঁধের কাজ সময়ে শেষ করার দৃঢ় সংকল্প কৃষক সমিতির কর্মীরা লইলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দৈনিক ২/৩ হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া বন্যা নামিয়া আসিবার পূর্বেই বাঁধের কাজ শেষ করা হইল। কৃষক সমিতির এই কাজ সেদিন সর্বসাধারণের প্রশংসা পাইয়াছিল। এই অজয় বাঁধ আন্দোলনে কমরেড মনসুর হবিব, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিপদবরণ রায়, দাশরথি চৌধুরী, করুণা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সালে ক্যানেল কর আবার ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া ৫ টাকা ৮ আনা করা হয়। ইহার বিরোধিতায় আবার দ্বিতীয়বার ক্যানেল আন্দোলন শুরু হয়। হলধরপুরের শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডুর গরু ক্যানেল কর্তৃপক্ষ ক্রোক করেন। স্থানীয় কৃষকেরা সেই ক্রোক করা গরু সারগাছির

খোঁয়াড়ে আটক করে এবং সারগাছিতে শিবির স্থাপন করিয়া তাহা পাহারা দেওয়া হয়। জেলা পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট জোর করিয়া সেই গরু অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিশ আনাইয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলে কৃষকেরা ক্রোক করা গরু লইয়া চলিয়া যায়। পুলিশ ক্ষিপ্ত হইয়া ওই অঞ্চলে জুলুম শুরু করে। করুরী গ্রামে গুলি চলে। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর হয় এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. প্রফুল্ল ঘোষ একটা সমঝোতায় আসেন এবং কৃষক নেতাদের উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উঠাইয়া লওয়া হয়। ক্যানেল করও কমাইয়া ৪ টাকা করা হয়। পরে ২/৩ বছর বাদেই আবার কর বাড়াইয়া ৫ টাকা ৮ আনা করা হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার অন্যতম আসামী কমরেড সুবোধ চৌধুরী দীর্ঘ ১৬ বৎসর কারাভোগের পর ১৯৪৬ সালের শেষে মুক্তি পান। তিনি মুক্তি লাভের পর তাঁহার জন্মভূমি অগ্রদ্বীপে আসিয়া কৃষকদের ভিতর কাজ শুরু করেন। অগ্রদ্বীপের জমিদার মল্লিক বাবুদের অত্যাচার ওই অঞ্চলে একটা ভীষণ সন্ত্রাসের বিষয় ছিল। কমরেড সুবোধ চৌধুরী এই জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষক ও গোয়ালাদের সংগঠিত করিতে শুরু করেন এবং ওই অঞ্চলে শক্তিশালী কৃষক সমিতির ভিত্তি স্থাপন করেন। কৃষক সমিতিকে ভাঙিবার জন্য মল্লিক পরিবার তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। পুলিশের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত মল্লিক পরিবারের আত্মীয়তা থাকায় পুলিশকে এই ব্যাপারে পূর্ণভাবে নিয়োগ করা হয়। গ্রামে একটা সশস্ত্র পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয় এবং সন্ত্রাসের বিভীষিকা সৃষ্টি করা হয়। পুলিশের বেয়নেটের খোঁচায় তরুণ কৃষককর্মী সুনীল পাল মারা যান। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্থানীয় কৃষক ও গোয়ালাদের সংগঠন ও মনোবল ভাঙিতে কংগ্রেস সরকার ও জমিদার ব্যর্থ হন। অগ্রদ্বীপে জমিদারী অত্যাচারের অবসান হয়। অগ্রদ্বীপের বিজয়ী কৃষকেরা সারা কাটোয়া মহকুমায় নূতন প্রেরণা ও সংগ্রামী চেতনা আনিয়া দেয়। এরপর হইতেই কাটোয়া শহর বারে বারে অগ্রদ্বীপ অঞ্চলের কৃষকদের মিছিলে মুখরিত হইয়াছে। অগ্রদ্বীপের জমিদারী বিরোধী আন্দোলনে ধৃত কমরেড সুশীল চক্রবর্তী জেলে মৃত্যু বরণ করেন।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে আবার কৃষক নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। কৃষক নেতারা আত্মগোপন করিয়া কাজ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে রায়না থানার আহারবেলমা ইউনিয়নের সহজপুর, রসুইখণ্ড, আলালপুর, মাঝপুর প্রভৃতি ৮/৯ খানি গ্রাম লইয়া একটা শক্তিশালী গরিব কৃষক ও ভাগচাষী এলাকা গড়িয়া ওঠে। এই এলাকার নানারূপ সমস্যা লইয়া স্থানীয় কমরেড বিপদবরণের নেতৃত্বে সংগ্রাম করেন। এই অঞ্চলেই আত্মগোপন অবস্থায় কমরেড বিপদবরণ রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে যাইলে তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া কৃষককর্মী সন্তোষ রায় ও যুগল মালিক পুলিশের গুলিতে শহীদ হন।

১৯৫০-৫১ সালে কংগ্রেসী সরকারের কর্ডন ও লেভির বিরুদ্ধে কৃষক সমিতি জেলাব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। সর্বত্র বৈঠক, জনসভা ও মিছিল সংগঠিত করিয়া কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতির মুখোস খোলা হয়। খাদ্য শস্যের অবাধ যাতায়াতের মাধ্যমেই

বিভিন্ন এলাকার মধ্যে দরের সমতা আসে। কর্ডন করিয়া এই অবাধ যাতায়াতের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিলে দরের অসমতা বাড়িবে। একটা এলাকা হইতে আর একটা এলাকার মধ্যে দরের পার্থক্য বাড়িলেই মুনাফার লোভে চোরাকারবার হইতে বাধ্য এবং এক একটা জেলার বিস্তৃত এলাকা সেভাবে পাহারা দেওয়া বাস্তবতার দিক হইতে একরূপ অসম্ভব। তাই কর্ডন কার্যকরীও নয় ফলপ্রদও নয়। বরং ইহা চোরাকারবারকে পরোক্ষভাবে পুষ্ট করে। তাই কৃষক সমিতি ইহার তীব্র বিরোধিতা করিতে থাকে।

লেভির ব্যাপারেও দেখা গেল কংগ্রেসী সরকার অত্যন্ত খামখেয়ালী ভাবে জেলার বিভিন্ন থানায় গড় ফলন ঘোষণা করিয়া দিলেন। সরকারের ঘোষিত গড় ফলনের সহিত বাস্তব ফলনের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। চাষীর নিজস্ব প্রয়োজন ঠিক করার ব্যাপারেও খাম্‌খেয়ালীভাবে অত্যন্ত কম করিয়া ধরা হইল। আনুমানিক উৎপাদন হইতে আনুমানিক সাংসারিক প্রয়োজন বাদ দিয়া, যে ভাবে লেভি ধার্য করা হইল, তাহা পূরণ করিতে কৃষককে অনেক ক্ষেত্রে বাজার হইতে কিনিয়া দিতে হইল। ৩০ বিঘা বা তদূর্ধ্ব জমির মালিকের উপর এইভাবে লেভি ধার্য হইল। ধার্য করিবার ব্যাপারে দেখা গেল অজ্ঞাত কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে ১০/১১ হাজার বিঘা জমির মালিক লেভি হইতে বাদ পড়িলেন অথচ ২৮/২৯ বিঘা জমির মালিক রেহাই পাইলেন না। বড় বড় জোতের মালিকেরা হাইকোর্ট করিয়া ইন্‌জ্যাংশন পাইলেন। ছোট, মাঝারি মালিকদের সে অর্থসঙ্গতি না থাকায় অশেষ দুর্গতি ভোগ করিলেন। এই ব্যাপারে কৃষকসভা প্রাদেশিক ভিত্তিতে ক্রমাগত আন্দোলন চালানোর দরুণ শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসী সরকার এই নীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জমিদারী ক্রয় আইন ও পরে ভূমি সংস্কার আইন সভায় আলোচনা হইবার সময় হইতেই ভূমি সমস্যার মৌলিক সমাধানের প্রশ্ন দেশের সামনে উপস্থিত হইয়াছে। তখন হইতেই এই মূল প্রশ্নকে ভিত্তি করিয়া কৃষক সমিতি আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে। ভূমি সমস্যার সমাধান আজ শুধু কৃষকদের প্রধান সমস্যা নয় সমগ্র দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। কৃষির অগ্রগতি ব্যতিরেকে দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতি অসম্ভব। উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ, শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ, আভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশ যে কোন দিক হইতেই বিচার করা হউক, আমাদের মত পশ্চাৎপদ দেশের কৃষির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কৃষির উন্নতির জন্য যেমন একদিকে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত কৃষিঋণ উন্নত ধরনের বীজ ও সারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তেমনি অন্যদিকে তদপেক্ষা বেশি প্রয়োজন যে মানুষ ফসল ফলায়, নূতন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করা। তাই কৃষি বিপ্লব প্রধানত যান্ত্রিক বিপ্লব নয়-সামাজিক বিপ্লব এর মূল কথা: ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী ও নিতান্ত কম জমির মালিক দরিদ্র কৃষকদের বিনামূল্যে জমি বিতরণ করা। এই বিতরণ করার জমি সংগ্রহ করিতে হইবে। কৃষি উৎপাদনের সহিত সম্পর্ক শূন্য বড় বড় জমিদার ও জোতদার শ্রেণীর নিকট হইতে। জমিদারী ক্রয় আইনে বিরোধী পক্ষের সমস্ত ক্রয় উপেক্ষা করিয়া যেরূপ ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে তাহাতে বড় বড় জমিদার ও জোতদারদের পক্ষে পরিবারের ও আত্মীয় বন্ধুদের ভিতর বণ্টন ও বেনামী হস্তান্তর করিয়া আইন ফাঁকি দিবার সুবিধা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদী ১ কোটি ১৭ লক্ষ একর জমির ভিতর মাত্র ৬ লক্ষ একর বিতরণের জন্য পাওয়া যাইবে বলিয়া পূর্বে বারে বারে ঘোষণা করা সত্ত্বেও বর্তমানে কেবলমাত্র ১ লক্ষ ২২ হাজার একর উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গিয়াছে। এই জমিও সরাসরি কৃষকদের ভিতর বিতরণ না করিয়া পঞ্চায়েত কিংবা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে চাষ করাইবার পরিকল্পনা চলিতেছে। ইহাকে প্রহসন ছাড়া আর কি বলা যায়? জমি পাইয়া নূতন সামাজিক পরিবেশে নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ চলিতে থাকায়, হতাশা ও অবসাদ দেখা দিয়াছে। ছোট ও মাঝারি মালিকরাও বিভ্রান্ত হইয়া জমির স্বত্ব চলিয়া যাইবার আশংকায় নিজ চাষ শুরু করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সরকার এই শ্রেণীকে স্বত্ব সম্বন্ধে আশ্বস্ত করিয়া উচ্ছেদ হইতে নিরস্ত করিবার ব্যবস্থার কোন কিছুই করিতেছেন না। নিষ্করের উপর খাজনা, পুকুর ডাঙার প্রভৃতির উপর সাপ্তাহিক খাজনা ধার্য হওয়ায় খাজনার চাপ হ্রাস হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার ওপর সেটেলমেণ্টের জন্য হয়রানির অন্ত নাই। কৃষক সমিতি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এইসব বিষয়গুলি লইয়া আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসী সরকার ভূমি-সংক্রান্ত এইসব আইনগুলির মাধ্যমে সুকৌশলে গ্রামাঞ্চলে যে বিভেদের বীজ বপন করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালাইয়া কৃষকদের ভিতর ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে।

ভূমি সমস্যা সমাধান না হওয়ার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ খাদ্য সমস্যা দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। ১৯৫৩ ও ৫৪ সালের অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার দরুণ সাময়িকভাবে খাদ্য সমস্যার কিছুটা উপশম হইলেও ১৯৫৫ সাল হইতে একটানা খাদ্যসঙ্কট চলিতেছে। গ্রাম অঞ্চলে কাজের অভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যাভাব আরও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। তাই কৃষক সমিতির একদিকে সস্তা রেশনের দোকান খোলান, কৃষি ঋণ, খয়রাতি সাহায্য এবং টেস্ট রিলিফের কাজ শুরু করা প্রভৃতি আশু দাবী, অন্যদিকে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকৃত ভূমি সংস্কারের মৌলিক দাবী লইয়া কৃষক সমিতি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। মহকুমা শহরগুলিতে ও জেলা কেন্দ্রে প্রতি বৎসর খাদ্য মিছিল আসিয়াছে, মহকুমা শাসক ও জেলা শাসককে ঘেরাও করা হইয়াছে। সত্যাগ্রহ করিয়া সমিতির কর্মীরা কারাবরণ করিয়াছে। এই সবের মাধ্যমে কিছু কিছু আংশিক দাবী আদায় করিতে কৃষক সমিতি সক্ষম হইয়াছে।

১৯৫৮ সালে ডি. ভি. সি.-র সেচ এলাকায় জলকর সম্পর্কে আইন পাশ হইয়াছে। ওই আইন করিয়া শস্যের জল একর প্রতি ১২ টাকা ৮ আনা এবং রবি শস্যের জন্য একর প্রতি ১৫ টাকা করের উর্ধ্ব সীমা ধার্য হইয়াছে। এই বৎসর এখনও পর্যন্ত- কি হারে ডি. ভি. সি. এলাকায় কর আদায় হইবে সে বিষয়ে কোন নোটিশ জারি হয় নাই। তবে করের হার যে ২/১ বৎসরের মধ্যে ১২ টাকা আট আনা ও ১৫ টাকা করা হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার উপর আবার একরে ১৫ টাকার মত উন্নয়ন লেভি বসাইতে চেষ্টা চলিতেছে। এই বৎসরেই পাঞ্জাবে একবে ১৩০ টাকা উন্নয়ন লেভি আদায় করিবার চেষ্টা হওয়ায় সেখানে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়। প্রায় ১২ হাজারের মত কৃষক কৃষানী গ্রেপ্তার হয়।

৫ জন রমনী সমেত ৯ জন শহীদ হন। শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব সরকার নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। উন্নয়ন লেভি কমাইয়া একরে ৩০ টাকা করা হয়। বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতিও এই অন্যায় ও অতিরিক্ত জলকরের বিরুদ্ধে এবং উন্নয়ন লেভি বসাইবার নীতির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। ডি. ভি. সি. ও মৌরাক্ষী এলাকার কৃষকদের সামনে জলকর এবং উন্নয়ন লেভির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আগামী দিনের অন্যতম প্রধান সংগ্রামে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতি সেই উদ্যোগ লইয়া ডি. ভি. সি ও মৌরাক্ষী এলাকায় প্রতিনিধিদের লইয়া একটা কন্‌ভেনশন আহ্বান করিয়াছে। এই কন্‌ভেনশনে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া কৃষকেরা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইবে।

জেলা কৃষক সমিতির ২৫ বৎসরের ইতিহাস নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস। কৃষকদের এই নিজস্ব শ্রেণী প্রতিষ্ঠান সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। কংগ্রেসী সরকারের সমস্ত বিভেদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া কৃষক ঐক্যকে আরো জোরদার করিয়া কৃষক সমিতিকে শক্তিশালী করুন। কৃষকদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ আঘাতের পর আঘাত আসিতেছে। এইসব আঘাতকে প্রতিহত করিয়া সর্বশ্রেণীর কৃষকদের স্বার্থ বজায় রাখিতে-সত্যিকার জনতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষক সমিতি যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। জেলা কৃষক সমিতির রজত জয়ন্তী সম্মেলনে এই আহ্বানই আজ কৃষকদের নিকট দেওয়া হইতেছে।

□ 'বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির' রজত জয়ন্তী সম্মেলনে প্রকাশিত, ১৯৫৯ □

দুর্গাপুরে কৃষক আন্দোলন
শ্রমিক কৃষক মৈত্রী একটি অভিজ্ঞতা
রথীন রায়

১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রযন্ত্র ও কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে জনরোষের একটি বিস্ফোরণ ঘটে। কমরেড আশীষ দাশগুপ্ত ও কমরেড জব্বরের শহীদের মৃত্যু বরণে যা মহান। এই সংগ্রামই দুর্গাপুরে প্রথম আগস্ট আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যে-সমস্ত কারণে আগস্ট আন্দোলন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা হল ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করা। একটি শিল্পাঞ্চল-সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে কৃষকসমাজকে সংগঠিত করে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ার দৃষ্টান্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি ইতিবাচক দিক-নির্দেশ।

দুর্গাপুরে শ্রমিক আন্দোলন সন্নিহিত গ্রামগুলিতে কৃষক সংগঠন গড়তে উদ্যোগী হয়েছিল আগস্ট আন্দোলন লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে। অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘস্থায়ী শ্রমিক সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হবে না যদি না পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। কারণ উত্তাল আন্দোলনের প্রাথমিক আবেগ কেটে যেতেই গ্রামাঞ্চল থেকে আসা শ্রমিকদের মধ্যে কাজে যোগদানের প্রবণতা বাড়তে থাকে। আন্দোলনের তীব্রতায় প্রাথমিক ভাবে হতচকিত প্রতিক্রিয়ার শক্তি ক্রমেই সক্রিয় হয় এবং গ্রামগুলি থেকে আসা শ্রমিকদের একটি বড় অংশকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

সেই সময়ে এতদঞ্চলে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ছিল খুবই দুর্বল। বর্ধমান জেলার কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গাপুর মহকুমা ছিল পশ্চাৎপদ। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ভিন্ন প্রায় সমগ্র অঞ্চলই ছিল রাজনৈতিক চেতনা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানমনস্কতার দিক থেকে প্রায়ান্ধকার। শিল্প ও শহর গড়ে তোলার জন্য হাজার হাজার বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। অধিগৃহীত জমির মধ্যে বন, চাষযোগ্য উর্বর জমি, ডাঙা, বসতবাটি সবই ছিল। কিছু ক্ষেত্রে কোনও দিনই হয়ত কাজে আসবে না এবং কারখানা থেকে বহু দূরের জমি অপরিকল্পিতভাবে অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগৃহীত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও জমিচ্যুতদের চাকরি দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঘটেছে চূড়ান্ত অনিয়ম। জমিচ্যুতদের দুর্বল অংশের অনেকে চাকরি পায়নি। বর্গাদার-ক্ষেতমজুরদের ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের কথা ভাবাই হয়নি। এসমস্ত বেনিয়ম ও অবিচার হয়েছে কিছু কংগ্রেসী নেতা ও কয়েমী স্বার্থের নেতৃত্বে। যেহেতু কোন কৃষক সংগঠন ছিল না এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল নিতান্তই দুর্বল, সুতরাং প্রতিবাদের ক্ষীণ কণ্ঠকে কোন আমল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করা হয়নি। সমাজের বঞ্চিত পশ্চাৎপদ মানুষের স্বার্থরক্ষার কথা বলা সেই সময়ের নিরিখে দুর্গাপুরে ছিল অপরাধ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৫০ ও ৬০-এর দশকে দুর্গাপুরে যে শিল্প-কারখানাগুলি গড়ে উঠেছিল তা ছিল সেই সময়ের প্রেক্ষিতে আধুনিক। আধুনিক শিল্পগুলিতে যারা শ্রমিক হল তারা প্রায় অধিকাংশই প্রথম প্রজন্মের। এই শ্রমিকদের মূলত তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়। যে অংশটি সর্ববৃহৎ তারা এসেছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহর-গঞ্জ-জেলা থেকে -- সদ্য কলেজ ইত্যাদি থেকে পাশ করা যুবক। সেই সময়ে ছাত্র-আন্দোলনে বামপন্থী ধারাই ছিল প্রবল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও কংগ্রেসের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামে ছাত্রসমাজ ছিল সামনের সারিতে। এছাড়াও জঙ্গি উদ্বাস্তু আন্দোলন, শিক্ষকসমাজ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ধারাবাহিক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, কৃষক সংগ্রামগুলি সাধারণভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের যুবকদের বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল করেছিল। তৎকালীন দুর্গাপুরের আধুনিক শিল্পে এরাই ছিল শ্রমিকদের প্রধান অংশ। যদিও বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে একমাত্র দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাতেই পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ৭৫০-র অধিক শ্রমিক কর্মচারীর চাকরি গিয়েছিল। এইরকম ভীতির পরিবেশের মধ্যেও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন মতবাদও এদের মধ্যেই দ্রুত প্রসারিত হয়। দ্বিতীয় অংশটি এসেছিল দুর্গাপুর-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল থেকে। এই অংশের শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠই জমির সাথে সম্পর্কিত। গ্রামে তারা শোষক। সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বল উপস্থিতি, সামন্ততন্ত্রের সুদৃঢ় প্রভাব, জাতপাতের প্রবল ভেদাভেদ প্রভৃতি নানাবিধ পশ্চাৎপদ চিন্তাধারার কারণে নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, প্রগতিশীল চিন্তাধারা সম্পর্কে তারা খুবই সন্দিগ্ধ। তৃতীয় অংশটি এসেছিল বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য থেকে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতা ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবের অধীন থাকার জন্য কার্যত তাঁদের অবস্থান ছিল প্রগতি আন্দোলনের বিপরীতে। প্রতিক্রিয়ার শক্তি মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের শ্রমিকদেরই বেছে নেয় প্রগতিশীল বামপন্থী আন্দোলন প্রসারের বিরুদ্ধে।

এইরকমই এক পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গাপুরের শ্রমিক আন্দোলন দুটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমত, দুর্গাপুরে শ্রমিক আন্দোলনে সমন্বয় সাধন করার জন্য দুর্গাপুর ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দুর্গাপুর মহকুমা এলাকায় কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য হিন্দুস্থান স্টীল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে ইউনিয়নের কাজ থেকে অব্যাহিত দিয়ে কৃষক সংগঠন গড়ার কাজে নিয়োজিত হতে নির্দেশ দেয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই সেই সময় ছিলেন ইউনিয়নের সম্পাদকগুলীর সদস্য। প্রথমাবস্থা থেকেই যারা কৃষক সভার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রমথ মজুমদার, রথীন রায়, মানব রায়, মহাদেব মুখার্জি রমাপ্রসাদ গাঙ্গুলী, প্রণব লাহিড়ী, দিলীপ মজুমদার, সলিল দাশগুপ্ত (বড়)। এছাড়াও অনেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন। সেই সময় দুর্গাপুর অঞ্চলে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁদের উপর বর্তেছিল, প্রকৃতপক্ষে কাজটি ছিল তাঁদের পক্ষে সত্যই

দুরূহ। অচেনা জায়গা, অচেনা মানুষ, ভিন্ন রুচি, শত্রুতামূলক মনোভাব এবং কৃষক সমস্যা ও আন্দোলন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা কাটিয়েই অগ্রসর হতে হয়েছিল।

সেই সময় কংগ্রেসের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছিল। আগস্ট আন্দোলন বৃহত্তর দুর্গাপরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অর্গল খুলে দেয়। প্রগতিশীল যে অংশ এযাবৎকাল আস্থাহীনতায় ভুগছিল তারা উজ্জীবিত হয় এবং বামপন্থী প্রগতি-আন্দোলনে সংগঠকের কাজ শুরু করে দেয়। গ্রাম থেকে আগত শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বামপন্থী আন্দোলনের কেন্দ্রগুলির সাথে যোগসূত্র রচনা করেন এবং গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক ও কিশোররাও সংগঠন গড়ার কাজে এগিয়ে আসেন, এঁদের মধ্যে অনেকেই আজ বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কাজ করছেন। সেই সময়ের সংগঠকদের মধ্যে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন মধুসূদন মণ্ডল, মোক্তার হোসেন, সুখময় রুইদাস। পরবর্তীকালে শহীদ হন নীরদ মণ্ডল। স্বাভাবিক ও অন্য দুর্ঘটনাজনিত কারণে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মনু পাল, ছকড়ি ঘোষ, কড়ি মুখার্জি, মলিন্দ বাউরি, মালেক মণ্ডল, বিশ্বনাথ ঘোষ, জলধর ঘোষ, জগন্নাথ দাস, মুরলী কর্মকার, কালীপদ লোহার, হারাধন মিত্র, অবিনাশ রুইদাস, বাদল চ্যাটার্জি, বিশ্বেশ্বর লোহার, মধু গড়াই, দ্বারিক কুণ্ডু, প্রকাশ বাগদি, মুক্তিপদ রুইদাস, জীতেন ঘোষ, ফিরোহরি বাগদি, স্বপন ভট্টাচার্য। কেউ কেউ বামপন্থী আন্দোলনের সমর্থক থাকলেও সক্রিয়ভাবে আর নেই। মাত্র কয়েকজন ভিন্ন-রাজনীতির পক্ষে চলে গিয়েছেন। ইতিহাস সংরক্ষণের স্বার্থে সব কমরেডদের উল্লেখ করতে পারলে ভাল হত--কিন্তু দীর্ঘায়িত হবার ভয়ে এবং আরও তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-এর জন্য সময়াভাবে করা গেল না। ভবিষ্যতে কখনও করতে হবে।

প্রাক্ কথা

দুর্গাপুরে ৫০-এর দশক থেকে বনভূমি কেটে নতুন শিল্প গড়ে ওঠার আগেও ১৯০৫ সালে বার্ন রিফ্রাকটারি কারখানা তৈরি হয়। রাণীগঞ্জের বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে দুর্গাপুরের কারখানাতেও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এই ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে একটি কেন্দ্র আগে থেকেই ছিল। সগরভাঙা গ্রামে তরুণ চ্যাটার্জি ও নডিহা গ্রামে প্রয়াত দুঃখহরণ চ্যাটার্জি সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সাধ্যমত বামপন্থী মতবাদ প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন।

অণ্ডাল থানার পূবরা মদনপুর অঞ্চলে কমরেড লালচাঁদ মিশ্রকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলনের কিছু প্রভাব ছিল। রাণীগঞ্জের কমরেডদের প্রচেষ্টাতেই প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কাঁকসা থানার গোপালপুর অঞ্চলে কাশীনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে কৃষক, উদ্বাস্তু ও বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পানাগড়ে রবীন মজুমদারের নেতৃত্বে কাঁকসা ও পার্শ্ববর্তী আউসগ্রামের কয়েকটি গ্রামে বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাব বাড়তে থাকে। শহীদ সুকুমার ব্যানার্জির গ্রাম কুলডিহাতেও সুখেন্দু ব্যানার্জির নেতৃত্বে একটি কেন্দ্র কাজ করত। লাউদহ থানার জামগড়া গ্রামে কড়ি মুখার্জি ও মোহিত চ্যাটার্জি বামপন্থার কথা প্রচারের চেষ্টা চালাতেন।

গোগলা ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি গ্রাম ও কোলিয়ারিতে প্রয়াত বিশ্বনাথ ঘোষ, দীননাথ রায়ের নেতৃত্বে একটি জঙ্গি বামপন্থী-মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী কাজ করত। পরে সকলেই শ্রমিক আন্দোলনের মূল ধারায় যোগ দেন। রাঙামাটি গ্রামে এই সময়েই বর্ষীয়ান ফটিক চাচার কথাও উল্লেখ করতে হয়।

এছাড়াও ১৯৫৭-৫৮ সালে বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে আসেন এবং বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজনকে সংগঠিত করে ওয়ার্কার্স পার্টি গড়ার চেষ্টা করেন। সাহস ও নেতৃত্বের অভাবে সংগঠন কোনদিনই তেমন দানা বাঁধেনি। পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই শ্রমিক আন্দোলনের মূল ধারায় মিশে যান। এই গ্রামেরই কমরেড জব্বর ১৯৬৬ সালে আগস্ট আন্দোলনে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

আগস্ট (৬৬) আন্দোলনের শিক্ষায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তমত ট্রেড ইউনিয়নগুলি যখন কৃষক সংগঠন গড়ায় উদ্যোগী হয়, তার আগে থেকে এই সব ক্ষীণ ধারাগুলি বইছিল।

সেই সময়ে

সদ্যগঠিত কৃষক আন্দোলন কায়েমী স্বার্থকে যেখানে আঘাত করার পরিকল্পনা নেয় তা হল কারখানা ও উন্নয়ন-কর্তৃপক্ষের উদ্বৃত্ত জমিতে ভূমিহীন কৃষকদের চাষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সেই সময় শিল্পায়নের জন্য বহু কৃষিযোগ্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ ও চাকরিও দেওয়া হয়। অধিগৃহীত বহু চাষযোগ্য জমি কারখানার প্রয়োজনে লাগেনি। পূর্বতন জমির মালিকরা সেই জমি নিজের দখলে রেখে চাষ করছিল। কৃষক আন্দোলন দাবি তোলে এই জমিতে ভূমিহীন কৃষকদেরই চাষ করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। এই দাবি প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে ক্ষিপ্ত করে। সংগ্রামের ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত হচ্ছে সেই সময় ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্টের ভূমি রাজস্বমন্ত্রী কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার ঘোষণা করেন---কারখানার উদ্বৃত্তজমি প্রতি ১০ টাকা লাইসেন্স ফি-তে বাৎসরিক বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে। এই ঘোষণা বাঁধভাঙা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। জমির সংগ্রাম কার্যত অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। শোভাপুর-বিজরা, পারুলিয়া-কমলপুর, কালীগঞ্জ-শংকরপুর সহ আরও অনেক গ্রামে দফায় দফায় অনেক সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে বন্দুক ব্যবহৃত হয়।

বিজরা গ্রামে চাষ করা জমি পূর্বতন জমির মালিককে ফিরিয়ে দেবার জন্য কংগ্রেস প্রতিক্রিয়াশীলদের সংগঠিত করে। জব্বর জমাদার নামে একজন কৃষক-কর্মীকে খড়ের মধ্যে বন্ধ করে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত হয়। গ্রামে গরিব মানুষ ও ইস্পাত-শ্রমিকরা একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়।
গুলিবিদ্ধ হন মিশ্র ইস্পাত-শ্রমিক নরেন রায়। যুবকর্মী সলিল দাশগুপ্ত, রথীন রায়, দিলীপ মজুমদার, নলিনী রায়, ইরফান্ আলি মিদ্দা সহ প্রায় ৮০ জন নেতার বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলা চলে' ৭৭ সাল পর্যন্ত। মামলার সমস্ত খরচ বহন করে হিন্দুস্তান স্টীল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। কয়েকজনকে' ৭৭ সাল পর্যন্ত সাময়িক কর্মচ্যুত থাকতে হয়।

সেই সময়ে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে শোভাপুর গ্রামে। লাইসেন্স প্রাপ্ত জমির পাকা ধান পূর্বতন জমির মালিকের খামারে পুলিশকে তুলে দিতে হবে এই মর্মে হাইকোর্ট

নির্দেশ দেয়। পুলিশ কিছু করার আগেই ইস্পাত-শ্রমিক-পরিবারের মহিলারা সংঘবদ্ধ ভাবে অপটুহাতেই তিন বিঘা জমির ধান কৃষকের ঘরে তুলে দেয়। এই ঘটনা সেই সময়ের দুর্গাপুরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বলা যায় দুর্গাপুরে ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক দ্বিতীয় আগস্ট আন্দোলনে ইস্পাত-নগরীতে সি. আর. পি.'র সঙ্গে মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ ব্যরিকেড লড়াই-এর বীজ প্রোথিত হয়েছিল এখান থেকেই।

কারখানার উদ্বৃত্ত জমির ফসল রক্ষায় পারুলিয়া গ্রামে কৃষক রমণীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পুলিশের সহায়তায় জোটবদ্ধ জমির মালিকরা পাকা ধান জোর করে কাটতে গেলে কয়েকদিন ধরেই মূলত কৃষক রমণীদের সাথে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত কৃষক সংগ্রামই জয়যুক্ত হয়। এক্ষেত্রেও ইস্পাত শ্রমিকরা প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনের পাশে দাঁড়ায় এবং মামলার খরচ বহন করে।

কালীগঞ্জ গ্রামে সেইসময় একটি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সংগঠিত হয় জমির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। গ্রামের বৃহৎ জমির মালিকের সাথে সংঘর্ষ হয়। মালিক পক্ষ বন্দুক ব্যবহার করে। বন্দুকের সামনে কৃষকরা অকুতোভয় লড়াই চালায়। সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়। অসংখ্য মামলা রুজু করা হয়। মোট ১৩টি মামলা করা হয়। খুনের মামলায় শঙ্কর রুইদাস, মাণিক খারাৎ, কালিপদ রুইদাস, সন্ন্যাসী পরামাণিক, তারাপদ পরামাণিক, সমর মুর্মু, কমরেড লক্ষণ রুইদাস, কমরেড অজিত রুইদাস প্রমুখ আটজন কৃষককর্মীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এই আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে কমরেড তরুণ চ্যাটার্জীর মিসা হয়।' ৭৭ সালে বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার পর ৮ জন কৃষককর্মী মুক্ত হন।

এইসব মামলার খরচ অনেকাংশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বহন করে। এইসব মামলার পরিচালনা ও অর্থসংস্থানের জন্য সারা দুর্গাপুরের ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুর্গাপুর লিগ্যাল এইড কমিটি গঠিত হয়। বেনাচিতিতে অনুষ্ঠিত যে কনভেনশনে এই কমিটি গঠিত হয় সেই কনভেনশনে সি. আই. টি. ইউ.-র বর্তমান সাধারণ সম্পাদক এম. কে. পান্ধে উপস্থিত ছিলেন।

গোপালমাঠে লাইসেন্সপ্রাপ্ত জমির ধান কাটার সময় কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হাতে প্রহৃত হন কমরেড শ্যাম মণ্ডল, কমরেড কাশীনাথ চ্যাটার্জী, কমরেড অজিত ঘোষ প্রভৃতি কমরেডরা। ধূপচুড়ুরিয়া মৌজায় কাজোরার হাজরাদের খাসজমি দখলের লড়াইও এলাকায় প্রভাব ফেলেছিল।

তীব্র আধা ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসের সময় বাবনাবেড়ায় তিন বিঘা খাসজমি দখলের সফল সংগ্রাম কৃষক-কর্মীদের মধ্যে দারুণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। জমির আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল ফরিদপুর, জেমুয়া, গোগলা, কাঁটাবেড়িয়া, আমলাজোড়া, বাবনাবেড়া, বিদবিহার অঞ্চলে। এই সব আন্দোলনে অসংখ্য মামলা হয়। অনেক কর্মীকে গৃহছাড়া হতে হয়। পুলিশ ও কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হতে হয়। অনেক কমরেডকে কারাবাস করতে হয়। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎখাত কৃষক কর্মীরা শ্রমিক পরিবারে আশ্রয় পেয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে। ইস্পাতনগরীর একটি এলাকায় একসময় ১৩১ জন কৃষক-কর্মী শ্রমিক পরিবারগুলিতে বসবাস করত।

সেই সময় দুর্গাপুর অঞ্চলে বর্গা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং ভাগের দাবিতে গ্রামগুলিতে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত হয়। বর্গাদার ৭৫:২৫, কৃষাণী-বর্গাদারদের ৫০: ৫০ ভাগের দাবী আসেনি। এতদঞ্চলে কৃষাণী বর্গাদারের সংখ্যাই বেশি। কৃষাণী বর্গাদাররা পেত মাত্র ৩০থেকে ৩৩ ভাগ মাত্র। কোন খড় পেত না। দাবী তোলা হয়, ৪০ ভাগ এবং খড় দিতে হবে। এই দাবীর বিরোধীতায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জমির মালিকরা মরিয়া আক্রমণ চালায়। জমির মালিকরা প্রায় প্রতিটি গ্রামেই উচ্ছেদ করতে থাকে। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও ভাগের দাবীতে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলে। হার-জিতের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষক আন্দোলনই জয়যুক্ত হয়। জামগড়া ও বিদবিহার অঞ্চলে আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছিল। জামগড়া গ্রামে পাকা ধান মাঠে পড়েছিল প্রায় তিনমাস। বিদবিহার অঞ্চলে জোটবদ্ধ জমির মালিকদের ১২ খানা বন্দুকের বিরুদ্ধে কৃষকরা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে সফল হয়।

১৯৭০ সালে লস্করবাঁধ গ্রামে বর্গা ভাগের আন্দোলন তীব্র আকার নেয়। এলাকার সংগঠক বিশ্বনাথ ঘোষকে প্রচণ্ড প্রহার করে মৃত ভেবে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু কৃষকদের মনোবল ভাঙা যায়নি। এ ধরনের অসংখ্য আন্দোলন সংগঠিত হয় গ্রামগুলিতে।

মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন সংগঠিত করার গুরুত্ব সেই সময়েই উপলব্ধিতে এসেছিল। ১৯৭১ সালের কোন এক সময়ে ফরিদপুর গ্রামে ৮ টাকা মজুরির দাবীর উপর কৃযক কর্মীদের একটি কর্মশালা সংগঠিত করা হয়। সেই কর্মশালায় কমরেড রামনারায়ণ গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে কেন আট টাকা মজুরির দাবী ন্যায্য সেটা কর্মী ও ক্ষেতমজুরদের বোঝানো প্রয়োজন ছিল। কর্মশালার পর দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন সংগঠিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্দোলন সংঘাতের রূপ নেয়। ১৯৭৬ জরুরি অবস্থায় সময় ও কালীগঞ্জ-শঙ্করপুর আবড়া গ্রামগুলিতে মজুরির আন্দোলন সংগঠিত হয়। সবথেকে উল্লেখযোগ্য ৪০দিন ক্ষেতমজুর ধর্মঘট চলে। আমরাই কাণ্ডেশ্বর এলাকায় মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রায় ৮দিন যাবৎ আন্দোলন চলে। উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয় উখড়ায়। ক্ষেতমজুর পরিবারের যুবকরা মাঠ পাহাড়ার মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন সংগঠিত করে। এই আন্দোলনও তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই আন্দোলনের সাফল্য এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। এই ধরনের অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দুর্গাপুরে কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৯৬৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কৃষকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। সেই সময় কৃষক সংগঠন পরবর্তীকালে লাউদহ থানা এলাকায় কোলিয়ারি শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

উপসংহার

১৯৬৭ সালে সগরভাঙা গ্রামে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা কৃষকসভা গঠিত হয়। সভাপতি হন কমরেড দিলীপ মজুমদার ও সম্পাদক হন কমরেড তরুণ চ্যাটার্জী।

১৯৮৫ সালে অণ্ডাল থানা এলাকার গ্রামগুলিতে পৃথক থানা কমিটি গঠিত হয়। বিদবিহার অঞ্চল, আমলাজোড়া অঞ্চল, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি কাঁকসা থানা কমিটির সাথে যুক্ত

হয়। দুর্গাপুর ও লাউদহ একসঙ্গেই থাকে। ১৯৮৬ সালে সরপী গ্রামে সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে লাউদহ ও দুর্গাপুর দুটি পৃথক থানা কমিটি গঠিত হয়।

১৯৬৬ সালে ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে সংগঠিত কৃষক সংগঠনের বিকাশ ঘটেছে ব্যাপকতায় ও গভীরতায়। দুর্গাপুর মহকুমায় আজ আর এমন গ্রাম নেই যেখানে কৃষক সভার সদস্য নেই। ৪টি থানা কমিটিই তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী। এরা শ্রমিক শ্রেণীর মিত্র হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে সতত নিরলস।

পরিশেষে, তথ্য সংগ্রহে সবিশেষ সাহায্য করবার জন্য কৃষক সভার জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মাগারাম রুইদাসের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে অপরাধ হবে।

□ বর্ধমান জেলা কৃষক সভার সংকলন, 'আন্দোলনে সংগ্রামে ৬০ বছর' □
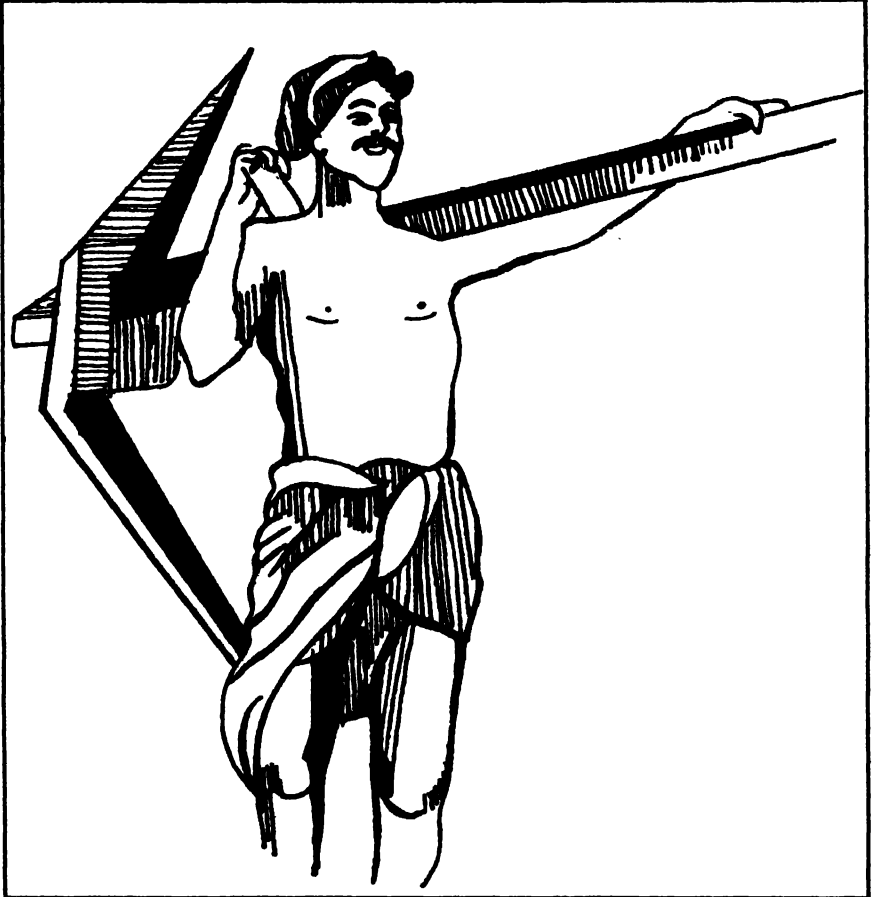
বর্ধমান জেলায় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি

অরিন্দম কোঙার

একটি জেলা

ব্রিটিশ আমলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বা বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত বর্ধমান একটি জেলায় পরিণত হয়। ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত কয়েকবার সীমানার পুনর্বিন্যাস করে এবং ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত সীমানার কিছু রদবদল ঘটিয়ে বর্ধমান জেলার যে আয়তন দাঁড়ায়, সেই আয়তন নিয়েই স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলা বর্ধমান। ১৯৯১ সালের জন-গণনা অনুযায়ী বর্ধমান জেলার আয়তন ৭,০২৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৬০,৫০,৬০৫, যার মধ্যে পুরুষ ৩১,৮৬,৮৩৩ ও মহিলা ২৮,৬৩,৭৭২ জন। বর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা শিল্পাঞ্চল এবং বর্ধমান উত্তর, বর্ধমান দক্ষিণ, কাটোয়া ও কালনা মহকুমা কৃষি অঞ্চল হিসাবে সাধারণভাবে পরিচিত।

১৯৯১ সালের লোক-গণনা অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় জনবসতি আছে এমন গ্রামের সংখ্যা ২,৪৮৮। জেলায় বাণিজ্যিকভাবে কয়লার উত্তোলন শুরু হয় ১৭৭৪ সালে, রেল লাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৮৫৫ সালে, ১৮৭০ সালে কুলটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং দেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রায়ত্ত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কাজ শুরু হয় ১৯৬০ সালে। অর্থাৎ কৃষি-অধ্যুষিত বর্ধমান জেলায় শিল্পের বিকাশ হতে থাকে অষ্টাদশ শতক থেকে।

জেলার নারী সমাজ

সারা দেশে যেমন কম-বেশি সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া আছে, প্রভাব আছে, বর্ধমান জেলাতেও এই প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব কাজ করছে। এর ফলে মানুষকে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়তে হচ্ছে, নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করতে হচ্ছে এবং মহিলাদের মধ্যে এই দুঃখ-দুর্দশা, নির্যাতন-নিপীড়ন তুলনামূলকভাবে বেশি। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৮১৫ সালে বর্ধমান জেলায় সতীর সংখ্যা ৫০ যার মধ্যে ২৯ জন সন্তানবতী, ১৮২৩ সালে সতীর সংখ্যা ৪৫, যার মধ্যে ৬ জনের বয়স ২০ বছর থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। উইলিয়াম অ্যাডমস্-এর রিপোর্ট, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের রিপোর্ট, 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা ইত্যাদি থেকে জানা যায় যে উনিশ শতকে বর্ধমান জেলায় স্ত্রীশিক্ষার জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে তা ছিল অপ্রতুল। ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্যাসাগর বর্ধমান জেলায় যে ১১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়গুলি পরিচালনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ায় অনেকগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯১ সালের জন-গণনা অনুযায়ী জেলায় সাক্ষরতার হার ৬১.৮৮ শতাংশ, পুরুষদের মধ্যে ৭১.১২ শতাংশ, মহিলাদের ৫১.৪৬ শতাংশ। এই গণনা অনুযায়ী জেলায় কর্মহীন মানুষের হার ৬৯.৩৪ শতাংশ, পুরুষদের মধ্যে ৪৯.৯০ শতাংশ, মহিলাদের মধ্যে ৯০.৯৯ শতাংশ। ১৯৯১ সালে প্রতি ১,০০০ পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা ৮৯৯।

ভাস্বর নারীরা

স্বাধীন দেশে অর্ধ শতক পেরিয়ে যাবার পরও মহিলারা যেখানে এখনও অনেক পশ্চাদ্‌পদ অবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, সেখানে অষ্টাদশ শতকে আউসগ্রাম থানার কলাইঝুটি গ্রামের রূপমঞ্জরী দাস (হটু বিদ্যালঙ্কার) (১৭৭৫-১৮৭৫) ও একই থানার সোঁয়াই গ্রামে হটী বিদ্যালঙ্কার (মৃত্যু ১৮১০), রায়না থানার শাকনাড়া গ্রামের কুড়ুনি দেবী (অষ্টাদশ-উনিশ শতক), খণ্ডঘোষ থানার খণ্ডঘোষের ভগবতী দেবী বিদ্যাচর্চায় বিশেষ পারদর্শীতার পরিচয় দেন।

সাহিত্যচর্চায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন নীরোদমোহিনী বসু (১৮৬৪-১৯৫৪) যাঁর কাব্যের বিষয় ছিল নারী মুক্তি, দেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি। আমাদের বিস্মিত করেন শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪)। এই গৃহবধূ প্রথম উপন্যাস 'শেখ আন্দু' লেখেন ১৯১৫-১৬ সালে, যে উপন্যাস সম্পর্কে ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম চিন্তাবিদ শিবনারায়ণ রায় লেখেন, "এখন থেকে আশি বছর আগে যে তরুণী হিন্দু কুলবধূ একটি আদর্শবাদী ও হৃদয়বান মুসলমান যুবককে তাঁর কাহিনীর নায়করূপে সযত্নে এঁকেছিলেন তাঁর মুক্তবুদ্ধি, সৎসাহস এবং উজ্জ্বল কল্পনাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই।" (ভূমিকা- শেখ আন্দু)

প্রতিবাদে প্রতিরোধে

বিশ শতকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বর্ধমান জেলার নারী সমাজকেও নাড়া দেয়। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের নেতৃত্ব দেন কাটোয়ার সুরমা মুখোপাধ্যায়, বর্ধমানের রেণু অধিকারী, কাটোয়া থানার কুলগাছি গ্রামের নির্মলা সান্যাল (ময়মনসিংহ-এর কমিউনিস্ট নেতা মণি সিং-এর বোন) প্রমুখ। সুরমা মুখোপাধ্যায় দুবারে ৬ মাস করে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি ছাড়া ১৯৩২ সালে কারাবরণ করেন বীণাপাণি দেবী, সরসীবালা দাসী, নির্মলা সান্যাল, শিবানীবালা দেবী, দুর্গারানী দেবী, সুবাসিনী চন্দ, জ্ঞানপ্রভা দেবী, কমলেকামিনী দেবী, সুষমা দেবী, মঞ্জুরানী ঘোষ প্রমুখ। নির্মলা সান্যাল আকর্ষণীয় বক্তৃতায় মহিলাদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগরিত করতে পারতেন। ১৯৩৩ সালে বর্ধমান জেলার কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলনের ৩ মাস পর নির্মলা সান্যাল সমিতির জেলা কমিটির সদস্যা হন। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর অনুগামী নিবারণচন্দ্র ঘটকের মাসীমা বীরভূম জেলার দুকড়িবালা দেবী ঘটককে রাণীগঞ্জ থানার সিয়ারশোলে যুগান্তর দল গড়ে তুলতে সাহায্য করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা কমিটি গঠিত হয় ১৯৩৬ সালে যাতে একমাত্র ছাত্রী ছিলেন বর্ধমানের খ্যাতনামা কবিরাজ মথুরানাথ সেনগুপ্তের মেয়ে জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত, যিনি পরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মী হন। চারের দশকের ছাত্রীকর্মী বীণা সেনচৌধুরী (পরে কাঞ্জিলাল) পরবর্তী সময়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন এবং ১৯৫০ সালে কারারুদ্ধও হন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির প্রথম সম্পাদক সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ লিখেছেন, "১৯৫০ সালের ৩১শে অক্টোবর হঠাৎ খবর পেলাম জামিনে আমাদের মুক্তি হয়েছে। আমি যে মামলায় ছিলাম,

আমরা ১৪ জন আসামী, বেশির ভাগই ছাত্র-ছাত্রী, কারণ ছাত্রদের গোপনে আলোচনা সভা ছিল। সেই সময় অর্থাৎ ৩১মে ১৯৫০ জেলে একজন ছাত্রী কমরেড সুশান্তা বসুকে (প্রকৃতপক্ষে ঘোষ) হারিয়ে এলাম। তাঁকে যখন ধরে তখনই তাঁর জ্বর ছিল। ... বাকি আমরা ১৩ জন তাঁকে হারিয়ে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে ছিলেন কমরেড সুশীল ভট্টাচার্য্য (বর্ধমান শহর কমিটির সম্পাদক), কমরেড বিভা কোঙার (কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্ত্রী), সুশীল দেবদাস (পরে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতা), কমরেড বীণা সেন চৌধুরী, অনঙ্গ রুদ্র (বর্তমানে পার্টিতে নেই, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক -- পার্টিতে নেই বলতে পার্টি সভ্য নেই), আর বাকি ছিলেন ছাত্রগণ।'' (বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ) বর্ধমানের রেবা মল্লিক, মমতা সেনগুপ্ত কাটোয়ার যোড়শী দাস চার-পাঁচের দশকে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৯৫৬ সালের ২১শে মার্চ বর্ধমান কোর্ট প্রাঙ্গনে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে বিভা কোঙারের নেতৃত্বে মহিলাদের আইন অমান্য

কৃষক আন্দোলনে বর্ধমান জেলার মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান সদর, গলসী, মেমারি, মন্তেশ্বর, ভাতার থানা এলাকায় ১৯৩৭-৩৯ সালে ক্যানেল কর প্রতিকার আন্দোলনে মহিলারাও শামিল হন। ১৯৩৯ সালে বর্ধমান সদর থানার সড্যা গ্রামের নলিনীবালা সামন্তের নেতৃত্বে প্রত্যহ প্রায় ৩০০ কৃষক মহিলা মিছিল করতেন। পরে এঁদের সঙ্গে প্রায় ১,০০০ মহিলা যোগ দেন। এই ক্যানেল কর প্রতিকার আন্দোলনে জেলার বাইরের মহিলারাও আকৃষ্ট হন। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে আছে, 'জানা গেছে পার্টি (অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি) সদস্য ও অন্যান্য (সুরেশ রায়চৌধুরী, প্রাক্তন ডেটিনিউ, অমরেশ লাহিড়ি, প্রা. ডে. লীলা দে, বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রী, কমলা চ্যাটার্জী প্রা. ডে., বেণী বাগচি , প্রা. ডে. এবং অন্যান্য) ৭.৩.৩৯ তারিখে ৮/২ ভবানী দত্ত লেনে একত্রিত হন এবং বর্ধমান ক্যানেল কর আন্দোলনের বিষয়ে নিস্পৃহ মনোভাবের জন্য হক মন্ত্রিসভাকে নিন্দা করেন এবং সেখানে কৃষক নিপীড়নের জন্য তাকে দায়ী করেন। কমলা চ্যাটার্জী ও লীলা দে-কে সেখানে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য বলা হয়।'' (স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ, লর্ড সিন্‌হা রোড, দিনলিপি ১৫.৩.৩৯)

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর ১৯৬৭-৭০ সালে বর্ধমান জেলার কৃষক আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়, যেখানে মহিলাদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ১৯৬৭-৭০সালে বর্ধমান সদর ও গলসী থানার নলা-তিরিঙ্গিতে ভোলা দাসী, অন্নদা বাগদী, গীতা বাগদী প্রমুখের নেতৃত্বে জমি দখলের সংগ্রামে ব্যাপক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে মেমারি থানার নবস্থায় ন্যস্ত জমি দখল করতে গিয়ে সরস্বতী হেমব্রম, চুনো মুর্মু, মঞ্জু মুর্মু, গীতা কিসকু, কুর্নী সোরেন, সুন্দরী মুর্মু, রাধিকা মুর্মু প্রমুখ ১৩ জন মহিলাসহ ৪৯ জন কৃষক আন্দোলনের নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন। মেমারি, মঙ্গলকোট, মন্তেশ্বর, জামালপুর, কাটোয়া থানায় খাস ও বেনামী জমি দখলের আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৮ সালে মেমারি থানার কল্যাণপুরে, ১৯৬৯ সালে মঙ্গলকোট থানার চৈতন্যপুরে, ১৯৭০ সালে মেমারি থানার বিজুরে হিংস্র পুলিশী আক্রমণের মুখেও কৃষক আন্দোলনে মহিলারা শামিল হন। পাঁচ থেকে সাতের দশকে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণের মুখেও কৃষক আন্দোলনে জাগিয়া রাজোয়া (অগ্রদ্বীপ - কাটোয়া, রিবি হাঁসদা (বড়বহরকুলি -- কালনা), পার্বতী কিসকু (বরোঙা -- মেমারি)-র মতো অনেক মহিলাই বেশ সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বিশ শতকের তিনের দশক থেকে বর্ধমান জেলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মহিলারাও সামিল হতে থাকেন। বর্ধমানের মানুষ না হয়েও বিমলপ্রতিভা দেবী (মুখোপাধ্যায়, পরে বন্দ্যোপাধ্যায়) জেলায়, বিশেষ করে আসানসোল মহকুমায় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা রবীন সেন তাঁর 'পাঁচ অধ্যায়' বইয়ে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁর 'স্মৃতি স্মৃতি আর স্মৃতি' বইয়ে বারে বারে বিমলপ্রতিভা দেবীর ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। বিমলপ্রতিভা দেবী ছিলেন আসানসোল বাস ইউনিয়নের সভাপতি, ১৯৪৭ সালে রানীগঞ্জ থানার বল্লভপুরের বেঙ্গল পেপার মিল মজদুর ইউনিয়ন যখন রেজিস্ট্রিভুক্ত হয় তখন সেই ইউনিয়নের অন্যতম সহ-সভাপতি। বেঙ্গল পেপার মিলের শ্রমিক আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা বোঝা যায় সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরীর স্মৃতিকথা থেকে। তিনি লিখেছেন, "তখন (১৯৩৮ সাল) একদিন দাসী বাউরী, ভগবস্তিয়া, যশোবস্তিয়া নারী শ্রমিকরা ইউনিয়ন অফিসে এসে আমাদের বললো, দাদা আপনারা যদি ধরা পড়েন তাহলে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া শক্ত হবে। আমরা মেয়েরাও ভলেন্টিয়ার হয়ে পিকেটিং করব। তখন আমরা বললাম তোমরা নারী শ্রমিকদের একটা ভলেন্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলো। তোমাদের ব্যাচ পরপর একে একে পিকেটিং করতে নামবে। কয়েকদিন পর থেকে নারী শ্রমিকরাও পিকেটিং করতে শুরু করলো।" (অতীতের কথা: কিছু অভিজ্ঞতা)

১৯৫৪ সালে রাণীগঞ্জের রিফ্র্যাক্টরি অ্যান্ড সেরামিক কোম্পানির শ্রমিকরা যখন ১১ দিন ধরে রাণীগঞ্জ থেকে কলকাতা অভিযান করেন, তখন সেই অভিযান সফল করতে মহিলারাও এগিয়ে আসেন। নভেম্বর মাসের শীতের সন্ধ্যায় দুর্গাপুরে অভিযাত্রীদের জন্য ব্যবস্থাপনার বিবরণ সাহিত্যিক গোলাম কুদ্দুসের কাব্যিক ভাষায়, "বঁটি পেতে কয়েকজন

মেয়ে শ্রমিক বসে গেল তরকারী কুটতে। অল্প সময়েব মধ্যেই কীরকম একটা উৎসবের আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেছে! মেয়েরা কেউ গিয়ে ইঁদারা থেকে জল তুলে আনছে কাঁখে করে, মাথায় করে। তাদের পা খালি, গায়েও জামা নেই, শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে। উপবাসী শ্রমিক অভিযাত্রী ভাইদের জন্য এই নরনারীদের হিমের মধ্যে রান্নায় আয়োজন কেমন এক বিষণ্ণ মধুরতার ভাব এনে দিল মনে।" (একসঙ্গে)

১৯৫৯ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে বর্ধমান জেলার মহিলা সমাজ

১৯৬৬ সালে, ১৯৭০ সালে বারে বারে দুর্গাপুরের শ্রমিকদের ঐতিহাসিক সংগ্রামে দুর্গাপুরের মহিলারাও পিছিয়ে থাকেন নি। ১৯৭০ সালে ১২-২২ আগস্ট দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ৬০,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘটে মহিলাদের ভূমিকা ওখানকার মহিলানেত্রী মিনতি মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ অনুযায়ী, "সমস্ত জায়গায় ছিল সংগঠিত মহিলা নেতৃত্ব। সেদিন পারেনি পুলিশ প্রশাসন বা গুণ্ডাবাহিনী নারীশক্তিকে রোধ করতে। এই প্রতিরোধ আন্দোলন শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করল। সি. আই. টি. ইউ. তার সমস্ত রাজ্য সংগঠনের কাছে এই অভূতপূর্ব সাংগঠনিক শক্তির কথা পৌঁছে দিল। কমঃ বিনয় কোঙার জেলের অভ্যন্তর থেকে দুর্গাপুরের সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মহিলাদের অভিনন্দিত করলেন।" ('যে বীজ অঙ্কুরিত হল '৬৬ তে')।

কোলিয়ারি মজদুর আন্দোলনে নারী কয়লা শ্রমিকদের ভূমিকা বিবেচনা করেই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রমজীবী নারী কনভেনশন হয় আসানসোলের উপকণ্ঠে কালিপাহাড়ী রেল স্টেশনের কাছে কোলিয়ারি অঞ্চলে ১৯৭৯ সালের ৩-৪ মার্চ।

১৯৫৬ সালে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে আইন অমান্যকারীদের মধ্যে অন্তত ৩০ জন মহিলা ছিলেন। ১৯৫৬-৫৯ সালে খাদ্যের দাবিতে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মহিলারা বারে বারে কারাবরণ করেন।

১৯৮৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বর্ধমান কোর্ট প্রাঙ্গণে অন্যান্য সত্যাগ্রহীর সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে মহিলারা

সংগঠিত উদ্যোগ

প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সংগঠিতভাবে মহিলাদের সামিল করার তাগিদ থেকে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্ধমান জেলাও সেই উদ্যোগে যুক্ত হয়। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষে আর্ত মানুষকে সাহায্য করতে বর্ধমান শহরে রাবিয়া বেগম (কমিউনিস্ট নেতা সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্-এর স্ত্রী), শামশুন্নেসা (বাদশা), নির্মলা রায় (সেনগুপ্ত), বিভা কোঙার (কমিউনিস্ট নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্ত্রী), রেণু অধিকারী, শেফালী চৌধুরী, কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরীর স্ত্রী, জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত, মকসুদা খাতুন (কমিউনিস্ট নেতা মনসুর হবিবুল্লাহ্-এর স্ত্রী), নলিনী বক্সি প্রমুখের উদ্যোগে একটি মহিলা সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সভানেত্রী—রাবিয়া বেগম, সম্পাদিকা—শামশুন্নেসা, কমিটির সদস্যা—জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত, নির্মলা রায়, বিভা কোঙার, রেণু অধিকারী প্রমুখ।

প্রাদেশিক স্তরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আত্মপ্রকাশ করায় এই মহিলা সমিতি পরিণত হয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে। তখন সমিতির সভ্যা ছিল ২০০ জন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বর্ধমান জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ ও মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বর্ধমানে। প্রাদেশিক স্তর থেকে বর্ধমান জেলায় সংগঠন গড়তে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের অন্যতমা মণিকুন্তলা সেন এই সম্মেলনের

বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, "বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে বর্ধমানের কয়েকটি রাস্তা পরিক্রমা করা হলো। এরকম ব্যানার ও ফেস্টুন সহ মেয়েদের মিছিল এখানে এর আগে কেউ দেখেনি। সব শাখা থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছিল। প্রকাশ্য অধিবেশনে বিপুল সংখ্যক মেয়ে যোগ দেওয়ায় শহরের টাউন হলটি ভরে গেল।" ('সেদিনের কথা')

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম জেলা কমিটির সভানেত্রী হন শিবরানী মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিকা বিভা দত্ত, কমিটির অন্যান্য সদস্যা -- রাবিয়া বেগম, শামশুন্নেসা, নির্মলা রায়, জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত, রেণু অধিকারী, বিভা কোঙার, অর্চনা সেন, জ্যোতি দাশগুপ্ত, ভারতী দেবী, শেফালী চৌধুরী প্রমুখ। শিবরানী মুখোপাধ্যায় বেশ অবস্থাপন্ন পরিবারের গৃহকর্ত্রী ছিলেন এবং তিনি ও বিভা দত্ত সাধারণত বাড়ির বাইরে যেতেন না। সংগঠন গড়ে তোলার সময় সংগঠনের কাজ সম্পর্কে বিভা কোঙার লিখেছেন, "বর্ধমান জেলায় মহিলা সমিতি গড়ে তোলার সময় চারিদিকে চলছিল খাদ্যের হাহাকার। সুতরাং দুর্গতদের খাদ্য সরবরাহের বিভিন্ন কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করি। খাদ্যের দাবি, ফুড কমিটি গঠন, খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য তৈরি করে বিতরণ ইত্যাদি কাজ আমরা পরিচালনা করি, এমনকি শিশু ও অসুস্থদের জন্য দুধ সরবরাহেরও ব্যবস্থা করি। ১৯৪৩ সালে বন্যার সময়ও আমরা একই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমরা প্রথম থেকেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতাম। পরিবারগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে আমরা ধীরে ধীরে তাঁদের আপনজন হয়ে যেতাম।" ('পুরানো সেই দিনের কথা')

সেবামূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান জেলায় মহিলা সমিতি প্রথম থেকেই নারীদের অধিকারের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৪১ সালের রাও কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মহিলাদের কিছু অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে দুটি বিল --- বিবাহ বিল ও সম্পত্তির অধিকার বিল উত্থাপিত হয়। রাবিয়া বেগম লিখেছেন, "১৯৪৪ সালে বরিশালে আমাদের দ্বিতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন নারী সমাজের মুক্তি ও পুরুষের সাথে সমান অধিকারের আহ্বান দেয়। বরিশাল সম্মেলনে অন্যতম বিশেষ প্রস্তাব ছিল--নারীর স্বত্বাধিকার বিষয়ে রাও কমিটিকে সমর্থন। এই উপলক্ষে আমাদের কাজ ছিল রাও বিল নিয়ে ঘরে ঘরে বোঝানো, সভা ইত্যাদি করা। বর্ধমান শহরে আমরা একটি বড় মহিলা সভা করি। ঐ সভায় স্বনামখ্যাত উকিল প্রয়াত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমন্ত্রণ করেছিলাম। তিনি রাও বিলের উপর এবং তার সমর্থনে সব কিছু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন।" ('বর্ধমান মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি - স্মৃতিকথা')

আসানসোল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৪৫-৪৬ সাল থেকে। এখানে সমিতি শ্রমজীবী মহিলাদেরও সংগঠিত করার চেষ্টা করে। বিনয় চৌধুরী লিখেছেন, "এখানে ইন্দুমতী দেবী এবং বরিশালের আর এক মহিলা-- এঁদের নিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে ওঠে। পরে বিজয় পাল বেনারস গিয়ে, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শচীন বক্সির দিদিকে নিয়ে আসে। তিনিও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে যুক্ত হন। আসানসোলে ক্রমশ ধাঙ্গরদের মধ্যে ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। তখন এই দিদি ধাঙ্গর

ইউনিয়নের কাজে নেমে পড়েন এবং এদের মধ্যে দিদির প্রভাব গড়ে ওঠে।" ('অতীতের কথা - কিছু অভিজ্ঞতা')

১৯৬৬-৭০ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিনগুলিতে দুর্গাপুরে আত্মপ্রকাশ করে 'মহিলা সংসদ' নামে মহিলা সংগঠন, যেহেতু দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীতে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির নাম গ্রহণের সুযোগ তখন ছিল না। কিন্তু এই সংগঠন গড়ে তুলতে মহিলা সমিতির রাজ্য নেতৃত্ব যেমন কনক মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি চক্রবর্তী, পঙ্কজ আচার্য; জেলা নেতৃত্ব যেমন জেলা সম্পাদিকা রাজলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় (পরে চট্টোপাধ্যায়), প্রভা চট্টোপাধ্যায় স্থানীয় সংগঠকদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন।

প্রথম দিকের সংগঠকরা ছাড়াও চার ও পাঁচের দশকে বর্ধমান জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠক হিসাবে যাঁরা পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমান সদর মহকুমার রেণু ঘোষ, অঞ্জলি বসু, অর্চনা গুহ, রানু চট্টোপাধ্যায়, নীহারকণা কোঙার, বালক ঘোষ, রেবা লাহিড়ী, গীতা হাজরা, সত্যবালা কোঙার, কাশীরানী মণ্ডল, রাধারানী চৌধুরী, নির্বাণকুমারী চৌধুরী, আসানসোল মহকুমার ইন্দুমতী চট্টোপাধ্যায় (মাসীমা), কাটোয়া মহকুমার আশালতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ষোড়শী দাস, কালনা মহকুমার নিবেদিতা নাগ, প্রীতিলতা গোস্বামী, আশালতা দেবী, কালোশশী পাল (বাঘনাপাড়ার মা) প্রমুখ। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সমিতির মুখপত্র 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হতে থাকে এবং এক সময়ে বর্ধমান জেলায় এককভাবে এই পত্রিকা সবচেয়ে বেশি প্রচার করতেন আসানসোলের রাণু মৈত্র। পাঁচ ও ছয়ের দশকে মহিলা সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচীর ছবি তুলতেন মলয় ঘোষ, সর্ববিজয় হাজরা, আশুতোষ মিশ্র। ১৯৭০ সালে দুষ্কৃতীরা মলয় ঘোষের স্টুডিও নষ্ট করে দেয় এবং তিনি বর্ধমান জেলার বাইরে চলে যেতে বাধ্য হন।

১৯৪৮-৫১ সালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির স্বাভাবিক কাজকর্মে যখন নিষেধাজ্ঞা ছিল, তখন যাঁরা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিভা কোঙার, বীণা সেনচৌধুরী, গোবিন্দবালা মুখোপাধ্যায়, দুর্গা গোস্বামী (২ শিশু সন্তানসহ) প্রমুখ। এঁরা রাজবন্দীদের মর্যাদার দাবিতে বর্ধমান জেলে কম-বেশি এক পক্ষ কাল অনশন ধর্মঘট করেন। সমসাময়িক সময়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে যাঁরা বিনা বিচারে আটক ছিলেন, তাঁদের অন্যতমা সুলেখা সান্যাল। বর্ধমান সদর থানার বড়শুলের এই শিক্ষিকা জেলার নারী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও এক সময়ে সমিতির মুখপত্র 'ঘরে বাইরে'র সম্পাদিকামণ্ডলীর সদস্যা ছিলেন এবং তাঁর লেখনী দ্বারা পুষ্ট করেছেন নারী আন্দোলনকে। ৩৪ বছরের স্বল্প পরিসর জীবনে প্রতিবাদী লেখিকা সুলেখা সান্যাল তাঁর গল্পে-উপন্যাসে নারী সমাজকে তুলে ধরেছেন। ১৯৪৯ সালে মহিলা সমিতির স্বাভাবিক কাজকর্ম যখন ব্যাহত, তখন কলকাতায় এক মহিলা সমাবেশে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার হন রাবিয়া বেগম ও মকসুদা খাতুন এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁরা ৮ দিন আটক থাকেন।

মণিকুন্তলা সেন, কনক মুখোপাধ্যায়, রেণু চক্রবর্তী, গীতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ বর্ধমান জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তুলতে বিভিন্নভাবে সাহায্য

করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ (পূর্বের বঙ্গীয়) মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির রাজ্য কার্যকরী কমিটিতে বর্ধমান জেলা থেকে প্রথম সদস্যা হন মকসুদা বেগম ১৯৫৪ সালে সমিতির সপ্তম রাজ্য সম্মেলনে। বিভা কোঙার রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্যা হন ১৯৫৬ সালে অষ্টম রাজ্য সম্মেলনে। ১৯৫৯ সালে সংগঠনের নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি এবং ১৯৬৫ সালে একাদশ সম্মেলনে রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্যা হন রেণু ঘোষ, ১৯৬৭ সালে দ্বাদশ সম্মেলনে বিভা কোঙার এবং ১৯৭০ সালে ত্রয়োদশ সম্মেলনে প্রভা চট্টোপাধ্যায় ও অর্চনা গুহ।

চার-পাঁচের দশকে বর্ধমান জেলার মহিলা নেত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যা ছিলেন। ১৯৪৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩। তাঁরা হলেন বিভা কোঙার, রাবিয়া বেগম, শামশুন্নেসা। ১৯৫৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬। এই ৬ জন হলেন বীণা সেন চৌধুরী, রেণু ঘোষ, বিভা কোঙার (১৯৪৩ সালে সভ্যা হন), অঞ্জলি বসু, রাবিয়া বেগম, নলিনী বক্সি। ১৯৫৫ সালে পার্টিসভ্যা ছিলেন ১ জন- ইন্দুমতী চট্টোপাধ্যায়।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠকরা মহিলাদের ছোট-বড় বিভিন্ন সমস্যার প্রতি কীরকম নজর দিতেন তা বোঝা যায় ১৯৫৪ সালে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সংগঠনের তৃতীয় জেলা সম্মেলনে প্রতিনিধিদের আলোচনা থেকে। বর্ধমানের 'সাপ্তাহিক নূতন পত্রিকা'-র রিপোর্টে লেখা হয়েছে, ''আলোচনার সময় পল্লী অঞ্চলের এমনকি শহরের নীলপুর অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ প্রসূতি ব্যবস্থার অভাবে কিরূপ ব্যাপকভাবে মহিলা ও শিশু প্রাণ হারাইতেছেন তাহার মর্মান্তিক বিবরণ দেন। বনপাসের প্রতিনিধিগণ স্থানীয় কুটীর শিল্পের বিধ্বস্ত অবস্থার বর্ণনা করিয়া ও কিভাবে উক্ত কার্যে নিযুক্ত মহিলাদের রুজিরোজগার ভীষণভাবে আঘাত পাইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত দেন। সকল অঞ্চল হইতেই কৃষক মহিলারা ধান ভাচার কাজের অভাবে কিরূপ খাদ্যাভাব ও সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহা বর্ণনা করেন। ... কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ কিভাবে গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় মহকুমা আদালতে তিন দিন বসিয়া থাকিয়া খয়রাতি সাহায্য আদায় করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দেন।'' (১১ মার্চ ১৯৫৪)

আত্মরক্ষা থেকে গণতান্ত্রিক

১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক (বা নিখিল বঙ্গ) মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি ও ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতিতে পরিণত হয়। বর্ধমান জেলায় তখন শুরু হয়ে গেছে সন্ত্রাস, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মধ্যে জেলার গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতিকে কাজ করতে হয়। খণ্ডঘোষ থানার আহ্লাদিপুরের মতো একটির পর একটি গ্রাম আক্রান্ত হয়। মেমারি থানার চকবলরামপুরে ১৯৭১ সালের ৩ নভেম্বর একই দিনে ৫ জন খেতমজুরকে হত্যার মতো নির্বিচারে হত্যার ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯৭২ সালের ১৩ এপ্রিল কাটোয়া থানার সুদপুরে নিহত হন পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমান জেলায় সংগঠিত নারী আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

এই পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণে রেখে ১৯৭৩ সালের ১০-১১ মার্চ কাটোয়া থানার বরমপুরে পূর্ণিমা পল্লীতে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বর্ধমান জেলা অষ্টম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের স্থান নির্ধারিত ছিল মঙ্গলকোট থানার বাজার গ্রাম। কিন্তু ১০ মার্চ ১৪৪ ধারা জারি হওয়ায় প্রতিনিধিদের ৩ কিলোমিটার হেঁটে বাজার থেকে বরমপুর গ্রাম যেতে হয় এবং চা-মুড়ি খেয়ে রাত সাড়ে সাতটায় ৬৩টি প্রাথমিক কমিটির ১০,০০০ সভ্যার দ্বারা নির্বাচিত ক্লান্ত কিন্তু দৃঢ় প্রতিনিধিদের সম্মেলন শুরু করতে হয়।

আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মাঝখানে ১৯৭৩ সালের ১২-১৫ নভেম্বর কংগ্রেস সরকারের খাদ্যনীতি ও দমনপীড়ন নীতির বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলির রাজ্যব্যাপী গণ-অবস্থান ও আইন অমান্য আন্দোলনে বর্ধমান জেলার অন্তত ৪৬২ জন মহিলা অংশগ্রহণ করে আইন অমান্য করেন। ১৯৭৪ সালের ১১-১২ মার্চ কলকাতায় খাদ্যের দাবিতে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আহ্বানে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী অবস্থানে বর্ধমান জেলা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মহিলারা অংশগ্রহণ করেন যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন খেতমজুর, বর্গাদার, গরিব কৃষক পরিবারের মহিলা ও কয়লাখনি অঞ্চলের নারী শ্রমিক। একই বছরের ৮-২৮ মে দেশব্যাপী রেলকর্মীদের ধর্মঘটে অণ্ডাল, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান, আসানসোলের রেল কলোনিগুলিতে মহিলা সমিতি ধর্মঘটীদের সাহায্যে বিশেষভাবে এগিয়ে আসে।

সন্ত্রাসে বারে বারে আক্রান্ত হয়েছেন বর্ধমান জেলার মহিলা নেত্রী ও কর্মীরা এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মহিলা সমাজ। ১৯৭০-৭৩ সালে আক্রান্ত হয়েছেন ঝর্ণা দাশগুপ্ত (দুর্গাপুর), অর্চনা গুহ, রাজলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় (বর্ধমান), অনিমা চক্রবর্তী (আসানসোল) প্রমুখ জেলা নেত্রীরা। ১৯৭২ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন সালানপুর থানার এথোড়া গ্রামের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সক্রিয় কর্মী ভারতী তরফদার (রায়)। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর ভারতী তরফদার মুক্তি পান এবং ২ জুলাই কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানের মহিলা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

ছয় ও সাতের দশকে বর্ধমান জেলায় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি পরিচালনায় বিভা কোঙার, রেনু ঘোষ, আশালতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্চনা গুহ, রাণূ চট্টোপাধ্যায়, রেবা লাহিড়ী, গীতা হাজরা প্রমুখ ছাড়াও প্রভা চট্টোপাধ্যায় (জেলার বাইরে থাকায় অন্যত্র নেত্রী হিসাবে আগেই প্রতিষ্ঠিতা), অনিমা চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়, উমা গঙ্গোপাধ্যায়, লীলাবতী দেবী, মহারানী কোঙার, চিনু নাহা, ত্রিপুরা গোস্বামী, নীলিমা রায়, নমিতা বাগচি, ঝর্ণা দাশগুপ্ত, সাধনা সিংহ (পরে মল্লিক), নূরনাহার বেগম, অঞ্জু কর, উপাসনা সিংহ রায়, শিবানী সিংহ রায়, মীরা ঘোষ প্রমুখ নেত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বিশ শতকের শেষ দুই দশকে বর্ধমান জেলায় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে। ১৯৮১-৮২ সালে জেলায় সমিতির সভ্যা ছিল ৫১,৪০৩ জন আর ১৯৯৯ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,৩৪,৭১৪। বিশ শতকের শেষে জেলায় সমিতি কাজ করে ১৬টি জোনাল কমিটি, ৮১টি আঞ্চলিক কমিটি ও ৬৮৩টি প্রাথমিক কমিটির

মাধ্যমে। ২০০০ সালের ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি কাটোয়ায় অনুষ্ঠিত জেলা সম্মেলনে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বর্ধমান জেলা কমিটির নির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন সভানেত্রী—মহারানী কোঙার; সহ সভানেত্রী— লতা গোস্বামী, অর্চনা ভট্টাচার্য, ঝর্ণা দাশগুপ্ত, অঞ্জু কর; সম্পাদিকা —সাধনা মল্লিক; সহ সম্পাদিকা—ভারতী ঘোষাল, নূরনাহার বেগম, সুমিতা মুখোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষা—গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়। সমিতির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ১৯৮৬ সাল থেকে সাধনা মল্লিক, ১৯৯৬ সাল থেকে অঞ্জু কর। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যা হন মহারানী কোঙার ১৯৮২, ১৯৮৭ ও ১৯৯১ সালে, অঞ্জু কর ১৯৮২, ১৯৮৭, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে, সাধনা মল্লিক ১৯৯৬ সালে। অঞ্জু কর আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন ১৯৯১ সাল থেকে। বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্যা হন মহারানী কোঙার ১৯৭৮ সালে এবং তিনিই বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রথম মহিলা সদস্য। এঁরা সকলেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র প্রতিনিধি। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রথম মহিলা সদস্যা বর্ধমান জেলা থেকে নির্বাচিতা হন ১৯৫৭ সালে আভালতা কুণ্ডু, পৌরসভায় প্রথম মহিলা সদস্য নির্বাচিতা হন ১৯৪৮ সালে কালনায় সুচরিতা পাল। উভয়েই ছিলেন কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি।

এই শেষ দুই দশকে যে-কোনও গণআন্দোলনেই মহিলাদের অংশগ্রহণ নজরে পড়ে। যেমন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কিংবা বি জে পি জোট সরকারের অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতির ফলে শিল্প, কৃষি ও আর্থিক সংস্থায় যে আক্রমণ নেমে আসে, তার প্রতিবাদে ১৯৯৪ ও ১৯৯৯ সালে বর্ধমান জেলায় এবং জেলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত যে সমস্ত জাঠা পরিচালিত হয়, সেই সব জাঠায় মূল পদযাত্রীরা ছাড়াও ব্যাপক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বে অনেক মহিলা এইসব মানুষের মধ্যে ছিলেন। ১৯৯৪ সালের ১৯-২৪ মার্চ শিল্পাঞ্চলে পদযাত্রীদের সঙ্গে জাঠা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ৪০,৩৫০ জন মানুষ যার মধ্যে মহিলা ৭,৩৫০ জন। ১৯৯৯ সালের ৯-১৫ ফেব্রুয়ারি দেবীপুর থেকে আসানসোল পর্যন্ত জাঠায় ১৬৯ পদযাত্রীর মধ্যে মহিলা ছিলেন ৫ জন, ১৯৯৯ সালের ২১-২৫ মার্চ দেবীপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত ১৫৩ জন পদযাত্রীর মধ্যে মহিলা ছিলেন ১৩ জন।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি থেকে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি--বর্ধমান জেলায় মহিলা সংগঠন ক্রমপ্রসারমান। সাংগঠনিক প্রসারে জেলা সম্মেলনগুলি হচ্ছেঃ প্রথম -১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ ও মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বর্ধমানে, দ্বিতীয় -- ১৯৪৪ সালে ১৫ মার্চ ও ১৫ এপ্রিলের মধ্যে, তৃতীয়-১৯৫৪ সালের ৬-৭ মার্চ বর্ধমানে, চতুর্থ..., পঞ্চম ..., ষষ্ঠ -- ১৯৬৮ সালের ২১ জানুয়ারি বর্ধমান সদর থানার হাটগোবিন্দপুরে, সপ্তম - ১৯৭০ সালের ২৭-২৮ জানুয়ারি বর্ধমানে, অষ্টম-১৯৭৩ সালের ১০-১১ মার্চ কাটোয়া থানার বরমপুরে (পূর্ণিমা পল্লী), নবম-১৯৭৫ সালের ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি কাটোয়ায়, দশম-১৯৭৯ সালের ১২-১৩ মে বর্ধমানে, একাদশ-১৯৮৩ সালের ১-২ জানুয়ারি আসানসোলে, দ্বাদশ-১৯৮৬ সালের ২৩-২৫ মে কালনায়, ত্রয়োদশ-১৯৮৯ সালের ১-৩ সেপ্টেম্বর

রানীগঞ্জে, চতুর্দশ - ১৯৯২ সালের ৪-৬ ডিসেম্বর গুসকরায়, পঞ্চদশ - ১৯৯৬ সালের ২৬-২৮ জানুয়ারি মানকরে (আশালতা ব্যানার্জী নগর) ষোড়শ -- ২০০০ সালের ১১-১৩ ফেব্রুয়ারী কাটোয়ায় (ছায়া বেরা ও প্রণতি ভট্টাচার্য নগর)।

অসম্পূর্ণ ইতিহাস

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির দ্বাবিংশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২০০০ সালের ১২-১৫ আগস্ট বর্ধমান শহরে (ছায়া বেরা নগর)। বর্ধমান জেলায় সংগঠন প্রসারিত ও সংহত হয়েছে বলেই এই জেলায় এই প্রথম সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই কেমনভাবে জেলায় সংগঠন বিস্তার লাভ করল, তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সন্দেহ নেই, এ ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। তবে এইরকম বিভিন্ন অসম্পূর্ণ ইতিহাস থেকেই তো সম্পূর্ণ ইতিহাস তৈরি হয়। সুখী সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্নে সমাজ পরিবর্তনের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন, সম্পূর্ণ ইতিহাস তাঁরাই রচনা করবেন। নারী আন্দোলন ধাবিত হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের দিকে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী কনক মুখোপাধ্যায় এই প্রত্যয়ই ব্যক্ত করেছেন সমিতির একবিংশ রাজ্য সম্মেলনে ১৯৯৬ সালে। তাঁর ভাষায়, "দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে জনগণের প্রতিটি সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি তার যোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। আগামীদিনেও সমাজ পরিবর্তনের, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৃহত্তর গণসংগ্রামে এই সমিতি তার ঐতিহাসিক ভূমিকা নিশ্চয়ই পালন করবে।" (সভানেত্রীর অভিভাষণ)

□ 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি' দ্বাবিংশ রাজ্য সম্মেলন, আগস্ট, ২০০০ স্মরণিকা □

বর্ধমান জেলায়
নারী তথা গণতান্ত্রিক
আন্দোলনের
অন্যতম স্থপতি
বিনয় চৌধুরী
(১৯১১-২০০০)

বর্ধমানে সমবায় আন্দোলনের ধারা

অরুণোদয় সরকার

বিগত অর্ধশতাব্দীর নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমবায় আন্দোলন আজ যে স্তরে এসে পৌঁছেছে, সেটাকে বৃহত্তর অগ্রগতির পথে এক বিরাট পদক্ষেপ হিসেবে মেনে নিতে আজ আর কারও দ্বিধা নেই। আনন্দের কথা এই যে, সেই অগ্রগতির মিছিলে বাংলাদেশের পতাকা যাঁরা উচ্চে তুলে ধরেছেন, আমাদের এই বর্ধমান জেলার সমবায়ী বন্ধুরা তাদের পুরোভাগে। একথা আজ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে সমবায় আন্দোলনের সর্বভারতীয় অগ্রগতির সঙ্গে সমতালে এগিয়ে গেছে এই জেলার সমবায়মূলক কর্মকাণ্ড। কৃষিপ্রধান এই জেলার কৃষি ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে সমবায় আন্দোলন আজ এগিয়ে এসেছে মেহনতী মানুষের অতি কাছে, জাগিয়ে দিয়েছে তার বহুযুগের নিরাশা-নিপীড়ত বুকের মধ্যে ভাগ্য পরিবর্তনের অদম্য বাসনা। সমবায় আন্দোলনের সর্বরকম কর্মধারায় তাই আজ এই জেলার মানুষের এত উৎসাহ।

যে বর্ধমান জেলার জনসমষ্টির শতকরা ৭৮ ভাগই কৃষিজীবী, তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির একমাত্র পথ কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন। অবশ্য, সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতেও সমবায় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য তাই-ই। ভারতের অন্যান্য অংশের মতই, এই বর্ধমান জেলার কৃষিব্যবস্থাও বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ঋণভার কবলিত কৃষকের সম্মুখে বিস্তীর্ণ রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষযোগ্য জমি যাতে সার দেওয়া হয় না কতকাল; ভাল বীজের কল্পনাও করতে পারে না চাষী; সামান্য উৎপন্ন ফসলের বেশির ভাগই মহাজনের ঋণ শোধের জন্য কম দামেই বিক্রয় করতে বাধ্য হয় সে, ফলে তার সারা বছরের খাবার ধানও থাকে না ঘরে। চড়াসুদে গ্রাম্য মহাজনের কাছ থেকে সে ঋণ নিতে বাধ্য হয়, বংশ পরম্পরায় সেই ঋণের বোঝা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েই আজ সুজলা-সুফলা বর্ধমান জেলার চাষীকেও হতশ্রী, হতোদ্যম হয়ে থাকতে হচ্ছে। এ সত্যিই পরিতাপের কথা!

তাই এই জেলায় সমবায় আন্দোলন আজ এগিয়ে এসেছে কৃষিব্যবস্থার সর্বাত্মক উন্নতি সাধনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিঋণের ব্যবস্থা, ভাল বীজ, সার প্রভৃতির ব্যবস্থা, কৃষিজ পণ্যের বিপণনের ব্যবস্থা, কৃষকের উৎপাদিত কাঁচামাল হতে বিক্রয়যোগ্য পণ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা, গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা কৃষির উপরে চাপ কমানোর ব্যবস্থা--ইত্যাদি বহুমুখী আক্রমণ ব্যূহ রচনা করেছে আজ সমবায় আন্দোলন -- জেলার দারিদ্র্য দূর করতে।

প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি এই জেলায় বরাবরই ভাল কাজ করে এসেছে। সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে তারা মিটিয়ে এসেছে তাদের সভ্যদের ঋণের চাহিদা। এই জেলার শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমবায়ের মাধ্যমে চাষীদের প্রভূত কল্যাণসাধন করতে সক্ষম হয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম সার্থক সমবায় সমিতি হিসেবে সুপরিচিত হয়েছে।

স্বাধীনোত্তর যুগের প্রথম পাদে জাতীয় সরকারের সমবায় সম্পর্কিত নীতি যখন চিরাচরিত গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি বা "one village one society ''-র পরিবর্তে বৃহদায়তন কৃষি ঋণদান সমিতি গঠনের নীতিতে পর্যবসিত হল--সেদিন সেই নবতর ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই অতি অল্পকালের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল এই জেলায় ৯২টি ইউনিয়নভিত্তিক কৃষি ঋণদান সমিতি। নিজেদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় এবং সরকারের অকৃপণ আর্থিক সহায়তায় আজ এই সমিতিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সমিতিগুলির মাধ্যমে আজ লক্ষ লক্ষ টাকা সভ্যদের মধ্যে কৃষিঋণ হিসেবে দাদন করা হচ্ছে। কৃষিঋণের সহিত বিপণনের ব্যবস্থার নতুন পরিকল্পনায় এই সমিতিগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক সমিতি বিপণন কার্যও আরম্ভ করেছে। এইভাবে চাষীর আর্থিক উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে রক্তশোষণকারী মহাজনের কবল থেকে আজ জেলার চাষীরা রক্ষা পেয়েছেন।

বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে যখন বৃহদায়তন কৃষিঋণদান সমিতিগুলির কার্যক্রমে নানারকম অসুবিধা দেখা দিল--তখন সরকারী নীতির আবার পরিবর্তন হোল--অর্থাৎ আর্থিক সংহতির দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামভিত্তিক সেবা সমবায় বা service co-operative গঠন করাই স্থির হল। নবপ্রতিষ্ঠিত পঞ্চায়তীরাজের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতির পূর্ণ বিকাশের সর্বময় দায়িত্ব অর্পিত হল এই সেবা সমবায়ের উপর। এই যুগান্তকারী কার্যপদ্ধতি এই জেলায়ও পূর্ণ উদ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। এই জেলায় আজ প্রায় ৩০০টি সেবা সমবায় গঠিত হয়েছে। প্রায় ৪০০টি গ্রামের প্রায় ৬৫০০ চাষী আজ এই সমিতিগুলির মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ঋণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। নিজেদের ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টায় এবং সরকারী সাহায্যে চাষীরা আজ অগ্রগতির নতুন পথে এগিয়ে চলেছেন। এই সমিতিগুলির অংশগত মূলধন প্রায় ৮০,০০০ টাকা। অদূর ভবিষ্যতে যাতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত গ্রামের কৃষিজ উৎপাদনের বিশদ পরিকল্পনা (Production programme) রূপায়ণের সব ব্যবস্থা, যথা, প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কৃষিজ যন্ত্রপাতি আর স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ সরবরাহ আর উৎপন্ন শস্যের লাভজনক বিপণনের ব্যবস্থা ইত্যাদি এই সমিতিগুলির মাধ্যমেই হতে পারে--তারই এই প্রথম পদক্ষেপ। প্রাথমিক ঋণদান সমিতি, বৃহদাকার ঋণদান সমিতি এবং সেবাসমবায় সমিতি --- এই তিন ধরনের সমিতি আজ এই জেলার কৃষি ঋণের চাহিদা সন্তোষজনকভাবে মেটাচ্ছে। এদের মোট সভ্যসংখ্যা, কার্যকরী মূলধন এবং ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ঋণদানের পরিমাণ আজ পশ্চিমবাংলার মধ্যে অতি উচ্চে।

কৃষিঋণ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলার সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির পুনর্বিন্যাসের আশু ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড সদর এবং আসানসোল মহকুমার প্রয়োজন মিটাচ্ছে। আসানসোল পিপলস্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (Urban Bank) হিসেবে কাজ করছে আসানসোল শহরে। কালনা এবং কাটোয়া মহকুমার দাবী মিটাচ্ছে, আর দুটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এই দুইটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংমিশ্রণে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠনের পরিকল্পনা অদূর ভবিষ্যতে রূপায়ণের পথে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির

মধ্যে ১৯১৭ সালে স্থাপিত বর্ধমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সারা পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠানের গৌরব লাভ করেছে। বিগত মরশুমে এই ব্যাঙ্ক প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবে দাদন করেছে। কৃষির স্থায়ী উন্নতি সাধনের জন্যে মধ্যমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থাও এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে করা হবে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের অভাব পূরণে বর্ধমান কো-অপারেটিভ ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড সারা পশ্চিমবাংলার এই ধরনের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী।

সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ এই জেলায় বহুদিন হতেই প্রচলিত আছে। কয়েকটি সমবায় কৃষি সমিতির কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু কৃষিজ আয়করের প্রচণ্ড চাপ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে আজ তাদের ক্ষয়িষ্ণু দশা। নাগপুরে গৃহীত ভারতে ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে যুগান্তকারী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে--আজ নূতন করে ভাববার সময় এসেছে দেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে সমবায় যৌথখামারগুলির ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে।

এই জেলার উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সহায়তার জন্যে সমবায়ের মাধ্যমে ঋণ ছাড়াও সরকার প্রদত্ত রাসায়নিক সার আর নিজেদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত মিশ্রসার প্রাথমিক সমিতি মারফৎ ও সরাসরি কৃষকগণকে সময়মত ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্ধমানের অন্যতম প্রধান ফসল আলু সংরক্ষণের অভাবে উৎপাদনকারীদের যে প্রভূত ক্ষতি হত--তারই নিরসনকল্পে বর্ধমানের মেমারিতে সমবায়ভিত্তিক হিমাগার স্থাপিত হয়েছে। সারা ভারতে সমবায় ভিত্তিতে হিমাগার প্রতিষ্ঠা এই জেলায়ই প্রথম। আজ অবশ্য বর্ধমানে আরও কয়েকটি হিমাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে আলু উৎপাদনকারীদের সমস্যা বিদূরিত হয়েছে।

নিখিল ভারত কৃষিঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ ছিল--উৎপাদন-এর সঙ্গে বিপণনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে তবেই চাষীর প্রত্যক্ষ উপকার হবে। বলা বাহুল্য--সমবায়ের মাধ্যমেই এ কাজ সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ জেলার প্রতি থানায় বৃহদায়তন কৃষিজ বিপণন সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে ও হচ্ছে। সভ্যদের ঐকান্তিকতায় এবং সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্যে পুষ্ট এই সমিতিগুলি চাষীর প্রভূত উপকার সাধন করছে। প্রায় ৬০০০ সভ্য ও ৩০০ সমিতি আজ এই বিপণন সমিতিগুলির মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। এই ব্যবস্থার আশু সম্প্রসারণের জন্যে জনসাধারণের ও সরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়ে দ্রুত কাজ এগিয়ে চলেছে। নিজেদের গুদামে সভ্যগণের উৎপন্ন ফসল জমা রেখে তৎকালীন বাজার দর হিসাবে শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা দিয়ে তার সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে; শস্যের দাম বাড়লে চাষী তার পছন্দমত দরে বিপণন সমিতির মাধ্যমে তার ফসল বিক্রয় করছে। এই জেলায় ফসলের ন্যায্যমূল্য সংগ্রহের উপরোক্ত ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু না হলেও প্রাথমিক ব্যবস্থাদি যেমন, ঋণদান সমিতির সঙ্গে সংযোগ (integration), গুদাম তৈরী ও তার ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা, মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা--ইত্যাদি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়াও বর্ধমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও এই সমিতিগুলিকে 'ব্যাঙ্কক্রেডিট' হিসাবে মূলধন সরবরাহ করছেন।

কোনও অবনতি কখনও ঘটেনি। বেসরকারি উদ্যমে আজ জেলার প্রান্তে প্রান্তে সমবায় ইউনিয়ন শিক্ষাশিবির উদ্বোধন করেছেন, সমবায়ের আদর্শ গ্রামের মানুষের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করেছেন ও করছেন। এই প্রীতিপূর্ণ ঐতিহ্যের স্থিতিস্থাপকতার জন্য জেলাব্যাপী অনাবিল সমবায়ের আদর্শ বিস্তারে ইউনিয়নের উদ্যম প্রশংসনীয়।...বর্ধমান জেলা সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত মহৎ প্রচেষ্টা এই আঞ্চলিক সমবায় আলোচনাচক্রের মাধ্যমে সেই প্রীতির সম্পর্কেরই পুনরনুধ্যান হবে এবং আশা করব, নতুনতর, সবলতর প্রীতির বন্ধনে জনসাধারণ ও সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন এই জেলার প্রতিটি মানুষের জীবনদর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে জড়িত হতে সক্ষম হবে।

□ 'বর্ধমান জেলা সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড স্মরণিকা', ১৯৬১ □

আসানসোল পৌর প্রতিষ্ঠানের অতীত ইতিহাস
(১৮৯৬-১৯২৮)
রামশংকর চৌধুরী

আসানসোল নামের ব্যুৎপত্তি

এমন একদিন ছিল, যেদিন বরফে ঢাকা থাকত আসানসোল। ছিল ঘন অরণ্যের নীরন্ধ্র অন্ধকার আর অন্ধকার রাজ্যে নিরুদ্বেগে বাস করত অরণ্যচারী জীব--আর তাদের সাথেই সহবাস করত যাযাবর মানুষ দামোদরের তটে।

সেই যুগের সমাপ্তি ঘটেছে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে। তারপর যাঁরা প্রথম এই ঘাটিতে পা রাখেন, তাঁরা সভ্য মানুষের পূর্ব পুরুষ — অস্ট্রেলিয়ত্ জাতি গোষ্ঠীর মানুষ। বলতে গেলে বাংলা দেশের মানুষেরই পূর্ব পুরুষ এঁরাই।

এরপর শতাব্দীর পর শতাব্দী হয়েছে অতিবাহিত, ঘন জঙ্গলের পায়ে চলা সরু রাস্তা গড়ে তুলেছেন তীর্থ যাত্রীরা, যে রাস্তা কালক্রমে শেরশাহের নামাঙ্কিত হয়ে হল পরিচিত। আরও পরে নাম হল গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। আজ আমরা ভুলে গেছি অতীত দিনের সেই দুঃসাহসী নির্ভীক তীর্থগামী মানুষদের। যাঁরা ছিলেন অতীত সংস্কৃতির প্রাণবন্ত প্রচারক বাহক। আরও বহুকাল পরে গড়ে উঠল লোকালয়। সে লোকালয়ের নাম আসানসোল। অবশ্য লোকালয় গড়ে উঠবার পূর্বেই কাগজে কলমে এই নাম ছিল--তখন, যখন 'যার লাঠি তার মাটি'র কাল। এই মাটি কত হাত ফেরতা হয়ে যে পঞ্চকূটের জমিদারের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়--তা গবেষণার বিষয়।

কিন্তু আসানসোল এই নামের ব্যুৎপত্তি কি? উত্তরটি এক কথাতেই দেওয়া যায়--তবু একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

আসানসোল একটি সমাস-বদ্ধ শব্দ। 'আসন' ও 'সোল' এই দুটি শব্দকে নিয়ে হয়েছে আসানসোল তবে আসনেরই বা মানে কি আর সোলেরই বা কি অর্থ?

আসন মানে আসন গাছ। এ গাছ মূল্যবান। প্রায় সবাই এটি স্বীকার করেন। 'সোল' শব্দের মানে যার যা অভিরুচি তাই করে থাকেন। কেউ বলে 'সোলও এক শ্রেণীর গাছ'। বন যখন ছিল তখন গাছ ছাড়া আর কি হবে! একে অতি সরলীকরণই বলে। কেউ আবার 'সোলের' দন্ত- স কে তালব্য শ করে দন্ত- স এর স্থানে তালব্য শ বসিয়ে শোল করে একটি ব্যাখ্যা দেন আসন গাছ আর শাল গাছ। হাস্যকর যুক্তি। এঁদের মগজেও সেই একই ধারণা- বন যখন ছিল তখন নিশ্চয়ই শাল গাছ থাকবে। শাল হয়ত ছিল, কিন্তু আসানসোলে ছিল না এঁরা আবার আসনসোলের নামটাও পালটে দিয়ে বাংলায় বলেন আসানসোল। ইংরাজরা এসে অনেক নামেরই বিকৃতি ঘটিয়েছে--কলিকাতা হয়ে গেছে ক্যালকাটা, সুতানটি হয়ে গেছে চুটানুটি' (Chuttanutte) আসনসোল মানে যদি হয় 'আসন আর শাল' তবে মুর্গাসোল, খয়রাসোল, পায়রাসোল, সিয়াড়সোল --এদের অর্থ কি হয়? এই অঞ্চলের লোকে উর্বর জমিকে সোল বলে। শব্দটা হয়ত বাংলা নাও হতে পারে। সোল জমির উপর আসন গাছ

থাকার জন্যই আসনসোল। এমনি মুর্গাসোল, খয়রাসোল। সোলের মতই আরও একটি শব্দ আছে 'তড়া'। তড়া অর্থেও জমি। যেমন শালতড়া, বালিতড়া, বেলেতড়া ইত্যাদি। সোল জমির উপর আসন গাছের অবস্থিতির জন্যই আসনসোল।

আসানসোল গ্রামের প্রাচীনতা

আসানসোল গ্রাম কত প্রাচীন তা প্রমাণ করার মত দলিল এখন আর এখানে পাওয়া যায় না। এক সময় ছিল একটি তাম্রপত্র। এই মূল্যবান দলিলটির কি হয়েছে কেউ বলতে পারেন না।

আসানসোল গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো দুটি নাম, একটি রামকৃষ্ণ অন্যটি নকড়ি।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে আসানসোল মৌজা ছিল পঞ্চকূট (পঞ্চকোট নয়) জমিদারের। এই জমিদারের অধীনে কাজ করতেন বর্ধমানের এরুয়ার গ্রামের রামকৃষ্ণ যশ ও বর্ধমানের তরসআড়া গ্রামের নকড়ি দাঁ। পরে রায় হন। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর জমিদার আসানসোল মৌজার ১০ হাজার বিঘা জমি খাজনায় বিলি করেন। এই গ্রামে বসতি গড়বার আগে এঁরা সাময়িক ভাবে সাঁতা গ্রামে বাস করেন।

পঞ্চকূটে এক সময় জৈনদের প্রভাব ছিল। এখনও 'সরাক' নামে জৈন ধর্মালম্বী এক জাতি সেখানে বাস করেন। জমিদার গরুড় নারায়ণ সিংহ দেও পঞ্চকূটের বাস তুলে দিয়ে কাশীপুরে (পুরুলিয়া) এসে মহল গড়েন। গরুড় নারায়ণ নীলমণি সিংহ দেও-এর পিতা। নীলমণি সিংহ দেও ঊনবিংশ শতকের মানুষ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পুরুলিয়ার ট্রেজারি লুঠ করার অপরাধে সাজা হয়। গরুড় নারায়ণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। গরুড় নারায়ণের পুর্বে কোনো জমিদার এই মৌজা দিয়ে থাকবেন মনে হয়। এ কেন মনে হয়? বর্তমানে রামকৃষ্ণ রায়ের দশম পুরুষ চলছে। এক পুরুষের পরমায়ু যদি চল্লিশ ধরা হয় তবে প্রাচীনতা হয় চারশ বছরের। তিরিশ ধরলে হয় ৩০০।

আসানসোল শহর

আসানসোল শহর গড়ে উঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে। শহর গড়ে উঠবার পিছনে একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে। আগেকার দিনে নগর গড়ে উঠত রাজাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু শিল্পায়নের যুগে শহর নগর নগরী গড়ে উঠে শিল্পকে কেন্দ্র করে। এ অঞ্চলের দুটি প্রাচীন শিল্প। একটি রেল অন্যটি কয়লা।

এখানে রেল কবে এসেছে দেখা যাক।

শ্রদ্ধেয় রাধারমণ মিত্রের কলিকাতা দর্পণ থেকেই তথ্যটি তুলে দেওয়াই সমীচীন।

হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত প্রথম রেল চলে ১৫.৮.১৮৫৪ তারিখে। পাণ্ডুয়া পর্যন্ত চলে ১.৯.১৮৫৪ তারিখে, পাণ্ডুয়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত চলে ৩.২.১৮৫৫ তারিখে (পৃ. ২০৯)।

রাণীগঞ্জ — আসানসোল অংশ খোলা হয় ১৮৬৩ সনে এবং আসানসোল সীতারামপুর অংশ দু বছর পরে ১৮৬৫ সনে। সীতারামপুর থেকে বরাকর পর্যন্ত অংশ খোলা হয় ১৮৬৫ সনে। আর বরাকর থেকে ধানবাদ অংশ ১৮৯৪ সনে। (পৃ. ২১০) এই গেল

ই. আই. আর.। এবার বি. এন. আর. বলি "পুরুলিয়া থেকে দামোদর নদ ১৪.২.১৮৮৯ দামোদর নদ থেকে আসানসোল ১২.৬.১৮৮৯"।

এবার কয়লা-শিল্প কখন প্রথম গড়ে উঠল দেখা যাক যতদূর জানা যায় কার-টেগার কোং-ই রাণীগঞ্জ থেকে প্রথমে দামোদর নদী পথে কলকাতায় কয়লা নিয়ে যেতেন। তখনকার দামোদরের এমন দারিদ্র্য ছিল না। এই কয়লা-শিল্প রাণীগঞ্জে গড়ে উঠে তখন নিশ্চয়ই মালবাহী ট্রেন চলে নি। রাধারমণ মিত্র অন্তত কোনো তথ্য দেন নি। যাত্রাবাহী ট্রেনই ছিল। তিনটি ক্লাস ছিল -- ১ম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী।

মালগাড়ি যদি না চলে তবে কয়লা যাবে কি করে? একমাত্র পথ ছিল নদী পথ। এ ছাড়া ১৮৮৫-র আগে বা ১৮৮৫ অব্যবহিত পরেও আসানসোল হতে মালবাহী গাড়ি তেমন চলেনি।

আসানসোল পর্যন্ত ট্রেন ১৮৬৩ সালে চললেও, তখন জংশন গড়ে ওঠেনি। এখন যেটি পুরোনো স্টেশন কলোনী সেখানেই ছিল একটি স্টেশন। ১৮৬৩-তে রেলের কারখানা বা লোকো শেডও গড়ে উঠেনি। কারখানা ছিল রাণীগঞ্জে কাজেই ১৮৮৫ পর্যন্ত শহর গড়ে উঠার যুক্তিসঙ্গতকারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে রাণীগঞ্জকে কেন্দ্র করে আসানসোলের বসতি বাড়তে পারে এমনও হতে পারে, রাণীগঞ্জই ছিল মূল শহর এবং ব্যবসা কেন্দ্র। সেই শহরে ব্যবসা করার ঠাঁই না পেয়ে এখানে থেকে ব্যবসা করেন। রেল আসার আগে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডই ছিল পূর্ব পশ্চিম স্থলপথে যোগাযোগ রক্ষার উপায়। এই রাস্তা দিয়ে সৈন্য ত যেতই, ডাকও যেত। পালকি করে মানুষও যেত ডাকও যেত। একে বলত পালকি ডাক। ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন পোস্ট মাস্টার। ১৭৯৬ সালে কলিকাতা থেকে পাটনা পালকি ডাকের হার ছিল ৪০০ সিক্কা টাকা। প্রথমে "পথে কয়েক মাইল অন্তর অন্তর সরাই বা চটি ডাক-বাংলো থাকত। ডাক বাংলোকে এই জন্যই ডাক বাংলো বলা হয়। প্রথম দিকে আসানসোলের পূর্বে মুর্গাসোলের কাছে এমনি একটি চটি ছিল। এই সব চটি বা ডাক বাংলোয় যাত্রীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। পালকি ডাক ছাড়াও পালকি গাড়ি ছিল। এই জি.টি. রোড হয়েই যেত। আগ্রা থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রতি ২০ মাইল অন্তর ডাক বাংলো বা পান্থশালা ছিল। এই গাড়িগুলিকে প্রথমে টানত মানুষ তারপরে ঘোড়ায়।

এইসব কারণে জি. টি. রোড খুব গুরুত্বপূর্ণ যে হবে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এই শহরকে গড়ে তোলার জন্য জি. টি. রোডের ভূমিকা আছে। জি. টি. রোডের ধারে ধারে যে দোকান পাট গড়ে উঠবে তা আর বিচিত্র কি?

আরো একটি কারণ রাণীগঞ্জকে মহকুমা করা। সেখানে এস. ডি. ও. কোর্ট মুন্সেফ কোর্ট এখানের অনেকেই উকিল হন। ওখানে আইন ব্যবসায় করলেও এখানেই এঁরা বাস করতেন। ১৮৬৫ সালে রেল চললে ব্যবসারও সুযোগ বেড়ে যায়।

এবার পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসি।

আসানসোলের বর্তমান স্টেশনটি গড়ে উঠেছে ১৮৮৫ সালে। এবং এই সময়েই ডি. টি. এস. অফিস, লোকো শেড্ কারখানা এবং ইউরোপীয়ন ড্রাইভার, গার্ড, স্টেশন মাস্টার,

অফিসার্সদের বাড়িগুলি গড়ে উঠে। এই রেল কলোনী গড়ে উঠবার আগেই লরেটো কনভেন্ট প্রতিষ্ঠত হয়। সেটা ১৮৭৭। এ থেকে বোঝা যায় ১৮৭৭ সালের আগে কোনো সময়ে ইউরোপীয়রা আসে। এমনও হতে পারে তাঁদের আসার আগেই জায়গা নেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় লরেটো সন্ন্যাসিনীরা আসেন ১৮৪০ সালে। মাদার টেরেসা এই কনভেন্টেই প্রথম আসেন ১৯২৮ সালে। ক্যাথলিক চার্চ যেটি এখন জি. টি. রোডের উত্তরে অবস্থিত সেটি পূর্বে ছিল প্যারোচিয়েল হলে—এখন ঠিক গীর্জা মোড়ের দক্ষিণ দিকে যে বাড়িটি আছে সেইখানে, এটি আনুমানিক ১৮৭২, প্রোটেস্টেন্ট চার্চটি ১৮৮২। এছাড়াও ডুরান্ডের মিনি হলে ছিল আর্মেনিয়ান চার্চ তখন ডুরান্ড হল হয়নি। এদের আসার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোলও বাড়তে থাকে। ১৯০৩ সালে এস. ডি. ও. কোর্ট রাণীগঞ্জ থেকে এখানে উঠে আসে।

আসানসোল পৌর প্রতিষ্ঠান

পৌর কর্মচারীদের কেউ কেউ বলে থাকেন পৌর প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৮৮৫ সালে। এর কোনো লিখিত রেকর্ড পৌর অফিসে পাওয়া যায় না। রাণীগঞ্জে হয়ত পাওয়া যেতে পারে। পৌরসভার কর্তৃপক্ষের উচিত সঠিক সাল তারিখ জেনে নেওয়া। এটা এমন কঠিন কাজ নয়। পৌরসভার অফিসে বোর্ডের যে কার্যবিবরণী (Minutes) লিপিবদ্ধ করা আছে, তাদের শুরু ১৮৯৬ সাল থেকে। কাজেই পৌর প্রতিষ্ঠানের অতীত ইতিহাস ১৮৯৬ থেকে না করে উপায় নেই।

পৌর প্রতিষ্ঠান যদি ১৮৮৫-তেই হয়ে থাকে তবে, তখন তা কাগজেই ছিল। কিম্বা হয়ত কিছু কাজ হলেও সামান্যই হয়েছিল। হয়ত দু-চারটি রাস্তা, দু চারটি পায়খানা ইত্যাদি। তবে ১৮৯৬ সালের আগেই যে এখানে বাজার, ওষুধের দোকান, ডাক্তারখানা, মনোহারী দোকান ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ আছে।

মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত বোর্ড গঠিত হত না। বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কমিশনার সকলেই নিযুক্ত (Appointed) হতেন। বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নিযুক্ত করতেন জিলা শাসক আবার চেয়ারম্যান ভাইস-চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সভ্যদের নিযুক্ত করতেন। অন্তত কার্যবিবরণী থেকে তাই জানা যায়। প্রমাণ স্বরূপ একটি প্রস্তাব হুবহু তুলে দিচ্ছি ১৮৯৬ সালের প্রথম সভার বিবরণী থেকে

Reso 1. After some discussion it was unanimously resolved that Mr. R.S. Highet be appointed Vice-Chairman. Mr. Highet accepted the appointment on the understanding that he should be relieved after few months.

এখানে এমনও বলা নেই যে "ডি. এম.-কে অনুরোধ করা হোক্ নামটি গেজেটে প্রকাশ করতে" এ থেকে কি ধারণা হয়? অবশ্য কয়েক বছর পরে ডি. এম.-কে জানিয়ে দেবার নজির আছে।

বোর্ড যা গঠিত হত তার সভ্যদের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। কখন দেখছি ৬ জন নিয়ে বোর্ড গঠিত হয়েছে কখনো আবার তা থেকেও বেশি। বোর্ডের যে কোনো সভ্য

যে কোনো সময় পদত্যাগ করতে পারতেন আবার যে কোনো সময় নূতন সভ্য গ্রহণ করতে পারতেন। আবার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সব সময়েই ইউরোপীয়েন হতেন। ভারতীয় সভ্যরা নিযুক্ত হতেন বিত্তবানদের মধ্য থেকে। ১৮৯৬ সালের জানুয়ারিতে যাঁদের নিয়ে বোর্ড গঠিত হয়েছিল তাদের নাম দেখলেই তা বোঝা যাবে।

চেয়ারম্যান -- মি. বাশে হায়েট নারলি ম্যাকার্থি

ভাইস চেয়ারম্যান -- মি. আর. এস. হায়েট

বাবু জানকিনাথ মুখার্জী

বাবু গোপাল চন্দ্র মিত্র

বাবু শশীভূষণ রাহা

মুন্সী আজিমুদ্দীন

শেষের ব্যক্তির বানানটি ইংরাজীতে কোথাও আছে Azimuddin কোথাও Asimuddin আবার কোথাও Assimuddin.

এদের মধ্যে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের পরিবর্তন বহু বারই হয়েছে কিন্তু ভারতীয়দের পরিবর্তন হয়েছে একমাত্র মৃত্যু হলে। বাবু জানকিনাথ মুখার্জী ১৯০০ সালে মারা গেলে তাঁর জায়গায় ঈশ্বরী মল মাড়োয়ারীকে নেওয়া হয়। এই ঈশ্বরী মলের নাম কোথাও কোথাও Ihorhimull লিখিত আছে। জি. সি. মিত্র ১৯০১ সালে ভাইস চেয়ারম্যান হন।

ইউরোপীয় সভ্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের পরিচয় কিছু জানা যায় না। হয়ত এঁরা রেলওয়ে অফিসার, নয় কলিয়ারীর অফিসার, নয় কলিয়ারীর মালিক, নয় ব্যবসাদার। নিশ্চিত করে বলার মত কোনো তথ্য নেই।

বাবু জানকিনাথ মুখার্জির পরিচয় জানার চেষ্টা করেছি, পাই নি। বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র হলেন প্রসিদ্ধ ঔষধ ব্যবসায়ী জি. সি. মিত্র। এঁর নামে রাস্তাও আছে। বাবু শশীভূষণ রাহা ছিলেন ধনী ব্যক্তি--যাঁর নামে রাহা লেন। মুন্সী আজিমুদ্দীন মুন্সী বাজারের মালিক।

যেমন যেমন রেল বাড়তে শুরু করেছে তেমনি তেমনি রেল থেকে ইউরোপীয় সভ্য নেওয়া হয়েছে। এঁদের সবাই আসতেন অফিসার শ্রেণী থেকে।

যাইহোক্ এবার বলি মিউনিসিপ্যালিটির পরিসীমা ও ওয়ার্ডের কথা —

প্রথম থেকে মিউনিসিপ্যালিটির পরিসীমা ছিল ২.৫ বর্গ মাইল। এই পরিসীমার মধ্যে ছিল চারিটি ওয়ার্ড। মিউনিসিপ্যালিটিকে চারিটি ওয়ার্ডে বিভক্তি করণ করা হয় ১৯.৩.১৮৯৭ এ ডি. এম. নির্দেশ অনুযায়ী। ডি. এম. তাঁর ৫ই মার্চের ৫২৫ নং চিঠিতে বলেন : To devide the Municipality into 4 Wards on each side of the G.T. Road as shown in the map এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আরও বললেন— "That the following the gentlemen be asked to look after the several words." এ থেকে দেখা যায় ---

১নং ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছে --- মি. নারলি, মি. গ্যাথে

২ নং ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছে -- ডা. বাশে ও জি. সি. মিত্র

৩নং ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছে --- মি. ম্যাকার্থি

৪ নং ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছে -- ডা. বাশে, এস. বি. রাহা, জে. এন. মুখার্জি, মুন্সী আজিমুদ্দিন

এ থেকেও বোঝা যায় ১৮৮৫ সালে মিউনিসিপ্যালিটি হওয়া কি সম্ভব? সন্দেহ হয় না-কি ? ১৮৮৫ সালে মিউনিসিপ্যালিটি হল আর ওয়ার্ড গঠিত হল ১৮৯৭ সালে!

এরপর আরও একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আগে আমি যে বলেছি ১৮৮৫ সালে, যদিই ধরে নেওয়া যায় -- মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম তবু তা ছিল কাগুজে সংগঠন। ১৮৯৬ সালেও মিউনিসিপ্যালিটির ভাড়াটে বাড়িও ছিল না, অফিসও ছিল না, কত হোল্ডিং আছে, কত ট্যাক্স, কনসারভেন্সী স্টাফ্ কেরাণি, ট্যাক্স সংগ্রহকারক ইত্যাদি কিছুই ছিল না। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের মিটিং হত সকালে ডাক বাংলোয়। ১০.১১.১৮৯৬-এর এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

১) হোল্ডিং -এর বার্ষিক মূল্যের উপর সাড়ে সাত শতাংশ হারে মিউনিসিপ্যালটি ট্যাক্স ধার্য করা। মনে হয় মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট (আইন অনুযায়ীই করা হয়। পরে ১৯৩২ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টেও এই হারই দেওয়া হয়)। এরপর মাত্র তিনমাস পরে ৬.২.৯৭-এর সভায় যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় তা নিচে লিখিত হল

১। মিউনিসিপ্যালিটির একটি শীল তৈরী করাতে হবে। (এটি ১৮৮৫ সাল থেকে ছিল না -যদি ১৮৮৫-তেই মিউনিসিপ্যালিটি হয়ে থাকে)

২। ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে বাবু মহেন্দ্র মুখার্জির একটি ঘর মাসিক ২০৲ টাকা ভাড়ায় নেওয়া হোক-- অস্থায়ী ভাবে।

৩। অফিসের আসবাব পত্রের জন্য ৫০৲ টাকা খরচ করা হোক।

৪। (Establishment) এর জন্য নিম্নলিখিত পদগুলির সৃষ্টি করা হল ---

ক) ১জন ওভারসিয়ার মাসিক বেতন ১০০ টাকা

খ) ১ জন ট্যাক্স দারোগা মাসিক বেতন ২৫ টাকা গচ্ছিত রাখতে হবে ৫০০ টাকা

গ) কালেকটিং পিওন ৩ জন প্রত্যেকের মাসিক বেতন ১০ টাকা। গচ্ছিৎত রাখতে হবে ১০০ টাকা।

ঘ) কেরাণি ১ জন। মাসিক বেতন ২৫ টাকা। গচ্ছিত রাখতে হবে ২৫০ টাকা।

এগুলি ছাড়া যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে আছে বাইলস গ্রহণ করা, সিডিউল V অনুযায়ী ঘোড়ার ও অন্যান্য পশুর ট্যাক্স ধার্য করা, গোরুর গাড়ির বাৎসরিক ২ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি ধার্য করা।

এই সভাতেই (Reso. 10) সরকারের নিকট অফিস ঘরের জন্য, ৪টি পায়খানা তৈরীর জন্য, বলদদের থাকবার শেড্-এর জন্য এবং ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড কেনবার জন্য অনধিক ২০,০০০ টাকা ঋণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিউনিসিপ্যালিটির জন্মের ইতিহাস জানতে হলে --- এগুলি প্রয়োজনীয়।

এবার বলি এই মহেন্দ্রনাথ মুখার্জি কে ছিলেন এবং তাঁর কোন্ বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়।

এই শ্রী মুখার্জি হলেন বাঁকুড়া জেলার কাপিষ্টা গ্রামের মানুষ। প্রচুর জমি গ্রামে আছে। মুখার্জিদের মহাজনি কারবার ছিল, সেই কারবারের জন্যই তাঁরা এখানে আসেন। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৯৭ সালের মধ্যে জি. টি. রোডের দক্ষিণ পাশে কয়েকটি পাকা বাড়ি করেন। যেটি গুপ্ত ব্রাদার্সের রেডিওর দোকান, সেইটিই মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। এরই কাছাকাছি যেটিতে এখন মান্না দাঁত চিকিৎসক আছেন সেটি ছিল সাব্ রেজিস্ট্রি অফিস। এ বাড়িটি বোধহয় পলাশডিহার রায়দের।

আমি পূর্বেই ঘরের ট্যাক্সের কথা উল্লেখ করেছি। এবার পায়খানার ট্যাক্স ধার্য হয় হোল্ডিং বার্ষিক, ৩৬/৪ শতাংশ। তখন কুলি ডিপার্ট ছিল রেল পারে, এখনও আছে। এই কুলি ডিপার্টের ইমিগ্রেশন এজেন্ট ছিলেন লোয়ান (Loyan) এবং লেস্‌লি (Leslie)। এই কুলি ডিপোয় যতগুলি কুলির থাকার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি জন পিছু ১ টাকা পায়খানা ট্যাক্স ধার্য করা হয় ১৯.৬ ১৮৯৭ তারিখে এই হার কমাবার জন্য উক্ত এজেন্ট একটি দরখাস্ত করেন কিন্তু তাঁদের দরখাস্ত বাতিল হয়ে যায় এবং ট্যাক্স এক টাকা থেকে বাড়িয়ে ডি. এম. এক টাকা দশ আনা নয় পাই করেছেন। ২৬.৮ ১৯০৯ তারিখে। আরও পরে ৩০০ কুলির হিঃ ৪০০ টাকা ট্যাক্স হয়। শহরের কোনো কোনো অংশকে পায়খানা ট্যাক্স থেকে রেহাই দেওয়া হয় ১৯.৬.১৮৯৭ তারিখে সেগুলি হলো

ওয়ার্ড নং ২, ওয়ার্ড নং ৪-এগুলি ছিল রেলওয়ে ওয়ার্ড, বর্তমানে লোকো কলোনী ও ট্রাফিক কলোনী। জি. টি. রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে ৬০০ গজ আসানসোল গ্রামের পূর্ব পশ্চিমে অন্তর্গত ঘরগুলি ও সমস্ত গ্রাম। রেল কলোনীগুলিকে বাদ দেওয়ার কারণ তখনো কোং কে কত টাকা দিতে হবে তা স্থির হয়নি। রেল কলোনীর ট্যাক্স কনসারভেনসী পায়খানা ট্যাক্স ইত্যাদির জন্য এস-ডি-ও রাণীগঞ্জ একটি সার্ভে করেন এবং একটি রিপোর্ট ১৯০২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে দাখিল করেন, বোর্ড সেই রিপোর্ট গ্রহণীয় নয় বলে মন্তব্য করে, বলেন এই রিপোর্ট ঠিক স্বচ্ছ নয়। পরে এই ট্যাক্স নিয়ে পূর্ব ভারতীয় রেলপথের এজেন্টের সঙ্গে অনেক চিঠি পত্রের আদান প্রদান হয়। শেষে ১৯০৭ সালে কোয়ার্টারলি ৮৩৪ টাকা ধার্য হয়, পরে এটি বেড়ে হয় ৩০০৮ টাকা। পরে আরও বেড়ে যায়।

কাজেই গোরুর গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ফিস ২ টাকা ধার্য হয়েছিল। এতে চাষীদের গোরুর গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ফিস্ লাগবে কি না, তাদের গাড়ি রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে হবে কি না --এইরূপ সন্দেহ থাকার ২৬.৮.১৯০১-এ স্থির হয় যে সব গাড়ি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে চলবে তাদের রেজিস্ট্রেশন ফিস্ দিতে হবে।

সিডিউল -- পাঁচ অনুযায়ী ঘোড়ার গাড়ির ট্যাক্স ধার্য করা হয় ৩০.১২.১৮৯৬ তারিখে। বাজার ট্যাক্স ধার্য করা ৫ টাকা । ১২.৬.১৮৯৭ তারিখে শ্লটার হাউস-এর ফিস্ ধার্য হয় আট আনা।

সেকসন ২৬১ অনুযায়ী আর যাদের ফিস্ ধার্য করা হয় ১৮.১২.১৮৯৭-এ তাদের তালিকা দিই

মাংস বিক্রীর দোকান	—	২ টাকা বার্ষিক
টেনারি	—	৫ টাকা বার্ষিক
সাবান কারখানা	—	৫ টাকা বার্ষিক
ইট্ ভাটা	—	৫ টাকা প্রতি লাখ
চূন ভাটা	—	১০ টাকা প্রতি ভাটা
কাঠ গোলা	—	৫ টাকা প্রতি ডিপো
দাহ্য পদার্থ	—	৫ টাকা
র‍্যাগ স্টোর্স	—	২০ টাকা
হাড় স্টোর্স	—	২০ টাকা

শূকর মালিকের উপর ১ টাকা লেভি ধার্য করা হয় ৩০.৯.১৯০১. তারিখে।

এসব ছাড়া কোনো ব্যক্তি জি. টি. রোডের পাশের কোনো জমিতে ঘর করবার সাজ সরঞ্জাম জমা করে রাখলে তাকে এক টাকা হিসাবে দিতে হত জরিমানা।

আসানসোলে জলকষ্ট প্রথম থেকেই। যে কটি কূপ ছিল তাই মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা হত। মিউনিসিপ্যালিটি বরাবরই জলের জন্য পরের কাছে হাত পেতে এসেছে। ১৯০১ সালে রেল কোং যখন বরাকর থেকে পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে তখন মিউনিসিপ্যালিটি পূর্ব ভারতীয় রেলপথের এজেন্ট এর কাছ থেকে জানতে চায় --- কি শর্তে অর্থাৎ কত টাকায় প্রতি ১০০০ গ্যালন জল তাঁরা দিতে পারেন। এবং দৈনিক ৭৫০০০ গ্যালন নিতে হলে কিই বা দিতে হবে। এর উত্তরে এজেন্ট ১৯০১ সালের জানুয়ারী মাসে জানান প্রতি হাজার গ্যালন ছয় আনা দিতে হবে। মিউনিসিপ্যালিটি পাঁচ আনা দিতে স্বীকৃত হন। এর জবাবে এজেন্ট ১৯০১ সালের আগস্ট মাসে ৫০০০০ গ্যালন দিতে রাজী হন এবং প্রথম ২৫০০ গ্যালন ছয় আনা প্রতি হাজার গ্যালন ও বাকি ২৫০০০ গ্যালন চার আনা ১০০০ গ্যালন হিসাবে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি রাজী হতে পারেন নি। এরপরে দেখছি মিউনিসিপ্যালিটি নিজের জল প্রকল্পের জন্য প্রচেষ্টা করছেন। হিসাব-কিতাবও করা হয়। ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে একটি হিসাব করা হয় এবং তাতে দেখা যায় ৫৪৯৫০ টাকা প্রয়োজন। জলের এই সমস্যা সম্বন্ধে সরকারও অবহিত ছিলেন। রেলের কাছে বার বার জল চাওয়ায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে শর্ত আরোপ করেছে। একবার বললো, তারা যা দেবে -- তা তাদের হোল্ডিং ট্যাক্স পায়খানা ট্যাক্স-এ কাটা যাবে। মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে রেলের কোয়ার্টার্সের এ্যাসেস্‌ম্যান্ট (Assessment) নিয়ে বহুকাল চিঠি চালাচালি হয়েছে। যাক্ মিউনিসিপ্যালিটিকে সরকার এক লাখ টাকা জলের জন্য দিতে চাইলো এবং রেল দিতে স্বীকৃত হল সমস্ত রকমের করের পরিবর্তে ১২০০০ হাজার টাকা। মিউনিসিপ্যালিটিকে যে টাকা সরকার দিতে রাজী হল তার শর্ত ছিল-- শতকরা ৪ টাকা প্রতি বছর সুদ দিতে হবে। প্রতি বছর ৫০০০ হাজার টাকা করে

শোধ করতে হবে এবং ২০ বছরের মধ্যে সব টাকা শোধ করে দিতে হবে (৩১.৭.১৯০৫) ৮.১.১৯০৬ -এ মিউনিসিপ্যালিটি সরকারকে নিয়ম মাফিক ঋণের দরখাস্ত করলো। এবং তাতে বলা হল

জল সরবরাহের জন্য -	৫৪৯৫০
রেলপার বস্তির রাস্তার জন্য মুন্সী বাজারের ড্রেনের জন্য পদ্মতলা রাস্তার জন্য	৪২,৬৭৮

বস্তির বাজারের প্রধান ড্রেনের জন্য ২,৩৭২। জলের জন্য এই যে টাকা -- তা কোনো প্রকল্প গড়ার জন্য নয়।

জলের অভাবে কলেরা প্লেগ ত ছিল প্রতিবছরেরই আশংকা। এর জন্য পরবর্তী কালে অস্থায়ী হাসপাতালও করতে হত। যাক্ জল সমস্যা শেষ করি -- এরপর একেবারেই আমাদের আসতে হবে ১৩.৮.২৭ তারিখে। এই দিন দেখছি পাবলিক হেলথ্ ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে বিস্তৃত পরিকল্পনা স্কীম এসেছে এবং ১১.২.২৮ তারিখে ৪ নং প্রস্তাবে লেখা রয়েছে, সরকারের পাবলিক হেলথের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার ৪,৫০,০০০ টাকার একটি স্কীম পাঠিয়েছেন।

মিউনিসিপ্যালিটি এটিকে গ্রহণ করে কাজে নামেন। দামোদরে পাম্প বসানোর ব্যবস্থা হয় এবং ১২.৫.২৮ তারিখে ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোং লি. সঙ্গে পাম্পিং স্টেশনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার চুক্তিপত্র দিয়ে এগিয়ে যান। এ চুক্তি নিশ্চয়ই ১৯২৮-এর জুলাই এর পর স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৭.৭.২৭ তারিখের একটি প্রস্তাবে দেখছি মি. ই. সি আগাবেগ জলের জন্য ৫০,০০০ টাকা দিয়েছেন। মিউনিসিপ্যালিটি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। এর পূর্বে চারটি ওয়ার্ডের উল্লেখ করেছি। ১৯০৪ সালেও দেখছি সেই চারটি ওয়ার্ড। যেহেতু নির্বাচিত প্রতিনিধি নেওয়ার পদ্ধতি বা আইন ছিল না সেই হেতু বোর্ড বিভিন্ন সদস্যকে এক একটি ওয়ার্ডের দায়িত্ব অর্পণ করত। ১৯০৪ সালের ১২.১২. তারিখে যাদের উপর এই চারটি ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয় তা নিচে দিলাম—

১নং ওয়ার্ড -- ডিস্ট্রিক্ট লোকো সুপারিনটেনডেন্ট ই. আই. আর. ও মুন্সী আজিমুদ্দিন।
২নং ওয়ার্ড — (Assimuddin) ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার ই. আই. আর. ও জি. সি. মিত্র।
৩নং ওয়ার্ড — মিঃ এস. হেস্লপ ও জাহারিমল মাড়োয়ারি।
৪ নং ওয়ার্ড — ডিস্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট ও এস. বি. রাহা।

এ থেকে কোন অঞ্চল কত নম্বর ওয়ার্ড স্পষ্ট করে জানা না গেলেও অনুমান করা যায় ১ ও ৪ নং যথাক্রমে লেকো কলোনী ও ট্রাফিক কলোনী। ২ ও ৩ নং জি. টি. রোডের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত।

যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটির পরিসীমা ছিল ২.২৫ বর্গ মাইল তখন মনে হয় (নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই) ২ নং ছিল জি. টি. রোডের দক্ষিণ পাশের গীর্জা মোড় থেকে আসানসোল গ্রাম নিয়ে রাহা লেন পর্যন্ত, অন্যটি ছিল রাহা লেন থেকে নুরুদ্দিন মিস্ত্রী রোড

পর্যন্ত। ১.৯.১৯০৩ এই সীমা বেড়ে দাঁড়ায় ৩.৭৮ অবশ্য রহিনাড্ডি গ্রাম সমেত। পরে রহিনাড্ডি বাদ গিয়ে সীমা দাঁড়ায় ৩.৭৫।

আসানসোল পরিকল্পিত শহর নয়। যখন যখন মিউনিসিপ্যালিটির সীমার বাইরে ঘর বা বস্তি গড়ে উঠেছে তখন তখন মিউনিসিপ্যালিটি Bengal Municipal Act. অনুযায়ী সরকারকে সীমা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছে। আর শহর বেড়েছে।

রাস্তা

১৮৮৬ সালেই কতগুলি রাস্তা ছিল তার কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় না। তবে বড় রাস্তা যে ছিল না তার প্রমাণ আছে। আমি কয়েকটি বড় রাস্তারই উল্লেখ করবো। তার সঙ্গে যে ক' টি ছোট রাস্তা হয়েছে তাও বলব।

২১.১.১৯০০ তারিখে মিউনিসিপ্যালিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে

Reso. 3. Proposed to make a new rood Parallel to G.T. Road and in continuation of Munsi Bazar Road D.M Was requested to acquire land.

এইটি আগের ডা. নিকলস রোড বর্তমানের নেতাজী সুভাষ রোড।

২৭.৪.১৮৯৯ তারিখে এস. ডি. ও. রাণীগঞ্জকে কুলি ডিপো যাবার রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণ করার অনুরোধ করেন। এই জমি বি. বি. মল্লিকের মোট ৭ বিঘা ১২ কাঠা জমি ২২৯ টাকায় নেওয়া হয়। এবং টানেল থেকে কুলি ডিপো রাস্তা গড়ে উঠে ১৯০২ সালে।

১১. ৮. ১৯০৩ এ তালপুকুর থেকে বুধা রাস্তাটি করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। ১২.৬.১৯০৫ -এ রামগোলাম সিংকে ঠিকা দেওয়া হয় কিন্তু জমি অধিগ্রহণ করে টাকা দেবার সঙ্গতি না থাকায় জমির মালিকদের জমি দান করতে অনুরোধ করা হয়। পরে রাস্তাটি হয়। আগে এ রাস্তার নাম ছিল ইয়ং রোড, বর্তমানে শশীভূষণ গরাই রোড। এই গরাই মহাশয়ই মিউনিসিপ্যালিটির ঠিকাদারও ছিলেন। এই রাস্তাটি প্রস্তুত করার সময়ই বলে দেওয়া হয় যে জি. টি. রোডের সঙ্গে তিনটি রাস্তার সঙ্গে এই রাস্তাটি সংযুক্ত থাকবে। এই তিনটি রাস্তা হল তালপুকুর রোড (যেটি নুরুদ্দিন মিস্ত্রী রোড) আরও দুটি হল জি.সি. মিত্র রোড -- হটন রোড ও বর্তমানে গীর্জা মোড় থেকে বুধা গ্রামের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে। মনে রাখতে হবে তখনো হটন রোড বর্তমানের মেঘনাদ সাহা রোড হয়নি।

১৯০৩ সালের ১৯.১১ তারিখে খালাসিটোলায় একটি রাস্তা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে খালাসিতলা নয়। তলা ও টোলার ব্যুৎপত্তিগত পার্থক্য আছে। টোলা মানে পাড়া। যেখানে বহুলোক একত্রে বাস করে। ছোট পাড়া হলে বলে টুলি। 'তলা'র অর্থ ও পাড়া। তবে এই তলার সঙ্গে কোনো গাছের তলকে বোঝায় না, সেই গাছের শ্রেণীর পাশে যে পাড়া গড়ে উঠে তাকেই বোঝায়। হিন্দি তালাওকেও আমরা তলা করে নিয়েছি যেমন 'পদ্মতলা' কথাটি পদ্মতালাও। তেমনি হবে রামবন্ধু তালাও--'তলা' নয়।

যাক এ প্রসঙ্গ। এখন এই খালাসিটোলা থেকে আমরা জানতে পারি শুরুতে কিছু লোক বিহার বা অন্য কোনো স্থান থেকে রেলে চাকরি করবার জন্য আসেন, সাহেবদের

সঙ্গেও আসতে পারেন, এঁরা খালাসির কাজ করতেন এবং নিজেরাই রেলপারের একটা অংশে বসতি গড়ে তোলেন--সেই থেকে সেটিকে খালাসি টোলাই বলা হত। ১৯০৪ সালের ২৫শে জুলাই ৫ নং প্রস্তাবে ময়লা খাল মহল্লা থেকে পুরোনো রাইফেল রেঞ্জে সাধারণের জন্য নির্মিত পায়খানা পর্যন্ত একটি কাঁচা রাস্তা করা হবে বলে লিখিত হয়। পরে এ রাস্তা হয়েছিল। এখন এই ময়লা খাল মহল্লা কোথায় ছিল জানা নেই।

১৯০৫ সালের ২০শে মার্চ একটি রাস্তার নির্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই রাস্তাটি ঠিক কোনটি বলা যাচ্ছে না, অন্তত আমি ঠিক করে বলতে পারছি না। রেকর্ডে লিখিত আছে— "Road starting from Munsi Bazar latrine through Gangaram Marwari's land to meet the G.T. Road on the north"—এই রাস্তাটি কোন্‌টি তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

১৯০৩ সালের ১১ই আগস্ট পাক্‌কা বাজারের পিছনে একটি রোড করার জন্য ১৭০০ টাকায় জমি নেওয়া আগেই হয়েছিল, এই তারিখে সেই রাস্তা তৈরীর এস্টিমেট গৃহীত হয়। এই রাস্তাটি সম্ভবত যেখানে মুসলীম লীগ অফিসটি ছিল সেই রাস্তাটি।

এরপরে হয়ত আরও কিছু রাস্তা হয়েছে তার রেকর্ড পাওয়া যায় না। ১৯০৭ থেকে ১৯২৬ সালের জুন পর্য্যন্ত নির্ভর যোগ্য রেকর্ডের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য, এই সময়কালের ইতিহাস দিতে হলে বহু সময়ের প্রয়োজন, সে সময় এখন নেই।

এবার সংক্ষেপে রাস্তার নামকরণ কেমন করে হয়েছে সংক্ষেপে বর্ণনা দিই। রাস্তার নাম এখন যে বিবেচনায় দেওয়া হয়, কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বা এমন কোনো ব্যক্তি, যাঁর সমাজে দান আছে, তখন কিন্তু তা দেওয়া হত না। দেখছি দেখেছি যাঁরা কমিশনার ছিলেন, যে ঠিকাদার ছিলেন বা কেউ ড্রেন বা রাস্তার ছাই দিয়ে করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে তার নামেই রাস্তা হত। যেমন যেমন ঘাঁটি গলির নাম ছিল এন. সি. ভট্টাচার্যি লেন, ডা. আর. সি. ব্যানার্জি ১৯০৪ সালে ওই লেনের ড্রেন করে দেবার প্রস্তাব দিয়ে লেনটিকে তাঁর নামে দিতে বলেন, প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং ৯.২.১৯০৪ তারিখে ওই লেনের নাম ডা. আর. সি. ব্যানার্জী লেন হয়।

নুরুদ্দিন মিস্ত্রী ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির ঠিকাদার। তাঁর একটি কারখানাও ছিল। তালপুকুর রোডের ঠিক এখন যেখানে রবীন্দ্র সরণী তার কাছাকাছি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি কারখানা ছিল। ইনি তালপুকুর মহল্লার রাস্তাটি ছাই দিয়ে করে দেওয়ায় তার নামে রাস্তাটির নাম হয় ১৯০৫। এস. বি. রাহা ছিলেন কমিশনার। তিনি তাঁর রাস্তাটির পাকা ড্রেন করে দেওয়ায় রাস্তাটির নাম হয় এস. বি. রাহা লেন। এখন যেটি কেদার মুখার্জি লেন। সেটির পূর্বের নাম ছিল প্রিটোরিয়া লেন। কেদার মুখার্জি এই লেনটিকে তাঁর নামে করবার জন্য দরখাস্ত দিলে, কেদার মুখার্জি লেন করা হয় ৪.৮.১৯০২ তারিখে।

উল্লেখ করতে ভুলে গেছি নুরুদ্দিন মিস্ত্রীর কারখানার সামনে দিয়ে একটি রাস্তা পশ্চিম দিকে আসানসোল গ্রামের মধ্যে গেছে। এল. এম. হাসপাতালের পিছন দিয়ে। সেটির আগের নাম ছিল হরিদাস ভট্টাচার্য রোড। ডা. আর. কে. ব্যানার্জি তাঁর নামে রাস্তাটি করার জন্য দরখাস্ত করলে রাস্তাটির নাম হয় ডা. আর. ব্যানার্জি রোড।

জি. সি. মিত্র ছিলেন কমিশনার। একবার ভাইস চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। তাঁর জীবিত কালেই তাঁর দরখাস্ত অনুযায়ী জি. সি. মিত্র রোড করা হয়।

ইয়ং সাহেব ছিলেন ভাইস-চেয়ারম্যান। তাঁর নামে ইয়ং রোড। ডা. নিকলস্ ছিলেন রেলের মেডিক্যাল অফিসার, তাঁর নামে ডা. নিকলস্ রোড।

সাহারি মল মাড়োয়ারী ছিলেন কমিশনার তাঁর নামে রাস্তাটির নামকরণ।

রেল পারের বসতি এবং ধাদিকা তখনো ভালো করে গড়ে উঠেনি। ধাদিকায় বীরভূম কোল কোম্পানী জায়গা নিলে কুলি ডিপো থেকে রাস্তা আরও উত্তরে যায়। এরপর দেখছি যেমন যেমন বস্তি গড়ে উঠছে বস্তির মানুষ পিটিশন করছে রাস্তার জন্য।

মার্কেট

মিউনিসিপ্যালিটি তাদের মাংস মার্কেট, ফল এবং সবজী বাজার রেলওয়ের কাছে জমি ও টাকা সাহায্য নিয়ে পুরাতন রেস কোর্সের বর্তমান স্টেশন রোডের পশ্চিম দিকের অংশে গড়ে তোলে ১৯০৬ সালের আগেই। তখন ডি. এস. অফিসের রাস্তাও ছিল না। এই বিস্তৃত এলাকা ছিল রেস কোর্স।

রাস্তার আলো

রাস্তায় কেরোসিনের বাতি জ্বলত। এই বাতি সরবরাহ করা পোস্ট দেওয়া, জ্বালানো এবং নেবানোর জন্য ঠিকা দেওয়া হত। এই ব্যবস্থা ১৯২৮ পর্যন্তই চলেছে। প্রথম ঠিকাদার ছিলেন যুধিষ্ঠির গরাই। অবশ্য ১৯০৩ সালের পূর্বে মিউনিসিপ্যালিটিই চালাত। ১৯০৩-এর ১৯.১১ তারিখে এক প্রস্তাবে ঠিকাদারকে দেওয়া হয়। আগে ১৯০৩ সালে প্রতিটি আলোর রেট ছিল দেড় টাকা, ১৯০৪-এর জানুয়ারীতে তা বেড়ে ২ টাকায় হয়।

একটি প্রস্তাবে দেখছি ৩টি ক্ষয়ে যাওয়ায় এবং ৬টি লণ্ঠনের প্রতিটির ৩০ টাকা লাগে। একেবারে ১৯২৬ দেখছি রমেশ চন্দ্র হাজরাকে প্রতিটি আলোর জন্য দুই টাকা এক আনা দেওয়া হত। নির্দেশ ছিল পূর্ণিমার রাতে আলো জ্বলবে না।

১৯২৮ সালে দুটি প্যাট্রোমেক্স কেনা হয় তার একটি জি. টি. রোড স্টেশন রোডের মোড়ে দেওয়া হয়। অন্যটি আরও কয়েকমাস পরে কিনে জি. সি. মিত্র রোড, জি. টি. রোড সার্কুলার রোড মোড়ে দেওয়া হয়।

মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব বাড়ী

মিউনিসিপ্যালিটির অফিস ঠিক কবে হয়েছিল তা বলার মত রেকর্ড নেই। মনে হয় ১৯০৮ থেকে ১৯১৪-১৫ সালের কোনো সময়ে। অফিসের প্রয়োজনীয়তা দারুণ ভাবে অনুভূত হয়। ১৯০৪ সালের ৯.২. তারিখের একটি বিবরণীতে জানা যায় —

অফিসে	-	৯ টি কর্মচারী
কনসারভেন্সীতে	-	৮৯ কর্মচারী

আবার ২৮.১১.১৯০৪ এ সংখ্যা কিছু বেড়ে যায় যেমন —

অফিস	-	৪ জন
কালেকসনে	-	৬ জন

ড্রেনেজ	-	৫ জন
কনসারভেন্সী	-	৪৪ জন (প্রাইভেট প্রিভি)
কনসারভেন্সী	-	২৩ জন (পাবলিক)
রাস্তা সাফাই	-	১৭ জন
ঠিকা	-	৫ জন
জবাইখানা	-	৫ জন
		১০৯ জন

এই কারণে কাজও বাড়ে। স্থির হয় রেল কোং (E.I.R) গঙ্গারাম মাড়োয়ারীর ঘর ও জমিটি অধিগ্রহণ করে মিউনিসিপ্যালিটিকে দিবে (Reso. 8 of 22.8.04) এবং বাড়িটি মিউনিসিপ্যালিটির হাতে এনে ঘরটি ভেঙ্গে দিয়ে তার ইট সুরকি ইত্যাদি রাস্তার কাজে লাগাবে। পরে আরও একটি প্রস্তাবে ঘরটিকে নিলামে বিক্রী করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। আমার মনে হয় বর্তমানের অফিস সেই ঘরেই। তখন মাত্র দক্ষিণ দিকের দুটি ঘর ছাড়া আর ঘর ছিল না। এমন কি গেটও ছিল না। সম্ভবত ঘরটি রেল কোং তৈরী করে দেয়। এর একটি ঘরে ছিল অফিস আর একটি ছিল হল। পরে স্যার আশুতোষ মুখার্জির মৃত্যুর পর ১৪.৮.২৬ তারিখে একটি টাউন হল করার প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং এই হলটির নামকরণ সম্বন্ধে বলা হয় -

That the when Hall extended shall be called the "Ashutosh Memorial Hall"

আরও বলা হয় -- এর জন্য একটি সাব-কমিটি করা হৌক এবং সাধারণের কাছ থেকে সাবস্ক্রিপশন নেওয়া হৌক।

কে কত সাবস্ক্রিপশন (Subscription) দিয়েছিলেন তা জানা যায় না, তবে বলা হয়—

"That the town Hall when built shall beset entirely in the Municipality Plan estimate Rs. 5079/-

শিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি স্কুলকে মাসিক ৮ টাকা থেকে ১০ টাকা সাহায্য দেওয়া ছাড়া ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত আর কিছু হয়নি।

১৯২৬ সালে ৩১.৭ তারিখে নির্বাচিত ও নিযুক্ত কমিশনারদের বোর্ড গঠিত হয়। (এর আগেও হতে পারে, রেকর্ড নেই) যাই হৌক সেই বোর্ডে ৬ জন নির্বাচিত ও ৩ জন নিযুক্ত সদস্যের নাম পাচ্ছি। যাঁরা নির্বাচিত হলেন তাঁরা কোন্ কোন্ ওয়ার্ড থেকে হলেন কতগুলি ওয়ার্ড ছিল কারা ভোট দিল এসব লিখিত নাই। হতে পারে সে রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হৌক যাঁরা এলেন তাঁরা হলেন —

১। কৃষ্ণলাল চ্যাটার্জি
২। ডা. এন. চৌধুরী
৩। মি. ই. সি. এগাবেগ
৪। মি. জে. এ. বার্জ
৫। মি. বামজি -- সুপারিনটেণ্ডেন্ট ওয়ে অ্যাণ্ড ওয়াকর্স (ই. আই. আর)
৬। বাবু হরিদাস মুখার্জি
৭। যোগেন্দ্রনাথ রায়
৮। মতিলাল সিনহা
৯। শুকদেও লাল
১০।মৌলভি আবদুল লতিফ
১১। মৌলভি আবদুল রসিদ
১২।মৌলভি ভোষ্ট মহম্মদ

ভোটে স্থির হয় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন না, নিযুক্ত ব্যক্তি হবেন।

ভাইস-চেয়ারম্যান এর জন্য দুজন প্রার্থী ছিলেন। (১) ডা. এন. চৌধুরী (২) শ্রী যোগেন্দ্রনাথ রায়। যোগেন্দ্রনাথ রায় এক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন এবং ডা. নিশিকান্ত চৌধুরী ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

চেয়ারম্যান হন--এইচ. টাফলেন ব্যারেট আই. সি. এস. ইনি আসানসোলের এস. ডি. ও. ছিলেন।

এই বোর্ডেই চারিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় করার প্রস্তাব নেন এবং বিল্ডিং করার ব্যয় ভার বহন করেন।

চেলিডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় —৮২৬৫ টাকা
বুধা প্রাথমিক বিদ্যালয় —৭৮০৬ টাকা (১৪.৩.২৬)

এর আগেই হয়ত আসানসোল গ্রামের ও ধাদিকায় স্কুল হয়েছে। কিন্তু ২৩.১২.২৬ তারিখেই তাদের প্রথম নামকরণ হয় —

গ্রামের স্কুলের নামকরণ ব্যারেট স্কুল
বুধা গ্রামের স্কুলের নাম হয় কালিপাণ্ডে স্কুল
চেলিডাঙ্গা স্কুলের নাম হয় কারনানি
রেলপারের স্কুলের নাম হয় এগাবেগ।

এঁদের মধ্যে কারনানি ছিলেন কলিয়ারীর মালিক ও ব্যারেট ছিলেন এখানকার এস. ডি. ও. কালিপাণ্ডে একজন ঠিকাদার। এগাবেগ ছিলেন লেঃ কর্ণেল। ইনি এগাবেগের দাদা।

ইতিমধ্যেই প্রবন্ধ অনেক বড়ো হয়ে গেছে। আমার দায়িত্ব ছিল এই পর্যন্তই। সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবার চেষ্টা করেছি। স্বকপোলকল্পিত কোনো তথ্য দেবার চেষ্টা করিনি। যা কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটির একাউণ্টেণ্ট শিবপদ ভট্টাচার্যের সাহায্যে। কিছু কিছু সাহায্য শ্রীরাধারমণ মিত্রের কলিকাতা দর্পণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

□ আসানসোল পৌরসভার বর্ষপূর্তি 'স্মরণিকা', ১৯৮২ □

সুপ্রাচীন বর্ধমান হাসপাতালের ইতিকথা

বর্ধমান ফ্রেজার হসপিটাল

নীরদবরণ সরকার

যুগান্তর আবর্তন বন্ধ থাকেনা। সময় তাই পলে-পলে আবর্তনের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলে, পিছু ফিরে তাকাবার তার অবসর থাকেনা। ইতিহাস বেত্তারা সেই ফেলে আসা দিনগুলিকে নিয়ে 'আখর' কেটে চলেন এই তাঁদের প্রবৃত্তি। আর কিছু লোক 'হরিলুটে'র ফুল বাতাসার মত সাগ্রহে তা কুড়িয়ে নেয়। আমিও সেই 'ফুল বাতাসা' কুড়িয়ে নিয়েছি।

বলছি আজ বর্ধমান হাসপাতালের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কথা। আজকের যে বিশাল 'বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল' শ্যামসায়রের পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শতশত পীড়িত পীড়িতাকে বুকে নিয়ে; কত বিনিদ্র রজনী যাপন করে চলেছে মাতৃ স্নেহে তাদের সেবায়! তারই সূত্র ধরে যদি একশত বছর পিছিয়ে যাই— খুঁজে পাব একটি নাম 'বর্ধমান ফ্রেজার হসপিটাল'। আবর্তনের মধ্যে এসেছে পরিবর্তন। ইংরেজ শাসন মুক্ত হয়েছে ভারত তাই তার নামের পরিবর্তন করে হয়েছে, তার স্রস্টার নামানুসারে 'বিজয়চাঁদ হাসপাতাল'।

ইংরাজী ১৯৫৯ সাল। রাজ্য বিধানসভায় আইন পাশ হল - "The Burdwan University by Act 1959 ঘোষণা করা হল 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। রাষ্ট্রপতি ১৯৬০ সালের ১৯শে এপ্রিল No. 9411, Notification বলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি প্রদান করেন। তারপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ১৯৬৯ সালে এই পীড়িত জন পরিসেবা কেন্দ্রটির নাম হয় Burdwan Universsity Medical College. ১৯৭৬ সাল; ২রা আগষ্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করেন এই পরিসেবা কেন্দ্র। নাম দিলেন - 'Burdwan Medical College'. তারপর 'Hospital' সংযোজন করা হল, আজ যে নামে ডাকছি তাকে - "Burdwan Medical College and Hospital" কিন্তু সেই হারিয়ে যাওয়া নাম, একশো বছর আগে যাকে বলা হত "বর্ধমান ফ্রেজার হসপিটাল?" বলছি তারই কথা।

ইংরাজি ১৯০৬ সাল। তৎকালীন বর্ধমান মহারাজধিরাজ স্যার্ বিজয়চাঁদ মাহতাব ইউরোপ ভ্রমণে গেছেন। তিনি সেখানে ঘুরেছেন বহু স্থান, দেখেছেন বহু প্রতিষ্ঠান। দেখেছেন সেবা প্রতিষ্ঠান, আরও দেখেছেন সেখানকার হসপিটাল। মনে হয়েছে তার বর্ধমানের কথা। উপবব্ধি করেছেন, বর্ধমানেও একটি অনুরূপ সেবা প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই প্রয়োজন। তখন বর্ধমানে মাত্র দুটি চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল। একটি বর্ধমানরাজের ও অপরটি পৌর প্রতিষ্ঠানের বদান্যতায় পরিচালিত হত। মহারাজধিরাজ ঐ দুটি হাসপাতালকে একত্র করে ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক হাসপাতাল করতে মনস্থ করলেন। তিনি তৎকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহারাজ, স্যার এনড্রুজ ফ্রেজার সরকারের সমর্থন পান।

এ সমন্ধে ১৯০৭ সালের ১৩ই জুলাই এক জরুরী সভা আহুত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন, বর্ধমান বিভাগের কমিশনার, তদানিন্তন সরকারের অর্থ-সচিব, অসামরিক হাসপাতাল

সমূহের পরিদর্শক, বর্ধমান জেলা সমার্হতা, সিভিল সার্জেন (অসামরিক শল্য চিকিৎসক), বর্ধমান পৌর প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং মহারাজ স্বয়ং। মহারাজধিরাজ হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ৩০ বিঘার অধিক জমি, গৃহ নির্ম্মাণ বাবদ ৮০,০০০্ (আশি হাজার টাকা নগদ এবং বার্ষিক অনুদান বাবদ ১২,০০০্ (বারো হাজার) টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। পরে বার্ষিক অনুদান ১২,৫০০্ (বারো হাজার পাঁচশো) টাকায় বর্ধিত হয়। তদানিন্তন সরকার গৃহ নির্মাণের জন্য ৪০,০০০্ (চল্লিশ হাজার) টাকা এবং বার্ষিক অনুদান হিসাবে ৯,০০০্ (নয় হাজার) টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। পরে এই অনুদান বর্ধিত হয়ে ৯,২৫০্ (নয় হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা হয়।

এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী 'মেসার্স ম্যাকিনট্স বার্ণ এণ্ড কোং'-কে গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্যার এনড্রুজ ফ্রেজার বর্ধমান পরিদর্শনে এসে ১৯০৮ সালের ১৬ই জুলাই হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু পরে আবার আর্থিক অসুবিধা দেখা দেয়। তখন মহারাজ গৃহ নির্মাণের জমি প্রস্তুত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে আরও প্রায় ২০,০০০্ (কুড়ি হাজার) টাকা প্রদান করেন। দু'বছর পর হাসপাতালের গৃহ নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে হাসপাতালের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়। ১৯১০ সালের ৯ই নভেম্বর স্যার এড্ওয়ার্ড বেকার আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতালের উদ্বোধন করেন।

প্রথমে হাসপাতালটি অন্তর্বিভাগে ১২৭টি শয্যার ব্যবস্থা করা হয় এবং বহির্বিভাগে (Out Door) দৈনিক গড়ে ১৮৬ জন রোগী চিকিৎসিত হত বলাবাহুল্য অন্তর্বিভাগে কোন শয্যাই খালি পড়ে থাকত না।

তদানিন্তন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন বর্ধমানের এই হাসপাতালটি বাংলার (অবিভক্ত) মফঃস্বলীয় হাসপাতাল সমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং কলিকাতার মেডিকেল কলেজের পরেই ইহার স্থান।

তাঁদের রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় ১৯১৪ - ১৫' এই হাসপাতালেই মফঃস্বলের সর্বাপেক্ষা অধিক জটিল শল্য চিকিৎসা সাধিত হয়।

স্যার এড্ওয়ার্ড বেকার "Contagious Word" নির্মাণের জন্য ১১,০০০্ (এগারো হাজার) টাকা প্রদান করেন এবং সরকার আরও ১০,০০০্ (দশ হাজার) টাকা প্রদান করেন ঐ সংলগ্ন 'Pathesical Word' প্রস্তুতি করার জন্য। এই Word টিতে পুরুষ রোগীর জন্য ৬টি শয্যা এবং মহিলা রোগীর জন্য ২টি শয্যার ব্যবস্থা করা হয়। সার্জেন জেনারেল জি. এফ. এ. হ্যারিস. সি. এস. আই. ১৯১৫ সালের ১৩ই ফেব্রায়রি Pathesical Word টির উদ্বোধন করেন ও তাঁরই নাম অনুসরে ওয়ার্ডটির নাম করণ করা হয়।

মহারাজ পরিচালিত পুরাতন হাসপাতালের মহিলা বিভাগটি যথোপযুক্ত না থাকায় ৩৩,০০০্ (তেত্রিশ হাজার) টাকা ব্যায়ে যথেষ্ট আলো বাতাস যুক্ত গৃহ নির্মাণ করান ও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। তবে ঐ ৩৩,০০০্ (তেত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে মহারাজ দেন ১০,০০০্ (দশ হাজার) টাকা, জেলা পরিষদ দেন

৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা এবং বাকি টাকা হাসপাতালের নিজস্ব তহবিল থেকে দেওয়া হয়।

মহামান্যা হেডি কারমাইকেল ১৯১২ সালের ১২ই ডিসেম্বর এই মহিলা বিভাগের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিন বছর পর ১৯১৫ সালের ২০শে মার্চ তিনিই উদ্বোধন করেন। মহিলা বিভাগটির তাঁরই নামানুসারে নামকরণ করা হয়। এই বিভাগে ১৬টি শয্যা, শল্য চিকিৎসাগার ও প্রসব গৃহের ব্যবস্থা থাকে। মহিলা বিভাগ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মেসার্স এ উইং এণ্ড কোম্পানীর উপর।

পরবর্তীকালে হাসপাতালের সমস্ত সম্পত্তি একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে ছিলেন নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

১) মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, বর্ধমান

২) জেলা ম্যাজিস্টেট এণ্ড কালেক্টর (সমাহর্তা)

৩) জেলার অসামরিক শল্যবিদ (সিভিল সার্জেন), যিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট এবং নির্বাচিত সেক্রেটারী।

৪) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা তার মনোনীত একজন সদস্য।

৫) জেলা পরিষদের আর একজন সদস্য।

৬) পৌরসভার পৌরপতি অথবা তার মনোনীত একজন পৌর কমিশনার।

৭) দুজন পৌর কমিশনার।

৮) তিন জন রাজপ্রতিনিধি।

এই হলো "বর্ধমান ফ্রেজার হসপিটালের" ইতিবৃত্ত, স্বাধীনতার পর যার নাম হয়েছিল "বিজয়চাঁদ হাসাপতাল"।

পরিশিষ্ট - ১

বর্ধমান সমগ্র প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র

চিত্রসূচী

পরিশিষ্ট - ২

বর্ধমান সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

চিত্রসূচী

পরিশিষ্ট - ৩

বর্ধমান জেলা সম্পর্কিত প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা

১) বর্ধমানের ইতিহাস — সত্যকিংকর মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৬
২) বর্ধমানের ইতিকথা — নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ১৩২১
৩) বর্ধমান পরিচিতি — অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী, ১৩৭৩
৪) বর্ধমানের ইতিহাস — বলাই দেবশর্মা, ১৯৬৫
৫) বর্ধমান পরিক্রমা — সুধীর চন্দ্র দাঁ, ১৯৯২
৬) বর্ধমান - ইতিহাস ও সংস্কৃতি — যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ১ম খণ্ড, ১৯৯০
৭) বর্ধমান - ইতিহাস ও সংস্কৃতি — যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ২য় খণ্ড, ১৯৯১
৮) বর্ধমান - ইতিহাস ও সংস্কৃতি — যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৪
৯) বর্ধমানের কথা — সুশীল কুমার সেন, ১৪০১
১০) পুরানো বর্ধমানের কথা — সুশীল কুমার সেন, ১৪০৩
১১) বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তি ও সংস্কৃতি — বর্ধমান জিলা পরিষদ, ১৯৯৮
১২) বর্ধমান চর্চা — অভিযান গোষ্ঠী, ১ম খণ্ড, ১৯৯৮
১৩) বর্ধমান চর্চা — অভিযান গোষ্ঠী, ২য় খণ্ড, ১৯৯০
১৪) বর্ধমান চর্চা — পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০১
১৫) বর্ধমান জেলার মেলা-সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা — গোপীকান্ত কোঙার, ১৯৮৫
১৬) বর্ধমান জেলার মেলা : সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ) — গোপীকান্ত কোঙার, ২০০২
১৭) বর্ধমানের বড় মানুষ — সুধীর চন্দ্র দাঁ, ১৯৯৮
১৮) বর্ধিষ্ণু বর্ধমান — হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ১৯৯৮
১৯) বর্ধমান সমগ্র, ১ম খণ্ড — সম্পাদনা গোপীকান্ত কোঙার, ২০০০
২০) বর্ধমান সমগ্র, ২য় খণ্ড — সম্পাদনা গোপীকান্ত কোঙার, ২০০০
২১) জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্ধমান — নারায়ণ চৌধুরী, ১৯৯৬
২২) ছবি ছড়ায় বর্ধমান — সুধীর চন্দ্র দাঁ, ১ম খণ্ড
২৩) ছবি ছড়ায় বর্ধমান — সুধীর চন্দ্র দাঁ, ২য় খণ্ড
২৪) প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা — নীরদবরণ সরকার, ২০০০
২৫) নগর বর্ধমানের দেব-দেবী — নীরদ বরণ সরকার, ১৯৯৯
২৬) সাধক কবি কমলাকান্ত — লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা, ১৪০০
২৭) বর্ধমান গৌরব কাহিনী (১ম সংস্করণ) — সলিল মিত্র, ১৯৮০
২৮) বর্ধমান গৌরব কাহিনী (২য় সংস্করণ) — সলিল মিত্র, ১৯৮২
২৯) বর্ধমান জেলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গে — সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, ১৯৯১
৩০) অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, বর্ধমান- দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ও দেবেন্দ্রনাথ সরকার, ১৩২১

৩১) জনপদ বর্ধমান (১ম খণ্ড) — সম্পাদনা কবিতা মুখোপাধ্যায়, ২০০১
৩২) জনপদ বর্ধমান (২য় খণ্ড) — সম্পাদনা কবিতা মুখোপাধ্যায়, ২০০২
৩৩) পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা — অশোক মিত্র সম্পাদিত, ৫ম খণ্ড, ১৯৮২
৩৪) বাংলায় ভ্রমণ — পূর্ব রেলের প্রচার বিভাগ, ১৯৪০ পরবর্তী শৈব্যা সংস্করণ, ১৯৯৭
৩৫) ডাইরেক্টরী — বর্ধমান, ২য় খণ্ড, ১৯১১
৩৬) পশ্চিমবঙ্গ ও সন্নিহিত অঞ্চলে পর্যটনের আকর্ষণ — চিত্তরঞ্জন মজুমদার, ২০০০
৩৭) Census of Bengal — G. A. Grierson, 1901
৩৮) West Bengal District Gazetteers — Bardhaman, 1994
(Edited by K. R. Biswas, State Editor)
৩৯) Bengal District Gazetteers — Bardhaman, J.C.K. Peterson, 1910
৪০) A Statistial Account of Bengal — Bardhaman, W.W. Hunter, 1976
৪১) District Statistical Hand Book — Burdwan, 1996-97
৪২) District Statistical Hand Book — Burdwan, 1998
৪৩) List of Inportant Fairs and Melas — District Burdwan, Asoke Mitra
৪৪) বর্ধমান জেলা সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ - তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
— পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৩
৪৫) বর্ধমান রাজ বংশানুক্রম — রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, ১৩২১
৪৬) বর্ধমান রাজ — আবদুল গণিখান, ১৯৮১,১৯৮৮
৪৭) বর্ধমান রাজ সভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য — আবদুস সামাদ, ১৯৯১
৪৮) বর্ধমান বন্দনা — কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ১৯৪৭
৪৯) বর্ধমানের সাময়িক পত্র - মননের দর্পণে — কবিতা মুখোপাধ্যায়
৫০) সংস্কৃতির আলোকে বর্ধমান (১ম খণ্ড) — জয়ন্ত সোম, ১৯৯৯
৫১) সংস্কৃতির আলোকে বর্ধমান (২য় খণ্ড) — জয়ন্ত সোম, ২০০১
৫২) বর্ধমান সহায়িকা — বর্ধমান সমাচার,
১৯৯০ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত মোট ৭টি সংস্করণ
৫৩) বর্ধমানের গৌরব — নাগ ও ভট্টাচার্য, ১৯৬৫
৫৪) কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী — মীরা চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৭
৫৫) বর্ধমানেশ্বরী সর্বমঙ্গলা — রতনলাল দত্ত, ১৯৯৭
৫৬) হজরত পীরবাহরাম ও বর্ধমানের নূরজাহান — আবদুল গণিখান, ১৩৭০
৫৭) দেবীতীর্থ বর্ধমান — রতনলাল দত্ত, ১৯৯৯
৫৮) বিস্মৃত রাঢ়ের বিলুপ্ত কথন — নীরদবরণ সরকার, ২০০১
৫৯) দুর্গাপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে — মধু চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১
৬০) দুর্গাপুরের ইতিহাস — প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৮
৬১) আসানসোলের ইতিবৃত্ত — সম্পাদনা নন্দদুলাল আচার্য, ১৯৯৮